একটি নক্ষত্র আসে

অম্বুজ বসু

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

উৎসর্গ

মা ও বাবাকে

বিষয়-সূচী

জীবনানন্দের গ্রন্থগুলির রচনাকাল

বাঁদিক থেকে : লাবণ্য দাশ, মঞ্জুশ্রী দাশ, অমিতানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশ, সমরানন্দ দাশ

ভূমিকা

এক

জীবনানন্দর মৃত্যু হয় ১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে। তাঁর মৃত্যুতে বাঙালী কাব্যরসিক যে কতটা অভিভূত হয়েছিলেন তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় সেদিনের নানারকম সাহিত্যপত্রিকায়। কোনো কোনো পত্রিকায় (বিশেষত যেগুলি নবীন কবিদের রচনাশ্রয়ী) জীবনানন্দ স্মরণে বিশেষ আলোচনার মূল্যবান সমাবেশ হয়েছিল। জীবনানন্দর কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে ধারণা বাঙালী কবি ও কবিতা পাঠকের কিছুমাত্র বদলায়নি বিগত দশ বৎসরে, বদলাবার কোনো লক্ষণ নেই, বরঞ্চ মনে হয় যতই দিন যাবে এই কবিপ্রতিভার মহত্ত্ব অনন্যতা সম্বন্ধে ধারণা ও ব্যাখ্যা ততই বেশি দৃঢ় ও পরিচ্ছন্ন হবে। জনৈক নবীন কবি এ-বিষয়ে যথার্থ বলেছেন :

> "যদি কোনদিন এই ভয়ঙ্কর অপ্রেম-যুগের অবসান হয়ে অন্য নতুন-জীবনের অনুভব মানুষের চেতনায় স্পষ্ট হয়···· সেদিন আমরা জীবনানন্দর কবি-আসনটি অন্য কোন কবির জন্য এই দেশেও রচনা করবো। তার পূর্বে, অন্ততঃ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে, যখন কবিকে অমৃতের পুত্র এবং কবিতাকে মন্ত্র করার মত কোন সুচেতন মুহূর্তই মানব সমাজের মধ্যে স্থির নেই তখন···এই বিষণ্ণ অপ্রেমের মধ্যেও যিনি শিশু-মানুষের নিরপরাধ প্রেম-চেতনাকে কবিতার বিষয় ক'রে গেলেন, তাঁর আসন আমাদের নিজেদের বুকের মধ্যে।
>
> ঃ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "জীবনায়ন"

জীবনানন্দর কাব্য সম্বন্ধে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ব্যাপক ও গভীর বলেই আমার আশ্চর্য লাগে যে, তাঁর কোনো জীবনীগ্রন্থ আজো রচিত হয়নি, তাঁর কাব্যের আলোচনায় কোনো সমগ্র গ্রন্থ নিবেদিত হয়নি, যদিও একাধিক সমালোচনা-গ্রন্থে আধুনিক বাংলা কাব্যের দিঙনির্ণয় কালে জীবনানন্দ সম্বন্ধে পুরো পরিচ্ছেদ নিয়োজিত হয়েছে। আশ্চর্য লাগে, কেননা অন্যান্য কোনো কোনো সাহিত্যের ইতিহাসে প্রিয় কবিদের সম্বন্ধে ভিন্ন আচরণের আভাস পাই। একটা দৃষ্টান্ত দেব। উইলিয়ম বাট্‌লার ইয়েট্‌স্ মারা গিয়েছিলেন ১৯৩৯ সালের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে। চার বৎসর পরেই, ১৯৪৩ সালের

১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, প্রকাশিত হয় জোসেফ হোন্ প্রণীত ইয়েট্‌স্-জীবনী। (বস্তুত গ্রন্থখানা রচিত হয়েছিল প্রায় এক বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ইয়েট্‌সের মৃত্যুর তিন বৎসরের মধ্যে।) ইতিপূর্বে ১৯৪১ সালে কবি ম্যাক্‌নীস্-রচিত "দ্য পোইট্রি অব ইয়েট্‌স্" প্রকাশিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে আমার সতীর্থ অধ্যাপক নর্ম্যান্ জেফার্স ইয়েট্‌সের জীবনী ও কাব্য-ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এরপরে যে ইয়েট্‌স্ সম্বন্ধে কতগুলি প্রবন্ধ এবং গোটা বই লেখা হয়েছে তার হিসেব রাখা গ্রন্থপঞ্জী-কারকের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত ইয়েট্‌স্-প্রীতি ইদানীং কাব্যরসিকের উদার এলাকা ছাড়িয়ে চলে' গেছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মবিচারী অধ্যাপক-সমালোচকের ও পরীক্ষার্থীর সঙ্কীর্ণ স্তিমিতপ্রাণ পাঠকক্ষে। জীবনানন্দর কাব্য এখনো "ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত" হয়নি সেকথা যেমন অপেশাদার কাব্য-পাঠকের পক্ষে সুখের বিষয়, অপরপক্ষে শ্রীঅম্বুজ বসুর গ্রন্থখানি সুধীসমাজে সমাদৃত হওয়া উচিত কেননা কোনো অভূতপূর্ব মত প্রকাশের ও মূল্যায়নের প্রয়াসী না হয়েও এই গ্রন্থখানি জীবনানন্দ সম্বন্ধে প্রথম সমগ্র গ্রন্থ তো বটেই, উপরন্তু (এবং এইটেই বিশেষ প্রশংসার কথা) গ্রন্থখানি শ্রদ্ধাবান অনুরাগী ও সংবেদনশীল চিত্তের পরিচয়। গ্রন্থখানিতে সাধ্য ও সাধনার সুমিতি লক্ষ্য করবার বিষয়। জীবনানন্দর কাব্য পাঠ ক'রে অম্বুজ বসু নিবিড় আনন্দবোধ করেছেন, সে-আনন্দে একই কালে তাঁর আবেগ ও মনন উদ্বেজিত হয়েছে, অতএব সে-আনন্দের পরিচ্ছন্ন সংহত এবং (সংস্কৃত আলঙ্কারিকের অর্থে) সহৃদয় প্রকাশে তাঁর সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি জানেন যে জীবনানন্দ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনার অন্য পন্থাও সম্ভব কিন্তু সে সব পন্থার দিকে তিনি অগ্রসর হননি। তিনি বলছেন, "আমরা জীবনানন্দর জীবনী লিখতে বসিনি।" জীবনী-রচনার আবশ্যকীয় দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি অপর কোনো নিষ্ঠাবান নির্লোভ সাহিত্যসেবীকে আহ্বান জানিয়েছেন। লেখক আরো বলছেন: "জীবনানন্দর প্রতিভার বিচার আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়।" আমার মনে হয়, এটাই সমাচীন যে প্রিয় কবি সম্বন্ধে রচিত প্রথম গ্রন্থটি অনার্দ্র মূল্যায়নে প্রবৃত্ত না হ'য়ে সেদিকে অগ্রসর হয়েছে সেদিকে (জীবনানন্দর নিজ অননুকরণীয় ভাষায়) শ্রেষ্ঠ কাব্যের গভীর ও বিরাট মেঘ-ধবলিমা, কবিতার শান্তি ও মাত্রাচেতনা। ইতিহাসের নিয়ম অনুসারে স্বকালের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দর কাব্য নিকষিত হবে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই হবে। তা' ছাড়া আলোচিত হবে এ কাব্যের নিজস্ব অচ্ছেদ্য দেশকালোত্তীর্ণ মূল্য কোথায় সে-প্রশ্ন, আবার বিশ্লেষিত হবে বাংলা কাব্যের অতীত পরম্পরা এবং কবির সমকালীন সংবেদনার সঙ্গে এ কাব্যের তুলনা কোথায় সে-জিজ্ঞাসা, প্রবহমান বাঙালী ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত হ'য়ে নিবিড় ভাবে অনুষিক্ত হ'য়ে এ-কাব্যের ব্যাপক ঐতিহাসিক মূল্য কোথায় সে-জিজ্ঞাসা। কিন্তু

প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা সেখানেই থামবে না। মহৎ কাব্য তো শুধু গ্রহণই করে না, শুধু ঐতিহ্য ও সমকালীন প্রেরণাপুষ্ট নয়, সে-কাব্য অচিরে নিজেই ঐতিহ্যের ভাণ্ডারভুক্ত হয়। আজকের ও আগামীকালের বাঙালী কবির কাছে জীবনানন্দ নিজেই ঐতিহ্যের প্রতীক। আজকের ও আগামীকালের সক্রিয় কবি তাঁর নিজ অভিব্যক্তিশীল কবি-জীবনের পূর্বস্থরী হিসাবে জীবনানন্দর কাব্য বিচার করবেন। সে-বিচার সশ্রদ্ধ ও সপ্রেম কিন্তু নিষ্করুণ হ'তেও পারে। যে **hungry generation treading down**-এর চিত্র কল্পনা করেছিলেন কীট্স্, সেই তীক্ষনখর জীবনক্ষুধায় জীবনেরই শাশ্বত অস্তি। জীবনানন্দর কাব্যে মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে থাকলে একালের ও আগামীকালের বাংলা কাব্যের মুক্তি না বন্ধন সে-প্রশ্ন অচিরেই উঠবে, দেখতে পাচ্ছি অন্তত একজন এখনই প্রশ্ন তুলেছেন। শ্রীঅশোক মিত্রের একটি প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি উদ্যতপ্রশ্ন বাক্যের উদ্ধার করছি:

> "আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগেকার রবীন্দ্রানুস্মৃতির মতোই, বর্তমানের জীবনানন্দীয় ঘোর, আমার ধারণায়, বাংলা কাব্যকে এক জায়গায় আটকে রেখেছে, জীবনানন্দকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে না-আসতে পারলে মুক্তি অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের সৃষ্টি জ্যোতির্ময়তম, কিন্তু সেজন্যই বলছি, তাঁর সর্বসমাচ্ছন্ন করা প্রভাব পরম সর্বনাশের ব্যাপার।"
>
> : পরিচয়, আষাঢ় ১৩৭২

উত্তরস্থরীর সংবেদনায় মহৎ কবির কাব্য যে-দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব বিস্তার করে, (কখনও বা সে-প্রভাবের পরিণামে চংক্রমিত, অনুকৃতির বিবর্ণ সৃষ্টি-বিফলতা) সে-প্রভাব সাহিত্যের ইতিহাসের চিত্তাকর্ষক প্রস্তাব বটে, এবং উত্তরস্থরীর সৃষ্টিবেদনাপিষ্ট সংবেদনার স্বাক্ষরও বটে, কিন্তু সে-প্রভাবের আলোচনায় কবির কাব্যের স্বরূপ আলোচিত হয় না। বস্তুতঃ ইতিহাসের রসিক পরিহাসে এমন অবস্থাও ঘটেছে যে মহৎ কবির প্রভাব সর্বনাশেরই মূল হয়েছে। মিল্টনের প্রভাব এ প্রসঙ্গে অবধানের বিষয়। সে-প্রভাবে আঠারো-উনিশ শতকে ইংরেজি ভাষায় অনেক মন্দ পদ্য রচিত হয়েছিল। অনুরূপ সূত্রেই পেত্রার্কার অসংখ্য অনুকারকগণ পনেরো ষোল শতকে উজ্জ্বল প্রদীপের চারিদিকে নিরলস ঘূর্ণাবিষ্ট সবুজ পোকার মতো অদ্ভুত আত্মরতির অন্ধ ধাঁধায় ঘুরেছিল। এবং অনুরূপ সূত্রেই শতাধিক বর্ষকাল ইংরেজিভাষায় ওয়র্ডসোয়র্থ-কোলরিজ-শেলি-কীট্স্-ব্রাউনিং-টেনিসন প্রমুখ বহু মেধাবী ও কুশলী কবি কাব্য-নাট্য সৃষ্টির প্রয়াসে শেক্‌সপিয়রের অনুকরণে স্বকীয় সৃজনীবীর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমাদের সমকালে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের ও এলিয়টের দুর্বার প্রভাব কত প্রতিশ্রুতির সংহারের কারণ হয়েছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে পরিণামে ও মূলে সাযুজ্য

নেই, পরিণামের ভয়াবহতায় মূলের দোষ প্রমাণ হয় না। সীতার রূপে লঙ্কা জ্বলেছিল, হেলেনের অগ্নিশিখায় পুড়ে' ছাই হয়েছিল ট্রয়। সেজন্য, ইচ্ছে হয়, দোষ ধরতে পারেন কাম-লালসার, রাবণের ও প্যারিসের। অথবা পরম পৌরুষের অমিত অভিমানে বলতে পারেন, যেমন খৃষ্টীয় ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে নানাভাবে বলা হয়েছে, স্ত্রীলোক থেকেই সর্বনাশ সমুৎপন্ন হয়। বলতে হয় বলুন, কিন্তু এমন কথা বলতে তো পারেন না যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে সীতা এবং হেলেন লঙ্কা ও ট্রয়ের ধ্বংসের জন্য দায়ী। এলিয়ট যখন মিলটন-অনুকারকদের নির্বলতার প্রমাণে মিলটনেরই কাব্য দোষযুক্ত বলে' সাব্যস্ত করেছিলেন তখন তাঁর উক্তিতে যেমন তথ্যাভাব ঘটেছিল, তেমনই অভাব দেখা দিয়েছিল সুযুক্তির এবং সুরুচির। এলিয়টের উক্তির হেত্বাভাস অশোক মিত্রের আর্তনাদে প্রকাশ পায়নি, বরং তিনি তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন একথা বলে, "জীবনানন্দ আমার প্রিয়তম কবি।" কাব্যের শিল্পরূপ ও ঐতিহাসিক রূপ, এই দুই অভিন্ন নয় একথা অশোক মিত্র জানেন। তাঁর উক্তির উল্লেখ করেছি এই কারণে যে যদিও আমার নিজ বিশ্বাসে আজকের, বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের, বাংলা কাব্যে যে শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় তার মূলে জীবনানন্দর 'কুহকিনী' কাব্য নয় ববং সে কাব্যের অমনোযোগী পাঠ, তাহলেও আমি অশোক মিত্রের মূল কথা মানি যে আগামী দিনের মহৎ কবি মহত্ত্ব অর্জন করবেন জীবনানন্দর দ্বারা আচ্ছন্ন থেকে নয়, স্বকীযতায় মুক্তিলাভ ক'রে, যেমন জীবনানন্দ স্বয়ং পরম পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে অনবশেষ শ্রদ্ধান্বিত হয়েও, সে-কাব্যের ঐতিহ্যপুষ্ট হয়েও, সে-কাব্যে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকেন নি। জীবনানন্দর কাব্য যে সমগ্রভাবে মেধার সহিত অধীত হচ্ছে না বরং তাঁর কাব্য সম্বন্ধে একপেশে দৃষ্টিই তাঁর অনুরাগী নবীন কবিদের রচনায় অনেক সময় প্রকট তার প্রমাণ তাঁর কাব্যের একটি উজ্জ্বল আদিম অংশ সম্বন্ধে বহু পাঠকের অমনোযোগ। জীবনানন্দর যে-সচেতনা আমাদের চিত্তে অবশ শিহরণ জাগায়, সেই সুচেতনার মূলে ছিল গভীর লোকপ্রেম, নিবিড় বস্তুনিষ্ঠ বলিষ্ঠ লোকচেতনা। শুধুই ইংরেজি রোমাণ্টিক কাব্যের Man নয়, ব্রাউনিং-উল্লিখিত Men and women। একদা কবি বলেছিলেন:

১। আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার, কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব।

: মৃত্যুর আগে : ধূসর পাণ্ডুলিপি

২। এই বোধ—শুধু এই স্বাদে
পায় সেকি অগাধ—অগাধ!

পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে ?   করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ ?

ঃ বোধ ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি

৩। দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি,—
তবে ঐ পৃথিবীর দেওয়ালের 'পরে
লিখিতে যেয়োনা তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে
অন্তরের কথা।

ঃ স্বপ্নের হাতে ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি

সে ছিল এক অদ্ভুত আলো-আঁধারী কল্পজগৎ কিন্তু সে জগতের ভিত্তিও সুনিষ্ঠ বস্তুচেতনা : পাতা কুটো ভাঙ্গা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত ; খড়-নাড়া-পোড়ো জমি—মাঠের ফাটল,/শিশিরের জল ; পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণ ; শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ ; বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত/এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে। কবি বলছেন "আমরা দেখেছি যারা।" দেখেছি। দর্শনেন্দ্রিয়ের আশ্চর্য তীক্ষ্ণ বিন্দুসংহত অভিজ্ঞায় বিধৃত হয়েছে বস্তুজগৎ, প্রত্যক্ষ জগৎ, এমন কি সর্বদ্যোতক মানুষ-নামা প্রাণীরও জগৎ কিন্তু এখনও বিধৃত হয়নি বিশিষ্ট অনন্য স্বকীয়তা-সম্পন্ন মানুষ-মানুষীর জগৎ। এর পরে হ'ল প্রত্যক্ষজ্ঞাত নিসর্গলোক থেকে প্রত্যক্ষজ্ঞাত মানুষ-মানুষীর লোকে উত্তরণ—জীবনানন্দর কবিসত্তার বিচিত্র অভিব্যক্তিতে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এই লোকে মানুষ-মানুষী ছায়াশরীরী নয়, এরা স্বকীয় নামাঙ্কিত দেহী নরনারী—ইয়াসিন হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ ; গগন বিপিন শশী ; পাথুরেঘাটার মানিকতলার শ্যামবাজারের গ্যালিফ ষ্ট্রিটের এণ্টালীর। এতকাল নিসর্গচেতনা ও মানুষ-চেতনা দুই-ই এক অপার্থিব ধূসরতায়, এক অস্পষ্ট সীমাঙ্কিত কোমলতায়, রঞ্জিত ছিল, নিসর্গবস্তুর অথবা মানুষের যেন স্বতন্ত্র অবয়ব-রেখা ছিল না, মানুষ যেন ইনডিভিজুয়্যল্ ছিল না। এখন মানুষ ইনডিভিজুয়্যল্ হ'ল, প্রত্যেক মানুষের নামধাম বাসস্থান নির্ণীত হ'য়ে তা'রা চারিত্রিক ব্যক্তিত্ব অর্জন করল। "এই সব অণুর মতন/উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত

জীবনগুলো।" অবশ্য সবারই জীবন উপেক্ষিত নয়, এই লোকে বাস করে অনুপম ত্রিবেদী, সুবিনয় মুস্তফী, লোকেন বোস, সোমেন পালিত। আর বেনামী বন্দরের কিছু নামহীন নাবিকও জীবনের সড়কের একপাশ দিয়ে চলে যায় : 'গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী'; 'তিনজন আবো আইবুড়ো ভিখিরী'; 'এক ভিখিরিণী তিনজন খোঁড়া'। কিন্তু অনামা লোকেরও ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট।

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

ঃ রাত্রি : সাতটি তারার তিমির

প্রত্যক্ষজ্ঞাত এই মানুষ-মানুষীর লোকে ইতিহাসাঙ্কিত মানুষের ভিড় : নচিকেতা জরাথুষ্ট্র লাওৎসে এঞ্জেলো রুশো লেলিন, কুইসলিং, হিটলার, কে এম মুন্সী, বীর নরীম্যান। আমার বিশ্বাস যেদিন জীবনানন্দর কাব্যপাঠ আত্মকেন্দ্রিক না হ'য়ে কবিকেন্দ্রিক হবে সেদিন তাঁর কাব্যের নিরন্তর বস্তুনিষ্ঠা উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করবে এবং সে মর্যাদালাভে কবির সম্পূর্ণ মূল্য যেমন হৃদয়ঙ্গম হবে, নবীন কবিদেরও আদর্শ তেমন উজ্জীবনকারক হবে।

দুই

যখন বলা হয় যে জীবনানন্দ ভয়ঙ্কর অপ্রেম যুগের বিষণ্ণ কবি তখন খণ্ডিত দৃষ্টিতে তাঁর কাব্যের মূল্যায়ন হয়। এ যুগের বাঙালী কবি মনে করেন তিনি যন্ত্রণাযুগের কবি যে **Angst**-দ্বারা বিমথিত হয়েছে পশ্চিম ইওরোপের লাঞ্ছিত যুব-হৃদয়, তারই ছোঁওয়া লেগেছে তাঁরও গায়ে, যে **Age of Anxiety** অথবা **Age of Nightmare** হয়েছে প্রতীচ্য সভ্যতার পরিমণ্ডল তার বায়ুস্রোতে চঞ্চল হয়েছে অন্তত বাঙালী জীবন। বিগত আট দশ বৎসরের বাংলা কবিতায় 'যন্ত্রণা' শব্দটি অথবা এই অনুভূতিজ্ঞাপক অনুরূপ শব্দাদি যে কতবার কত ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়েছে তার হিসাব রাখা শুমারনবিশের কাজ। এ যুগের কবির যন্ত্রণাবোধ আমি আদৌ পরিহাসের বা অবিশ্বাসের বিষয় মনে করি না। খুবই সম্ভবত কোনো এক আশ্চর্য বিপর্যয়বোধে, সর্বসত্তাচূর্ণকারী সর্বনিষ্পেষণকারী এক সুতীব্র ক্লেশজ্ঞানে উদ্বেজিত হয় নবীন কবির সৃজনীশক্তি। প্রতীচ্য সমাজে ও বঙ্গীয় সমাজে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনার আনুরূপ্য কতটা, সে আনুরূপ্যে বাঙালী কবির বিপর্যয়বোধ সঙ্গত ও স্বাভাবিক ব'লে সাব্যস্ত করা

যায় কিনা, এসব মামুলি ও হাল্‌কা প্রশ্ন তোলার আমি পক্ষপাতী নই কেননা আনুরূপ্য কখনও নিঃসংশয় অব্‌জেক্‌টিভ্‌ মানদণ্ডে নির্ণীত হতে পারে না পরিজ্ঞাত হয় দ্রষ্টার একান্ত আপন দর্শনক্ষমতায়। অতএব নবীন বাঙালী কবির আত্মচেতনার দাবী মেনে নেব। আর বস্তুত সে-আত্মচেতনা আপাতত আমার আলোচনার অধিগত বিষয়ও নয়। আমার প্রশ্ন জীবনানন্দকে **Angst**-এর কবি বলা সঙ্গত কি না। এ প্রশ্নের স-বিশ্লেষণ উত্তর বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিধিতে সম্ভব নয়, আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর বিশ্লেষণ বর্জিত বটে কিন্তু বিন্দুমাত্র সংশয়ধূমাঙ্কিত নয়। আমার অধ্যয়নের ফলে আমি দেখতে পাই যে যদিচ জীবনানন্দের শিল্পাবেগে সমকালীন জীবনের অনেক রিরংসার বলাৎকারের বীভৎসতার তিক্ত মানস অভিজ্ঞতা এসেছিল, যেসব অভিজ্ঞতার ফলে এই স্পর্শাতুর কবিহৃদয় ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সজারু-কাঁটায় আবৃত করেছিল আপন বিষণ্ণ মমত্ববোধ, যদিচ কামাচ্ছন্ন অর্ধসত্যের অর্থাৎ প্রবহমান ইতিহাসের ইদানীন্তন বিকৃত ব্যাদিত শ্বাপদ হিংস্র করালদংষ্ট্রা চর্বণ করতে চেয়েছে কবির সকল ঐতিহ্যবোধ ও সংস্কৃতি-চেতনা, এবং যদিচ কবির চারিধারে অপহৃত হয়ে' চলেছে মানুষের বিশ্বাস; শিল্পী দর্শনবিৎ ধর্মবিৎ ভেসেছেন লঘুতম প্রচেষ্টার গড্ডলিকা-স্রোতে; যদিচ সৎ শুভ আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন লোক খুঁজতে গিয়ে অনুসন্ধানীর চোখে ছানি প'ড়ে যায়, তবুও কবির বলিষ্ঠ অমল জীবনবোধ নেতিবাদী নয়, বরং সদর্থক জ্ঞানে অশুভের ওপারে শুভের পানে অভিসারী। অসৎ থেকে সতে, তমসা থেকে জ্যোতিতে, নেতি থেকে অস্তিতে, যে এক মহান অভিগমন লক্ষণীয়, জীবনানন্দের কাব্য বিবর্তনে তার প্রথম পর্যায় অনুধাবন করুন :

> বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
>
> *   *   *   *   *   *
>
> সে-সব সন্তান আজ এ-যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ়
> ক্লান্ত লোক সমাজের ভিড়ে চাপা প'ড়ে
> মৃত প্রায়, আজকের এই সব গ্রাম্য সন্ততির
> প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে—অন্ধকারে জমিদাদের
> চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমাযে গিয়েছে।
> ওরা খুব বেশি ভালো ছিলো না, তবুও
> আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতায়
> অন্ধ শতছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে
> পৃথক আর-এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিলো।

: ১৯৪৬-৪৭ : শ্রেষ্ঠ কবিতা

রূপসী বাংলার আজ এই হাল! আমাদের প্রগাঢ় প্রপিতামহগণ, 'ওরা খুব বেশি ভালো ছিলো না', কিন্তু তারা অন্তত আজকের কাফ্‌কা-জগতের চেয়ে স্পষ্টতর জগতের অধিবাসী ছিল।

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তা'রা
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিম্বা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

ঃ অদ্ভুত আঁধার এক : শ্রেষ্ঠ কবিতা

—আতুর বিমথিত প্রাণের ক্রমধ্বস্ত উপলব্ধি। যতদূর দৃষ্টি যায়, ইতিহাসের ক্রম-বিলীয়মান পশ্চাতের দিকে যখন তাকিয়ে দেখেন কবি (এবং আমরাও দেখি), সুপ্রাচীন যুগ থেকে গতকাল পর্যন্ত বিবর্তিত সময়ের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও কর্ম যখন স্মরণ করেন কবি (আমরাও করি), তখন আত্মস্থ থাকা যায় না এই ভাবলে যে সমস্ত ঐতিহ্য যেন কোন্ ক্রূর দানবের হাতে লণ্ড ভণ্ড হ'য়ে গেল! কিন্তু জীবনানন্দ এই উপলব্ধির উষর বন্ধ্যা জমিতে প্রস্তরীভূত হ'যে রইলেন না মহীনের অপ্রাকৃত ঘোড়ার মতো। তাঁর কম্প্র সংবেদনা, তাঁর সংহত মেধা ও মনন এগিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে।

"সাহিত্যকে যদি যুগের দর্পণ হিসেবেই শুধু স্বীকার ক'রে নেয়া যায়, একটা ক্ষয়িষ্ণু যুগের নির্মম দর্পণ হয়েও সাংবাদিকী ও প্রচারধর্মী রচনার সঙ্গে কবিতার পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত জিনিসগুলোর ভিতর অভিজ্ঞতা-বিশোধিত ভাবনা-প্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতি কিছুই নেই, কবিতায় তা আছে * * * সমাজ ও ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতা দোষে দুষ্ট হ'লেও সাহিত্য তার ভিতরে লালিত হয়ে'ও যদি তাকে প্রয়োগ-প্রতিভার শেষ বৈচিত্র্যে কোনো না কোনো এক রকম সঞ্চার, ইঙ্গিতের দিব্যতা না দিতে পারে তাহ'লে তা শ্লেষ বা ধ্বংস বা গঠনাত্মক গুরুতর প্রবন্ধ বা প্রচারপত্র হতে পারে, কিন্তু তাকে কাব্যসৃষ্টি বলা যেতে পারে না।"

ঃ রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা : কবিতার কথা

কিন্তু এ-প্রত্যয় অর্জন করা সহজ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তিনি ভেবেছেন "অভিজ্ঞতাবিশোধিত ভাবনা-প্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতির" কথা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতে তাঁকে লিখেছিলেন এই কথা :

অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হ'য়ে ওঠেন,—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হ'য়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা **serenity** জিনিষটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরণের সুর আছে সেখানে কাব্য অক্ষুণ্ণ হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। দান্তের **Divire Comedy**-র ভেতর কিম্বা শেলীর ভেতর **serenity** বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে ব'লে মনে হয় না। আমার মনে হয় বিভিন্ন রকমের বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানা সময় নানা রকম **moods** খেলা করে।···**Mood**-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্ব'লে ওঠে তাতে **serenity** অনেক সময়েই থাকে না—কিন্তু তাই ব'লেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হ'য়ে উঠতে পারবেনা কেন বুঝতে পারছি না।

: চিঠিপত্র : "ময়ূখ," জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৬১

জীবনানন্দ-কাব্যের অভিব্যক্তির একটি মস্ত কথার আভাস এই উদ্ধৃতিতে পাওয়া সম্ভব। জীবনানন্দর কাব্য নিবিড় অর্থে **Poetry of tension**, যে-কাব্যে কবিচিত্তে যুগপৎ সঞ্চরমান একাধিক আবেগের ও মননের আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণে একাধিক বোধের দোটানায় অথবা বহুটানায়, একটা প্রচণ্ড আলোড়ন উদ্ভূত হয়, সেই আলোড়নই এই কাব্যের সর্বধাত্রী প্রেরণা। যতক্ষণ না এই টেন্‌শন্ একটা বহিরঙ্গ কর্মে (অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে কবিকর্মে) নিযুক্ত হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ না অন্তরস্থিত আবেগ বহিরাশ্রয়ী হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কবির শান্তি নেই। অশান্তিতে এ-কাব্যের জন্ম, সৃষ্টির বেদনার্ত শ্রান্তি, ক্লান্তি ও শান্তিতে এর অবশেষ। অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, উদ্বেল, আলোড়িত উন্মথিত চিত্ত শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয় শান্তিতে আত্মস্থতায়, ভারসাম্যে। ডক্টর আইভর্ রিচার্ডস্ শিল্পকর্মের যে বহুমানিত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তদনুসারে শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিল্পী স্বয়ং এবং শিল্পগ্রাহীও একটা আত্মিক **balance of opposites** অনুভব করেন, কতকগুলি বিপরীত প্রবৃত্তির এক ভারসাম্য লাভ করেন। সৃষ্টির পূর্বে প্রবৃত্তিগুলি ছিল এলোমেলো, উত্তাল। সৃষ্টিক্রিয়াকালে একটা প্রচণ্ড সকর্মক শক্তির চাপে (এই শক্তিকেই ইংরেজিতে ইম্যাজিনেশন, সংস্কৃতে প্রতিভা বলা হয়েছে) প্রবৃত্তিগুলি সংযত সুশৃঙ্খল হ'য়ে যায়, কল্পনার নীহারিকাপুঞ্জ সুঠাম রূপ গ্রহণ করে। বিশৃঙ্খলা থেকে সুশৃঙ্খলায়, নীহারিকা থেকে গ্রহরূপে, বিমূর্ত থেকে মূর্তিতে, অশান্তি

থেকে প্রশান্তিতে এই যে রূপায়ণ তারই উপলব্ধি হচ্ছে শিল্পের আনন্দ। এই রূপায়ণই ছন্দ, সুর, ভাস্কর্যের সিমেট্রি বা সাম্য, চিত্রের ও স্থাপত্যের সুঠাম সুষমা। এই অর্থে জীবনানন্দর কাব্য **Poetry of tension**, একটা আবেগব্যাকুল ভাববিচল উন্মন্থন; উপরে উধৃত বাক্যগুলির প্রথম বাক্যটি আবার লক্ষ্য করুন। জীবনানন্দ বলছেন, "দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না।" এ যেন সেই প্রাচীন গ্রীকদের প্রতিহিংসা-সাধিনী দুর্বারবেগ নিষ্করুণ অর্ধদেবিগণ, ইউমেনাইডিস্ বা এইরিনাইএস্, যারা তাদের লক্ষ্যভূত মানবকে (যেমন অরেস্টেস্‌কে) নিরন্তর তাড়নায় অভিভূত ক'রে থাকে। কবিচিত্তের টেন্‌শন্ এই এইরিনাইএস্-এর তুল্য, সেই টেন্‌শন্ কবিকে তাড়না ক'রে চলে যতক্ষণ না তিনি শিল্পক্রিয়ায় রত হ'য়ে শিল্পকর্মের সিদ্ধিতে আপন চিত্তের সংযম ও ভারসাম্য লাভ করেন।

জীবনানন্দ তাহ'লে টেন্‌শন্-এর কবি। রবীন্দ্রনাথকে তিনি একথাই বলতে চেয়েছিলেন যে তাড়না থেকেও কবিতার জন্ম হয়।

তিন

কিন্তু জীবনানন্দ টেন্‌শনের কবি, মাত্র এই কথাটি বলার জন্য উপরের দীর্ঘ বাক্যস্তবকের অবতারণা করিনি। আমার বিশ্বাস (সে বিশ্বাসেরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও প্রামাণ্য উধৃতি এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়, এখানে অনেকটা যেন সমালোচন-অসঙ্গত আপ্তবাক্যেই ক্ষান্ত থাকছি), আমার বিশ্বাস জীবনানন্দ-কাব্যের অভিব্যক্তির আর একটি উজ্জ্বল ও অনুপম স্বাক্ষর পাই অন্য এক গতিতে। জীবনানন্দর কাব্য টেন্‌শন্ থেকে মুক্তি লাভ ক'রে প্রশান্তিতে পৌঁছল, এই গতিতে। জীবনানন্দ উপরে উধৃত কথাগুলি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের যে-চিঠির জবাবে সে-চিঠিতে **serenity** সম্বন্ধে কী বলা হয়েছিল তা জানিনা, রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানিনা, আদৌ বিদ্যমান কিনা না চিরতরে হারিয়ে গেছে তা-ও জানিনা। কিন্তু জীবনানন্দর জবাব প'ড়ে মনে হয় হয়তো জ্যেষ্ঠ কবি বলেছিলেন যে কনিষ্ঠের কবিতায় প্রশান্তির কিছু অভাব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন; হয়তো তিনি আরও বলেছিলেন যে প্রশান্তির অভাবে কাব্য সুন্দর ও স্থায়ী হ'য়ে উঠতে পারেনা। জীবনানন্দর জবাবের মূলকথা যে প্রশান্তি ছাড়াও তো মহৎ সুন্দর স্থায়ী কাব্য পৃথিবীতে জন্মেছে। এই ব'লে তিনি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন গ্রীক কাব্যের, দান্তের, পরে বীঠোফেনের।

এই পত্রটি লেখা হয়েছিল ইংরাজী ১৯৩৭ সনে। (এই তারিখ আমার অনুমান

মাত্র। "ময়ূখ" সম্পাদক তারিখ সম্বন্ধে অনিশ্চিত।) এর পরে এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দর আরো পত্র বিনিময় হয়েছিল কিনা জানিনা। কোনও রকম ধ্রুব বহিঃপ্রমাণের অভাবে আমি কেবল আমার কাব্যচেতনার নির্ভরে একটি কথা বলব। কথাটি আমার অনুমান যে যদিচ এই চিঠিতে জীবনানন্দর প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে যে প্রশান্তির অভাবেও সংকাব্য সম্ভব, তবুও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আমার অনুমান যে (দ্বিতীয় মহাসমরকালীন ও পরে দেশান্তরকালীন কবিতাগুলিতে তদানীন্তন বঙ্গসমাজের ও বৃহত্তর পৃথিবীর চরিত্রে ভ্রষ্টতা, আদর্শহানি ও সর্বৈব মিথ্যাচার লক্ষ্য ক'রে এই মেধাবী কবি যে-নিগূঢ় বেদনা ও অনাস্থা বোধ করেছিলেন, যে-তিক্ত বেদনা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাভাষার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রতীকী স্যাটায়ারে, সে বেদনার নেতিবাদে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই নেতিবাদী ক্লিষ্ট রুষ্ট ব্যঙ্গের দুইটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন:

১।　নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

: রাত্রি : সাতটি তারার তিমির)

২।　আপিলা চাপিলা
রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেড্‌বাস্কেট খেলো শেষে।
এরা সব নিজেদের গণিকা, দালাল, রেস্ত, শক্রর খোঁজে
সাতপাঁচ ভেবে সনির্বন্ধতায় নেমে আসে,
যদি বলি, তারা সব তোমাদের চেয়ে ভালো আছে,
অসৎ পাত্রের কাছে তবে তারা অন্ধ বিশ্বাসে
কথা বলেছিল দুই হাত সতর্কে গুটায়ে
হয়ে ওঠে কি যে উচাটন!
কুকুরের ক্যানারির কান্নার মতন:
তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি-ঘায়ে।

: সৃষ্টির তীরে: সাতটি তারার তিমির

তীব্র স্যাটায়ার। এ যেন জোনাথান সুইফ্‌ট্-কথিত ইয়াহু ও হুইহ নিহ্‌মদের জগৎ, জর্জ অরওয়েল-কথিত জানোয়ার-উপনিবেশ, অথবা পল ন্যাশ-অঙ্কিত বা রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত বিভীষিকার উল্কি মাখা অপ্রাকৃত অবপ্রাণীর জগৎ। মানুষের পৃথিবী যেন বিপর্যস্ত হ'য়ে গেছে এই বিপর্যয় বোধ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন সমসাময়িক পৃথিবীর

অনেক কবিই। তাঁরা অনেকেই উত্তরণ করেছেন কোনো না কোনো বিশেষ মতবাদের ভেলায়, চিন্তার ও সিদ্ধান্তের দায়িত্ব অপরে সমর্পণ করেছেন—আমাদের দেশের কবি, বিদেশের কবি। কিন্তু "তার প্রতিভার কাছে কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে।" জীবনানন্দর প্রতিভানিষ্ঠা একান্ত অমলিন। শকুন্তক্রান্তির কলরোলে যে-প্রলোভন সর্বাধিক মায়াময়—ছক-কাটা প্রত্যয়ের মসৃণ হাতে আত্মসমর্পণের প্রলোভন—সে প্রলোভনে জীবনানন্দ পথভ্রষ্ট হননি, আত্মপ্রতারণায় বিলোলপ্রজ্ঞ হননি। পুরোপুরি নির্মল ও নিঃসংশয় প্রত্যয়ে স্থিতধী, হওয়ার পূর্বেই মহাকাল তাঁকে টেনে নিয়েছিল কুয়াশার ওপারে, সে জন্যই শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যে থেকে থেকেই তাঁর ক্লিষ্ট বিপর্যস্ত আত্মার আর্তি রূপ পেয়েছে কিন্তু তবুও শেষ দিককার কাব্যে তিনি যে এক অন্তর্দীপ্ত স্থিরতা ও প্রশান্তি অর্জন করেছিলেন সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। জীবনানন্দ বলেছেন :

রাত

এখনো রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম
রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে-মাঝে বুদ্ধ সোক্রাতেস্
কনফুচ লেলিন গ্যেটে হোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে
আলোকিত হতে চায় ;—বেলজেনের সব-চেয়ে বেশি অন্ধকার
নিচে আরো নিচে নিচে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাকে ,
পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে
তবুও ফেনার ঝর্ণা,—রৌদ্র প্রদীপ্ত হয়,—মানুষের মন
সহসা আকাশ পথে বনহংসী-পাখির বর্ণালি
কী রকম সাহসিকা চেয়ে দেখে,—সূর্যের কিরণে
নিমেষেই বিকীরিত হয়ে ওঠে ;—অমর ব্যথায়
অসীম নিরুৎসাহ অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায় মানবের
ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত নাকি ? তবু, অগণন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

: পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে : বেলা অবেলা কালবেলা

এই অগ্রসর হওয়ার, এই অগ্রগমনের, কোনো বিশিষ্ট গতিভঙ্গী আছে কি ? "চরৈবেতি", "Excelsior", "আগে চল আগে চল ভাই," "কদম কদম বঢ়ায়ে যা"—কতরকম বাক্‌ভঙ্গীতে একই আহ্বান এসেছে মানুষের কাছে সময়ের অন্তিম ধূসর

রাজবর্ত্ম বেয়ে। আহ্বানের যাথার্থ্য নিয়ে সংসারে দ্বিমত নেই। সঙ্কট উপস্থিত হয় কোন্ উপায়ে অগ্রগমণ করব তাই নিয়ে। আর বস্তুতঃ এই উপায় সম্বন্ধে অস্পষ্টতা থাকলে আহ্বানের শক্তিশালিতা কমে যায়। শেলির বিপ্লবী মনোভাব শ্রদ্ধার্হ কিন্তু বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অতি অস্পষ্ট ধারণাগুলি অনেক মেধাবী পাঠক চিত্তে বিরাগ জন্মিয়েছে। অগ্রগমণের গতি সম্বন্ধে জীবনানন্দ কোন্ ধরণের চিন্তা করতেন তার বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য লিখিত সাক্ষ্য আমি পাচ্ছিনা "সাতটি তারার তিমির" গ্রন্থের একটি স্মরণীয় স্তবক ছাড়া :

> অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
> যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই ;
> কোথাও আঘাত ছাড়া —তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর
> সূর্যালোক নেই।
> হে কালপুরুষ তারা, অনন্তদ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
> কেবলি গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই
> স্বচ্ছন্দ উৎসবে ;
> নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলন সূর্যে মানবিক রণ
> ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয়
> মিলন ?
>
> ঃ সময়ের কাছে : সাতটি তারার তিমির

আঘাতেই জীবন, দ্বন্দ্বে জীবন, গতিই জীবন। জীবনই চলমান, জীবনই আহত হ'তে পারে, জীবন তো দ্বন্দ্বের সমার্থ। অতএব গতি দ্বন্দ্ব ও আঘাতের মধ্য দিয়েই জীবন আপনাকে সার্থক করবে, মিলনের স্বচ্ছন্দ উৎসবের পানে এগোবে। —এই ধারণার পশ্চাৎপটে সুপরিচিত দার্শনিক তত্ত্ব। আমাদের উপনিষদে আছে, আছে আমাদের মহাকাব্যে। পাশ্চাত্য জগতে প্রাচীন ও মধ্য যুগে ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ নামক যে ক্ষুর-ধার তর্কশাস্ত্র প্রচলিত ছিল তারও গোড়ার কথা দ্বান্দ্বিক দর্শন। পরবর্তী কালে হেগেল এই দ্বান্দ্বিক দর্শনের মুখ্য উদ্গাতা হ'য়ে ওঠেন। এবং তাঁর দার্শনিক প্যাটার্ণের ভিত্তিতে মার্ক্‌সবাদ দণ্ডায়মান। অপর পক্ষে গতিদর্শন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তার ঐতিহ্যে আবহমান কাল থেকেই প্রবল। এযুগে রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তার শ্রেষ্ঠ ধারক।—জীবন-নিহিত আঘাত এ-ও পুরনো চিন্তা, গৌতম বুদ্ধের দুঃখবাদের গোড়ার কথা, খৃষ্টীয় 'প্রব্লেম অফ্ ইভ ল্'-এর ও গোড়ার কথা, তাছাড়া উনিশ শতকে ডারুইনের বিচারে এ চিন্তা নতুন রূপে দেখা দিয়েছিল। জীবনানন্দ সুপাঠক ছিলেন, চিন্তাশীল ছিলেন, স্বল্পবাক 'ইন্‌ট্রোভার্ট' বা অন্তরাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও

সমকালীন সংসার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। দ্বন্দ্ব-আঘাত-গতির ধারণা তিনি কি বাইরের অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ দর্শন-অধ্যয়ন থেকে অথবা সমকালীন কোনো আন্দোলন বা প্রচার থেকে? না কি তাঁর চেতনা যতই গভীর থেকে গভীরতর হ'তে লাগল, ব্যক্তিস্বরূপের বহিঃস্থিত যাবতীয় বিষয় ব্যক্তিস্বরূপেরই ক্রমোজ্জ্বল বর্তিকায় আলোকিত হ'তে লাগল, ততই এই দ্বন্দ্ব-আঘাত-গতির ধারণা সুপ্রতিষ্ঠ হ'তে থাকল?—প্রশ্নগুলির উত্তর আমি দিতে পারব না, কোনো সহায়ক তথ্য আমার আয়ত্তে নেই। কিন্তু সম্ভবতঃ এ হেন তথ্য অনাবশ্যক। তথ্যের সাহায্যে বড় জোর এইটুকুই বলতে পারব যে জীবনানন্দ এ সব ধারণা আহরণ করেছিলেন অমুক গ্রন্থ থেকে অমুক দর্শন থেকে অথবা একান্তই নিজ অপ্রভাবিত চেতনা ও সংবেদনা থেকে। বলতে পারব না কোন্ উপায়ে বিমূর্ত ধারণা গ্রহণ করল কাব্যের শরীর, অথচ কাব্যই তো আসল বস্তুটি, অন্য সব কথাই কাব্যাস্বাদের প্রস্তুতি মাত্র। সুতরাং যে-তাবৎ না কোনো নিঃসংশয় তথ্যের নির্ভরে বিশ্বাস করতে পারি যে জীবনানন্দর চিন্তার উৎস বহিঃস্থিত, ততদিন আমি বরং বিশ্বাস করব যে তাঁর গতি-দ্বন্দ্ব-আঘাত-ছন্দিত জীবনবোধ তাঁর নিজস্ব সকর্মক চেতনা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। বস্তুতঃ জীবন মানেই যে গতি দ্বন্দ্ব আঘাত, এই ধারণা কবির অনেক আগেকার রচনায়ও প্রকাশ পেয়েছিল, যদিচ এমন মেধাবী বচনে নয়! "জীবন" কবিতার একটি স্তবক তুলছি:

> যতদিন রয়ে যাই এই শক্তি রয়ে যায় সাথে,—
> বিকালের দিকে যেই ঝড় আসে তাহার মতন!
> যে-ফসল নষ্ট হবে তারি ক্ষেত উড়াতে ফুরাতে
> আমাদের বুকে এসে এই শক্তি করে আয়োজন!
> নতুন বীজের গন্ধে ভরে দেয় আমাদের মন
> এই শক্তি,—একদিন হয়তো বা ফলিবে ফসল!—
> এরি জোরে একদিন হয়তো বা হৃদয়ের বন
> আহ্লাদে ফেলিবে ভরে অলক্ষিত আকাশের তল!
> দুরন্ত চিতার মত গতি তার,—বিদ্যুতের মত সে চঞ্চল!

: জীবন : ধূসর পাণ্ডুলিপি

গতিময়, দ্বন্দ্ব ও আঘাতময়, জীবনবোধের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়েছে কবির ইতিহাস-চেতনা। ইতিহাস-চেতনায় নিহিত তাঁর শুভ্র আশার বীজ, কোনো সাজানো মতবাদের কেয়ারি-করা জমিনে নয়। ইতিহাস-চেতনা মানে কোনো সরলরেখ বা চক্রবৃত্ত বা কম্বুরেখ নিয়তির নিয়মে প্রত্যয় নয়। জিয়মবাটিষ্টা ভিকো বা হেগেল

বা স্পেংলার বা টয়নবি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গভীরে যে সব পুনরাবৃত্ত নিয়ম বা ছন্দ লক্ষ্য করেছেন তেমন কোনো অবশ্যমান্য বিশ্বাস আমাদের কাছে উপস্থিত করেননি কবি। তাঁর ইতিহাস-চেতনা পুরোপুরি কবিমানসিক, অর্থাৎ তত্ত্বমুখর নয় অনুভূতি নির্ভর, যুক্তি সাপেক্ষ নয় বাক্‌প্রতিমায় বিধৃত। আবহমান ইতিহাসের বঙ্কিম বন্ধুর পথে তিনি কয়েকটি আলোক-বর্তিকা দেখেছেন—নচিকেতা বুদ্ধ ঈশা··· গান্ধী, এই সব বর্তিকায় উদ্ভাসিত হয়েছে মানবিক জীবনধারার প্রকৃত অর্থ। এই সব বর্তিকা যেন সহস্র ঝঞ্ঝার ঊর্ধ্বে কোথাও নিবাত নিষ্কম্প শিখা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং আজো যে এই নিটোল পবিত্র পরম্পরা অব্যাহত আছে তার প্রমাণ গান্ধীজীর জীবন। 'মহাত্মা গান্ধী' শীর্ষক কবিতায় কবি বলছেন :

> এই অন্ধ বাত্যাহত পৃথিবীকে কোনো দূর স্নিগ্ধ অলৌকিক
> তনুবাত শিখরের অপরূপ ঈশ্বরের কাছে
> টেনে নিয়ে নয়—ইহলোক মিথ্যা প্রমাণিত ক'রে পরকাল
> দীনাত্মা বিশ্বাসীদের নিধান স্বর্গের দেশ ব'লে সম্ভাষণ ক'রে নয়—
> কিন্তু তার শেষ বিদায়ের আগে নিজেকে মহাত্মা
> জীবনের ঢের পরিসর ভ'রে ক্লান্তিহীন নিয়োজনে চালায়ে গিয়েছে
> পৃথিবীরই সুধা সূর্য নীড় জল স্বাধীনতা সমবেদনাকে
> সকলকে—সকলের নিচে যারা সকলকে সকলকে দিতে।

: মহাত্মা গান্ধী : বেলা অবেলা কালবেলা

ইতিহাসের বর্তমান সর্গে, জীবনানন্দ বলছেন : "চাই শান্তি পর্ব ও সুসীম আস্তিক্যের সুর"। অনেক বিক্ষোভ সত্ত্বেও, "যতদূর দৃষ্টি যায় জীবনের ও ইতিহাসের সত্যের ওপিঠ ও এপিঠের অন্তিমবর্ণে নিজেকে—মানবকে ফলিয়ে তুলে—তবুও এমন একটা সঙ্গতির আভাস পাওয়া যায়—যা কঠিনতম আনন্দ একজনের কাছে, সফলতম বেদনা অন্যের নিকটে—তবুও তাদের প্রাণে এক সুরসাম্যের জন্ম দেয়।" —এই মনোমৈত্রী থেকে পরিণামে হৃদয়ে প্রশান্তির জন্ম হয়, আর প্রশান্তি মানে মাত্রাচেতনা। জীবনানন্দ কোথাও মাত্রাচেতনা কথাটির সংজ্ঞা দেননি, আমার মনে হয় ইংরেজ নিও-ক্লাসিকদের প্রযুক্ত good sense অর্থে তিনি কথাটির ব্যবহার করেছেন, যে good sense and equilibrium, মাত্রাচেতনা ও ভারসাম্য, ক্ল্যাসিক্যাল বা ধ্রুপদী কাব্যের পরম লক্ষণ। সম্ভবতঃ এই প্রশান্তির দিকেই ইশারা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং যদিও পত্রোত্তরে জীবনানন্দ বলেছিলেন যে প্রশান্তি ব্যতিরেকেই মহৎ কাব্য জন্মাতে পারে, তবুও, আমার বিশ্বাস, জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের কথা ভোলেননি, নিদেন পক্ষে শেষ কয় বৎসর নিজ মননের গভীরে ও

বৃহত্তর জাগতিক জীবনের প্রমাণে এই প্রশান্তি ও স্থিরতার দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমার অনুমান যে মহাযুদ্ধের অবসান কাল থেকেই জীবনানন্দর কবিচিত্তে তাড়নার স্থলে সুস্থিরতার তাগিদ প্রবল হচ্ছিল। এই সময়কার একটি চিঠি—তারিখ ২৬. ১২. ৪৫—এ-প্রসঙ্গে মূল্যবান :

কোনো কিছুকে 'চরম' ভেবে সুস্থিরতা লাভ করবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই, * * রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করবার প্রয়াস—যাকে কবিজগৎ বলা যেতে পারে—নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখতে চায়। এতে করে বাস্তব বাস্তবই থেকে যায় না ; দুয়ের একটা সমন্বয়ে সেতুলোক তৈরী হয়ে চলতে থাকে এক যুগ থেকে অপর যুগে—কোনো পরিনির্বাণের দিকে কারু মতে ; অল্লাধিক শুভ পরিচ্ছন্ন সমাজ-প্রয়াণের দিকে অন্য কারু ধারণায় ; কবিজগতে যে পাঠকেরা ভ্রমণ করেছেন তাঁদের মনে (কিংবা হাতে) ইহজগৎ আবার নতুন ক'রে পরিকল্পিত হবার সুযোগ পায় তাই। * * রয়েছে হয়তো কবির ভাবনাপ্রসাদ ; চরম ভেবে আঁকড়ে থাকার ভিতর নির্বাণ-অনির্বাণেরও সমন্বয়স্বপ্নও আছে, শান্তি আছে, মাত্রাচেতনা আছে, উত্তেজনাও যে নেই, তা' নয়, কিন্তু তা নিরিখের সান্ত্বনায় ফিরে আসে।

(উদ্ধৃত অংশটি নেওয়া হয়েছে 'ময়ূখ' ১৩৬১ থেকে, তারকা-চিহ্নের অন্তবর্তী অংশটি 'পূর্বাশায়' প্রকাশিত হয়েছিল, আমি দুটি অংশ একই চিন্তা প্রবাহের উক্তি বলে এক সঙ্গে সাজিয়েছি।)

অর্থাৎ কবি কোনো সদ্যপ্রস্তুত রেডিমেড সার্বিক দর্শনের আলোকে জীবন দেখছেন না, তাঁর দৃষ্টি সব সময় 'নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে ফলিয়ে দেখতে চায়।' এই হিসাবে তাঁর সমকালীন অন্য যে কোনো বাঙালী কবির তুলনায় জীবনানন্দ অধিক স্বাধীনচিত্ত। স্বাধীনচিত্ত আবার মুক্তচিত্তও বটে, নিশ্চয় স্বাধীন বলেই মুক্ত। তাঁর আবহমান ইতিহাস-চেতনায় সমভাবে বিধৃত হয়েছেন নচিকেতা জরাথুস্ত্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিন, সোফোক্লেস ও মহাভারত, বুদ্ধ সোক্রাতেস্ কনফুচ লেনিন গ্যেটে হোল্ডেরলিন রবীন্দ্র, জেসন ওডিসিয়ুস ধর্মাশোক, শ্বেতাশ্বতর যম নচিকেতা বুদ্ধদেব ঈশা। জীবনানন্দর স্বাধীন মুক্তচিত্ত আসলে স্থানকালোত্তর শুভ্র মানবিকতারই চিত্ত।

কিন্তু আমি এমন কথা বলতে চাই না যে সোনালি সিংহের দেশে যেমন হিরন্ময় সূর্য, নিরুত্তেজ বিকেল, প্রক্ষিপ্ত রাত্রি এবং ভোর চক্রান্বিত অনুক্রমে আসে যায় তেমনি বিমথিত বেদনা, ব্যাহত মূল্যজ্ঞান, তিক্ত পরিহাস, সুস্থিরতা ও প্রশান্তি জীবনানন্দর কাব্যবিবর্তনে স্থান নিয়েছে পরিচ্ছন্ন পারম্পর্যে। যেন প্রয়াগ সঙ্গমে গঙ্গার শাদা জল

পেরিয়ে যমুনার কৃষ্ণ নীল জলে পৌঁছলাম। না, এমন স্পষ্ট কালানুক্রম জীবনানন্দের কবিভাবনায় নেই। বস্তুতঃ কোনো মহৎ কাব্যেই নেই। কোলরিজের ভাষায় এ হেন স্পষ্ট পারম্পর্য হচ্ছে fixities and definites, যা কিনা fancy নামক নিরেস শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়, অপর পক্ষে secondary imagination or esemplastic power নামক প্রাণপ্রচুর ও প্রাণচঞ্চল সৃজনী-প্রতিভায় কোনো শিলীভূত স্থবির অনুভূতির স্থান নেই। সুতরাং নিজ সৃজনী-প্রতিভার স্বভাবেই এমন হ'তে পারেনি যে জীবনানন্দ এককালে মানবিক ঐতিহ্যের ও আদর্শের পরাজয় এবং অন্যকালে সেই ঐতিহ্যের ও আদর্শেরই জয়লাভ দেখেছেন। তা'ছাড়া ১৯৪৫-এর পরে পরেই বহির্জগতে যে সব মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটেছিল—কলকাতার দাঙ্গা, দেশবিভাগ, কোটি কোটি নরনারীর দেশান্তর, জীবনানন্দের নিজ দেশান্তর, গান্ধীজীর হত্যা, আজাদ ভারতে বহু দেশপ্রেমিকের চরিত্রবিকার ইত্যাদি—তার ফলে নিতান্ত doctrinaire অনমনীয় মতবাদী না হ'য়ে যিনি শুধু শুভ্র মানবিক আদর্শের ভোর চেয়েছেন, তাঁর পক্ষে আশায় বা নিরাশায়, যন্ত্রণায় বা আনন্দে, জয়ে বা পরাজয়ে, একটি মাত্র বিন্দুতে স্থিতিশীল হওয়া অসম্ভব ছিল। অতএব জীবনানন্দের কবিতায় শেষ অবধি চিন্তার দ্বিধারা সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে যদিও (আমার কাব্যপাঠে আমি দেখতে পাই) তাঁর অস্তিজ্ঞান ক্রমেই যেন নেতিজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে আসছিল।

১। তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের
বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে, তৃতীয় চতুর্থ—আরো সব
আন্তর্জাতিক গ'ড়ে ভেঙ্গে গ'ড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত
জাতক মানব।

: সৌরকরোজ্জ্বল : সাতটি তারার তিমির

২। জানি তবু মানবতা নিজের স্বভাবে
কালকে ভোরের রক্ত প্রয়াস সুধসমাজ রাষ্ট্রে উঠে গেছে,
ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু, নরনারীর ভিড়
নব নবীন প্রাকৃসাধনার,—নিজের মনের সচল পৃথিবীকে
ক্রেমলিনে লণ্ডনে দেখে তবুও তারা আরো নতুন অমল পৃথিবীর।

: প্রয়াণপটভূমি : বেলা অবেলা কালবেলা

এবং যদিও "বেলা অবেলা কালবেলা" গ্রন্থের কবিতা-বিন্যাসে কালানুক্রমিক রচনা-

শৃঙ্খলা সর্বথা রক্ষিত হয়নি, তাহ'লেও এ-গ্রন্থের শেষ কবিতাটির তিন ছত্রে যেন তাঁর অস্তিজ্ঞান-সমুখ, ভাবনার অন্তিম প্রতীক :

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি।

: হে হৃদয় : বেলা অবেলা কালবেলা

আগের টেন্‌শন্ অন্তর্হিত হয়েছে। অবরুদ্ধ আবেগের উগ্র উৎক্ষেপ আর নেই। কবির আবেগ তাঁর মননের দ্বারা, তাঁর মানবিক ঐতিহ্যবোধ দ্বারা, সংযত হয়েছে। টেন্‌শনের বহির্লক্ষণ আমি আর দেখতে পাই না কেবল একটি ছাড়া; তাঁর অতি নিজস্ব খেয়ালী ভাষা প্রয়োগে। অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাসের রীতি-লঙ্ঘন তাঁর কবিতায় প্রথম থেকেই প্রকট (বিশেষতঃ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে) কিন্তু "সাতটি তারার তিমির" ও "বেলা অবেলা কালবেলা" দুই গ্রন্থে অধিক, অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ আবেগের কালেই অধিক। বিশদ বিশ্লেষণের সুযোগ এ-প্রবন্ধে নেই, শুধু একথা বলে' ক্ষান্ত হব যে ভাষা-প্রয়োগও শেষদিকে ক্রমশঃ সুস্থির সুবিন্যস্ত স্বচ্ছ হ'য়ে আসছিল বলে আমার মনে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মহাত্মা গান্ধী' কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি। কবিভাবনার গভীরে এমন সুস্থিরতা এমন অনবরুদ্ধ আবেগ বিদ্যমান যে ভাষা-প্রয়োগে কোনো অনচ্ছতা, কোনো বহু-ইঙ্গিত-জড়ানো অসম্পূর্ণ বাক্যবিন্যাস উপস্থিত হয় নি। যেমন চিন্তায় তেমনি ভাষায় নির্মলতা ঋজুতা প্রশান্তি। জীবনানন্দর কাব্য থেকে টেন্‌শন্ বিলীন হ'য়ে উদ্ভাসিত হ'ল কে এক পাখি যে গভীর সুসময়ে সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে দীপ্ত প্রাণ দান করে। "নব সূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও—প্রাণ দাও পাখি।"

টেন্‌শন্ বিলীন হ'ল মানে মনন ও আবেগের অস্থিরতা ও বিপর্যয় বোধ বিলীন হ'ল। জীবনানন্দর কবিচিত্ত এখন আত্মবিকাশের সেই স্তরে পৌঁছেছে যেখানে কাব্যের জন্ম balance of opposites-এ নয়, কাব্যের জন্ম স্থিতধী চেতনায়। খুব কম কবির সংবেদনায় এই স্থিতধী সমন্বয়ী প্রশান্তি বিদ্যমান। যেখানে বিদ্যমান সেখানে হয়তো কবি গৌণ কবি, যিনি সংকীর্ণ স্বচ্ছন্দ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে কিছু সুকাব্যের ফসল ফলিয়েই পরিতৃপ্ত, অথবা অন্যত্র বিদ্যমান যেখানে কবির বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মহৎ প্রতিভার সমগোত্রজ, যে-প্রতিভায় বহু আবেগের অণুপরমাণুগুলি একটা সর্বধাত্রী জীবনবোধে বিধৃত হ'য়ে স্থিতপ্রজ্ঞ কবিকর্মে প্রশান্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও শিল্পে টেন্‌শন্ নয়, হার্মনির লীলা। আমার বিশ্বাস যে এ-যুগের বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি সার্থক ভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও আঙ্গিক থেকে মুক্তি অর্জন

করেছিলেন, যিনি এমন স্বরের প্রবর্তন করেছেন—অবিস্মরণীয় স্বর, সে-স্বর জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়—যে-স্বর রবীন্দ্রনাথেও পাওয়া যায় না, অথচ যিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-অভিব্যক্তিতে নিয়ত বহমান যে অপরিমেয়তল প্রশান্তির ধারা সে ধারা নিজ অভিব্যক্তিতে আয়ত্ত করেছেন, তিনিই রবীন্দ্রনাথের আত্মার নিকটতম আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্য কবিদের যোগ বহিরঙ্গে, সে-যোগ জীবনানন্দর বেলায় অন্তর্গূঢ় ও আত্মিক। বাঙালী মানসের ও কাব্যের যে নিঃসংশয় ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথে বর্তেছিল তার ধারক জীবনানন্দ দাশ।

প্রাগ্‌ভাষ

এক

কবিতা রস-মাধুর্যং কবির্বেত্তি, ন তৎ কবি। এই প্রবচনটি বহুকাল আবিজ্ঞ-সাধারণের কাছে প্রাপ্যের চেয়ে বেশি মর্যাদা পেয়ে এখন শর্ত-নিরপেক্ষ সত্যের সমতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। উক্তিটি আংশিক সত্য বলেই আমরা প্রথমেই এর প্রতিবাদ করবো। বিশেষ কোনো কবি আপন কাব্যের মর্ম উদ্ঘাটনে অপটু—এমন দেখা গেলেও একথা সার্বজনীন সত্য হতে পারে না। ববং একালের কবিতা যখন ব্যক্তিনিষ্ঠ, কবিতা যখন আত্মচিন্তা বা স্বগতোক্তিব সমার্থক প্রায়—তখন মনীষী-কবিরা পাঠক-সুলভ নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষতা অর্জন করলে আপন কবিতার সার্থক সমালোচক হতে পারবেন নিঃসন্দেহে। উপরন্তু আপন কবিতার বিশ্লেষণে এমন উন্মোচনী আলোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে যা অন্যদের পক্ষে আবিষ্কার করা অনেক সময় ও শ্রম-সাপেক্ষ তো বটেই, তা আদৌ কখনো সম্ভবপর হবে কিনা সন্দেহ। বিহারীলাল চক্রবর্তী যদি 'সারদামঙ্গল' কাব্যের রস-রহস্যের বিশ্লেষণ ক'রে যেতেন তবে আমরা এমন কিছু পেতে পারতাম যাব অভাব এমন কি রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিসঞ্জাত সমালোচনাও পূর্ণ করতে পারেনি।

কিন্তু এই প্রাপ্তির পথে অনেকক্ষেত্রে প্রথাই প্রধান অন্তরায়। আজ যদি প্রবীণ শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে আপন কবিতার ব্যাখ্যা করেন তবে আগামীকালের পাঠক-আলোচকের অনেক শ্রম ও সাধনা লঘু হবে, অনেক প্রশ্নের সহজ মীমাংসা মিলবে। কিন্তু আশ্চর্য! তেমন দাবী আজও আমরা তুলছিনা এবং যুগান্তরীণ সংস্কারে স্বভাব-লাজুক কবিরাও নীরবতা ভেঙে বেরিয়ে আসেন নি। আসলে কবিতার মর্ম-উদ্ঘাটনে আমাদের উৎসাহ বড় কম। তার ফল যে কত শোচনীয় সমকালীন কবিদের উপর যে সব আলোচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয় তা থেকেই প্রমাণ হবে। কবিতা আজ স্বভাব-কবিতার পর্যায়ে নেই, দেশ-কাল-প্রসারিত নানা সমান্তরাল আন্দোলনের দোলায় সঞ্চালিত কবিতার মর্ম-আবিষ্কার তাই আজ স্বভাবসমালোচকদের সাধ্য নয়। বিশেষ ক'রে যে সব কবি এই সব বিচিত্রধর্মী আন্দোলনকে উপলব্ধি ক'রে তার অংশ-ভাক্ হয়ে চলেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে তো বটেই।

এক বন্ধু বলেছিলেন, 'কবি জীবনানন্দকে বাংলাদেশের কবিরাই সমালোচকদের আগে আবিষ্কার করেন।' তাঁর জীবিতকালে তাঁর কবিতার প্রকৃত সমালোচনা হয়নি বললেই হয়। আধুনিক কবিতার পক্ষে অক্লান্ত-সংগ্রামী শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু-র মতো বিরল ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে একথা মর্মান্তিক সত্য। মনে রাখতে হবে শ্রীযুক্ত

বস্তুও মূলত রুচিই। বাংলা সমালোচনা-শিক্ষা যে কত পঙ্গু তা এতেই বোঝা যায়। তরুণ কবিরা যাঁকে অন্তত দুই দশক আগে অনুকরণ ও আত্মস্থ করতে প্রবৃত্ত, তাঁর মৃত্যুর পর সেই কবির প্রতিভা সম্পর্কে রসিক-মহলে চেতনা এলো, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য সাহিত্যের নেই।

সম্প্রতি জীবনানন্দ সম্পর্কে সমালোচকরা যে বিশেষ উৎসাহী হয়েছেন এও আশার কথা। এবং আমরা স্বীকার করি, জীবনানন্দ যে জাতের প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন তার স্বরূপ-নির্ণয় কোনো ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা অথবা একই যুগের সমালোচকদের পক্ষে নির্ভুল ভাবে করা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা আলোচনার জন্য কলম তুলে নিয়েছেন তাঁদের অন্তত একটা সৎ প্রচেষ্টা থাকা উচিত তাঁর অন্তর্প্রকৃতি অনুধাবনের। আর সে প্রয়াস যদি না থাকে, অথবা কবি যদি সেই প্রয়াসের যোগ্য ব'লে বিবেচিত না হন তবে অকারণ স্তবমালা রচনার আড়ম্বর কেন? এই জাতের রচনা দিয়ে আমরা শুধু কবিকে নয়, পাঠকদেরও অপমান করি।

জীবনানন্দের জীবৎকালে কদাচিৎ তাঁর সম্পর্কে এমন যে দু-একটি অপরিণত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তা দেখে কবি তুষ্ট হতে পারেন নি। কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশের কাছে আমরা শুনেছি নিজের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছে খুব প্রবল হয়েছিল তাঁর শেষ জীবনে। ভাবনার সূত্রগুলো পরপর সাজিয়েছিলেন। কয়েকটি শব্দ-সংকেত মাত্র। এখন তার অর্থভেদ করা যায় না।

জীবনানন্দের সেই অলিখিত আলোচনার দ্বারা আমরা উপকৃত হতে পারিনি। তবু তাঁর নিজের কবিতা সম্পর্কে ইতস্তত ছড়ানো দু-একটি উক্তি অনুসরণে অনুমান করতে পারি সে আলোচনা রসনিবিড় এবং মর্মার্থসাধক হতো। কবিতার আলোচনায় তাঁর বহুদর্শিতা, সমালোচনার মান ও উচ্চ রুচি সম্পর্কে যে ধারণা তাঁর 'কবিতার কথা' বইটি পড়ে হয় তাতে আমাদের প্রত্যাশা অহেতুক মনে হয় না।

নিজের কবিতা সম্পর্কে ইতস্তত আলোচনার যে দু-একটি সঙ্কেত তাঁর রয়েছে আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে তা দিক্-দর্শনীর মতো হয়েছে। এ রকম দুটি উক্তি আমরা এখানে মূল্যবান ভেবে উদ্ধার করছি।

(১) আমার কাব্য প্রেরণার উৎস নিরবধিকাল ও ধূসর প্রকৃতির চেতনার ভিতর রয়েছে বলেই ত মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সব সময়েই যে ধূসর তা হয়তো নয়। মহাবিশ্বলোকের ইসারা থেকে উৎসারিত সময় চেতনা, consciousness of time as a universal, তা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মত; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ জিনিষটাকে আমি গ্রহণ না করে পারি না।

: কবিতা প্রসঙ্গে

(২) আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ চেতনার; কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী, সম্পূর্ণ অবচেতনার, সুররিয়ালিষ্ট। আরো নানা রকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসাবে নয়। : ভূমিকা : শ্রেষ্ঠ কবিতা

বজ্রানুবিদ্ধ মুক্তায় যেমন অনায়াসে সুতা পরানো যায় তেমনি এই উক্তি দুটি জীবনানন্দের কবিতার পূর্ণরূপ উদ্ঘাটনে আমাদের সহায়তা করেছিল নইলে এই প্রবন্ধ-মালা অন্তত এই আকারে রচনা করা যেত কিনা সন্দেহ। উপলব্ধির দীনতা ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার জন্য উদ্ধৃত উক্তির তাৎপর্য আমরা কত দূর অনুসরণ করতে পেরেছি এবং সব মিলিয়ে জীবনানন্দের সামগ্রিক স্বরূপটি এখানে ফুটলো কিনা সুধীজনই তা বিবেচনা করবেন।

দুই

বর্তমান আলোচনায় আমাদের অনুসৃত রীতি সম্পর্কেও দু-একটি কথা বলার রয়েছে। সমকালীন কবিতার পটভূমিকায় জীবনানন্দের কবিকৃতি উপস্থাপিত ক'রে তার মূল্যায়নের বিস্তারিত প্রয়াস আমরা করিনি। আমাদের মনে হয়েছে আধুনিক কবিতার এবং তার আলোচনার যাঁরা জিজ্ঞাসু পাঠক তাঁদের কাছে আধুনিক কবিতার পটভূমিকাটি অপরিজ্ঞাত থাকার কথা নয়।

সংক্ষেপে এতটুকু শুধু স্মরণ রাখা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমানায়, খ্যাতির শীর্ষবিন্দুতে, তখন আরো কয়েকজন অখ্যাতনামা সহযোগী কবির মতোই অজ্ঞাতশীল জীবনানন্দের বাংলা কবিতার অঙ্গনে অলক্ষিত আবির্ভাব। এখন যে যুগটাকে আমরা রবীন্দ্রোত্তর যুগ ব'লে অভিহিত করি তখনো সেটি নাম গোত্রে চিহ্নিত হয়নি। তখন রবীন্দ্রনাথের নিত্যপ্রসারী কবিসত্তা ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের বিভিন্ন দিক এবং পাশ্চাত্য জীবনবোধ ও শিল্পতত্ত্বের অনুকূল অংশ আত্মস্থ ক'রে এমন এক ব্যাপক ভাবরাজ্য অধিকার করেছিল, আর তাঁর কবিতার ভাব-ভাষা-রূপে এমন এক আশ্চর্য উজ্জ্বল শিল্পসিদ্ধি ঘটেছিল, যে মনে হয়েছিল, তার বাইরে পদচারণার স্থান খুবই সংকীর্ণ। সে যুগের পাঠকেরা জীবন ও শিল্প সম্পর্কে একটা শুচিশুভ্র নীতিবাদ, সাহিত্যের বিষয় সম্পর্কে একটা অনুদার পূর্বপোষিত ধারণা, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে একটা উন্নাসিক উপেক্ষা, এই

সব মিলিয়ে একটা আত্মতৃপ্তিজাত জড়ত্বের মধ্যে ছিলেন। এমনকি সে যুগের যাঁরা অন্যতম প্রতিষ্ঠিত কবি তাঁরাও প্রায় ভুলতে বসেছিলেন যে মধুসূদন প্রভৃতি প্রাচীনদের প্রভাব পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা অজস্র সৃষ্টি করছেন তা থেকে ভিন্ন কোনো প্রশস্ত পথ আছে, আর সেই পথে নূতন এবং সার্থক কিছু করা সম্ভব ও সঙ্গত। অথচ একথা তাঁরা বুঝতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাবভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর সমান বা কাছাকাছি সার্থকতা লাভ করাও নূতনদের পক্ষে দুরাশা।

বার্নার্ড শ' একদা শেক্সপীয়রের নাট্যপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, সাহিত্যের উৎকর্ষের এক নির্ধারিত সীমা আছে এবং সাহিত্য বারবার সেই সীমা স্পর্শ করেছে। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যিক যদি একই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একই সীমা স্পর্শ করতে যান তবে তার ব্যর্থতা অবধারিত। সার্থক হতে হ'লে তাঁকে নূতন ক্ষেত্র সন্ধান করতে হবে। বাঙালী সাহিত্যিকরা, বিশেষত বাঙালা কবিরা যে রবীন্দ্র-প্রভাব বর্জিত নূতন ক্ষেত্র অন্বেষায় নিযুক্ত ছিলেন, এ তাঁদের জীবধর্মেরই তাগিদ। 'কল্লোলে' 'কালি কলমে' 'উত্তরা'য় নূতনের এই অনিবার্য অভ্যুদয়ে যে প্রচণ্ড সন্দেহ ও বিক্ষোভ এবং তুমুল বিসংবাদ দেখা দিয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সংবাদ হয়ে আছে। এই ভাবেই রবীন্দ্রোত্তর যুগের সূচনা হয়েছিল।

অথচ তখনো রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিশীল হয়েই বর্তমান ছিলেন। আর বহু খ্যাতিমান সাহিত্যরথী নিয়ে রবীন্দ্র-যুগ যে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে বা ক্ষীণবল হয়েছে একথাও কেউ বলবে না। বস্তুত রবীন্দ্র রীতি ও রবীন্দ্রোত্তর-রীতির বিবদমান দুটি ধারা তখন থেকে দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যে পাশাপাশি চলেছে। এখনো চলছে। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কেননা রবীন্দ্র যুগের সাহিত্য ও রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য বলতে কোনো কালগত শ্রেণীবিভাগ বোঝায় না, বোঝায় দুই জাতের সাহিত্যের প্রকৃতি। প্রবীণ সমালোচক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছিলেন :

"রবীন্দ্রনাথের যাহা জীবন দর্শন এবং সেই জীবন দর্শন হইতে উদ্ভূত যে তাঁহার শিল্পাদর্শ এবং শিল্পের রূপায়ণ পদ্ধতি তাহা হইতে পৃথক শিল্পাদর্শ এবং শিল্পের রূপায়ণ পদ্ধতি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে যে সাহিত্য তাহাকেই অভিহিত করা যাইতে পারে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য বলিয়া—সে সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই গড়িয়া উঠুক —অথবা রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসানের পরেই গড়িয়া উঠুক।"

: কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়

তাঁর এই যুক্তি অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও উঠতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সমকালীন কবিদের জীবনাদর্শ ও শিল্পাদর্শের এ রকম পার্থক্য শুধু তো তাঁর কবিজীবনের শেষ পর্যায়ের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়, যখন থেকে

রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের মূল সুর তখন থেকে সর্বদাই এক বা একাধিক বিবাদী সুরের সন্ধান কবিতার ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। এমনকি এইসব বিবাদী সুরের দু-একটিকে অবশ্যই রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিতার লক্ষণ দিয়েও সনাক্ত করা সম্ভব। তাহলে আমরা কোন সময় থেকে রবীন্দ্রোত্তর কালের পূর্বসীমা নির্ধারণ করবো। ডঃ দাশগুপ্তই লক্ষ্য করেছেন বাংলা ১৩১৭ সালে 'গীতাঞ্জলি'র রচনাকালে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা'র প্রকাশ। আমরা প্রসঙ্গত ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং প্রমথ চৌধুরীর কবিতার কথা স্মরণ করতে পারি। গোবিন্দ দাসের কবিতায় বিদগ্ধজন সুলভ সংযম ও পরিপাট্য ছিল না; কিন্তু তাঁর জীবনবাদ, তাঁর বহু কবিতার বহু উজ্জ্বল পংক্তি, বর্ণনা ও চিত্রকল্প যে কোনো শক্তিমান আধুনিক কবির ঈর্ষার কারণ হতে পারে। আর প্রমথ চৌধুরীর নিরীশ্বর জীবনদর্শন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের সমশ্রেণীতে গণ্য হবে না।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে স্বসম্পাদিত 'একালের কবিতা'র মুখবন্ধে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের (শেষ?) চোদ্দ পনেরো বছরের কবিতা থেকেই সচরাচর বাংলা কাব্যে আধুনিক পর্ব নির্দিষ্ট। অথচ যেহেতু প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অনুজ তাই তাঁদের কবিতাও যদিচ পূর্ববর্তী, তবু স্মরণীয় মনে হয়েছে।·· ···নামকরণ একালের কবিতা মাত্রই রইল। কারণ আধুনিক শব্দটা খুব নিশ্চিত নয়।" তারপরে আত্মসচেতনতার ক্রমাভিব্যক্তি এবং 'ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যের চেয়ে ব্যক্তি-সমাজের নিহিত ভাবা-বিনিময়ের আততি'কে আধুনিক কবিতার মৌলিক লক্ষণ ঘোষণা ক'রে তিনি আবার লিখেছেন, "আধুনিকতার বিষয়ে উপরোক্ত একটা অস্পষ্ট ধারণা নিশ্চয়ই সংকলনের অবচেতনে ছিল। কিন্তু যেহেতু প্রথমত ধারণাটা সূত্রাকারে নির্দিষ্ট নয়, এবং যেহেতু গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের নানারকমে বাংলা কবিতার প্রগতির মোটামুটি একটা চেহারা সাধ্যমত ধরাই ছিল এর বিনীত উদ্দেশ্য, সেহেতু এই বিচার ছিল একটিমাত্র বিবেচ্য।"

'আধুনিক' শব্দটির এই অনিশ্চিততা এবং আধুনিক কবিতার লক্ষণের এই অস্পষ্টতা ইতিপূর্বে সম্ভবত শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুও অনুভব করেছিলেন। কেননা আধুনিক শব্দটিকে তিনি ব্যাখ্যার সাহায্যে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যা শাশ্বত তাই আধুনিক। সেই হিসাবে মেঘদূত কাব্যও আধুনিক, চণ্ডীদাসের পদও আধুনিক। কথাটি চমকপ্রদ বটে, কিন্তু অর্থহীন। ভালো কবিতার কাজই হলো যুগের সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে যুগোত্তরেও জীবিত থাকা। তাহলো কবিতার প্রথম বিচার। কিন্তু এমন কবিতাকেই আধুনিক বলা হবে কেন? আধুনিকতার সংজ্ঞাতে নিশ্চয়ই কালচেতনার কোনো স্পর্শ থাকা চাই। কেননা প্রতিটি যুগেরই একটা স্বতন্ত্র

চরিত্র আছে। তাই বিশেষ যুগের কবিতা সে যুগের বিশেষ সমস্যা, চেতনা ও লক্ষণে চিহ্নিত হয়ে ওঠে; কিন্তু তার সবই কালোত্তীর্ণ হবে এমন আশা অল্প। তবু হোমার, কালিদাস, মুকুন্দরাম ও মধুসূদনের মতো মহৎ কবির কবিতা তাদের স্বকীয় যুগচিহ্ন-গুলিকে বুকে নিয়েই চিরজীবী হয়ে আছে, তেমনই এযুগেরও যে কবিতা মহৎ এবং শাশ্বত তা যুগের ভেলায় চড়েই কাল-সমুদ্র পাড়ি দেবে।

রবীন্দ্রনাথ একবার আধুনিকতার সামান্য লক্ষণটি বিদেশী কবিতার আলোচনা ক্রমে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, "পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা। নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলেনা। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন, বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।"

সাহিত্যের কালের প্রসঙ্গে এই নদীর উপমাটা সুন্দর। নদীর জল জলের স্রোতটি শাশ্বত; কিন্তু তার রঙ, তার তটরেখা তার বিশিষ্ট রূপ নির্ভর করে বিশেষ দেশকালের মাটির বিশেষত্বের উপর। নদী যখন চলে নিজের প্রাণবেগে পথ কেটে চলে, বাইরের শক্তির প্রভাবে যখন তার গতি ব্যাহত হয় তখন নদী বাঁক নেয়। বাঁক নেয় বটে, কিন্তু নিজের প্রাণবেগ হারায় না। সাহিত্যও নিজের প্রাণছন্দে চলতে চলতে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে যুগবিপ্লবে রাষ্ট্রবিপ্লবে চিন্তাবিপ্লবে নূতন পথে মোড় নেয়, তবু নদীর মতই তার প্রবাহ অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন। আর সেই নূতন পরিণতির সাহিত্যের রূপ রস রঙ নির্ভর করে ব্যক্তি-প্রতিভা, যুগ ও সমাজ জীবনের উপর।

আধুনিক কবিতার এই শেষ বাঁক যে রবীন্দ্র-বিরোধী ভাবধারা দিয়ে শুরু তা ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতো আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু ডঃ দাশগুপ্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে, অবশ্যই মোহিতলাল প্রমুখ আরো কয়েকজনের সঙ্গে, নবযুগসূচক কবি হিসাবে ধরে নিয়ে রবীন্দ্রোত্তর কবিতার কালসীমাকে বাংলা ১৩১৭ অবধি টেনে নিয়ে গেছেন। উক্ত কবিদের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নেই, অবশ্যই রবীন্দ্রোত্তর কবিতার উন্মেষের কালে তাঁরাও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—কিন্তু যুগ-বিভাগকে ঐভাবে সম্প্রসারিত করায়, আমাদের মনে হয়, বিপদ আছে। শ্রদ্ধেয় সমালোচক সম্পর্কে কোনো কটাক্ষ না রেখেও একথা বলা উচিত এই যুক্তিধারাকে অনুসরণ করলে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টিকালকেই হয়তো রবীন্দ্রোত্তর কালে টেনে আনা যাবে। কেননা প্রত্যেক আন্দোলনের একটা সূচনা আছে এবং সূচনার আগে ভূমিকাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

বস্তুত রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারা বলতে কোনো নূতন পৃথক কাব্যধারা বোঝায় না—

আমরা তা বোঝাতেও চাইছি না। এটি রবীন্দ্র-জীবনাদর্শ ও শিল্পাদর্শের বিরোধী এক ধারা যা দীর্ঘদিন ফল্গু-স্রোতের মতো নেপথ্যে স্তিমিত ছিল হয়তো উপযুক্ত কাল পরিবেশ ছিল না ব'লেই সদর্প বিদ্রোহের সাহস পায়নি। কেননা যতদিন বাংলাদেশ রবীন্দ্র-সাহিত্যকে একান্ত ও সর্বৈব বলে ভাবতে শেখেনি ততদিন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রশ্ন অর্থহীন। কিন্তু যখন এই ভাবনা দৃঢ়মূল হয়ে উঠলো, তখনই উপযুক্ত পরিবেশে একটি পুরানো বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হলো ; বহুজনের ক্ষোভ যেন এক সুচিন্তিত ; পরিকল্পনায় অভিব্যক্ত হলো এবং তখনই হলো রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের সূচনা।

তিন

আর এই জন্যই রবীন্দ্রোত্তর কবিতার সূচনায় 'কল্লোলের' ভূমিকা স্মরণীয়। যতীন্দ্রনাথ মোহিতলালেরা যা করেছেন 'কল্লোলে'র কবিরা যে তাঁদের তৎকালীন রচনায় তার থেকে স্পষ্ট ক'রে রবীন্দ্র-বিরোধী কোনো সুর কবিতায় তুলতে পেরেছেন একথা বলা যাবে না। তাঁরা শুধু বহুদিনের সুপ্ত বিদ্রোহকে ভাষা দিয়েছিলেন সেদিন। তাঁদের সেদিনের মনোভাবনাকে জীবনানন্দ অনেক দিন পরে ব্যক্ত করেছেন—

> রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর আগেই একটা নূতন প্রস্তুতির ইশারা পাওয়া যাচ্ছিল বাংলা কাব্যে ; সেটা 'কল্লোলে'র সময়। 'কল্লোলে'র লেখকরা মনে করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সার্থক কবিতা লিখেছেন—কিন্তু তিনি যাবতীয় উল্লেখ্য বিষয় নিয়ে কবিতা লিখবার প্রয়োজন বোধ করেন না—যদিও তাঁর কোনো-কোনো কবিতায় ইতিহাসের বিরাট জটিলতা প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়, তিনি ভারত ও ইউরোপের অনেক জ্ঞাত ও অনেকের মতে শাশ্বত বিষয় নিয়ে শিল্পে সিদ্ধি লাভ করেছেন, কিন্তু জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের নানা রকম সঙ্কেত রয়েছে যা তিনি ধারণা করতে পারেননি বা করতে চাননি। ঠিক এই ভাষায় যে এই ধরনের যুক্তি তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন তা নয়, যুক্তিগুলোও সত্য মিথ্যায় মেশানো ; কিন্তু এই ভাবেই দানা বাঁধছিল।
>
> **: অসমাপ্ত আলোচনা : কবিতার কথা**

বাংলা ১৩৬০ সালে লেখা এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্পর্কে 'অনেকের মতে'র প্রসঙ্গে জীবনানন্দের শ্লেষটি লক্ষ্য করতে হবে। শিল্পের কোনো 'শাশ্বত বিষয়' আছে কিনা এ প্রশ্ন কি তিনি তুলতে চেয়েছিলেন ? যে বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন শুধু সেটাই শাশ্বত কবিতার বিষয় নয় তার বাইরেও এমন বিষয় থাকতে পারে যা নিয়ে শিল্প সিদ্ধি সম্ভব। বাস্তবিক, 'কল্লোল' রবীন্দ্রসাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা

সম্পর্কেই কলরব তুলেছিল। 'কল্লোলে'র কবিদের ভূমিকা ছিল যুগপৎ অনুপূরকের এবং বিরোধের। এঁদের সামনে আদর্শ ছিল নজরুল ইসলামের দুঃসাহসী বলিষ্ঠতা। প্রেরণার মতো, নায়কের মতো নজরুলই নূতন কবিতার অনাগত বিধাতা হয়েছিলেন। তাঁর তীব্র জাতীয়তাবোধ, তাঁর মহৎ সাম্যভাবনা, প্রবল হৃদয়াবেগ, সুগভীর প্রেমপ্রসক্তি সবেরই মধ্যে একটা স্বপ্নময় বর্ণাঢ্য সুরোচ্ছল দীপ্ত পৌরুষ ছিল যা তরুণদের আকুল উন্মাদ ক'রে তুলতো। কবিতার ভাব ভাষা ছন্দে একটা অসংযত ঐশ্বর্য, একটা রূপময় ক্ষেপামি, রবীন্দ্রনাথের নিপুণ নিটোল সংযত সিদ্ধির পাশে এত স্বতন্ত্র, এত মোহময়, যে মনে হতো, যৌবনের ধর্মই এই অজস্র ফেলাছড়া, এই উদ্ধত নির্বিচারের মধ্যে নিহিত আছে।

কিন্তু নজরুলের প্রকৃতিতে যা সুস্থ যা স্বাভাবিক অন্য কবিদের ক্ষেত্রে তা 'পরোধর্ম'। তার হেতু কবিদের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। একথা বুঝতেও তাঁদের বেশি সময় লাগেনি যে নজরুলের কবিতা যতটা উন্মাদনা জাগায় ততখানি আশ্বস্ত করে না। নজরুলে নূতন ভঙ্গির প্রবলতা আছে, নূতন দৃষ্টির গভীরতা নেই। অথচ নূতন যুগতো নূতন ভঙ্গি নিয়ে হতে পারে না, নূতন বিশ্বাসের বাণী নিয়ে তাকে নিজের ভিতর সত্য হয়ে উঠতে হবে। নজরুল পথের ডাক দিয়ে গেলেন, পরবর্তীদের পথ খুঁজে নিতে হবে।

কল্লোলে এই নূতন পথের সন্ধান চলেছিল। বলা বাহুল্য তা সময় সাপেক্ষ। তাই এখন যেগুলিকে আমরা রবীন্দ্রোত্তর কবিতার লক্ষণ বলি ১৯২৪ সালে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর প্রথম বই 'মর্মবাণী' এবং ১৯২৭ সালে প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের প্রথম বই 'ঝরা পালকে' তেমন কোনো ভাবনা বা সুর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে ১৯২৩ ছিল কল্লোলের প্রকাশ-কাল। যে সমস্ত কবির লেখায় এবং যে সমস্ত কবিতার বই-এ আধুনিক কবিতার নূতন সুর বাজলো তার সবগুলিই অন্তত এর সাত বছর পরে প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' ১৯৩০, অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস' ১৯৩০, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' ১৯৩০, বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ১৯৩৩, জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ১৯৩৬, সমর সেন 'কয়েকটি কবিতা' ১৯৩৭, অমিয় চক্রবর্তী 'খসড়া' ১৯৩৮, প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিরা সকলেই অবশ্য তখনকার 'কল্লোল' গোষ্ঠীতে পড়েন না কিন্তু সকলেই রবীন্দ্রোত্তর কবি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। এই বইয়ের যেগুলি নূতন কবির প্রথম বই তার দু-একটিতে তখনো শিক্ষানবীশীর ভীরুতা ছিল বা রবীন্দ্রানুবর্তনের পুরানো সুর। তখনো কেউ কেউ স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর খুঁজে পাননি, গোষ্ঠীর নাম তাঁদের পরিচয়। তবু আজকের দূরত্বে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় এই অন্তবর্তী বছরগুলি ছিল এঁদের পরীক্ষা ও প্রাপ্তি, সন্ধান ও সিদ্ধির সময়।

এবং অনতিবিলম্বেই প্রমাণ হলো 'কল্লোল' কোনো সমানধর্মাদের গোষ্ঠী ছিল না,—ছিল বিচিত্রধর্মাদের মিলন-মঞ্চ। পশ্চিমের দেশগুলির মতো কোনো ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে এঁদের যৌথ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি, এঁদের মিলন সূত্রটি ছিল নঙর্থক অর্থাৎ রবীন্দ্র সাহিত্যাদর্শের বিরোধিতার। নূতন সাহিত্যের রূপপ্রকৃতি সম্পর্কে এদের প্রত্যেকের ভাবনা ধারণা কিছু বা অস্পষ্ট, এবং যথেষ্ট ভিন্ন ছিল। প্রাথমিক বহিরঙ্গিক মিল খসে যেতেই মনোভঙ্গির দুস্তর ব্যবধান চাপা রইল না। অন্নদাশঙ্কর রায় স্বভাবসিদ্ধ সরস ছন্দে বললেন, 'তোমার আমার মিল নাই, মিল নাই/ তাই বাঁধিলাম রাখী'। বাস্তবিক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রসাধনহীন কথা ও ছন্দের কাঁচা স্বাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেনি মোহিতলালের মন্দাক্রান্তা ছন্দ-সরস্বতী; বুদ্ধদেব বসুর নিচু গ্রামের হার্দ্য স্বরের সঙ্গে মিল খায় না সুধীন্দ্রনাথের বাক্-বিধির গুরু চাল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা আর বিষ্ণু দে-র বিপুল বৈদগ্ধ্যের পরিভাষা ভিন্ন।

এই স্বভাবগত ভিন্নতার জন্য কবিতা তাঁদের এক লক্ষ্যে পৌঁছেও দিল না। ওঁদের কেউ শিল্পসর্বস্বতায়, কেউ সমাজতত্ত্বে, কেউ মনস্তত্ত্বের জটিলতায়, কেউ ক্লাসিক ঐতিহ্যের নবাবিষ্কারে, কেউ মালার্মে প্রবর্তিত প্রতীকীবাদে, কেউ লরেন্স প্রমুখের প্রকৃতিবাদে, এমনি নানা পথে সাহিত্যের মুক্তি খুঁজছিলেন। প্রায়শই এঁরা সফলও হয়েছেন এবং সেদিক থেকে যে অর্থে 'কল্লোলের' যূথবদ্ধ আন্দোলন তা সার্থকও। রবীন্দ্রনাথের বহুবিসারী ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাসের ছায়াতে দাঁড়িয়ে, তাঁর মহৎ সাহিত্যের পাশাপাশি এক নূতন বহুবিচিত্র আধুনিক সাহিত্যের, আধুনিক কবিতার এঁরা জন্ম দিয়েছেন।

তবু যখন এই নূতন কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়োজন আসে তখন গত চল্লিশ বছরের কবিতার আন্দোলনের ধারাটিকে সামনে রেখে বিভ্রান্ত হতে হয়। ইতিমধ্যে কতো ঢেউ এলো গেল, বিস্মিত হয়ে তার পর্যায়ক্রমটিকে দেখতে হয়। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-উত্তেজনা আর ইতিহাসের প্রমত্তচারণা, কালিদাস রায় প্রমুখের পল্লীপ্রীতির সহজ রোমান্স, যতীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গস্নিগ্ধ নৈরাশ্যবাদ, নজরুল ইসলামের তীব্র দেশপ্রেম, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সবাস্তিকতা, বুদ্ধদেব বসুর ইন্দ্রিয়-প্রসক্তি, সমর সেনের শ্লেষাত্মক গদ্যচারণ, বিষ্ণু-দে-র মননিষ্ঠা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমাজ চেতনা, প্রতিনিয়ত মনে হতে লাগল আধুনিক কবিতার একান্ত লক্ষণ বুঝি এই, কবিতার মুক্তি বুঝি এই পথে। কিন্তু সেই উদ্ভাসিত বলয়গুলি পার হয়ে এসে আজ মনে হচ্ছে ওর অনেকগুলিই হয়তো অন্ধ গলিপথ ছিল শুধু। এককালে আধুনিক কবিতার সামান্য লক্ষণ যাঁরা নির্দেশ করেছিলেন 'সামাজিক বিষয় বিতর্ক ব্যঙ্গ মননধর্মিতা, নূতনতর ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখতা,' আজ মনে হয় সে সংজ্ঞা হাস্যকরভাবে সংকীর্ণ।

চার।

কিন্তু জীবনানন্দের কবিতার ধারা ভাল ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তিনি এসব সাময়িক উচ্ছ্বাসে পরের যুগে কখনো গভীর ভাবে আক্রান্ত হননি। এই দিক দিয়ে অন্যান্য কবিদের সঙ্গেও জীবনানন্দের সাহিত্যদৃষ্টি এবং আন্দোলনগত যোগ খুব নিবিড় ছিল না। অবশ্য অনেকে যেমন বলেছেন পূর্বতন ও সমকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সংস্রবহীন দেশ-কাল-নিরপেক্ষ তাঁর রচনা—আমরা তেমন কিছু এর মধ্যে ইঙ্গিত করছি না। আমরা বরং পরে আলোচনা করেছি কিভাবে বাংলাদেশের আবহমানের কাব্যধারায় তিনি অভিষিক্ত হয়েছিলেন, কি ভাবে কাব্য ও ইতিহাসের গভীরে গাহন ক'রে উপলব্ধি করেছিলেন কোন পথে বন্ধ্যাস্রোত বাংলা লিরিকের মহামুক্তি এবং সেই পথে বাংলা কবিতার ধারাকে কি ভাবে অগ্রসর ক'রে দেওয়া যাবে। আমরা শুধু এখানে এই কথাই বলতে চাইছি যে উত্তর-রবীন্দ্র কাব্যসৃষ্টির নানা পরস্পর বিরোধী সার্থক ও ব্যর্থ প্রয়াসের সমসাময়িক উত্তেজনায় জীবনানন্দকে কখনোই তেমন গভীর ভাবে আলোড়িত হতে দেখা যায় নি। নিজের লক্ষ্য স্থির ছিল ব'লে তিনি প্রায় সর্বদাই এই আবর্তের বাইরে স্থির ও একাভিমুখ।

জীবনানন্দের নিজের কবিতায় কোনো দ্বিধা বা কোনো দোলাচলতা ছিল না এমন কিছু একথার সাহায্যে বোঝানো হচ্ছে না। এ গ্রন্থেরই ভূমিকায় ডঃ অমলেন্দু বসু এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আপাতত না তুলেই বলা চলে বাঙলা সাহিত্যে জীবনানন্দের ভূমিকাটি এই অর্থে অনন্য ও ঐতিহাসিক যে কবিতার চিরায়ত রীতি ও প্রযুক্তি, ভাব ও ভাষার পরিধি পেরিয়ে তিনি এমন এক ভূখণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছেন বাঙলার তরুণতর কবিরা প্রত্যাশা করেন সেখানে নিজেদের স্থান ক'রে নিতে পারবেন অথচ স্বাতন্ত্র্য হারাবেন না। আমরা জানি শ্রেষ্ঠ কবিতার পটভূমিতে থাকে মহত্তর জীবনবেদ। এমন মহৎ জীবনবেদ পূর্বোল্লিখিত প্রধান কবিদের কবিতারও ভিত্তি রচনা করেছিল, তথাপি একটি স্বতন্ত্র কাব্য-ঐতিহ্য সৃষ্টির গৌরব এঁদের বর্তায় নি।

এর পিছনেও কারণ ছিল। এঁরা প্রত্যেকেই হয়ত এক একটি স্বতন্ত্র কাব্যরীতির প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, প্রতিষ্ঠা অর্থে পরবর্তী কবিদের প্রভাবিত করার দক্ষতা, কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে তা আর সম্ভব ছিল না। লিরিক কাব্যরীতি এমন এক পরিণতিতে আজ পৌঁছেছে যার রূপগত কোনো বিবর্তন না হলে তা আর বাঁচতে পারে না।

যে কোনো নূতন শিল্পকর্মের একটা আকর্ষণ আছে তা সে যত দুর্বল যত অপরিণতই হোক। বাংলায় লিরিক যখন প্রথম রচিত হচ্ছিল তখন তার অভিনবত্বের যে স্বাদ ছিল তার জন্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মোচ্ছ্বাস অথবা বিহারীলাল চক্রবর্তীর অস্ফুটভাব ও অপুষ্ট ভাষা—সব কিছুরই একটা মূল্য ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রযুগে লিরিক কবিতার সম্ভার যখন বিপুল হয়ে উঠেছে, তার ভাব ভাষা ছন্দ নিটোল সুডৌল রস-পরিণতি পেয়েছে তখন থেকে আর যে কোনো সৃষ্টিতে পাঠকমন তৃপ্ত হতে পারছে না আগের মতো। তারা ফজলি আম খেয়েছে, ফজলি আম ফুরোলে চাইছে ফজলিতর আম, কিন্তু সে আমতো পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং কবিরা নাচার, আর পাঠকরা বিক্ষুব্ধ। পাকা দাড়িকে গুড় তেঁতুল মাখিয়ে আম বলে কেউ কেউ চালাতে চাচ্ছেন কিন্তু সে ষ্টাণ্ট টিকছে না। আসলে সকলকে বুঝতে হবে আমের আসর শেষ হয়েছে। অপেক্ষা করতে হবে আতার আবির্ভাবের।

লিরিকের সব সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়েছে। আজকের লিরিক কবিতা আর তেমন করে পাঠকমন কাড়তে পারে না ব'লেই কবিদের অবিরাম প্রয়াস নূতন ছলাকলার। একালের কবিতা তাই আঙ্গিকে প্রকরণে এত সমৃদ্ধ। ভাব-ভাষার পরিণতির ফলে সার্থক লিরিক রচনা আজ অত্যন্ত সহজ কিন্তু মনোহরণের সেই পুরানো জাদুমন্ত্রটি খোয়া গেছে। আবেগের তীব্রতা দিয়ে আর পাঠকের হৃদয়কে জাগানো যায় না, অন্তরের তীক্ষ্ণ বেদনাকে ভাষা দিয়ে শ্রোতার মনে আর মোচড় দিতে পারা যাচ্ছে না। তাই হৃদয়ের সাহচর্য লাভের জন্য আরও সার্থক কোনো মাধ্যম আবিষ্কার করতে হবে। তাই নিয়ে দেশ-বিদেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই।

জীবনানন্দের কবিতায় এক অদ্ভুত সংবাদ-শালিতা আছে। কিন্তু যে কোনো সাধারণ বাংলা লিরিকের মতো অনেক সময়েই তার স্পষ্ট ব্যক্ত কোনো পরিভাষা নেই। যেন কিছু অর্ধস্ফুট এলোমেলো উক্তি, দু-একটি ইতস্তত ছড়ানো চিত্র, স্বল্পতম কথায় হয়তো একটি নির্বিশেষ পরিস্থিতি—সব মিলিয়ে এমন একটি অব্যক্ত অনুভূতির আমেজ আনে অথবা এক বেদনার ব্যথা ছড়িয়ে দেয় যে পাঠকের সুপ্তপ্রায় মন চমকে জেগে উঠে। তাঁর কবিতার ভাষা শব্দচয়ন ও প্রযুক্তিতে দুর্বলতার অন্ত নেই—অন্তত আধুনিক যে কাব্যরীতি এখনো প্রচলিত রয়েছে, তার বিচারে। জানি, আমাদের একথার প্রতিবাদ উঠবে বিস্তর, কিন্তু সে প্রতিবাদ অর্থহীন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বাক্‌শিক্ষা অধ্যায়ে বিশদ করা হয়েছে। এটুকু বললেই এখানে যথেষ্ট হবে যে জীবনানন্দের ভাষারীতি বাংলা কবিতার ভাষারীতি বা তার বাক্যবিন্যাস রীতিকে প্রায়ই অতিক্রম করেছে, নূতন কোনো ভাষারীতিকে প্রতিষ্ঠা দেবার আন্দোলন হিসাবে নয়—শুধু লিরিক কবিতার স্পষ্টতা অতিক্রম করে এক বিহ্বলতা সৃষ্টির

প্রয়োজনে। অনেক সময়ে সঠিক শব্দটাকে বদলে ভাবটাকে একটু অস্ফুট করে তোলা, বস্তুর বদলে ব্যঞ্জনা, অর্থের বদলে ভাবের অর্ধস্ফুট গুঞ্জরণ, এই তাঁর লক্ষ্য দেখা যায়।

১। সচ্ছল শাণিত নদী, তীরে তার সারস-দম্পতি
ঐ জল ক্লান্তিহীন উৎসানল অনুভব ক'রে ভালবাসে,
তাদের চোখের রং অনন্ত আকৃতি পায় নীলাভ আকাশে;

: মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প

২। তারি পাশে তোমারো রুধির কোনো বই—কোনো
প্রদীপের মতো আর নয়,
হয়তো শঙ্খের মতো সমুদ্রের পিতা হয়ে সৈকতের পরে
সেও স্থির আপনার প্রতিভায়—নিসর্গের মতো:
রূঢ়—প্রিয়—প্রিয়তম চেতনার মতো তারপরে।

: তার স্থির প্রেমিকের নিকট

ভাষা শব্দ অর্থের এই অভাবনীয়তা সত্ত্বেও কি এক আশ্চর্য কৌশলে তিনি হৃদয় ছুঁয়ে যেতে পারেন। তাঁর কবিতার মর্মমূলে যে গভীর চিন্তাপ্রবাহ চলে তা সাধারণ পাঠকের বুদ্ধিগম্য নয়, তবু জীবনানন্দের কবিতা পড়তে ভাল লাগে—এ রহস্য তরুণ কবিদের দৃষ্টি এড়ায় নি, আর এই জন্যেই তাঁর অনুকারকের অন্ত নেই।

ভাবকে উপযোগী ভাষার মাধ্যমে, ধ্বনির মাধ্যমে রসোত্তীর্ণ করার প্রচলিত পদ্ধতিতে নয়, পরন্তু কতকগুলি চিত্রের মাধ্যমে, বিভিন্ন বস্তুর আপাত-বিরুদ্ধ সম্বন্ধের মাধ্যমের অনুভূতিকে অক্ষরে চিত্রিত করার স্বতন্ত্র এক রীতি জীবনানন্দ আবিষ্কার করেছিলেন—

১। তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্যামলী, করেছি অনুভব।

: শ্যামলী

২। * * তার মুখ মনে পড়ে এ-রকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর
পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে ; চারিদিকে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো ; 'তবুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হয়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।

: শিরীষের ডালপালা

প্রথম কবিতাটিতে শ্যামলী নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে যে চিত্র ও বস্তুগুলি কল্পনায় ভেসে উঠেছে তাতে প্রেমিক হৃদয়ের বেদনার অভিব্যক্তি হয়েছে কি আশ্চর্য ভাবে! সমুদ্রের নীল, শূন্য বন্দর, বিকেলের আলোয় সাগরের চিল, নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন -- সব মিলিয়ে এক বিচ্ছেদাতুর আত্মার অসঙ্গ ব্যথা ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় কবিতাটিতে পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে একটা মুখের স্মৃতি মনে আসে আর যে দয়া লোকে মন থেকে মুছে যাওয়া প্রেমিককে করে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন মনে হয় সেই দয়ার মতো। এই সব আপাত অসংলগ্ন ভাব ও চিন্তা পাঠকের হৃদয়ে এমন শূন্যতার অব্যক্ত ব্যথার গভীর আবেগ সঞ্চারে সমর্থ যা প্রচলিত লিরিকের দীর্ঘ উচ্ছ্বাসময় স্বগতোক্তিতেও সম্ভব হতো না।

কিন্তু কবিতার এবংবিধ নূতন প্রকরণ আবিষ্কারেই তাঁর নিঃশেষ কৃতিত্ব নয়। কবিতার ভাবে ও রূপে যে গভীর জীবনানুভূতির সাক্ষর আছে, তাই তাঁকে যুগোত্তর আয়ু দেবে। তাঁর কবিতার সেই বিশেষ রূপপ্রকৃতি নির্ণয়ই আমাদের লক্ষ্য।

বিকাশের ধারা

উন্মেষ

যখন সন্ধ্যা নামে, নিচু জমিতে, মাঠে, ঝোপঝাড়ে অন্ধকার জমাট বাঁধে, উঁচু উঁচু গাছগুলোয় তখনো সূর্যের লাল আভা। তারপর রাত্রি জমে গাঢ় হয়, তখন অন্য এক দৃশ্যপট। অন্ধকারে উঁচু গাছগুলোয় পাথুরে কালো স্তূপের মতো দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়; আর মাঠে-ঝোপে তখন আবছা তরল অন্ধকার।

প্রকৃতির এই দৃশ্যান্তরের মতো কবি-প্রতিভার বর্ণান্তর ঘটতে দেখা যায় কখনো কখনো। প্রথম অবস্থায় যে বস্তুগুলো উঁচু হয়ে চোখে পড়ে তাতে হয়তো অস্তোন্মুখ অন্য প্রতিভার আভা। তখন নূতন কবির ব্যক্তিত্ব বুঝতে হলে দেখতে হয় ছোটখাট খুঁটিনাটি, খুঁজতে হয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে। তারপর সেই স্বাতন্ত্র্য যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন প্রধান বস্তুগুলোতেই সেই প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' থেকে শুধু কবিতার নামগুলি পড়ে গেলেই দেখা যাবে, বিষয় নির্বাচনে সে যুগের সাধারণ কবিচেতনার কি নিদারুণ আনুগত্য ছিল সেখানে। দেশবন্ধু, বিবেকানন্দ, হিন্দু-মুসলমান, আমি-কবি, আলেয়া, ডাহুকী, পিরামিড, ইত্যাদি সাময়িক ও বিষয় মুখ্য পদ্য—যা চিরকালই কবিতার আসরে সবচেয়ে প্রবল ধারা—তাই লেখা হয়েছিল। সে যুগে জীবনানন্দের কবিপ্রাণের বিশিষ্টতা বিষয় নির্বাচনে অথবা প্রয়োগদক্ষতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা লুকিয়ে আছে কবিতার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা বিষণ্ণ-বেদনা অথবা উপমা নির্বাচনের নিপুণ বিশেষত্বে। কিন্তু এই সব সাময়িক আবেদনের কবিতা যে আদৌ কবিতা নয়, অথবা অন্য কবির অনুচারণায় যে সত্যকারের শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়, একথা অনুভব করা মাত্রই এ জাতের লেখা জীবনানন্দের রচনা থেকে বাদ পড়ে গেছে। এগুলি সম্পর্কে তাঁর কোনো মোহ ছিল না। তার প্রমাণ, এমন কবিতা তিনি আর কখনোই লেখেন নি। যে-কোনো সৎকবিই জানেন এগুলির সৃষ্টিপদ্ধতি যান্ত্রিক, প্রকরণ রীতি-নিয়ন্ত্রিত এবং প্রেরণা অনৈসর্গিক। 'ঝরাপালক' বহুদিন নিঃশেষিত হলেও তাঁর জীবিতকালে পুনঃপ্রকাশ না হবার হেতুও অবশ্যই এখানে। এটি পুনঃপ্রকাশ না ক'রে জীবনানন্দ অন্তর্ভুক্ত পরিণত কাব্যবোধের প্রমাণ রেখেছেন।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর, হয়তো পাঠকদের দাবীতে অথবা হয়তো প্রকাশকদের আগ্রহে 'ঝরাপালক' পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। বইটি প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৯২৮

খৃষ্টাব্দে। কবিতাগুলির রচনাকাল জানা যায় না। তবে সাময়িক পত্রিকায় কবিতাগুলির প্রকাশকাল ১৯২৫ থেকে ১৯২৮ সাল। সমকালীন পত্রিকা থেকে আরো কিছু কবিতা সম্প্রতি গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'জীবনানন্দ' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। মনে করা যেতে পারে, 'ঝরাপালক' যখন প্রকাশ হয় জীবনানন্দের কাছে তখন অবধি এর অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলিই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথম পর্বের অপরিণত কবিতার দায়িত্ব শেষ পর্বে অস্বীকার করেছিলেন—শুধু সঞ্চয়িতায় সংকলিত তাঁর ঐ পর্বের কবিতাগুলি সম্পর্কেই তাঁর ঈষৎ মমতা ছিল। জীবনানন্দও পরবর্তী জীবনে 'ঝরাপালক' বইটির গুরুত্ব অস্বীকার করেও তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থে 'নীলিমা', 'পিরামিড', এবং 'সেদিন এ ধরনীর' এই তিনটি মাত্র কবিতাকে স্থান দিয়েছেন। এতখানি নির্মম না হলেও অবশ্য চলতো। অন্ততঃ আরো কয়েকটি কবিতা সেকালীন কবিতার আঙ্গিকের বিচারে অবশ্যই সুখপাঠ্য হয়েছিল। যেমন 'ছায়া প্রিয়া', 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল', 'সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিই কথা কয়' প্রভৃতি। কিন্তু সেকথা বাদ দিলেও, প্রশ্ন করা যেতে পারে কোন বিচারে উদ্ধৃত তিনটি কবিতা এই গ্রন্থের থেকে উদ্ধার যোগ্য মনে হয়েছিল। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে দেখাতে চেষ্টা করেছেন উদ্ধৃত তিনটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের মানসিকতার পার্থক্য পরিস্ফুট হয়েছে। তুলনাত্মক বিচারে তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' ও জীবনানন্দের 'পিরামিডে'র মধ্যে 'তাজমহল' ভাবসত্য ও কাব্যশ্রয়ী দর্শন অন্যপথে 'পিরামিড' ইতিহাস চেতনায় ব্যথাতুর, এবং ইতিহাসের শিক্ষায় সুস্থির। 'তাজমহল' ব্যক্তিকেন্দ্রিক, 'পিরামিড' ইতিহাসকেন্দ্রিক।

কিন্তু এহ বাহ্য। আমাদের মনে হয় শুধুমাত্র এ বইখানি থেকে সঙ্কলন করতেই হবে এই মনোভাব নিয়ে এমন নির্বাচন করা হয়েছিল আর তা কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার না করেই করা হয়েছিল। কবির মনোগঠনের নেপথ্য রহস্য জানার প্রয়োজন তাত্ত্বিক ও গবেষকদের। তাদের প্রয়োজন মেটাতে রসিকজনের দৃষ্টি ভোগে এক অপটু শিল্পীর অপূর্ণ প্রতিমা তুলে ধরা সমীচীন হয়নি।

'ঝরাপালক' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মধ্যে যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান দেখা যায় তাকে ক্রমবিকাশ ভাবা কঠিন। এই ব্যবধানের উপর আমরা জোর দিতে চাই, কারণ এই অধ্যায়েই তাঁর জীবনের জটিলতম গ্রন্থি। হ্যান্স অ্যাণ্ডারসনের রূপকথার গল্পের সেই ছোট্ট নোংরা পাতিহাঁস যেন হঠাৎ একদিন নিজেকে আবিষ্কার করল রাজহাঁস ব'লে—তেমনি আশ্চর্য কাহিনী একটি। ('ঝরাপালকে'র কবি আত্মচারী উচ্ছ্বাসী কিশোর পদ্যকার। নামী কবিদের অনুচিন্তাই যাঁর অভিজ্ঞতার পরিবর্ত, কি মায়ামণির

স্পর্শে সেই আত্মসর্বস্ব আত্মমুখ কবি এক নূতন প্রত্যয়ে জেগে উঠলেন ! নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের চেয়েও বিস্ময়কর সেই আত্ম-আবিষ্কারের ঘোষণা—

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বয়ে আনি ;
একদিন শুনেছ যে স্বর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ !
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার ;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক ;—সকলের পায়ের শব্দের
স্বর গেছে অন্ধকারে থেমে ;
তারপরে আসিয়াছি নেমে
আমি ;
আমার পায়ের শব্দ শোনো,—
নতুন এ—আর সব হারানো-পুরানো ।

: কয়েকটি লাইন

চিরায়ত উৎসবের কথা নয়, ব্যর্থতার গান নয় ; এক ব্যথার জাগরণের কাহিনী এই কাব্য। সেই ব্যথা প্রেম। 'ঝরাপালকে'র নায়ক কবির অহং,—'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবি নয়, পৃথিবী নয়, প্রকৃতি নয়, প্রিয়া নয়—প্রেমেরই মুখ্য ভূমিকা। আর এই প্রেমের উচ্চারণ যে ভাষায় তা আগের মতো প্রচলিত কবিতার ভাষা নয়, কবির মুখের ভাষা নয়, কবির অনুভবের ভাষা। মন্ত্রের পবিত্রতা সেই ভাষায়। মনে হয়, কোনো গভীর ব্যথাকে রক্তের মধ্যে আস্বাদ করতে হয়েছে বলেই শিল্পীপ্রাণের এই জাগরণ। অথচ সেই ব্যথাই ক্ষতের মতো তাঁর মনে জেগে থেকে কাজ ক'রে গেছে। সেই আত্মচারীর উচ্ছ্বাসময় দৃঢ়তা আর নেই—এক ক্রন্দন থেকে থেকে বাজে। কবিতায় প্রেমেরই মুখ্য আসন, অথচ পরিপূর্ণ আবেগশায়ী হতে ভয়। এক জায়গায় এসে কবি আর এগোতে চান না। বিচিত্র কৌশলে কবিতা শেষ করে দেন। নানা কারুকর্মে, ইন্দ্রিয়বৈভব দিয়ে এক রূপজগৎ সৃষ্টি ক'রে আমাদের চমকে দেবার খেলা খেলেন।

বিকাশ

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবি আবেগে গভীর ও প্রকরণে বিশিষ্ট। এই গভীরতার সঙ্গে বরাবরই বিষয়ের বৈচিত্র্য ও পটভূমির ব্যাপ্তির সাধনা ছিল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে, কবিতাগুলির রচনাকাল কিন্তু ১৯২৫ থেকে ১৯২৯। সুতরাং রচনাকালের বিচারে 'ঝরাপালকে'র কবিতা এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতা সমকালীন। ভূমিকাতে কবি লিখেছিলেন, "সেই সময়কার অনেক অপ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে—যদিও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয়—তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হয়ে বেঁচে রইল।" পরে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সিগনেট সংস্করণের ভূমিকায় অশোকানন্দ দাশ লিখেছিলেন, "সেই সব ধূসরতর কবিতার সন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি, তাদের অনেকগুলিই আজ আর বেঁচে নেই; কীট দষ্ট হয়ে উদ্ধারের অতীত হয়েছে····· এই অপ্রকাশিত কবিতাগুলির সংযোজনের ব্যাপারে ঈষৎ সংকোচ বোধ করতে হচ্ছে; কেননা প্রকাশ করবার পূর্বেই প্রত্যেকটি কবিতাকে পরিমার্জিত করার অভ্যাস কবির ছিল, যাতে করে প্রথম লিখবার সময় যেমন ভাবে ছিল তার চেয়ে বেশী স্পষ্টভাবে চারিদিককার প্রতিবেশ চেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে কবিতাটি আরও সত্য হয়ে উঠতে পারে: 'পুনরায় ভাব প্রতিভার আশ্রয়ে'।"

'ঝরাপালক' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যদি একই কালের কবিতা হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে 'ঝরাপালকে'র পরিত্যক্ত কবিতাগুলোই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নূতন রূপে রসে অভিনব হয়ে উঠেছে। কেননা একথা অবিশ্বাস্য যে কবি ভাল কবিতাগুলিকে বাদ দিয়ে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের সংকলন করেছিলেন।

এই রহস্যের সমাধান মেলে যদি আমরা স্মরণ রাখি কবি নির্দেশিত রচনাকালের আট বছর পরে গ্রন্থাকারে এই কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে এবং স্মরণ রাখি অশোকানন্দের পূর্বোদ্ধৃত উক্তি—'প্রকাশ করবার পূর্বে প্রত্যেকটি কবিতাকে পরিমার্জিত করার অভ্যাস কবির ছিল।' অন্তর্বর্তী এই আট বছরে কবিচিত্ত কবিতার যে নূতন রূপ ও রীতিতে দীক্ষিত হয়েছে একথা অনুভব করতে কষ্ট হয় না। এবং তাহলে বুঝতে পারি পুরোনো পরিত্যক্ত কবিতাগুলি শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে চারিদিককার প্রতিবেশ চেতনার ভিতর ভাব প্রতিভার পুনরাশ্রয়ে নব জন্ম নিয়েছে।

জীবনানন্দ লিখেছিলেন, সৎ কবি তাঁর প্রতিনিয়ত শিক্ষিত মনকে আরও বেশী শিক্ষিত করে নিচ্ছেন যা স্বভাব প্রতিভা বলে মনে হয়েছিল সেটাকে আরও স্থির ও বিশুদ্ধ করে।......যদি কবি মনে করেন তাঁর কোন একটি বিশেষ কবিতায় এই শিক্ষিত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ঠিকভাবে স্থির করতে পারেন নি তিনি, ফলে, কবিতার ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, শরীরও অনেক পরিমাণে, কিংবা শরীর উপর-উপর অক্ষুন্ন রয়েছে, কিন্তু ধর্ম নেই—তাহলে সে কবিতায় চরিতার্থ বোধ করবেন না তিনি, কবিতাটি কেটে ফেলতে হবে কিংবা শোধরাবার দরকার।

: কবিতার কথা

অর্থাৎ জীবনানন্দ রচনাকাল থেকে পত্রিকায় প্রকাশের কালে এবং প্রকাশের কাল থেকে গ্রন্থ সংকলনের কালে কবিতাকে এইভাবেই বারবার শোধন ও মার্জিত করে নিয়েছেন এবং মার্জনার মধ্যে তাঁর নিয়ত পরিবর্তমান কাব্য শিল্পবোধ স্বাক্ষর রেখেছে। যখন পত্রিকাতে প্রকাশিত কবিতাগুলির পাঠ বা জীবনানন্দের মূল পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হবে এবং মিলিয়ে দেখা হবে তখন একথার সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও আমরা জীবনানন্দের এই বিস্ময়কর মানস বিবর্তনের হেতু সন্ধান করতে চাই। প্রধানত পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে জীবনানন্দের যে নবতর শিল্পরুচি গড়ে উঠেছিল তাই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'কে নবরূপ দিয়েছে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর প্রভাব। এই বই বুদ্ধদেব বসুকে উৎসর্গিত এবং এর প্রকাশনার ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসু আগাগোড়া যুক্ত ছিলেন। সম্ভবত কবিতা নির্বাচন বা সম্পাদনাও তাঁকেই করতে হয়েছিল। কবিতাগুলির অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশ প্রগতিতে। তার উপর যখন বই ছাপা হল তখন ধাত্রীর কাজও আমি করেছিলাম। তাই ঐ গ্রন্থটিকে আমার নিজের জীবনের অংশ বলে মনে হয় আমার (বুদ্ধদেব বসু)। প্রবুদ্ধ সম্পাদকের হাতে কাব্যগ্রন্থের শ্রী ও মর্যাদা যে কতখানি বাড়তে পারে তার প্রমাণ টি. এস. এলিয়টের নোবেল পুরস্কার পাওয়া কবিতার বই The Waste Land, সেটি এজরা পাউণ্ডের সম্পাদনারগুণেই চমকপ্রদ হয়ে উঠেছিল।

অসতর্ক পাঠকের ধারণা যে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত 'সাতটি তারার তিমির' 'মহাপৃথিবী' 'বনলতা সেনের' পরবর্তী কালের কবিতা কিন্তু কবিতাগুলির রচনাকাল বিচারে দেখা যাবে প্রচলিত সংস্করণে ঐ তিনটি গ্রন্থ যে আকারে আছে তার মধ্যে 'বনলতা সেনে'র রচনাকাল ১৯২৫ থেকে ১৯৩৯, 'মহাপৃথিবী'র রচনাকাল ১৯২৯ থেকে ১৯৪১ এবং 'সাতটি তারার তিমিরে'র রচনাকাল ১৯২৮ থেকে ১৯৪৩। 'মহাপৃথিবীর' সংযোজন অংশের রচনাকাল ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৪, 'বেলা অবেলা কাল-

বেলা'র রচনা ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০ এরই মধ্যে এক খণ্ড কাল পর্বে ১৯৩২ সালে 'রূপসী বাংলা' বইখানি লেখা হয়েছিল।

সুতরাং এই সব গ্রন্থের বিষয় ও আঙ্গিকবিচারে এর মধ্যে কোনো বিকাশ বা উত্তরণ ঘটেছে কিনা তা নিয়ে তর্ক তোলা কঠিন। প্রাথমিকভাবে বড় জোর এটুক-খানি বলা যায় যে অন্তত এ পর্বে এক একটি সংকলন প্রকাশের সময় কবি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে নয়, বিশেষ এক একটি ভাব বা প্রকরণকে অবলম্বন করে নির্বাচন করেছিলেন। পরবর্তী কাব্যে ভিন্নতর ভাব বা প্রকরণের কবিতা বিধৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুক্রমে আরও এইটুকু যোগ করা যায় যে প্রত্যেক গ্রন্থ প্রকাশের আগে সেই কালে কবির বিবর্তনশীল শিল্প চেতনা বা কাব্য চিন্তা দিয়ে ঐ সব কবিতাগুলিকে যথা সম্ভব শোধন করে নেওয়া হয়েছিল, এবং তারই ফলে প্রতিটি বইয়ের ভাব ও রূপের বৈচিত্র্য বা বিকাশ দেখা গিয়েছিল যাকে অসতর্কভাবে কখনও কখনও বিবর্তন বলে মনে হয়েছে।

যদি তাই হয় তবে জীবনানন্দের কাব্যের রহস্যের সন্ধান করতে হবে প্রতিটি কবিতার প্রতিটি পাঠান্তরের কাল বিচারে। রচনাকালে কবিতার যে রূপ ছিল পত্রিকায় প্রকাশকালে তার রূপান্তর গ্রন্থ প্রকাশকালে তার পরিমার্জনা এবং এর মধ্যে জীবনানন্দের কাব্য বোধের বিবর্তনের প্রতিফলন আগামী গবেষকদের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে রইল।

'রূপসী বাংলা' গ্রন্থটি যেহেতু কবির জীবিত কালে প্রকাশিত হয়নি কবিচিত্তের বিকাশের স্তর পরম্পরায় তাই এ গ্রন্থের স্থান 'ঝরাপালকে'র পরে এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র আগে; কেন না তা ১৯৩২ সালের কবিচিত্তের ভাবপ্রবণতাকে ব্যক্ত করেছে। অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির সৃষ্টিকাল যাই হোক তার নব রূপান্তর ১৯৩৬ সালের কবি-চিত্তের শিল্প পরিণতির চিহ্নবাহী।

উত্তরণ

সচেতন শিল্পী মাত্রেরই পুনরাবৃত্তির স্পৃহা নেই। মাইকেল মধুসূদন এই অভিনবত্ব সন্ধানীদের আদর্শ স্থানীয়। জীবনানন্দের কাব্যে দেখা যায় অবিরত সঞ্চরণের নূতন নূতন ক্ষেত্র এষণা। 'রূপসী বাংলা'র পটপ্রেক্ষিত ও প্রকরণ নূতন ছিল তবু এই প্রকৃতি নিষ্ঠাও যখন একঘেঁয়ে লাগল তাও বাদ চলে গেল।

'মহাপৃথিবী'তে আবার ব্যাপ্তির সাধনা। গ্রামীণ বাংলার রূপময় পটভূমি তার ঋতুবৈচিত্র্য তার প্রেম ও বিষাদ পেরিয়ে কবি এবার নাগরিক যান্ত্রিক জীবনের মুখো-

মুখী এসে দাঁড়িয়েছে। এই বিশ্ব যদিও বিরাট ও বিচিত্র তবু আবহমানের নয়। চলমান ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র। তাই এর কাব্য ভাষার মধ্যেও তীব্র তীক্ষ্ণ চলিষ্ণুতা পুরানো রীতি প্রকরণ ত্যাগ করে নূতন উপযোগী রীতির অনুসন্ধান। আধুনিক বাস্তব জীবন প্রদক্ষিণ করে যে রূঢ় তিক্ত অভিজ্ঞতা কবি সঞ্চয় করেছেন তার প্রতিফলন এই কাব্য এবং তিক্ততা, ব্যঙ্গ, বিষাদ ও মৃত্যু কামনা তার ফসল। 'রূপসী বাংলা'তেও মৃত্যুর কথা ছিল। সেখানে জীবন যেমন সহজ স্বচ্ছন্দ, মৃত্যুও তেমনি সুন্দর, শোভাময়। স্বাভাবিক অবসানের ব্যথামাখা জীবনের নিটোল পরিণাম। অথচ 'মহাপৃথিবী'তে জীবন তিক্ত, ক্লান্তিকর, গ্লানিময়, অসহ ভারাতুর। কবির মননেও তাই মৃত্যুর মধ্যে মুক্তিস্পৃহার তামসী-বিলাস। মৃত্যু এখানেও আকাঙ্ক্ষিত, কারণ তা জীবনের দিকে পিঠ ফেরানো পলায়নের পথ।

'মহাপৃথিবী'তে কবি সনাক্ত করেছেন মানুষের বিকৃত জীবন ও বুদ্ধিকে। যে ভয়ানক নির্জন মুখের রূপ মানুষের ভোগের জন্য নয়, উপভোগের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল সেই—

> রূপ কেন নির্জন দেবদারু দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
> পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
> স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
> আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল :
> 'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায় ?'
>
> : আদিম দেবতারা

মানুষের রক্তে এই মাছির মতো কামনা; রূপকে স্থূল হাতে এমনি মাংসের মতো ব্যবহার ক'রে ক'রে স্বপ্নের সম্পদকে কামনার কলুষতা মাখিয়ে মাখিয়ে, বারবার মাখিয়ে শূয়ারের মাংসের মতো ঘৃণ্য অস্পৃশ্য অশুচি ক'রে তোলাই মানুষের ধর্ম।

পৃথিবীর এই কদর্য বামন মানুষগুলোর মধ্যে, এই ক্লেদাকীর্ণ যন্ত্রের বিষ-স্পর্শমাখা শহরের গর্ভে বাস ক'রেও কেউ কেউ অনুভব করে মহাকাশে সূর্য উঠছে, পঙ্কিল সভ্যতাকে ঘিরে নিজের অখণ্ড সজীবতা নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে মহাপ্রকৃতি। সার্বিক মূঢ়তায় কবি-মন শ্লেষে-বিদ্রূপে মর্মভেদী হয়ে উঠলেও হৃদয়ের গভীরে সুপক্ব রাত্রির গন্ধ পাওয়া যায়।

'মহাপৃথিবী'র সঙ্গে 'বনলতা সেন' বইটির অধিকাংশ কবিতার কালগত কোনো ভেদ নেই, কিন্তু মনোভঙ্গির দিক থেকে প্রভেদ দুস্তর। 'বনলতা সেনে'র কবিতাগুলি

সঙ্কলিত হয়েছিল প্রেম, প্রকৃতি এবং ইতিহাস চেতনার দিকে লক্ষ্য রেখে, তাই এই গ্রন্থের আবেদন ভিন্নতর।

বনলতা সেন কবিতাগুচ্ছে যে শিল্পশ্রী উন্মেষিত হয়েছে তার মধ্যে কবিচেতনার সক্রিয়তা ছিল। এখানে এক নূতন ইন্দ্রিয়লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যা ইতিপূর্বে বা পরে তাঁর লেখায় বা অন্য কারো লেখায় এত সুস্পষ্ট আকারে ধরা পড়েনি। (কবি নিজের চেতনাকে সংহত ক'রে, মননকে দমন ক'রে, কেবল ইন্দ্রিয়-গ্রামের মধ্যে দিয়ে এক রূপরাজ্য আবিষ্কার ক'রে নিয়েছেন, তার মধ্যেই তন্ময় হয়ে রয়েছেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র বিহ্বলতা, 'রূপসী বাংলা'র বেদনা 'মহাপৃথিবী'র তিক্ততা, 'সাতটি তারার তিমিরে'র প্রার্থনা এবং 'বেলা অবেলা কালবেলার' সুদৃঢ় মনন এবং মরমী চেতনা—সবকিছু মিলিয়ে জীবনানন্দের যে বলিষ্ঠ বিষণ্ণ কবিসত্তা, তাকে আচ্ছন্ন ক'রে, অতিক্রম ক'রে এক সুরেলা মিষ্টি মেজাজ প্রকাশ পেয়েছে এখানে।)কারণ কবি কিছুই বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করছেন না, মন দিয়ে লক্ষ্য করছেন না, গভীর মমতার সঙ্গে দেহ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে ছুঁয়ে চলেছেন সব কিছু।

বাস্তবিক জীবনানন্দের কবিতার সূক্ষ্ম পরিশীলিত শিল্পিতা নিয়ে যতখানি গর্ব আমাদের তার সাথে এই কবি প্রাণের মধ্যেও যে রক্তাক্ত বিবর্ণতা ও অন্তর্লীন শূন্যতার ব্যথা আছে সে কথা স্মরণ ক'রে বেদনাও কম নয়। একথার প্রতিবাদ হবে হয়তো, তবু আমাদের অভিযোগ করতে হবে কবির উদ্দেশ্যে যে তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে অন্তরলোকের সূক্ষ্মতম অভিজ্ঞতা ও অনুভবের মণিকণিকায় খচিত যে রূপ-জগতে আমরা উপনীত হই সেখানে অন্তর্গুহার বিষয়-রহস্যের উদ্‌ঘাটন নেই—আমরা শুধু অনুভব করি। অতীতে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সব আশ্চর্য অনুভূতির সামীপ্য পেয়েছিলাম অথচ যা আমরা মন দিয়ে লক্ষ্য করিনি, তেমনিই সব অভিজ্ঞতার দিব্য উন্মোচন সেখানে। কাব্য যে 'স্মৃতি সহযোগে ভাবাবলম্বনেচর্বনা'—এই কথা এইখানে এসে বিশ্বাস হয়। আমাদের বিমুগ্ধ হৃদয়ে এই স্মৃতি এক মনোময় নবাবিষ্কারের আনন্দ চমক দেয়। কিন্তু উচ্চাঙ্গের কবিতাতে যে বলয়িত পূর্ণতা থাকে, বস্তু ও প্রকরণের অতীত কোনো মহৎ জীবন উপলব্ধি বা আবেগের গভীর আবেশ যেভাবে অন্তর ভরে দেয়—জীবনানন্দের কবিতায় সাধারণতঃ পাঠকের সেই অমৃত-অভীপ্সা পূর্ণ হয় না। কবিতাগুলির শিল্প-বৈভব ও অঙ্গশ্রী-সুষমার অন্তরালে শূন্যতার স্বাদ হৃদয়ের অতৃপ্তি ও ক্ষুধা নিত্য অনুষঙ্গী করে রাখে।

এই ব্যর্থতা কেন তিনি অতিক্রম করতে পারলেন না—এ প্রশ্ন কাব্য বিচারে অর্থহীন। কি হয়নি তা আলোচকের জিজ্ঞাস্য নয়, কি হয়েছে তাই বিবেচ্য। তবু এই বিশিষ্টতা বিশ্লেষিত হওয়াও চাই। তাতে কবি স্বভাবটিকে চেনা সম্ভব হবে।

মহৎ কবিতা মাত্রেই একটা উত্তরণ আছে। প্রতিটি সার্থক কবিতা আমাদের আত্মাকে অনধিগত এক চেতনা ক্ষেত্রে পৌঁছে দেয়। কবির আবেগ গভীরতা ও মনন দীপ্তি থেকে এই চেতনাক্ষেত্রের জন্ম। কিন্তু জীবনানন্দ স্বভাবত মননশালী কবি নন, আবেগশায়ী কবি। তাই তাঁর যাত্রা আরো নিশ্চিত দূরত্যয় পথে। মননশীল কবি নিজের জীবনের উপলব্ধিকে তত্ত্বের আলোতে নূতনরূপে দেখতে অভ্যস্ত। অভিজ্ঞতা মননে বিশ্রুত হয়ে নূতন নূতন চিন্তার সংশ্রবে এলে কবিতা সৃষ্টি প্রচুর ও অনায়াস হতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল। কিন্তু আনকোরা আবেগ অভিজ্ঞতা যাঁর উপকরণ, তাঁর সৃষ্ট কবিতা, অনুভূতিতে গভীর—কিন্তু সংখ্যায় পর্যাপ্ত হয় না। যিনি আবেগশায়ী, দুর্মর বন্ধনের আনুগত্য থেকে তাঁর মুক্তি নেই—আত্মার সততার বন্ধন। ধরা যাক্, প্রেমের কবিতা। একই প্রেম মননধর্মী কবির দার্শনিক চিন্তার আলোকে অসংখ্য কবিতার জন্ম দিতে পারে, কিন্তু আবেগবান কবি নিজের অনুভূতিকে একবার মাত্রই স্ফুট রূপ দিতে পারেন—নয়তো তা পুনরুক্তি দুষ্ট হবেই। প্রেমের এক পরম আবেগ অভিজ্ঞতার লগ্ন হয়তো কোনো কোনো মানুষের জীবনে আসে, তখন সেই বজ্রাহত দগ্ধ-শেষ আত্মার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেই সত্য মৃত্যুর পরে প্রেমের অনুভূতি আবার আস্বাদ করা যায় না। যদিও বা সেই অসম্ভব সম্ভব হয়—স্মৃতির আকারে, ব্যথার আকারে যদি বা সেই আবেগ পুনর্জাত হয়—তবে তার স্বাদ ভিন্ন রকমের, আর তা নিয়েও বহুবার কবিতা সৃষ্টি দুঃসাধ্য।

আবেগের এমন উত্তরণময় নিটোল বলয়িত কবিতাও জীবনানন্দের খুব বেশী নেই। একদিকে যেমন তিনি মননের সেই চেতনালোক সৃষ্টি করতে পারেন নি যেখানে প্রেমিক প্রিয়ার অন্তরের স্পর্শ পেয়েও বলে—

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়॥

: শ্যামা : রবীন্দ্রনাথ

অন্যদিকে তেমনই আবেগের বিহ্বল আবেগ রচনাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি যখন কণ্ঠলগ্না প্রিয়াকে পুরুষ বলে—

তবে বলবো না কথা, তবে আমি চুপ করে থাকি
তোর অগ্নিচুম্বনে এ ঠোঁট দুটি জুড়ে,
তোর দুটি চোখে মোর শূন্য দৃষ্টি রাখি—
যে চোখ বিশ্বস্ত আবেগের, অন্বেষার—

তবু বোবা কামনারা ঘুরে ঘুরে ভাসে
উড়ন্ত মেঘের মতো লাভাস্রাবী আগ্নেয়গিরির চারপাশে।

: ইংরেজী কবিতা থেকে (অ. ব.)

জীবনানন্দ এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কবি হয়েও কবিতায় এমন প্রগাঢ় উন্মাদনা সঞ্চার করেননি। দু-একটি খণ্ডিত উক্তি, প্রত্যুক্তি, স্মৃতি, আক্ষেপ, ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি আবেগগর্ভ পংক্তি রয়েছে, কিন্তু পূর্ণ বলয়িত ভাবব্যঞ্জনা অনেক সময়েই অনুপস্থিত, ফলে প্রায়ই তাঁর কবিতা পরিণতিতে কোথাও পৌঁছে দেয় না। 'দুজন', 'অঘ্রাণ প্রান্তরে', অথবা 'জার্ণাল ১৩৪৬'-এর মতো কবিতাতেও সেই ব্যর্থতা, সেই স্থাণুত্ব ব্যথার মতো বাজে। মনে হয় ব্যক্তিগত জীবনের কোনো রূঢ় আঘাত, কোনো স্মৃতির তীক্ষ্ণ জ্বালা তাঁকে সম্পূর্ণ আবেগাশ্রয়ী হতে বাধা দিয়েছে। তাঁর সেই প্রথম যৌবনের অপরিজ্ঞাত ইতিহাসের উন্মোচন এখন প্রায় অসম্ভবই। তাই প্যাশানকে আশ্রয় ক'রে স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যেতে তাঁর বাধে। জীবনানন্দের 'ঘাস' বা 'হরিণেরা'র মতো কবিতা যেখানে প্রেমের প্রসঙ্গই নেই। 'পাখিরা' অথবা 'পরস্পরে'র মতো কবিতা যেখানে প্রতীকী ভাবনাই মুখ্য, অথবা 'বনলতা সেন', 'শঙ্খমালা'র মতো কবিতা যেখানে আবেগকে আড়াল ক'রে রয়েছে 'মিষ্টিক'-দীপ্তি, সেখানে কবিতার সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না।

কিন্তু যেখানে 'প্যাশান'ই মুখ্য হওয়া দরকার সেখানে তিনি নির্মমভাবে অদক্ষিণ 'পিপাসার ঋণে'র মতো দেহ পিপাসাও সেই অভাব মেটাতে পারে না।

শেলী-কীটস-ব্রাউনিং যদি কবিতায় 'প্যাশান'কে এমন পরিহার করতেন ইংরেজ পাঠক তাঁদের ক্ষমা করত না। কিন্তু প্রেমের প্রসঙ্গে জীবনানন্দের কুড়ি বছরের পরে চলে গিয়েই স্বস্তি, যেখানে—

ব্যস্ততা নেই কো আর
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখির নীড়ের থেকে খড়
ছড়াতেছে, মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল!

—কুড়ি বছর পরে

'চোখের পাতার মত নেমে কোথায় চুপি চুপি চিলের ডানা থামে', 'সোনালি সোনালি চিল শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে'—এইসব অমূল্য ইন্দ্রিয় বৈভবের জাদু দিয়ে কবিতার স্বাভাবিক পরিধি থেকে দূরে এনে তিনি আমাদের ভুলিয়ে রাখতে চান। পারেন ও।

তবু এই পারাটাই সব নয়। এমন ইন্দ্রিয়ময়তার পরিচয় দিয়েও তিনি যদি কবি-

ধর্মে মহৎ হতেন, সেটাই পরম শ্লাঘণীয় হতো। যা হয়নি তা নিয়ে ক্ষোভ নেই। বাংলা সাহিত্যে এক নূতন বররীতির জনয়িতা তিনি রইলেন ;—ক্ষোভ সেই অনন্য যাত্রী পথে পরাসিদ্ধি তাঁরও অনায়ত্ত রইল।

নব নিরীক্ষা

'বনলতা সেনে'র পরেই 'সাতটি তারার তিমির'। এক জায়গায় সিদ্ধির পরে অন্য জায়গায় সাধনা। জনপ্রিয়তার মোহ যাকে পায় সে আপন সফল সৃষ্টির অনুবর্তন করতে বাধ্য। কিন্তু বাংলা কবিতার সেই শোচনীয় অবক্ষয়ের যুগে 'বনলতা সেনে'র অভূতপূর্ব অভ্যর্থনার পরেও চিন্তার জটিলতার মধ্যে, সুর-রিয়ালিষ্ট কবিতার দুর্বোধ রহস্য গূঢ়তায়, নূতন অনিশ্চিত নিরীক্ষার পথে যে কবি অগ্রসর হতে পারেন, তিনি সাধারণ নন।

অথবা, এই তাঁর নিয়তির নির্দেশ। ইতিহাস সেই নিয়তি। যুদ্ধের সেই প্রচণ্ড বিভীষিকার মধ্যে মানুষের আত্মা যখন ক্ষতবিক্ষত রক্তাপ্লুত, তখন সৌখিন ইন্দ্রিয়ময়তার মধ্যে কাব্যবিলাস তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। চেতনা তখন প্রবল উত্তেজিত, বেদনা তখন দিগন্ত-প্রসারী—আর সেই বেদনার মধ্যে যখন অন্তরে এক দুর্নিরীক্ষ প্রত্যয় মাথা তুলে উঠছে, কোনো সৎকবির পক্ষে তখনো কি আর পুরানো পথে হাঁটা সম্ভব? সেই দুর্বোধ আগন্তুক দুর্বার আবেগে কবিকে নূতন পথে চালিয়ে নেবেই।

'মহাপৃথিবী'তে বিক্ষিপ্ত বস্তু পৃথিবী ও জীবন জটিলতার মননিষ্ঠ কিছু কবিতা বিধৃত হয়েছিল। 'সাতটি তারার তিমিরে' তারই পুনরাবর্তন দেখা গেল, কিন্তু এ গ্রন্থে পুরানো ভাবনার সঙ্গে মিশেছে নূতন উপলব্ধি তাই নূতন প্রকাশ পদ্ধতি, নূতন প্রতীক, নূতন সংকেত দেখা দিয়েছে। বহির্বিশ্বে তখন যুদ্ধের নান্দীরোল সর্বব্যাপী সংকট, আত্মঘাতী বুদ্ধি, রুচিহীন বিলাস ও প্রতিকারহীন নৈরাশ্য। রাজনীতিবিদ্‌রা নানা ইজমের তাড়নায়, স্বার্থের মোহে বিভ্রান্ত, চিন্তাশীলেরা বিমূঢ়, সাধারণেরা সর্বস্বান্ত। তখন জীবনানন্দ প্রজ্ঞার মাধ্যমে জীবনের জটিল দিকগুলোর পরিপূর্ণব্যাপ্তি নিয়ে জিজ্ঞাসা-মুখর কবিতা লিখছেন সমাধানে পৌছাবার প্রত্যাশায়। জীবনের যে কোনো দিক, যে কোনো সমস্যাকে যে কবিতাতে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে—এবং ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব কবির রয়েছে সে সম্পর্কে জীবনানন্দের অন্তত কোনো সংশয় ছিল না। সে কথা বিবৃত হয়েছে তাঁর 'কবিতার কথা' বইতে।

কিন্তু এসব কবিতা সিদ্ধ হয়েছে কি? দূর যুগান্তরে এইসব সমস্যাকেন্দ্রী কবিতা আপন রসমূল্যে কি বেঁচে থাকবে? এ তর্ক উঠুক। কবি অন্তত জানতেন এ পথে আসা, এই দুরূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর ব্যর্থ হয়নি। এই বিষয় কবিতার বাইরে নয় একেবারে, এখানেও কবির পরাসিদ্ধি সম্ভব।

এ ছাড়াও রয়েছে 'সুর-রিয়ালিষ্ট' কবিতা—অবচেতনার সেই আশ্চর্য সংকেত গূঢ় উদ্ঘাটন—এক নূতন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছে বাংলা কবিতাকে তারও উন্মেষ এখানেই। এসব কবিতা দুরূহ তো বটেই সেজন্য বইটি জনপ্রিয়তাও লাভ করে নি তেমন। যেমন বুদ্ধদেব বসুর মতো জীবনানন্দের একান্ত গুণগ্রাহী মানুষও এসব কবিতা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন না ক্ষুণ্ন কবি স্বয়ং লিখেছেন, "বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশী আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়।··· তারপরে 'বনলতা সেন' এবং পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজের ও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি।" আমাদের বিশ্বাস কবির এই ব্যক্তিগত বেদনা 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমিরের' কবিতাগুলি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর প্রতিকূল মনোভাবে। বর্তমান আকারে 'বনলতা সেন' গ্রন্থটি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বিরূপ ছিলেন না।

যাইহোক 'সাতটি তারার তিমির'-এ কবিচিত্তের বিকাশের আরেক স্তর, মালার্মে প্রভৃতির প্রতীকী আন্দোলন এবং পরবর্তী সুর-রিয়ালিষ্ট বা পরা-বাস্তববাদী আন্দোলন এতে প্রাণরস জুগিয়েছিল। যুদ্ধ পূর্বকালীন হতাশা ও বিষাদ এবং যুদ্ধকালীন সর্ববিধ মূল্যবোধের বিনষ্টি কবিতাগুলিতে যে তিক্ত পটভূমি রচনা করেছিল 'মহাপৃথিবী'র তুলনায় অনেক পরিণত শিল্পিতাসত্ত্বেও তা পাঠকচিত্তকে হৃষ্ট করতে পারে না, ক্লিষ্ট ও ভারাক্রান্তই ক'রে তোলে।

'মহাপৃথিবী'তেই এই বিষাদের সূচনা হয়েছিল। প্রকৃতির নির্জন প্রত্যন্তভূমি ছাড়িয়ে কবি যে মানব-সভ্যতার নবপীঠ নাগরিক জীবনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ব্যাপ্ত অথচ কলুষ পটভূমি কুটিল ও শ্বাসরোধী মনে হয়েছিল। হিংসা-মৃত্যু চক্রান্তের এই ভয়াল মঞ্চের পশ্চাৎপটে যে প্রশান্ত মহা প্রকৃতি বিদ্যমান তা নাগরিক মানুষকে কোনো স্বস্তি দিতে পারেনি; তাই কবিতার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়েছিল ব্যঙ্গ ও বিষাদ। 'সাতটি তারার তিমিরে' এই মনোভাবনাই আরো সঙ্কেত গূঢ় হয়ে উঠেছে। যে সপ্তর্ষিমণ্ডল মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক তা আর আলোক-বর্তিকার মতো মানুষকে পথ দেখাতে পারছে না। বরং এক তিমিরচ্ছটায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। তাই কবির চেতনায় আলো বার বার নিস্তেজ হয়ে নিভে আসে।

(ক) বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে নিভে যায়।

(খ) যত

নিরুপম সূর্যালোক জ্বলে গেছে—তার

ঋণ শোধ করে দিতে গিয়ে এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার,

মানুষের অভিজ্ঞতা এরকম।

(গ) যেদিকে তাকাই

কিছু নাই

রাত্রি ছাড়া।

'সাতটি তারার তিমির', তাই দিশাহারা বিপর্যস্ত মানবজীবন ও তার অন্তরালে শুশ্রূষাহীন নিরর্থক বিশাল নিসর্গের মহাকাব্য। তার মধ্যে তিমির নিমগ্ন কবির বিশ্বস্ত প্রার্থনা :

"মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেকে
মহান তৃতীয় অঙ্কে : গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হবে নাকি
সূর্য আরো নব সূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও—
প্রাণ দাও পাখি।"

মাত্রাচেতনা

১৩৫১ সালে জীবনানন্দ 'কবিতার কথা' গ্রন্থের 'মাত্রাচেতনা' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তাতে ছিল—

"আদিম মানুষ যেদিন নিজেকে বোঝাবার তাগিদ বোধ করেছিল সেই অস্পষ্টতার সময় থেকে ক্রমশ স্পষ্টতর ভাবে; এই ক্রমিক নির্মলতা তার চেতনার ভিতর কাজ করে এসেছে ; এবং সাংঘাতিক, সামাজিক প্রয়োজনে সকলের সঙ্গে মিলিত হতে হলে সেও বিশেষ কোনো অস্পষ্ট কথা বলে না, কোনো প্রতীকের দুর্গমতা বা রূপকের আবছায়ার দিকে সহজে ঘেঁষতে চায় না আর।…এ মানসকে কবিতার বিশিষ্ট স্বভাবের দিকে অগ্রসর করে দিতে পারা যায় কিনা—জনসাধারণের চেতনা রুচি ও ভাষা মহত্তর করে তুলতে পারা যায় কিনা, এইসব বহুকালের চলতি সমস্যা…। কবি মানসের প্রমত্ততা বা তার মহাভাবনার দৌরাত্ম্য তাকে যতই নিরাবলম্ব ও অস্পষ্ট করে তুলতে চাক না কেন—পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহাকবিই এই অস্বস্তি বোধ করেছে—জনসাধারণের নিজেদের বাচনরীতির সকল স্বচ্ছতার দাবি সে কাটিয়ে উঠতে

পারেনি।…কবিতা সৃষ্টি করবার সময় সে তার নিজের আদর্শ উপায়কে যতটা স্বায়ত্ত মনে করুক না কেন, ততদূর স্বাধীন তা নয়। সে সময়ে সে বাস করেছে, এবং যে সময়ে বাস করেনি, যে সমাজে সে কাল কাটাচ্ছে এবং যেখানে কাটায়নি, যে ঐতিহ্যে সে আছে এবং যেখানে সে নেই এই সকলের কাছেই সে ঋণী।… এজিনিষ ঋণও নয় উপায় বরং—মর্মার্থী হয়ে বেঁচে থাকবার,…নিজের অভিজ্ঞতাকে কতদূর অপরের করে তুলতে পারা যায়—সকলকে না হোক, অনেককেই পরিদীক্ষিত করতে পারা যায় নিজেব মূল্যজ্ঞানের চেতনায়—এ দায়িত্ব কবির।…

"কিন্তু তাই বলে কবিতার মানে পাঠক সম্বন্ধে নির্বিশেষে বিমুক্ত করতে গিয়ে যে যুগে ও যে দেশে আমি রয়েছি সেখানকার মানুষের মুখের ভাষায় কবিতা লিখব—এরকম বা যে কোনোরকম সংকল্পে কবিতা উতরায় না। সার্থক কবিতা হয়তো মুখের ভাষায়ই ফুটে উঠবে, কিংবা ঠিক মুখের ভাষা নয় এমনি কোনো ভাষায়; · যে জিনিষ হয়তো আমিই শুধু জেনেছি সেই সম্পর্কে আমাব স্থাপনাশক্তিকে স্পষ্টতা, আমার আত্মপ্রত্যয়কে সুস্থিরতা দেবাব জন্যে আমি তাকে সবচেয়ে স্পষ্ট স্বভাব প্রতিভার ভিতর দেখব, অপরকে দেখাবার বা জানাবার আগে নিজের ব্যক্তিপুরুষকে চরিতার্থ করে নেবাব জন্যে।"

: কবিতার কথা

এই প্রবন্ধ লেখার আগে 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির' দুটি বইয়েরই শেষ কবিতাটিও লেখা হয়ে গেছে। যদিও শেষোক্ত গ্রন্থটি এবং প্রথমটির অনেক কবিতাই তখনও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়নি। আমাদের মনে হয় পাঠকদেব বারংবার দুর্বোধ্যতার অভিযোগেব অভিঘাতে অথবা স্বাভাবিক আত্মপ্রতিক্রিয়ায জীবনানন্দ কাব্যশিল্প সম্পর্কে নূতন উপলব্ধিতে এসে পৌঁছেছেন। তারই অভিব্যক্তি দেখা গেছে তাঁর পরবর্তী কবিতাগুলিতে 'বেলা অবেলা কালবেলায়' শ্রেষ্ঠকবিতায বিধৃত অগ্রন্থভুক্ত কবিতা গুচ্ছে, সুররিয়ালিজম ও প্রতীক রূপকের দুর্গমতা পরিহার কবে তিনি ক্রমশ তাঁব 'স্থাপনাশক্তিকে স্পষ্টতা' দিতে চেয়েছেন। তার ফলে তাঁর কবিতায় আর এক দূরপ্রসাবী পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

'বেলা অবেলা কালবেলা' প্রকাশিত হয়েছিল কবির মৃত্যুর পরে। প্রকাশক বলেছেন 'গ্রন্থাগারে প্রকাশ করার জন্য কবি নিজেই কবিতাগুলি বাছাই করেছিলেন।' কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০। প্রায় ১৬ বছর ধরে ছড়ানো এই সব কবিতার প্রথম ১০ বছর 'সাতটি তারার তিমিরে'র কালসীমার সমান্তরাল এবং তার পরের আরো ছ'-বছরের কবিতা এর মধ্যে পাওয়া যাবে।

৫ প্রতীকী রীতি বর্জন ক'রে কবি এখানে সহজ হতে ও স্বভাবে স্থিত হতে চলেছেন।

কিন্তু চিন্তার গভীরতা মেধা বিশ্বাস ও মননের চাপ এখানে কমেনি বরং বেড়েছে। এখানেও ছড়িয়ে আছে সভ্যতার পরিণতি সম্পর্কে সংশয় ও বিষাদ : তাই স্বচ্ছতা ও সারল্য সত্ত্বেও এ বইটি 'সাতটি তারার তিমির'-এর চেয়ে কম দুরূহ, বা বেশী জনপ্রিয় নয়। সাঙ্কেতিকতা ত্যাগ করায় এখানে কবিতার আকার অনেকটা বড়ো, মননশীলতার প্রাবল্যে গদ্যধর্মী, ছন্দের বৈচিত্র্যও এ পর্বে অনেক কম। পংক্তিগুলির আকারও প্রায়শই দীর্ঘতর হয়েছে।

জীবনের শেষ পর্বে এসে মনে হয় কবি সব গুছিয়ে তুলছিলেন। সেই সব কবিতা যা স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় স্থির প্রশান্তিতে স্থিত। মনে হয়, মানুষ যা চেয়েছিল সেই মহাজিজ্ঞাসার উত্তর তাঁর উপলব্ধিতে পৌঁছেছিল। সেই আশ্চর্য জাগ্রত বোধির কবিতা—যাতে উপনিষদের কবিরা মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন—খুব দূর ছিল না। যেখানে ব্যক্তিটিকে কথা বলতে হয় না, তার প্রজ্ঞাময় অন্তর্তম সত্তা সামনের কুয়াশা কাটিয়ে দেখতে পায়, ব্যক্তিটিকে ঘুম পাড়িয়ে কবিতা সৃষ্টির লগ্নে আচ্ছন্ন (hypnotize) ক'রে রাখলে সে সত্তা জেগে ওঠে তা এসেছিল।

অন্তিমের প্রেমের কবিতায়—ওই যূথবদ্ধ, বিষণ্ণ, বিহ্বল স্বরের কবিতায় তিনি কিসের পরীক্ষা করছিলেন? আগের আমলের—'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন' পর্বের জোরালো রূপ-প্রকরণটা ভাঙলেন কেন? মনে হয় ভাঙাটাই লক্ষ্য। ভাঙলেই তাকে পাওয়া যায় যার জন্যে কবিতায় হাতড়ে বেড়ানো। শিল্পীর সতর্ক চেতনাটা সরে গেলেই অন্তরের ব্যথা কথা কয়ে ওঠে।

ইতিহাসচেতনা

নির্জনতা

খুব কৌতূহলোদ্দীপক একটি ব্যাপার হলো কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ উভয়েই সমবয়স্ক এবং কল্লোলের অব্যবহিত অগ্রজাতক, অথচ উভয়ের কাব্য-চেতনায় কি দুস্তর ব্যবধান! নজরুল রহস্য ক'রে আপনাকে 'যুগের এবং হুজুগের কবি' হিসাবে জাহির করেছিলেন। সেই আত্মবিজ্ঞপ্তির যথার্থতা আজ অনেকেই স্বীকার করবেন। বাস্তবিক তাঁর সৃষ্টির ভিতর যুগোত্তীর্ণ হওয়ার পাথেয় কবিতা থেকে গানের মধ্যেই বেশি পরিমাণে নিহিত।

কবিতার এই সাময়িক লক্ষণযুক্ততার জন্যই নজরুল জনচিত্তের যে অভিনন্দনে ধন্য হয়েছিলেন তা পেতে জীবনানন্দের তিন যুগ লেগেছে অথবা বলা চলে ততখানি গণস্বীকৃতি তিনি আজও পাননি। এতে বিস্মিত বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার কিছু নেই। তবু এই সহজাতক দুই কবির স্বভাব-বৈপরীত্য রসিক মনের প্রশ্নাতুরতাকে উদ্‌গ্রীব করে তুলবে। যে যুক্তিতে নজরুলকে জনতার কবি বলি, সেই যুক্তিতে জীবনানন্দকে নির্জনতার কবি বলতেই হয়—যদিও সূচনাতেই এমন উক্তির সীমা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। 'নির্জন কবি' বলতে যদি বোঝানো যায় যে, জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি, তবে কারোও কিছু বলার থাকে না; কিন্তু এর যদি অর্থ করা হয় জনজীবনের সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগ ছিল না তবে তা শুধু ভুল হবে না, জীবনানন্দের কবিকৃতি নির্ণয়ের পক্ষে মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা নজরুল ইসলামের লেখায় রূপ পেয়েছে। তার মধ্যে ফুটে উঠেছে সাধারণের প্রতি কবির অপরিসীম ভালবাসা। এই কথাই জীবনানন্দের কাব্যে আরো গভীর অর্থে সত্য। এখানেই উভয় কবির জীবন-দৃষ্টির মিল। কিন্তু কেবল গণজীবনের কামনা-বেদনা রূপায়িত ক'রে জীবনানন্দ ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি—আরও গভীরে দৃষ্টি ফেলে আজকের সভ্যতার অন্তর্নিহিত নিবিড় নৈরাশ্য ও হতাশা প্রত্যক্ষ করছেন। এই উপলব্ধি তাঁকে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে।

জনপ্রিয় কবি হতে গেলে কয়েকটি বিশিষ্ট গুণ থাকা চাই। জনসাধারণ আশা করতে, ভালবাসতে, উত্তেজিত হতে চায়। হতাশা তাদের কাছে দুঃসহ, চিন্তাশীলতা তাদের পক্ষে দুর্বহ। সোজা সাদাসিধে কথায় তাদের কামনা-বাসনা আনন্দের গান যারা গাইতে পারবে, জীবনের স্থূল প্রয়োজনগুলি যারা শিল্পিতাবর্জিত কাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে, তাদের আর মার নেই। জীবনানন্দের এই সব গুণের মারাত্মক

অভাব ছিল বৈকি! কোনো বিবেকী সৎ কবিই মনের গভীর দুশ্চিন্তা চেপে আনন্দের গান গাইতে পারেন না। জীবনের স্থূল প্রয়োজন সম্বল করে অহেতুক উত্তেজনা ছড়াতে পারেন না। জীবন তাদের জীবন-জিজ্ঞাসায় উত্তরিত করে, শিল্প তাদের শিল্পী-চেতনায় স্বাক্ষর রাখে।

এই পর্বের আরো একজন প্রধান কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যে এমন গভীর জীবন-জিজ্ঞাসার পরিচয় ছিল। ইতিহাস ধারার পশ্চাৎ পটে দৃষ্টিক্ষেপ করে গভীরতর হতাশা ও নির্বেদে নিমজ্জিত হয়েছিল তাঁর মন। তাই তীব্রতর শ্লেষ-বিদ্রূপে তিনি কশাঘাত করেছেন সর্বত্র—ধর্ম, সমাজ, রাজনীতিক সংস্কার-পন্থীদের,—জাতিকেই। জীবনানন্দের আদিযুগের কাব্য প্রেরণায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়—বরং তার তাৎপর্য বিশেষ ভাবে অনুভবনীয়। জীবনানন্দের কবিজীবনের মধ্যযুগ অবধি যে নির্বেদ ও নিদ্রাতুরতার প্রতি আসক্তি দেখা যায় তাও কি যতীন্দ্রনাথের 'ঘুমিওপ্যাথী'-র প্রভাব সঞ্জাত না? তবু জীবনানন্দের মনোগঠনটাই ভিন্নতর। যতীন্দ্রনাথের মতো শ্লেষ বিদ্রূপে যেমন তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়নি, তেমনই নির্বিকল্প হতাশাও তার চারিত্রিক আশাবাদকে ছাপিয়ে কখনো সর্বৈব হয়ে উঠতে পারেনি।

অথচ জীবনানন্দ পলায়নবাদী কবি হিসাবে আজও মিথ্যানিন্দিত। তাঁর কাব্যের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তারা এজাতীয় উক্তির অসারতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়। বাস্তবিক জীবন সম্পর্কে এমন সদাজাগ্রত কৌতূহল, এমন পরিপূর্ণ ইতিহাসচেতনা সমকালীন অন্য কোনো কবির মধ্যে নেই। তাঁর কাব্য পড়তে গেলে অনেক সময়েই মনে হয়, ইতিহাস বিশেষতঃ সমকালীন ইতিহাস তাঁর কাব্যে অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়েছে। তাঁর অনির্বচনীয় শিল্পদক্ষতায় তার রুক্ষতা চাপা পড়লেও পরিণামে পরিবর্তিত পরিবেশে তা হয়তো কিছু কিছু কবিতার ক্ষেত্রে শিল্পের অন্তিম মূল্যেরই হানি করবে—যদিও সেই দূর ভবিষ্যতের কথা কল্পনা ক'রে আপাতত বৃথা দুর্ভাবনার প্রয়োজন দেখি না।

ব্যাপ্তি

বৈষ্ণব কবিতার বিরুদ্ধে একটা বড়ো অভিযোগ ছিল সেখানে গভীরতা আছে, প্রসারতা নেই। জীবনের বিশাল ব্যাপ্তি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নব নব বৈচিত্র্য আদিম মহাকাব্যে, মধ্যযুগের গাথা ও মঙ্গল কাব্যে, উনিশ শতকী বীর-কাব্যে যেভাবে স্থান করে নিয়েছে সে সুযোগ বৈষ্ণব কবিতায় ঘটেনি। এই প্রসার মানে এ নয় যে,

মানুষের যাবতীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার স্থান কবিতায় ক'রে দিতেই হবে—এর অর্থ হ'লো জীবনের কোনো বিষয়ই কবিতা থেকে বহিষ্কার-যোগ্য নয়। প্রয়োজন মতো সব অভিজ্ঞতাকেই কবিতায় স্থান দেওয়া যাবে এমন উদার গ্রহণশীলতা কবিতার থাকা ভালো। বৈষ্ণব কবিতা শুদ্ধ-শিল্পের কবিতা—জীবন থেকে প্রাণ-নির্যাস নিয়ে তা বেঁচে থাকে। কিন্তু জীবনকে, জীবনের কোনো খণ্ডাংশ অথবা জীবন-সঞ্জাত অভিজ্ঞতাগুলিকে বৈষ্ণব কবিতা স্থান দিতে পারে না।

আধুনিক বাংলা লিরিকেরও অনেকখানি ঐ দশা। বাঙালী গীতিকবিদের মধ্যে জীবন-দৃষ্টির একটা ব্যাপ্ত পরিধি বহু সময়েই অনুপস্থিত। ইতিহাসের গতির সতর্ক অনুধাবন, পরিণত রাজনৈতিক চেতনা কবিতার উপযোগী আবহের পরিপন্থী এমন একটা ধারণা রয়েছে অধিকাংশ সাম্প্রতিক কবির। অনেক প্রবীণ কবি আজও শৈল্পিক শুদ্ধতায় বিশ্বাসী। এঁদের ধারণা ও রচনার অনুভাবনায় আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি বিশুদ্ধ হৃদয়ানুভবের বাইরেও গীতি কবিতার সঞ্চরণভূমি থাকতে পারে। জীবনের বুদ্ধি, জ্ঞান, চিন্তা, অনুভবের যে কোনো উপাদেই গীতি কবিতার মর্মকেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে।

অবশ্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা চিন্তা ও অনুভবের শুদ্ধতা প্রকট সত্যের মতো বা বৈজ্ঞানিক তথ্যের মতো কবিতাতে স্থান পাবে না। বরং এই বাস্তব প্রজ্ঞান এক স্বচ্ছতায় স্থিত হয়ে কবির সহজ স্বভাবগুণকে সজাগ ও তপঃশক্তিশীল ভাবে শিক্ষিত, অনুভূতি ঘন ও সুস্পষ্ট করে তুলবে। অভিজ্ঞতা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাই কবির পক্ষে আরো বেশি সিদ্ধির স্তরে পৌঁছানো সম্ভব। যদিও অভিজ্ঞতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কবিস্বভাব বিশৃঙ্খল হয়ে যাবারও আশঙ্কা আছে।

অথচ সাম্প্রতিক বাঙালী কবিরা কবিতার এই সঙ্কট এড়িয়ে যেতেই ইচ্ছুক। স্বভাব কবিতার পর্যায় পেরিয়ে আরো মহত্তর পরিণতির পথে তাই বাংলা কবিতা এগিয়ে যেতে পারছে না। হৃদয়াবেগ কেন্দ্রিত বাংলা কবিতায় যে সঙ্কীর্ণ আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে সেই ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্তি না পেলে বাংলা কবিতার সুস্থ স্বস্থ প্রতিষ্ঠা হবে না।

এমন কবি অবশ্য এদেশে অনেকেই আছেন রাজনৈতিক বিশ্বাস অথবা মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান যাদের কবিতা নিয়ন্ত্রিত করেছে। সেই বিশ্বাসী মনের কবিতা অথবা মনস্তাত্ত্বিক রীতির কবিতা কবির মনোভূমিকে আগেই এক নির্দিষ্ট আকার দেয় বলে স্বচ্ছ চোখে পৃথিবীকে, জীবনের সমস্যাগুলিকে দেখার দৃষ্টি হারিয়ে যায়। তত্ত্বের রঙিন আলোতে জীবনকে দেখা, সমাজকে ব্যাখ্যা করা এক, আর স্বাভাবিক চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে জীবনের বিরঞ্জিত অবস্থা এঁকে তোলা ভিন্ন কথা। প্রথমোক্তদের ক্ষেত্রে

তত্ত্বটি ধ্রুব, জীবনের ততটুকুই বর্ণনীয় যাতে তত্ত্বটি পরিস্ফুট হয়। স্বভাবতই শেষোক্তদের ক্ষেত্রে তা নয়।

জীবনানন্দের কবিদৃষ্টির মধ্যে কোনো প্রাক্-পরিগৃহীত সংস্কার ছিল না। কবিতা সম্পর্কে কোনো ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে গীতি-কবিতার পরিধিকে তিনি ছোট ক'রে আনেননি—অথবা পূর্বনির্ধারিত কোনো তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে তিনি অভিজ্ঞতা নির্বাচন করতে বসেন নি। তাঁর কবিদৃষ্টিতে ছিল ঐতিহাসিকের নির্মোহ স্বচ্ছতা। কবিতার প্রকরণের দিকে, হাল আমলের কবিদের মতো দু-একটি স্মরণীয় পংক্তির উজ্জ্বল নৈপুণ্যেই অখণ্ড মনোযোগ না দিয়ে কবিতার সার্বিক উদ্ভাসনায় তিনি যত্নবান ছিলেন। সেই সাথে বিষয়ের দিকে চিন্তা-বিসারের মধ্যে, যুগচেতনার মধ্যে কবিতার প্রসরণ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেই জীবনানন্দ একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন—

> সময়-ও সীমা-প্রসৃতির ভিতর সাহিত্যের পটভূমি বিমুক্ত দেখতে আমি ভালবাসি। তবু আমি এটা স্বীকার করব না যে 'মেমোরেবল স্পীচ' মাত্রই কবিতা। কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার। কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। কাল বা সময় বৈনাশিক, কিন্তু সে সেই সমস্ত কুয়াশাগুলোকেই কেটে-কেটে চলেছে যা পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াবার পক্ষে অন্তরায়ের মতো।
>
> **: কবিতার কথা**

জীবনানন্দের কবিতার বিচার প্রসঙ্গে এই উক্তির তাৎপর্যে অনুপ্রবেশের প্রয়োজন আছে। কবিতায় যে ভাবনা-কল্পনার ব্যাপ্তি আকাঙ্ক্ষিত, তার লেখায় তার অসদ্ভাব নেই। এই ভাবনা-কল্পনা ও যুগচেতনা কবিতার ফলশ্রুতিতে রসমূল্যে কোনো বিরোধ এনেছে কিনা তাও দেখতে হবে। কবিতা শুধু চিন্তাভূয়সী হলে চলবে না, সেই চিন্তা স্মরণীয় ভাষণ হয়ে ওঠাও যথেষ্ট নয়, তাকে উদ্ভাসিত হতে হবে। দীপ্তি কাব্যের এই দুরূহ আদর্শ সামনে রেখে তিনি কাব্য-পিপাসুদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

কবির পক্ষে সমাজবোধ প্রয়োজনীয়। ইতিহাসচেতনা কবিতার অস্থি-র মধ্যে মজ্জার মতো উপস্থিত থাকবে। যুগে যুগে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি, সাধনা ও ব্যর্থতা যদি চিনে নেওয়া কবির পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে আধুনিক সমাজের স্বরূপ তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হবে না। সুতরাং যুগজীবনের যিনি রূপকার তিনি যুগান্তরে বেঁচে থাকবেন যে তার নিশ্চয়তা কোথায়? ইতিহাস-চেতন হলে অবশ্যই থাকবেন। কারণ বৈনাশিক কাল সেই অবান্তর আবর্জনাগুলিকেই ধ্বংস করে যা যুগান্তরে অর্থ-হীন ভাব-স্বরূপ। এযুগের বিশিষ্ট চরিত্র যেমন অন্য যুগের তুলনায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে

ইতিহাস-চেতন কবির কাছে, তেমনি কোন কোন ভাবনা-কল্পনা যুগোত্তীর্ণ হওয়ার নয়, সে শিক্ষাও তাঁকে দেবে। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত কবির সৃষ্টি তাই যুগের চিহ্নবাহী হয়েও যুগোত্তীর্ণ। সর্ব কালের বলেই আধুনিক কালের।

ইতিহাসচেতনা

প্রত্যেক যুগের কবিকেই এক সমস্যার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়, সাহিত্যে সাময়িকতা ও শাশ্বতের সমস্যা। সাময়িকতা অতিক্রম ক'রে শাশ্বত কালের রসমূর্তি রচনাই শিল্পী মাত্রেরই আরাধ্য। সাধারণ শিল্পী শুধু শাশ্বতের সাধক—ইতিহাসের নয়। কিন্তু ইতিহাস-চেতন কবি যেমন নিজের যুগের, তেমনই সর্বকালের কবি। কারণ অতীতের জ্ঞান ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকে যুগের ও শাশ্বত কালের ধারণা লেখকের আসে। যুগের চেতনার সঙ্গে আবহমানের বেদনাকে যিনি সমন্বিত করতে পারেন তিনিই ইতিহাস-চেতন শিল্পী।

ইতিহাস-চেতন কবি ইতিহাসের গতির তাৎপর্য কালপ্রবাহ অনুধাবন ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে জেনেছেন বলেই ইতিহাসের স্বাভাবিক সঞ্চরণ পথ তাঁর চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে। কোথায় আমরা ইতিহাসের অভিপ্রায় বিরোধী পথে নেমেছি, কোথায় স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে আটকে রয়েছি তা তাঁর না জানা থাকার কথা নয়। তাই বদ্ধ পল্বল থেকে মুক্ত হয়ে, উজান গতি থেকে নিবৃত্ত হয়ে, সমুদ্র-সঙ্গমে পৌঁছাবার সঠিক উপায় তিনি আমাদের নির্দেশ করতে পারেন।

ইতিহাসাশ্রয়ী কবিতামাত্রই ইতিহাসচেতনার কবিতা হলে প্রতিটি রোম্যান্টিক কবিকেই সম্ভবত ইতিহাস-চেতন কবি বলা যেতে পারতো। কিন্তু তা হয় না। ইতিহাস-চেতনার তাৎপর্য হ'লো বিনাশশীল কাল ও অবিনাশী ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান। অতীত কখনোই নিজের যুগের সঙ্গে বিনষ্ট হয় না। বর্তমানের অন্তরে সে ফল্গুর মতো প্রবাহিত হয়, বর্তমানের অন্তরালে সে প্রেতের মতো বিরাজ করে, ভবিষ্যতের গর্ভে সে ভ্রূণের মতো পুনর্জাত হয়। 'হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে কাজ করে যাও গোপনে গোপনে'। অতীতের এই অবিনাশী অস্তিত্বকেই বলে ঐতিহ্য। ঐতিহ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ বোধকে সংহত আকারে বলা যায় ইতিহাসচেতনা। এই উপলব্ধিকেই কবিতায় আকার দিতে গিয়ে আর একজন ইতিহাস-চেতন কবি টি. এস. এলিয়ট তাঁর Four Quarters গ্রন্থে লিখেছেন—

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,

And time future contained in time past
If all time is eternally present
All time is unredeemable.

: ***Burnt Norton***

ইত্যাদি।

কবি জীবনানন্দ এমনই এক ইতিহাস-চেতন কবি কিন্তু কাব্য-সৃষ্টির সূচণাবধি যে সেই পরিণত চেতনা তাঁর ছিল এমন মনে করা ভুল। তবু যাঁর কল্পনা কবি জীবনের সূচনাতেই—

দূর উর —ব্যাবিলোন্—মিশরের মরুভূ সঙ্কটে,
কোথা পিরামিড্ তলে—ঈসিসের বেদিকার মূলে

সঞ্চরণশীল, প্রভেন্স প্রান্তরে, আসীরীয় সম্রাটের বেশে, ক্রবেদুরের যৌবন-মত্ততায় স্পেইনের সিয়োরায় দস্যু অশ্বারোহী রূপে, বাংলার ঘাটে-ঘাটে কদম তলায় বাঁশের বাঁশিটি হাতে, ইতিহাসের পর্বে পর্বে আপনাকে অনুভব করেছে, সেই চেতনাই আবার যুগ যুগ প্রবাহিত পিরামিডকে মানব সমাজ জাতি ও রাষ্ট্রের শত শত উত্থান পতনের সাক্ষী এক সুচিরস্থায়ী শ্মশান মন্দির হিসাবে সনাক্ত করেছে। মৃত্যু আমাদের কাঁদায় জীবন আমাদের সেই ক্ষণ-অশ্রু ভুলিয়ে দেয়—অচিরস্থায়ী এই হাসি-কান্নার জোয়ার-ভাটার পাশে অতীতের এই হিমগর্ভ কবর চিরন্তন হয়ে জেগে থাকে।

তবু এ কবিতাও ইতিহাসচেতনার কবিতা নয় কিন্তু এর মধ্যে কবির ইতিহাস-চেতন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা যে নিহিত এ কথা স্মরণ করতে চাই। সেদিন অন্য পাঁচ জন ইতিহাস কুতূহলী কবির মতোই দূর ইতিহাসের রন্ধ্রপথে স্বেচ্ছাচারী কল্পনা বিহারের মূলে ছিল জীবনানন্দের রোম্যান্টিক কবি চিত্ত! আদিম ও উন্মাদনাময় (বোহেমিয় ?) জীবনের আহ্বান। তবু কবি যে এখানে বহমান কালের মধ্যেও শাশ্বত কিছুর সন্ধান করেছিলেন এই কথাটা স্মরণ রাখতে বলি।

আরও একটি বিষয় প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের অতীত চারণায় যেমন ইতিহাসের স্থান-কাল-চিহ্নহীন ভাবরূপ এ কবিতা তেমন নয়। বরং স্থান ও কালের উল্লেখে ইতিহাসাশ্রয়ী শব্দ ও ভিনদেশী মুখ্যত আরবী ফারসী মেশানো বাংলা শব্দের প্রচুর প্রয়োগে উপযোগী আবহ তৈরীর চেষ্টা অবশ্য কাজী নজরুল এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র আরও সার্থক হয়েছিলেন।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এসে ইতিহাসের অহেতু উল্লেখ আর নেই। পরন্তু 'ঝরা-পালকের' বর্বর বিলাস উচ্ছলতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবির কাছে রুগ্ন প্রতিপন্ন

হয়েছে। রূপকথার রূপসীরা গত রাত্রির ফুলের মতো 'বাসি' হয়ে 'একেবারে মেকি' হয়ে গেছে। রোম্যান্টিক কল্পনা-বিলাসের স্বরূপ—

> সেই কুঁজ গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
> নষ্ট শসা, পচা চালকুমড়ার ছাঁচে
> যে সব হৃদয় ফলিয়াছে—

সেই সব তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তাই আত্মমগ্ন কবির কাছে ইতিহাসের অহেতু উল্লেখ আর নেই, তবু ইতিহাসচেতনার নূতন অনুভব"অস্ফুট আকারে 'ধূসর পাণ্ডুলিপিতে'ই লক্ষ্য করা যায়। নব সংযোজিত 'পায়রারা' কবিতায় তার প্রথম আবির্ভাব। কবি লিখছেন—

> আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে—তারপর পাণ্ডুলিপি গড়ি
> পুরানো জ্ঞানের খাতা রক্ত ক্লেদ রোমহর্ষ চুপে-চুপে করেছি সঞ্চয়
> অন্ধকারে ; অজন্তার ইলোরার রোম আলেকজান্দ্রিয়ার আমরা প্রহরী
> মিউজিয়মের ছায়া বিবর্ণতা—চামড়া ও কাগজের বিষণ্ন বিস্ময়
> এই কি জগৎ নয় আমাদের ?

বর্তমানের পটভূমিকায় অতীতের স্মৃতি-বিস্মৃতি, সংস্কারের লুপ্ত-শেষ অস্তিত্ব সম্পর্কে এমন স্পষ্ট উল্লেখ এর আগে কোথাও দেখা যাযনি। যাকে আমরা সভ্য ভাষায় সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য বলি, তা কী অতীতের মৃত পৃথিবীর অভিজ্ঞতার ভারাক্রান্ত বিষণ্ন বিস্ময়, মিউজিয়মের কৃত্রিম রক্ষণ-দক্ষতায় বিনষ্ট ছায়ান্ধকার পৃথিবীর জ্ঞান-বিস্ময় রক্ত-ক্লেদ রোমহর্ষের বিবর্ণ পাণ্ডুলিপি মাত্র নয় ? তবু গতদিনের কথা চিন্তা কাজ সমারোহে মন স্তব্ধ ক'রে রাখে কেন মানুষেরা ? কেন আমাদের অতীত পৃথিবীর ভারমুক্ত দায়হীন, অভিজ্ঞতাহীন, সতেজ, স্বচ্ছন্দ স্বাধীন সঞ্চরণশীলতা নেই পায়রাদের মতো।

অতীতের এই দায়ভার, স্মৃতিভার, ঐতিহ্যভার বহনের বেদনা ইতিহাস-চেতন কবিকে সহ্য করতে হবেই। কারণ, ঐতিহ্যের মধ্যে যেমন মানব সভ্যতার কালকূট, তেমনি অমৃতও লুকিয়ে আছে। অতীতের সংস্কার আমাদের রক্তের অনুতে অনুতে সঞ্চারিত হয়, ব্যাধির মতো আমাদের পীড়িত করে। আবার যা কিছু সভ্যতাকে ঋদ্ধ করেছে তার মূলও ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত। ইতিহাস-চেতন কবি তাই একে অস্বীকার ক'রে মুক্ত হতে পারেন না—আবার স্বীকার করার অনন্ত যন্ত্রণাও তাঁর চেতনাকে ক্লান্ত করে। নির্বেদ তাঁকে আচ্ছন্ন করে কখনো কখনো, মন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—অজ্ঞানতার অনাবিল বর্বর স্বাচ্ছন্দ্যে ফিরে যেতে চায়। আবার প্রবুদ্ধ চেতনা সভ্যতার ব্যাধি থেকে ঐতিহ্যের গ্লানি থেকে মানুষকে মুক্ত ক'রে নবতর জগতের সৃষ্টি শপথ গ্রহণ করে।

গতিধারা

'রূপসী বাংলা'য় ইতিহাসধারার মধ্য দিয়ে বাংলার বিনাশশীল জীবন আর অবিনাশী আবহমানের রূপ দেখেছেন কবি। সুতরাং ঐতিহ্যবোধের স্বাক্ষর আছে এখানেও—শুধু তা একটি দেশের ভৌগোলিক সীমায় বিধৃত। আর সার্বমানবিক পটপ্রেক্ষিত থেকে সরে এসে জাতীয় পটপ্রেক্ষিতে দাঁড়ানোর ফলে তার তাৎপর্যও পরিবর্তিত হয়েছে।

'ঝরাপালকে' যে কবি প্রেমকে দেশেকালে বিচ্ছিন্ন বহু জীবনের মধ্যে উপভোগ করেছিলেন, 'রূপসী বাংলা'য় তিনিই বহু যুগে বিস্তৃত দেশকে, দেশের জীবন ও আত্মাকে, তার ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। দূর অতীতের মধ্যে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেকে এই ভাবে প্রসারিত করা, নিজের মধ্যে এক শাশ্বত সত্বার অস্তিত্ব অঙ্গীকার—এই হলো ইতিহাসচেতনার মর্মবাণী।

'বনলতা সেন' কবিতায় কবির এই অবিনাশী সত্বাই হাজার বছর ধরে সঞ্চরণশীল। ইতিহাসের তীরে তীরে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে, বিদর্ভে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত সেই প্রাণ আজকের সভ্যতার তটে এসে পৌঁছেছে। আর পৃথিবীর বয়সিনী সেই নারী—যার চুলে বিদিশার অন্ধকার, মুখে শ্রাবস্তীর তক্ষিত রূপ সেও ইতিহাস বিস্তারের স্তরে স্তরে কবির সমযোনি।

সমান্তরাল উপলব্ধি থেকেই রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন :

> আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
> অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে !
> আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে···

ইত্যাদি। কিন্তু জীবনানন্দ লক্ষ্য করেছেন অডিসিউসের মতো একজনের নিয়ত সঞ্চরণ আর পেনেলোপের মতো একজনের নিয়ত প্রতীক্ষা। সভ্যতার নগরে বন্দরে দেখা চেনা কথা বলা। এবং এই প্রেমিক যুগলের পরিণামী ভবিষ্যৎও জীবনানন্দের কাছে স্পষ্ট। তিনি জানেন আজকের প্রবুদ্ধ সভ্যতা যখন দ্বারকার বিচূর্ণ থামের মতো দেবদারু ছায়ার নিচে অবলীন হয়ে যাবে, আজকের মানুষ যখন কেউ নেই আর, হাজার বছর শুধু অন্ধকারে জোনাকির মতো খেলা করে নিভে যাবে, সেই দূর ভবিষ্যতের গর্ভেও তাদের সত্বা, তাদের প্রেম জাগরূক হয়ে থাকবে।

এবং এই চেতনা দেখা দিল ব'লেই—ইতিহাস চেতনার পরিপূর্ণ তাৎপর্য তাঁর

কাছে উদ্ঘাটিত ব'লেই 'সুচেতনা' কবিতায় দাঙ্গা যুদ্ধ ও নানা দুর্গতির বর্ণনা ক্রমে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে তাকে উচ্চারণ করতে শুনি—

> সুচেতনা এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
> সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ,
> এ বাতাস কি পরম সূর্য করোজ্জ্বল ,—
> প্রায় ততদূর ভালো মানব-সমাজ
> আমাদের মতো ক্লান্ত, ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
> গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

কারণ ইতিহাসের গতিধারা তাঁর কাছে অপরিস্ফুট নেই আর। অকারণ অতিরিক্ত আশাও যেমন তাঁর নেই আর পাঁচজন আশাবাদী কবির মতো—তেমনই অহেতুক বিষণ্ণ ও হতাশ হবারও প্রয়োজন নেই। মানুষের গতি শ্লথ, কিন্তু নিশ্চিত। এ কথা জেনেছেন ব'লেই কবিতায় শেষ ছত্রে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন—

> দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—
> শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

এই প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি এসেছে তার চিন্তা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সমন্বয়ে। গ্রন্থ থেকে আমরা যে জ্ঞান পেতে পারি তাতেই সবকিছু স্পষ্ট হবে না।

> মোমের আলোয় আজ গ্রন্থের কাছে বসে—অথবা ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
> আমরা যতটা দূর চলে যাই—চেয়ে দেখি আরো কিছু আছে তার পরে।
>
> : আবহমান

জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। কিন্তু তার পরেও আরও কিছু অজ্ঞাত থেকে যায় —তা জানতে হয় উপলব্ধি থেকে, ইতিহাস থেকে। এইভাবে গ্রন্থের থেকে আহৃত জ্ঞান স্বভাবের থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে ইতিহাসের ইঙ্গিত অনুসরণ করেছেন বলেই দূরতর ভাবীকালের চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে তাঁর কাছে।

আলোকের পাখি

'মকর সংক্রান্তির রাতে' কবিতায় জীবনানন্দ প্রথম নির্দেশ করেছেন তার কাছে "আবহমান ইতিহাস চেতনা একটি পাখির মতো যেন।" পাখির রূপকে ইতিহাস-চেতনা জীবনানন্দ বহুবার ব্যক্ত করেছেন। এই আলোকের পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে, নক্ষত্রের থেকে আরো নক্ষত্রের রাতে, আজকের পৃথিবীর

আলোড়ন হৃদয়ে অনুভব ক'রেও আরো বড়ো বিষয়ের অভিমুখে, বর্তমান সময় অতিক্রম ক'রে আরো গভীর সুসময়ে সভ্যতাকে অগ্রসর ক'রে নিয়ে চলেছে। এপাখি কিছুতেই লুপ্তশেষ ডোডো রাখি নয়—যে স্থবিরতার মধ্যে, বিলুপ্তির মধ্যে, নিঃসীম মৃত্যুর মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে যাবে।

'পাখিরা' কবিতায় এই পাখিরাই রাত্রে সমুদ্রের বুক দিয়ে উড়ে চলেছে। ব্লিজার্ডের তাড়াখেয়ে এই সব পাখি একদিন সমুদ্রে নেমে পড়েছিল। সমুদ্রের মুখে লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে যেমন মৃত্যু অতল সত্য হয়ে আছে ঠিক তেমনই তাদের রবারের বলের মতো ছোট্ট বুকে বয়েছে জীবন। বহুদূরে সমুদ্রের পরপারে কোথাও জীবন আছে, জীবনের স্বাদ আছে, সাগরের মৃত্যুময় তিতা ফেনা পেরিয়ে কোথাও নদীর সুপেয় জল আছে—এই বিশ্বাস বুকে নিয়ে, শীত পিছনে ফেলে আশ্বাসেব অভিমুখে তারা উড়ে চলেছে। বন্ধ্যা সমুদ্রেব সীমা পেরিয়ে তারা কোনো ফসলের প্রান্তরে যাবে, কেন না তাদেরও ফসলের ঋতু আসন্ন। সমুদ্রেব অনেক লবণ ও লবণাক্ত অশ্রু ঘেঁটে এই মাটিব ঘ্রাণ মিলবে—ভালোবাসা, ভালোবাসাব সন্তান, নীড বচনাব স্বপ্ন—জীবনের এই গভীর স্বাদ অঙ্গীকাব ক'বে সাগবের গর্জন স্বব ছাপিয়েও পাখিবা কথা বলছে—মৃত্যুকে অতিক্রম কবতে কবতে জীবন কথা বলছে।

এই যাত্রাব পিছনে পডে আছে গৃহহাবা প্রাণেব বেদনা, মানুষ যেমন বাধ্য হয়ে মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পডে—তেমনি বাধ্য হয়েই পাখিদেব নোনা সমুদ্রের বুকে নেমে আসতে হযেছে, আশ্রযেব সন্ধানে। পুবানো আশ্রয়েব আশা সুখ সার্থকতা নিঃশেষে ত্যাগ ক'রে স্মৃতিব ব্যথা বুকে নিযে তাদের চলে যেতে হয়েছে।

অতীতেব ঐতিহ্য—যাব বেদনা বহন করে পাখিবা উড়ে চলেছে, তার ছায়া জীবনানন্দেব কবিতায আপ্রান্ত প্রসাবিত। তিনি সত্যিই ঐতিহ্যক্লান্ত স্মৃতিভার-মন্থর কবি। তিনি জেনেছেন অতীতের বিনাশ নেই। 'মানুষেব মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়', তাব চেতনা মন থেকে মনে সঞ্চাবিত হয়, যুগ থেকে যুগে গড়িয়ে গডিয়ে চলে। 'স্বপ্ন' কবিতায তিনি একেই নাম দিয়েছেন স্বপ্ন। যা অতীতে ছিল, বর্তমানে নেই, তা বিলুপ্ত হযনি, আমাদের অনুভূতির মধ্যে রয়ে গেছে।

কুয়াশা থেকে আরো কুয়াশায়, অস্পষ্টতা থেকে আরো অস্পষ্টতায় একাকীতম যে পাখি উড়ে গেল তার পাখার হাওয়া লেগে ঘরের প্রদীপ নিভে গেছে। এই নির্জন আঁধার হাতড়ে যখন আলো জালবো তখন হঠাৎ কার মুখ দেখে চমকে উঠবো? কার মুখ? মৃত অতীতের পরিচিত যে মুখ আজ বিস্মৃতির ধূসরতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তারই মুখ কোন নির্জ্জান মনের গহন অন্ধকার পার হয়ে আরেক আলোয় হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে? যে মুখ একদা এই পাণ্ডুলিপির চেয়ে, যে কোনো পার্থিব

বস্তুর চেয়ে সত্যতর ছিল, সে আজ পৃথিবী থেকে মুছে গিয়েও স্বপ্নের মধ্যে গুহান্বিত হয়ে রয়েছে।

তেমনই এই পৃথিবীর সব আলো একদিন মুছে যাবে, সব গল্প ফুরিয়ে যাবে—মানুষও থাকবে না আর—তখনো মানুষের অস্তিত্ব স্বপ্ন হয়ে বেঁচে থাকবে। সেই স্বপ্নের মধ্যে আমিও থাকবো, কিছুই বিলুপ্ত হবে না।

এমনই (জীবন থেকে স্বপ্নে, চেতনা থেকে অবচেতনায় মানুষের প্রতিনিয়ত সঞ্চরণ চলেছে। অজস্র অসংজ্ঞান স্মৃতিভার মানুষকে আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে। অতীতের অবিনাশী সত্ত্বা যুগান্তরের মানুষের কাছে তাই চেতনার পরিমাপ নিতে আসে। আবার কখনো রক্তের অন্তর্লীন আদিমতা মানুষের শিক্ষা সংস্কার বুদ্ধি-চেতনাকে ঘুলিয়ে আবিল ক'রে যায়। চেতনার গূঢ় স্তর থেকে এই অন্ধকার এই ঐতিহ্যভার মানুষ সরিয়ে ফেলতে পারে না। সঙ্কীর্ণচিত্ত আত্মতৃপ্ত মানুষের কাছে, সে বেদনা অবশ্য অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু উৎকৃষ্টচিত্ত মানুষের কাছে এই বেদনা দুর্বহ হয়ে ওঠে। জানবার অবিরাম বেদনা তার অনিদ্র মুহূর্তগুলিকে অস্বস্তিতে ভরে তোলে। জৈবিক সুখদুঃখে আর সে তৃপ্তি পায় না।

বধূ শুয়েছিল পাশে শিশুটিও ছিল,
প্রেম ছিল, আশা ছিল—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল
কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল,—লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমাবে এবার।

কি প্রগাঢ় বেদনায় সুখের সংসার ছেড়ে তারা মৃত্যুকে নির্বাচন করে তা মানুষের বুদ্ধিতে আসে না। তারা দেখে—

তবু ও তো পেঁচা জাগে,
গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

দেখে আর আত্মঘাতীর নির্বুদ্ধিতায় বিস্মিত হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাপনের গ্লানি যারা বোঝে তারাই অনুভব করে—

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ নয় সবখানি.
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে

আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;—

এই নিত্যতা থেকে নিষ্কৃতির আকাঙ্খা, এই aspiration for something greater, nobler and queer—জীবনানন্দের কোমল স্পর্শাতুর মনের এবং সাহিত্য সম্পর্কে তার মহত্তর মূল্যবোধের পরিচায়ক। এই বিচিত্র অনুভূতি, মানুষের জীবনের ভিতরে, তার অন্তর্লীন চৈতন্যের ভিতরে ; ইতিহাসের এই নিয়ন্ত্রণ অনুভব করে মানুষ ; তার তাৎপর্য উপলব্ধি না ক'রেও সংস্কারের আকারে তাকে ফিরে পায়। সে মানুষকে নূতন উদ্যমে উদ্বুদ্ধ করুক অথবা হতাশায় আত্মনাশ করতে প্ররোচিত করুক—তার লক্ষ্য আরো বড়ো সার্থকতার অভিমুখে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—ইতিহাস শুধু বহমানএকটি জীবন প্রবাহ নয়—মানব জীবনের মহত্তর বিকাশের দিক-চিহ্নও। আর তাই ইতিহাসের মূল্য। প্রাগৈতিহাসিক অনৈতিহাসিক অন্ধকার অতীত থেকে আজ অবধি যে খণ্ডিত সভ্যতার ধারা তার মধ্যে চীনে কুরুবর্ষে, গ্রীসে বেথলহেমে, জরাসন্ধ, নচিকেতা, বুদ্ধ, খৃষ্ট, লেনিন, মহাত্মা গান্ধী এরকম কয়েকটি আলোকবলয় আমরা পার হয়ে এসেছি। তিমির সমুদ্রের মধ্যে এই আলোকণাগুলিই আমাদের আগামী দিনের পথনির্দেশক আলোকস্তম্ভ (Light house) স্বরূপ। সেই উজ্জ্বলতর আলোর সন্ধান জীবনানন্দ পরিশেষে এসে পেয়েছিলেন। এই সংকেত অনুসরণ করেই আলোকিত বর্তমান থেকে শুচিশুভ্র ভবিষ্যতে যে পৌছানো যাবে এ বিশ্বাস কবি অর্জন করেছিলেন। জেনেছিলেন সেই শুভ্রতর আলোক-তীর্থে ভবিষ্যতের মানুষও মনীষীরা ইতিহাসকে একদিন পৌছে দেবেনই।)

সমাজচেতনা

স্বপ্নপ্রায়ণ

আধুনিক সমালোচনায় কবির বাস্তবদৃষ্টি ও সমাজ চেতনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ অপরিহার্য—কিন্তু সে যোগ কখনই চেতনার উপরিবলয়ের নয়। কবির জীবন-দৃষ্টি অন্তর্লীন প্রেরণার মতো সাহিত্যের প্রাণভূমিতে ক্রিয়া করে। কিন্তু সাম্প্রতিক সমালোচনায় সেই গভীর নিরীক্ষার দায়িত্ব না নিয়ে দু-একটি বিক্ষিপ্ত কূট উক্তির উপর, এলোমেলো পংক্তির উপর নির্ভর ক'রে যে ভাবে কবিদের শ্রেণীবিন্যাস করা হয় তার চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হয় না।

এই সব স্থূল সমালোচকরাই একদা জীবনানন্দকে পলায়নবাদী হিসাবে সনাক্ত করেছিলেন। জীবনানন্দ পলাতক কবি—এই সংজ্ঞা সস্তা বুলির মতো সাহিত্যের হাটে বাজারে আজও ছড়িয়ে আছে। ফলতঃ যারা এইসব চালু মার্কার উপর নির্ভর করে কবিদের গুণাগুণ নির্ণয় করেন, স্বকীয় সাহিত্য-বোধ দিয়ে যাচিয়ে দেখেন না, জীবনানন্দের কবিকৃতি সম্পর্কে তাঁদের অনীহা অব্যক্ত নেই। আর অন্যেরা, যাঁরা তাঁর কবিতা প'ড়ে অপরিসীম আনন্দ রস আস্বাদ করেছেন, তাঁরা কোনো বিতর্কে না গিয়ে তাঁর কবিতায় তুষ্ট আছেন। এই সব কাব্য-রস-পিপাসুদের অনির্দেয় অনুভবের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে তথাকথিত সমাজবাদীরা লাভবান হন নি। আরো গভীরতর সমীক্ষা তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একদা যে হঠকারিতার প্রশ্রয় দিয়ে বিদগ্ধ মহলে তাঁরা চিহ্নিত হয়েছিলেন জীবনানন্দ সম্পর্কে সেই অধ্যায়ই পুনরাবৃত্ত হ'লো।

আগেই বলা হয়েছে কবির সমাজবোধ ও ইতিহাসদৃষ্টি কোনো স্ফুট চিন্তার রূপে থাকে না, অন্তর্লীন প্রেরণার মতো কবিমানসকে নিত্য অভিষিক্ত করে। তবেই গভীর ও রসোপেত শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব হয়। নতুবা যে কবিতা লেখা হয় তা কখনো উচ্চরব ঘোষণার চেয়ে বেশি মর্যাদা পায় না। কোনো শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে তাঁর জীবনের বিক্ষিপ্ত উক্তি বা ঘটনা দিয়ে তাঁকে বিচার না ক'রে তার সামগ্রিক জীবনের সমস্ত আপাত-বিরুদ্ধ চিন্তা, ঘটনা ও ব্যবহার লক্ষ্য ক'রেও জীবনের গতি ও পরিণামের দিকে দৃষ্টি রেখে জীবনের অন্তর্সঙ্গতি খুঁজে দেখবো। এই ভাবে পর্যবেক্ষণের পরে সেই শিল্পীর সম্পর্কে কোনো মন্তব্য বা ঘোষণা করা চলে। নয়ত শ্রদ্ধাহীন, পর্যবেক্ষণ ব্যতিরিক্ত উক্তি মাত্রকেই অস্ত্র হিসাবে

দায়িত্বহীন ব্যক্তির কাছ থেকে এলেও, হাওয়ায় ওড়ানো কথার চেয়ে বেশি মর্যাদা দেবো না।

মানুষের জীবন, মানুষের বলেই নানা দ্বৈতত্ব, অসংখ্য অন্তর্দ্বন্দ্ব দিয়ে গড়া। জীবনানন্দের কবিজীবনও কোনো সমতল ঋজু রেখার উপর দাঁড়িয়ে নেই। জীবনকে লোকে যে ভাবে পেতে চায় সেই ভাবেই যদি সহজে পেতো তবে তার মধ্যে সৃষ্টি-যন্ত্রণার জন্ম হতো না। আমাদের ঈপ্সিত জীবন বাস্তব থেকে ভিন্ন বলেই জীবনকে ভাঙার আবেগ, আবার নূতন ক'রে গড়ার সাধনা, অথবা যন্ত্রণাবিদ্ধ নির্বেদ কিম্বা কল্পলোকে অভিসার। কিন্তু অভিব্যক্তি যেমনই হোক ইচ্ছার সঙ্গে প্রাপ্তির বিরোধ থেকেই তার উদ্ভব। জীবনানন্দের কবিচিত্ত যখন কল্পজগতের অভিসারে উন্মুখ ছিল তখনও জীবন সম্পর্কে অতৃপ্তিই ছিল তার হেতু—

স্বপন-সুরার ঘোরে
আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা ক'রে!
জনম ভরিয়া সে কোন্ হেঁয়ালি হ'লো না আমার সাধা,—
পায় পায় নাচে জিঞ্জির হায়,—পথে পথে ধায় ধাঁধা!
—নিমেষে পাসরি, এই বসুধার নিয়তি মানার বাধা
সারাটা জনম খেয়ালের খোশে পেয়ালা রেখেছি ভরে'।

: **আমি কবি,—সেই কবি**

অতৃপ্তির রূপটা এখানে স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু পায় পায় যার জিঞ্জির, নিয়তি মানার বাধায় যে বদ্ধ—সেই স্বপন সুরার ঘোরে মাতাল হতে চায়! প্রতি পদে যার যন্ত্রণায় কুশাঙ্কুর, স্বপ্ন-সাধ তার ব্যাহত হবেই। 'ঝরাপালকে'র অন্তিম কবিতায় সেই স্বীকারোক্তি আছে।

···কবে অবেলায় এলো মেলে পথে যেতে'
ঘোর ভেঙে গেল,—খেয়ালের খেলাঘরটি গেল যে ভেঙে'!

কারণ—

ফুরায়ে গিয়েছে যা ছিল গোপন,—স্বপন ক'দিন রয়!
এসেছে গোধূলি গোলাপী বরণ, —এ তবু গোধূলি নয়!

: **সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে**

স্বপ্নলোক থেকে মহাপ্রয়াণের গোধূলিটি ঠিক ঠিক সনাক্ত করেছেন কবি। তবু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এসেও যন্ত্রণার তীব্র অভিঘাতের মধ্যে বার বার স্বপ্নের হাতে নিজেকে তুলে দেবার ব্যর্থ আকুতি ধ্বনিত হয়েছে।

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে ;—স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই !…
সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিত যদি এই স্বপনের হাতে !
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর,—
থাকিত না হৃদয়ের জরা,—

: স্বপ্নের হাতে

কিন্তু সেই অসম্ভব সিদ্ধ হবার নয়। তাই সৌন্দর্য-স্বপ্নের অভীপ্সা ছেড়ে ঘুমের মধ্যে অসাড়তা ও নির্বেদের মধ্যে, কর্ম-কোলাহলের বাইরে তিনি মুক্তি খুঁজেছেন। কবির এই মুক্তির ইচ্ছাই রূপ নিচ্ছে 'মাঠের গল্পে', 'অবসরের গানে'—

এখানে চকিত হ'তে হবে নাকো,—ত্রস্ত হয়ে পড়িবার নাহিকো সময় ;
উদ্যমের ব্যথা নাই,—এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয় !
এইখানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে !
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর,—
রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর ;
ভালোবাসা আসিবে না,—
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর !

*   *   *

এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে ঘুমোবার
সাধ ভালবেসে।

: অবসরের গান

সব চেতনা ডুবিয়ে দিয়ে নিদ্রার মধ্যে শান্তি খোঁজার এই ইচ্ছা। পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নেই, বরং অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চাওয়া, বাস্তবের রূঢ়তা থেকে মুক্তি পাবার এই পলাতকা প্রবৃত্তি একদিন প্রবল হয়ে উঠেছিল সত্য। কিন্তু সেইটাই শেষ সত্য নয়। কারণ এভাবে কূর্মের মতো নিজের গভীরে ডুবে থেকে কিছুতেই বাঁচা, কিছুই এড়ানো যায় না—একদিন আলোর মুখোমুখি হতেই হয়।

অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে
বুঝতে পেরেছি আবার ;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা ;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে ;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে ;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শূয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে।
হায়, উৎসব !

: **অন্ধকার**

পৃথিবীর মুখোমুখি হবার অনিচ্ছা যতই প্রবল হোক্ এই ঘৃণা বুকে ক'রে, এই ঘৃণা মুখে মেখেও মানুষকে জেগে উঠতে হয়। জীবনকে এড়িয়ে মুক্তি পাবার পথ নেই কোথাও। সেই মুক্তি-কামনাও কবির জীবনের চরম কথা নয়। তাঁর এক সত্তা যখন গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে লালিত হচ্ছে, তখনই, আরো এক নিগূঢ় সত্তা—না এলেই ভালো হতো অনুভব ক'রে এসেও যে গভীরতর লাভ হয়েছে তা আস্বাদ ক'রে তৃপ্ত—এইজন্যেই অন্ধকার কবিতার পাশাপাশি 'বনলতা সেন' গ্রন্থেই এই কবিতাও জন্ম নিয়েছে।

…চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।

সুচেতনা, এই পথে আলো জেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;
এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল ;—
প্রায় তত দূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

: **সুচেতনা**

পাশাপাশি এই সুর। এই দ্বিতীয় সুরটি যখন স্মরণে রাখি তখন আর কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাসে কবির উপর অবিচার করার হেতু থাকে না। তখন আমরা অনুভব করি কি অভিজ্ঞতা স্মরণে রেখে তাঁকে 'তিমির হননের গান' লিখতে হয়—

> তিমির হননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
> আমরা কি তিমির বিলাসী ?
> আমরা তো তিমির বিনাশী
> হ'তে চাই।
> আমরা তো তিমির বিনাশী।

: **তিমির হননের গান**

বস্তুত তাঁর জীবনে কোনো পিছু ফেরা নেই—যা আছে তাকে বলা চলে ব্রত-চ্যুতি। কোনো বিরুদ্ধ-চেতনা নয়—মাঝে মাঝে এক নিশ্চেতনা তাঁকে সমাচ্ছন্ন করে। তিমির শিকারীরা তখন তিমির পিপাসী হয় যেন। আবার স্বচেতনার দিন ফিরে আসে, প্রখর উজ্জ্বল দিন। তিমির শিকারীরা জাগ্রত, উদ্যত হ'য়ে ওঠে। আবার দৃপ্ত বিশ্বাসে কবির মন ভরে যায়।

সন্ধিকাল

ঝরাপালক যদি স্বপ্ন-প্রয়াণের ঋতু, ধূসর পাণ্ডুলিপি-মহাপৃথিবী-বনলতা সেন, তবে কবিচেতনার গোলাপী-গোধূলি। চেতনার গভীর হৃদয়ে জিজ্ঞাসা-অন্তর্দ্বন্দ্ব-ক্ষোভ, বিদ্রূপ-বেদনা-সন্ধান এই নিয়ে এ ঋতুর চরিত্র। কিন্তু সব জড়িয়ে, সব ছাপিয়ে রয়েছে এক ইন্দ্রিয়লগ্ন স্বপ্নিল সৌন্দর্যের বলয়। দূরবিধৃত কল্পনার জগত থেকে নেমেই মাটি-পাথরের পৃথিবীতে পা রাখেন নি। বরং এই বস্তু পৃথিবীকে এক মনোভব চেতনার ম্লানালোক জ্যোৎস্নাধারায় যেন অভিষিক্ত ক'রে তুলে ধরেছেন। 'অন্ধকার' কবিতায় যে কস্তুরী আভার চাঁদের কথা বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে মনে আসবে। যদি কল্পনার নিঃসীম আকাশে ডানা মেলা নাই যায়—যদি অনবচ্ছিন্ন ঘুমের নিশ্চেতনায় নিলীন শান্তি নাই মেলে, তবে এই ম্লান চাঁদের দ্যুতিই বরণীয়। বর্হিপৃথিবীর বস্তুভার, কর্মভার, চিন্তাভার সরিয়ে এই স্তিমিত চন্দ্রালোক জাগরণেই নিদ্রার নিলীন শান্তি এনে দেবে—

> **হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,**
> **তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,**

হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে
রয়েছে যে অগাধ ঘুম
সে আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,

: অন্ধকার

কবিজীবনের এই অধ্যায়ে বস্তুপৃথিবীর প্রকৃতিটি এই। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রকৃতি-চিত্রের বস্তুভারহীন রূপ মানুষের নিদ্রালু চেতনায় আঘাত করে না, শান্তি দেয়। বাস্তব হয়েও অবাস্তবতার কুহেলি মাখা এই আশ্চর্য পৃথিবীটি তিনি এখানে ক্রমে ক্রমে তৈরী ক'রে নিয়েছেন। উপকরণ কোথাও জন্মান্তরীণ স্মৃতি-সৌন্দর্য, কোথাও বা মানুষের কালাতিশায়ী জীবন—যাকে ব্যাখ্যা ক'রে বলা হয়েছে ইতিহাসচেতনা। 'বনলতা সেন' গ্রন্থ এই পর্বের চরম বিকাশ।

কিন্তু সে কথা থাক্। এখানে আমাদের কবির জীবনজিজ্ঞাসার রূপটি লক্ষ্য ক'রে যেতে হবে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নিজের কবিচরিত্র ব্যাখ্যা করতে তিনি লিখেছেন—

যে-কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ
শুধু জেনেছে বিষাদ,
মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ,
যে বুঝেছে,—প্রলাপের ঘোরে
যে বকেছে,—সে-ও যাবে স'রে
একে-একে সবি
ডুবে যাবে ;—উৎসবের কবি,
তবু বলিতে কি পারো
যাতনা পাবেনা কেউ আরো ?
যেইদিন তুমি যাবে চ'লে
পৃথিবী গাবে কি গান তোমার বইয়ের পাতা খুলে ?
কিম্বা যদি গায়,—পৃথিবী যাবে কি তবু ভুলে
একদিন যেই ব্যথা সত্য ছিল তার ?

: কয়েকটি লাইন

তা যদি না যায়, পথের আহত মাছিদের মতো যদি আমাদের প্রাণ শুধু ব্যথা পেতে থাকে, তবে দুর্দশার গান বা উৎসবের কবিতা—এসব কিছুর সৃষ্টির সার্থকতা কি ? এমন সাময়িক কাব্য রচনার স্পৃহা তাঁর নেই, সৃষ্টির আহ্বানে যে কবি আসেন, সময়-সিন্ধুর মতো বর্তমানের বুকে যাঁর নিশ্চিত অভ্রান্ত পদক্ষেপ, তিনি উৎসব-দুর্দশার

ছোট্ট গণ্ডীতে ধরা দেন না। সৃষ্টির পিছনে আরো মহত্তর ভূমিকার উপলব্ধি তাঁর ছিল। তাই জীবনের সঙ্গে যোগ তার অবিচ্ছিন্ন এবং ক্রমপ্রসারী।

তবু এই পর্বে প্রশ্নহীন, অভিজ্ঞতাহীন, 'চিন্তার পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন' জীবনের প্রতি লোভ রয়েছে। চিন্তার, সঙ্কল্পের, ব্যথার পৃথিবীকে এড়িয়ে রূপের, রঙের, রসের, গন্ধের জগতে বিচরণ করতে চেয়েছেন বলেই মাটির জগতে নেমে আসা ইচ্ছা সত্ত্বেও এখনও সম্ভব হলো না। গোলাপী গোধূলি এলেও তবু বলতে হলো—এ 'তবু গোধূলি নয়'। তাই এই পর্বের পাঠক, যাঁরা জীবনানন্দকে রূপচেতনার কবি বলেই চিনলেন তাঁরাও তাকে সম্পূর্ণ চিনলেন না। আরো পরবর্তী সৃষ্টির মধ্যে তার পরিণততর পরিচয় লুকানো রইল।

ইন্দ্রিয়-চেতন কবি মাত্রেরই মননের বিরুদ্ধে যেন আক্রোশ থাকে। রবীন্দ্রনাথের পরিব্যাপ্ত মনীষাতেও আমরা জানি, মনের ক্রিয়াশীলতায় তার শ্রদ্ধা ছিল না। 'পঞ্চভূতে'র 'মন' প্রবন্ধে সে কথা খোলাখুলিই ব্যক্ত করছেন তিনি। "সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন-নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না। ...আমাদের ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না।...প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিয়াও চতুর্দিকে অনেকখানি মন বাকি থাকে। কাজেই সে বসিয়া বসিয়া ডায়ারি লেখে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, যাহাকে সহজে বোঝা যায় তাহাকে কঠিন করিয়া তুলে, যাহাকে একভাবে বোঝা উচিত তাহাকে আর-এক ভাবে দাঁড় করায়, যাহা কোনো কালে কিছুতেই বোঝা যায় না অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে, এমন-কি, এসকল অপেক্ষাও অনেক গুরুতর গর্হিত কার্য করে।" জীবনানন্দের কবিতায় ইন্দ্রিয়াসক্তির অতিকৃতির কালে মনের সম্পর্কে অনীহা ব্যক্ত হবে এতে বিস্ময় নেই।

> বৃ্যবনিক প্লেগের মতন
> সকল আচ্ছন্ন শান্ত স্নিগ্ধতারে নষ্ট করে ফেলিতেছে মানুষের মন।

তথাপি একই সঙ্গে এই প্রত্যয়ও তাঁর রয়েছে যে, মানুষের মন যেমন সব গ্লানি ও কলুষের জনক, তেমনই অন্য এক মহৎ বেদনায় রক্তাক্ত হওয়াও শুধু তার পক্ষেই সম্ভব। একমাত্র মানুষই এই সাধ, এই সাহস নিয়ে এসেছিল। অথচ তার সেই মহত্ত্ব শুধু 'গ্লানি হল—কৃপা হল—নক্ষত্রের ঘৃণা হল—অন্য কোন স্থল পেল নাক'—এই বেদনাও এই পর্বেই ধরা পড়ল। আশ্চর্য।

'বনলতা সেন' পর্যায়ে যে অনুভব অন্তর্লীন ছিল সেই জিজ্ঞাসা-অন্তর্দ্বন্দ্ব-ক্ষোভ, বিদ্রূপ-বেদনা-সন্ধান তার পরবর্তী স্তরের কবিতায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রায়শই কবির কণ্ঠস্বর এখানে পরিহাস-তরল; কিন্তু মন সামাজিক বৈপরীত্য ও অসংলগ্নতার বেদনায় জটিল। রূপের জগৎ আর তাঁকে তৃপ্তি দেয় না। গ্রামজীবনের বিবর্ণ শান্তির অনুধ্যানে আত্মপ্রসাদ নেই আর; ইতিহাসের বঙ্কিম গতিপথ বেয়ে সামাজিক সমস্যার গ্রন্থিমোচনের সাধনা এবার থেকে।

অনেক আগেই 'আবহমান' কবিতায় জীবনের সমস্যা ও সঙ্কটের রূপ স্পষ্ট ধরা পড়েছিল কবির কাছে। তিনি জেনেছিলেন অনেক মৃত্যু পরম্পরা পার হয়ে এসে আজ আর সভ্যতার মৃত্যু নেই। কিন্তু অতীতের মতো সরল একমুখী সমাজও আর নেই। নানা লক্ষ্যের সাধনায় সমাজ এখন অনেক জটিল। তবু মানুষের শুভবুদ্ধি-সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগিয়ে আসে নি। অতীতের মতোই—

পৃথিবীর রাজপথে—রক্তপথে—অন্ধকার অববাহিকায়
এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বার হয়।

: **আবহমান**

আর সাধারণ মানুষ সহজ বিশ্বাসে একটি পাখির মতো ডিনামাইটের উপরে বসে নিড়ানো ক্ষেতের কাজ ক'রে যাচ্ছে। সোনালি সূর্যের সাথে মিশে থেকেও তারা আলোর দিকে পিছু ফিরে রয়েছে।

অথচ গ্রন্থকীট সমাজ-তাত্ত্বিকেরা যে এদের সত্য পথের নির্দেশ দেবেন এমন অবস্থাও তাঁদের নেই। কারণ বিভিন্ন মতবাদের আবর্তে তাঁরা বিভ্রান্ত।

বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু ক'রে
হেগেল ও মার্কস: তার ডান আর বাম কান ধ'রে
দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিলো

: **অনুপম ত্রিবেদী**

জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক্ নিয়ে, ষ্ট্যালিন, নেহরু, ফরোয়ার্ড ব্লক বা মানবেন্দ্র রায়ের বোঝা বয়েই উদ্‌ভ্রান্ত এঁরা। মানুষের প্রাণ নিয়ে এই যে ছিনিমিনি খেলা—এর কোনো প্রতিকার বাতলাবেন তার সাধ্য কি? অথচ ঐ নিরক্ষর চাষীদের দিকে তাকালে আমরা ত্রাণের পথ খুঁজে পাবো। স্বার্থপরতা ও আত্মসর্বস্বতার ভ্রান্ত পথে

আমরা চলেছি। এই অপমৃত্যুর পথ থেকে অব্যাহতি পেতে হলে প্রেম ও সততার পথ, শ্রীজ্ঞানের পথ, প্রজ্ঞা পারমিতার পথ, বুদ্ধের পথে এসে দাঁড়াতে হবে।

শিল্পীরা এ পথ নির্দেশ করতে পারবে না। কারণ, 'কোনো আমলকী নেই শিল্পীর নির্জন করতলে'। গ্রন্থাদি থেকেও আমরা প্রয়োজনীয় নির্দেশ খুঁজে পাব না। 'বিবর্ণ জ্ঞানের রাজ্যে কাগজের ডাইয়ে পড়ে আছে'। ভোট দিয়ে জন মতামতে মিশেও কোনো সুফল ফলবে না। মাঠে ময়দানে কথা বলে জীবনের বিষ যারা ঝেড়ে দিতে চায় সেই নেতারা মূর্খ ওঝার মতো প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে শুধু। শোচনীয় কালের বিপাকে বিপ্লব ও এক-নায়ক তন্ত্রের উপরও সেই সান্দ্র বিশ্বাস নেই আর। সব বৈচিত্র্যকে একটি ছাঁচে ঢালতে চেয়ে, সবাইকে একের অনুকরণে বাধ্য করতে গিয়ে, মানব ভাই বোনকে বুকে টেনে নেবার ছলে তাদের নিকেশ ক'রে অনির্বচন রক্তে যন্ত্র-প্রতিম নায়কেরা নূতন বৃহৎ ভীষণ নদী সৃষ্টি করল। এই নূতন হিংসা ও রক্তপাতকে অভিধানের নবসৃষ্ট শব্দ ব্যাখ্যা ক'রে অননুতপ্ততায় ক্ষালন করা হলো।

অথচ জনসাধারণ সব কিছুই করেছে। কাজ করেছে, ভোট দিয়েছে, বইকে বিশ্বাস ক'রে পড়ে গেছে, নেতাদের সবকথা মেনে গেছে, বিশ্বাস-ভ্রষ্ট হয় নি। তবু কেন প্রীতি নেই? তারা বাসস্থান তৈরী করেছে অথচ বাসা পায়নি, ধান রুয়েছে অথচ গ্রাসাচ্ছাদন পায়নি। এই অসংখ্য শ্রমিক, কেউ বা মধ্যবিত্ত সমাজের লোক এবং এরা বাঁচবার পথের খোঁজ জানে না,

> জানেনা কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের
> মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে,
> জানেনা কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে।
> অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।

এই সব হা-ঘরে হা-ভেতেদেরও কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন আছে, বিচিত্র মৃত্যুর আগে শারীরিক শান্তির প্রয়োজন আছে একথা অনুভব করে না কেউ। রাজপথে মৃতশব আতঙ্ক মুখে নিয়ে পড়ে থাকে। যুগ শেষ হলে এমন আবিষ্ট নিয়ম নেমে আসে।

তবে কি এই জেনেই আমাদের তৃপ্ত থাকতে হবে যে প্রকৃতির মধ্যেই এই হিংসা চিরন্তন হয়ে থাকবে। এই কথাই কি বলতে হবে—

> সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ
> সৃষ্টির মনের কথা: আমাদের আন্তরিকতাকে
> আমাদের সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা
> খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুজ্জ্বল

ঝর্ণার জল দেখে তার পর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হ'য়ে আছে বলে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায় :
মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে, পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি ;

: ১৯৪৬-৪৭

কেউ না বলতেই যেমন পৃথিবীতে ভোরের আলো দেখা দেয়, কেউ না চাইতেই তেমনই কি দুপুরের ঢেউ কর্কশ ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে ? নিসর্গের থেকে স্বচ্ছ জল পেয়েও নদী মানুষের মূঢ়-রক্তে ভরে ওঠে। সময় সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে—নদী নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছে কি ? না মানুষের হৃদয়ের থেকে ?

উদ্ভিদ্ যেমন আলোর দিকে মাথা তোলে তেমনই আলোর দিকে এগোতে চেয়েছে মানুষ। সকলকে আলো দিতে চেয়েছে। কিন্তু আলো না পেয়ে অন্ধকারে শত্রু মনে ক'রে নিজের ভাইকে বধ করে ঘুমাচ্ছে। যদি আলো জ্বলে, কেউ যদি এসে এদের নাম ধরে ডাক দেয়, ঘুম ভাঙবে, আলো দেখবে এবং, সাড়া দেবে একত্রে সোল্লাসে। কিন্তু সেই আলো নেই। সূর্য নিভে গেছে।

পথ-নির্দেশ

ইতিহাস এখনো কালের সীমানায় অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন। আমরা তবু জীবনকে ভালবাসি। জীবনের মানে হলো—সকলের ভালো ক'রে জীবন যাপন। সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে। তবু যারা তুচ্ছতম আর্তকেও শারীরিক সান্ত্বনা এনে দিতে চায়, এই অপমৃত্যু রোধ ক'রে যারা এক সাহসী পৃথিবী, সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ গড়তে চায়—তাদের ধন্যবাদ দিতে হয়। সামান্য সুস্থ জীবন চাইতে গিয়ে আমাদের শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের মধ্যে এসে দাঁড়াতে হয়। এত আগুন, এত রক্ত মধ্যযুগেও দেখা যায় নি। তবু আজকের মানুষকেই সমস্তকালের হিসাব নিকাশ ক'রে শুভ কাজের সূচনায় স্নিগ্ধ ও বীতশোক হতে হবে। অন্তিম গুণ 'দীনতা' আশ্রয় করতে হবে। কারণ আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময় তৃতীয় অঙ্ক এখন।

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় র'য়েছি ;
একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে আমাদের আগে ;
আরেকটি পৃথিবীর দাবী
স্থির ক'রে নিতে হ'লে লাগে

সকালের আকাশের মতন বয়স ;
সে-সকাল কখনো আসে না ঘোর, স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।

: বিভিন্ন কোরাস

হিংসার এই আমিষ অন্ধকার পেরিয়ে সেই নিঃসৃত অন্ধকার রাত্রিতে পৌঁছাতে হবে। সেই শব্দহীন মৃত্যুহীন অন্ধকার না এলে মানুষের বিহ্বল দেহের সব দোষ প্রক্ষালন ক'রে মানুষের বিহ্বল আত্মাকে সব অপরাধ ক্লান্তি ভয় ভুল মুছিয়ে বীতকাম ও নির্মল ক'রে তুলবে কে? সেই মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকারের গর্ভেই ভোরের কান্তিময় আলো ফুটে উঠবে।

সাধারণ দৃষ্টিতে আজকের পৃথিবীতে সহজ মানুষের দাঁড়াবার মতো তিল ধারণের স্থান নেই। কিন্তু প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলে পথ মিলবে। বাংলার অশিক্ষিত কৃষকেরাও সে পথ নির্দেশ করতে পারে। সেই পথ হৃদয়ের সরল শান্তির পথ। মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ তার হৃদয়। হৃদয় আছে বলেই মানুষ ভাই-বোনকে খুন ক'রেও সেই রক্ত দেখে বিচলিত হয়ে জেগে ওঠে। ইতিহাসের স্থূলতা ঘুচিয়ে দিয়ে জ্ঞান—প্রতিভা—আকাশ—প্রেম—নক্ষত্রের শরণ নেয়। তাই হৃদয়কে আশ্রয় ক'রেই মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু জ্ঞান ছাড়া প্রেম নেই। এই জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের মতো সংকলিত জিনিষের ক্রমবর্ধমান ভিড় নয়, বিদ্যার পুঞ্জীকৃত উত্তরাধিকার নয়, প্রাণময় অর্থময় কিছু। সেই প্রাণময় জ্ঞানও দুর্লভ আজ পৃথিবীতে। অথচ এই পথেই আবহমানের মানব সভ্যতা এগিয়ে এসেছিল। বুদ্ধ সেই জ্ঞান সাধনা করেছিলেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে সেই পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আমরা ক্রমশ দূরে সরে এসেছি। তাই বিশ শতকে এসে প্রশ্ন জেগেছে 'একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে আবার বিশুদ্ধ হ'তে কতদিন লাগে?'

কিন্তু মানুষ জ্ঞান-পাপী। সব বুঝেও অভ্যাসের দাসত্ব অস্বীকার করার ক্ষমতা নেই তাদের।

বাজার দরের চেয়ে বেশি কালো টাকা ঘুষ দিয়ে
জীবনকে পাওয়া যাবে ভেবে
যেন কোনো জীবনের উৎস অন্বেষণে তারা সকলে চলেছে ;

পরস্পরের থেকে দূরে থেকে ; ছিন্ন হয়ে ; বিরোধিতা করেছে
সকলের আগে নিজে—অথবা নিজের দেশ—নিজের নেশন
সবার উপরে সত্য মনে ক'রে ;—জ্ঞান পাপে, অস্পষ্ট আবেগে।

: এইখানে সূর্যের

এবং এরই ফলে যে মানুষ যে দেশ টিকে থাকে সেই ব্যক্তি হয়—রাজ্য গড়ে, সাম্রাজ্যের মতো কোনো ভূমা চায়। ব্যক্তির দাবীতে তাই সাম্রাজ্য কেবলই ভেঙে আবার নূতন ক'রে গড়ে ওঠে। এর থেকে নির্মল কোনো রাজনীতি এযুগে সম্ভব নয়। বর্তমান শতাব্দীর সময় স্রোত পার হতে পারলে সেই অমল রাজনীতি পাওয়া সম্ভব।

আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই প্রেমে। দারিদ্র্য-অভাব-অজ্ঞানতা, লোভ-হিংসা-ধ্বংস—এই পাপচক্র থেকে মুক্তির এটাই পথ—এ নির্দেশ বাংলার চাষীদের কাছ থেকেই আমরা পাই। তার অর্থ নয় যে তারাই সভ্যতার চরমে এসে পৌঁছেছে। তাদেরও প্রাণের নিঃসাড়তা মৃত মমীর মতো।

কোথাও শান্তির কথা নেই, তার উদ্দীপ্তিও নেই,
একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে ;
সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিল খেতে ;
সূর্যাস্তের সাথে চলে গেছে।
সূর্য উঠবে জেনে স্থির হ'য়ে ঘুমায়ে রয়েছে।

: খেতে প্রান্তরে

এই মৃতকল্প জীবনের কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে থাকতে দেবে না। সভ্যতার ইতিহাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে করুণ নিরীহ নিরাশ্রয় হয়ে থাকার কোনো মানে নেই, বরং ইতিহাসের কূলহারা সাগরের চিহ্নগুলি চিনে চিনে নচিকেতার মতো অগ্রসর হলে স্বাভাবিক সূর্যালোকে পৌঁছানো যেতে পারে।

'সময়ের কাছে' কবিতায় সেই চিহ্নগুলির পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে। মানুষেরা বারবার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে, নব নব ইতিহাসসৈকতে তাদের অভিযান। কিন্তু নচিকেতা, জরাথুষ্ট লাওৎসে, এঞ্জেলো, রুশো, লেনিন প্রমুখ মনীষীরা মনে মনে যে পৃথিবীর স্বপ্ন এঁকেছিলেন কোথাও সেই অনির্বচনীয় স্বপ্নের সাফল্যের নিশানা দেখা যায় নি। শুভ্র মানবিকতার ভোরের উন্মেষ হয় নি। তবু এদেরই কল্পনার পৃথিবীর অভিঘাতে আজকের এই স্মরণীয় শতক আসতে পেরেছে। কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছি বলেই ক্লান্ত হয়ে শান্তি চাইলে চলবে না। যে নূতন নূতন সমস্যা ও সঙ্কটের আবর্তে সভ্যতাকে পৌঁছাতে হচ্ছে তাকে ইতিহাস-পুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়। এমন নিরন্তর আঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলেই আমাদের

আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে, তার চেয়েও মহত্তর সিদ্ধিতে উপনীত হতে পারবো। সুতরাং অনন্ত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শুধু গতির গুণগান গেয়ে বর্তমান শতকের সভ্যতার সৈকত ছেড়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। নূতন নূতন তরঙ্গে, নব নব বিপ্লবে আমাদের বিভেদ ও সংগ্রাম ক্রমবিদূরিত হবে। মানবিক মিলন গভীরতর হবে। নব নব মৃত্যু-শব্দ, রক্ত-শব্দ ভীতি-শব্দ জয় ক'রে মানুষের সেই চেতনার দিন এগিয়ে আসছে; সর্বমানবের কল্যাণের অভিমুখে, প্রগাঢ় আশাবাদের মধ্যে মানুষের বিষয় হৃদয় এগিয়ে চলেছে।

প্রেম

প্রেম ও মৃত্যু

।

বিজ্ঞান বলে, বস্তুর কোনো বর্ণ নেই। আলোক রশ্মি বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে প্রাণীর চোখের স্নায়ুতে আঘাত করলে বর্ণ বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। বস্তুর নিজের বর্ণ নেই বটে কিন্তু বর্ণশোষক শক্তি থাকতে পারে। অর্থাৎ আলোর সবগুলি উপাদান তাতে প্রতিফলিত না হতেও পারে। প্রতিফলিত আলোতে এই সব উপাদানের অভাব আমাদের চোখে যে প্রতিক্রিয়ার তারতম্য ঘটায়, তাতেই বর্ণ বৈচিত্র্যের প্রতীতি। আলোক-রশ্মি বিশ্লিষ্ট ক'রে বস্তু সমূহের উপর ফেলে আর এক জাতের বৈচিত্র্য সম্পাদন সম্ভব। আর এ কৌশলও আমাদের অভিজ্ঞতায় দুর্লভ নয় একেবারে। খালি চোখে পৃথিবীর যে রূপ দেখি, রঙিন কাঁচের মধ্যদিয়ে দেখলে তার বর্ণান্তর ঘটে বৈকি। কিন্তু বাইরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে অ্যালট্রা ভায়োলেট আলো জেলে দিলে সেই অদৃশ্য আলোয় বস্তুর যে আশ্চর্য রূপান্তর দেখবো তা দিনানুদিন অভিজ্ঞতার বিষয় নয়।

কবির লেখায় বিশ্বকে তার সহজ-স্বভাবে পাই না, ব্যক্তি অনুভূতির বিভায় বিরঞ্জিত হয় তার রূপ—সেই তার বিশেষ আকর্ষণ। কবিতা হতে গেলে তাই ব্যক্তি ও বিশ্ব —এই দুটি উপাদানের আবশ্যকতা প্রাথমিক। জীবনানন্দের কবিতায় যে ত্রিতল মাত্রা (third dimension) পাওয়া গেল তা হলো সময় ও ঐতিহ্য। কালের অনুবর্তনে অনুভূতির যে তারতম্য ঘটে, তার রূপায়ণে অন্য এক স্বাদ বর্তালো তাঁর কবিতায়। এবং এই কালপরিধি শুধু ব্যক্তি জীবনের নানা পর্বে সীমাবদ্ধ না রেখে সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে সৌর-বিশ্বের ক্রান্তিকাল পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে দেওয়ায় যে বিশিষ্টতা দেখা গেলো তাকেই বলা হয়েছে ইতিহাসচেতনা। ইতিহাসের পর্যায়ে পর্যায়ে এবং ব্যক্তি জীবনের পর্বে পর্বে কবি অনুভূতির যে বর্ণান্তর তা ঐ ত্রি শিরা কাঁচের মতো প্রতিসরিত আলোকচ্ছটায় জীবনকে বিচিত্র ও রমণীয় ক'রে তুলেছে। কিন্তু অন্তত প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে এই কৌশলও যথেষ্ট নয়—বরং মাঝে মাঝে আমাদের পরিচিত সব আলো নিভিয়ে দিয়ে মৃত্যুর অদৃশ্য আলট্রা-ভায়োলেট আলো জেলে জীবনের আর এক রূপ, আর এক তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং এটাই জীবনানন্দের কবিতার চতুস্তল মাত্রা।

ধরা যাক 'বনলতা সেন' কবিতাটি। এটিকে নিলাম কারণ এটিই জীবনানন্দের সব চেয়ে পরিচিত কবিতা। কবিতাটি সম্পর্কে আমাদের অদ্ভুত মোহ আছে। কারণ, ব্যঞ্জনায় ও অভিব্যক্তিতে এর তুলনা বাংলা সাহিত্যে একটিও নেই। তবু এই একটি

কবিতা দিয়ে জীবনানন্দকে চিনতে যাওয়া ভুল। এ কবিতাটি তাঁর বিশিষ্ট কবি মানসের প্রতিভূ তো নয়ই—তাঁর কোনো একক গ্রন্থকেও সে গৌরব দেওয়া যেতে পারে না। তাঁর কবিসত্তার পূর্ণ পরিচিতি শুধু মিলতে পারে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবের এবং রীতির কবিতার সামগ্রিক অনুধাবনে। সুতরাং এই কবিতাটি পড়লেই তাঁর প্রেম সম্পর্কে ভাবনা-কল্পনার মর্মোদ্ঘাটন করা যাবে না। বরং এতে তাঁর যে বিশিষ্ট চেতনার নিদর্শনগুলি পাবো তারই সন্তর্পিত অনুসরণ ক্রমে তাঁর প্রেমের কবিতার মর্মমূলে যে প্রাণরস সঞ্চারিত হচ্ছে, তার উৎসমুখে উপনীত হতে প্রয়াসী হবো।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রত্যেক প্রধান কবি নিজ নিজ কবিতায় প্রেম বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী বিশ্ববিসারী যুগল প্রেম কল্পনা, ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসের অস্থিমাংস-সম্বন্ধ প্রেমানুভূতি, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ক্ষণভঙ্গুর মিলন স্মৃতিকে স্থায়িত্ব দানের আকুতি, মোহিতলাল মজুমদারের দেহলগ্ন রতিবিমুখ প্রেমের ক্রন্দন ও হাহাকার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রেমকে অস্বীকার ও জীবনযন্ত্রণাকেই প্রেমের স্থলাভিষেক, বুদ্ধদেব বসুর জৈবিক মিলনের নিঃসঙ্গ ও উতরোল আনন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমাজভীরু প্রেমের খিন্ন অবসাদ ইত্যাদির বিশ্লেষণ ও বিস্তৃততর ব্যাখ্যার অবকাশ আপাতত নেই। জীবনানন্দের দৃষ্টিতেও প্রেম এক স্বতন্ত্রচেতনা।

জীবনানন্দের রচনার আদিপর্বে 'ঝরা পালকে'র আমলে সম্ভোগাতুর প্রেমের মানস উত্তেজনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তখন কল্লোলের কাল। সেই উদ্দাম যৌবনোদীপ্ত দিনগুলিতে দেহজ কামনা-প্রসক্তির রূপায়ণে কল্লোল কবি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সগোত্রতা ছিল। একটু নমুনা রাখলেই বোঝা যাবে, শুধু ভাবের বা বিষয়ের গ্রথিবন্ধন নয়, প্রকাশ পদ্ধতিতেও কি নিবিড় একরূপতা সেখানে—

> পেয়ালায়-পায়েলায় সেই নিশি হয়নি উতলা,
> নীল নিচোলের কোলে নাচে নাই আকাশের তলা!
> নটীরা ঘুমায়েছিল পুরে পুরে,—ঘুমে রাজবধূ,
> চুরি করে পিয়েছিনু ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু!
> সম্রাজ্ঞীর নির্দয় আঁখির দর্প বিদ্রূপ ভুলিয়া
> কৃষ্ণা তিথি-চাঁদিনীর তলে আমি ষোড়শীর উরু পরশিয়া
> লভেছিনু উল্লাস—উতরোল!

: অস্তচাঁদে

. প্রকল্পিত প্রেমের আবেগোচ্ছল আতিশয্যময় বর্ণনাতেও অন্যান্য প্রেমের কবির মতোই জীবনানন্দেরও কুশলতা ছিল একদা। কিন্তু এই উল্লাস ও উত্তেজনা 'ধূসর পাণ্ডু লিপি'তে এসে স্তিমিত হয়ে গেছে।

। মানুষের জীবনের সামগ্রিক তাৎপর্যের কাছে প্রেমের আপাত সংকীর্ণ পরিসর আলোচ্য 'বনলতা সেন' কবিতায় উদ্ঘাটিত হয়েছে। 'হাজার বছর' এখানে কোনো অতিশয়োক্তিমূলক শব্দমাত্র নয় বরং বুঝতে হবে হাজার বছর ধরে গতিশীল এই মানুষ কোনো ব্যক্তিপুরুষ নয়। শত শত প্রজন্মের মধ্যে বহমান মানবাত্মার প্রবাহকেই এখানে নায়ক ও নায়িকা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। সমান্তরাল উপলব্ধি থেকেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

> আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
> অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
> আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
> বিরহ বিধুর নয়ন সলিলে, মিলনমধুর লাজে—
> পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে।

: অনন্ত প্রেম

এখানে কিন্তু উভয়ের জীবনের স্রোতধারায় বহমান নন। পুরুষ তার কর্মক্ষেত্রে বহির্বিশ্বে বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ থেকে আজকের স্পষ্টতার কালে, সিংহল থেকে মালয় সাগর—সারা পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে আর নারী দূর কালান্তরের শ্রাবস্তী বিদিশার রহস্যময়তা নিয়ে গৃহাঙ্গনে আজ অবধি অপেক্ষমাণ। অডিসিউসের মতো একজনের নিয়ত সঞ্চরণ আর পেনেলোপের মতো অন্যজনের নিয়ত প্রতীক্ষা। সমস্ত দীর্ঘ কর্মময় দিনের অবসানে দিশেহারা ক্লান্ত মানবক যখন ঘরে ফেরে, তখন তার ভগ্ন-শ্রান্ত প্রাণকে আশ্রয়ের শান্তি দিতে পারে নারীর প্রেম, সেই প্রেমের সঙ্গে মানবাত্মার একটা ঐতিহাসিক স্মৃতির অস্পষ্ট পরিচিতি জড়িয়ে আছে—যা ঠিক চেনা যায় না, তবু বিশ্বাস করা যায়। যেন কোনো এক অতীত যুগান্তরে তার সঙ্গে আমাদের নিবিড় পরিচয় ছিল। সেই আধো পরিচিতির মাধুর্য, নারী হৃদয়ের সেই অপ্রত্যাশিত উষ্ণ আমন্ত্রণ ব্যর্থতা ভুলিয়ে দিতে পারে, শূন্যতার অন্ধকার ভরিয়ে তুলতে পারে।

কিন্তু জীবনে প্রেমের ভূমিকা সম্পর্কে এটুকু অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়। কর্মময় দিনে যেমন প্রেমের অনুভূতি নেই, কর্মাবসানের বিহ্বল মুহূর্তে তার আবির্ভাব তেমনি জীবনের সামগ্রিক লেনদেনের মতোই দূর ভবিষ্যতের বিচারে তার তাৎপর্যও যৎকিঞ্চিৎ। একথা বোঝাতে সম্ভবত পরে তাঁকে লিখতে হয়েছে—

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে পিরামিড-কাফনের ঘ্রাণ ;
বালির উপর জ্যোৎস্না—খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরিয় :—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান ।
শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ;
'মনে আছে ?' সুধাল সে, সুধালাম আমি শুধু 'বনলতা সেন' ?

: হাজার বছর শুধু খেলা করে

ব্যক্তিগত প্রেমের মূল্য ব্যক্তির সঙ্গেই নিঃশেষিত হয় । মৃত্যুর শীতল স্পর্শে যখন রক্তের উত্তাল উচ্ছ্বাস নিরসিত তখন সবচেয়ে জীবনমুখর প্রেমেরও কোনো অভিব্যক্তিময় উত্তরণ নেই । দুটি নরনারীর পরিচয়ের স্মৃতির নিরুত্তাপ স্বীকৃতি শুধু তখনও অবশিষ্ট থাকে নৈর্ব্যক্তিক প্রবাদের মতো ।

অথচ সমষ্টিগত দৃষ্টিতে যখন প্রেমকে তিনি লক্ষ্য করেছেন, তখন তার মধ্যে ব্যক্তিপ্রেমের অবসন্ন অবসান দেখেন নি । তিনি অনুভব করেছেন বিঘ্নলঙ্ঘী মৃত্যুত্তীর্ণ প্রেমের গম্ভীর রূপ কালপ্রবাহের মধ্যে আপনার প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে—

যে নক্ষত্ররা আকাশের বুকে হাজার-হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে ;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানায় কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে করে
কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?

: হাওয়ার রাত

এর সাঙ্কেতিকতা বিস্ময়াবহ । প্রেমের মধ্যে একটা প্রবল বেগ আছে, একটা বিঘ্নলঙ্ঘী প্রতিষ্ঠাকাম ভয়ঙ্কর আত্মতা আছে—যা যুগ অতিক্রম ক'রে মৃত্যু পদদলিত ক'রে একটা ব্যাপ্ত আয়তি চায়—সেই রহস্যাবৃত তথ্যই এখানে সঙ্কেতিত হয়েছে ।

প্রেমিক

শ্রদ্ধেয় শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণ বিস্ময়কর হলেও সত্য যে জীবনানন্দ প্রেমিক কবি, কিন্তু প্রেমের কবি নন। প্রেমের প্রতিফলনে প্রেমিক যে অব্যক্ত ব্যথা ও বিস্ময় বোধ করে, তাঁর কবিতাতে শুধু তারই উদ্ঘাটন আছে। এক বিচ্ছেদাতুর নৈর্ব্যক্তিক চেতনার স্মৃতি. ভাবানুষঙ্গ ক্রমে যে চিত্রকল্পগুলি আনে তাতে কোনো গভীর আলোড়ন নেই কিন্তু করুণ আর্তি আছে—অস্ফুট বেদনা, অবরুদ্ধ আবেগ আছে।

'হায় চিল' কবিতাটিতে বৃষ্টি ধোয়া মেঘের দুপুরে চিলের তীক্ষ্ণ কান্নার সুরে একটি প্রেমের আর্ত হাহাকার ছড়িয়ে আছে, আর কিছু নয়। আর কিছুর প্রয়োজনও নেই একটি সুন্দর লিরিকের জন্যে। বিগত প্রেমের স্মিত সুরভি শুধু পরিবেশ ও 'মুড'-এর অপরিহার্য যোগাযোগে এমন আশ্চর্য করুণ রসোচ্ছলতা লাভ করে, যা জীবনানন্দের কাব্যের বাইরে পাওয়া যাবে না। জীবনানন্দের আধুনিকতা এইখানে। আয়োজনের অতিশয্যে তিনি মনকে কখনই ভারাক্রান্ত করেন না। ভাবের সংহতিতে, প্রতীকের ব্যঞ্জনায় তিনি কাব্যকে ধ্বনিময় ক'রে তুলতে ভালবাসেন।

বাস্তবিক, জীবনানন্দ প্রেমকে নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন। তাঁর কবিতার একমাত্র নায়ক—কবি স্বয়ং। তাই প্রেমিক-পুরুষের হৃদয়ের নিবিড় বেদনা ও সূক্ষ্ম অনুভবগুলি সেখানে এত পরিচ্ছন্ন পরিভাষা পেয়েছে যে, তুলনায় সাধারণ প্রেমের কবিতা, বিশেষত বাংলা কবিতা, অত্যন্ত স্থূল, অত্যন্ত ভোঁতা মনে হয়।

যতদিন ভালবেসে গিয়েছি তোমারে
কেন যেন লেগুনের মতো আমি অন্ধকারে কোন্ দূর সমুদ্রের ঘর

চেয়েছি—চেয়েছি, আহা···ভালোবেসে না-কেঁদে কে পারে
তবুও সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চ'লে চুপে
তুমিও দেখনি ফিরে—তুমিও ডাকনি আর—আমিও খুঁজিনি অন্ধকারে
যেন এক দেশলাই জ্ব'লে গেছে—জ্বলিবেই—হালভাঙা জাহাজের স্তূপে
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চ'লে চুপে।

: **যেন এক দেশলাই**

প্রেমের সঙ্গে এই বিহ্বলতা, এই অসহায় আকুতি যেন ওতপ্রোত হয়ে আছে, অথচ এর সাক্ষাৎ সাহিত্যে অন্যত্র মিলবে না; কারণ এখনো সাহিত্য অভিজ্ঞতামূলক

হয়ে গড়ে ওঠে নি—এখনো সাহিত্যে আতিশয্যজনিত কৃত্রিমতার সমাদর—তাই তাতে মর্মস্পর্শের দক্ষতা নেই।

অথচ জীবনানন্দ কখনও প্রেমকে কাব্যের বিষয় বলে মনে করতে পারেন নি। প্রেম তাঁর কাছে জীবনের এক বিস্ময়কর অধ্যায়ের উদ্ঘাটন, কবিতা তার স্মৃতি-চর্বনা। তাই প্রেমের অবতারণা মাত্রই এক অদ্ভুত বিহ্বলতা তাঁকে আচ্ছন্ন-আবিষ্ট করে। এই আবেশ ও বিহ্বলতা কাটাতে না পারলে কখনও প্রেমের কবির কুশল-শৈলী আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু সম্ভব না হোক, প্রেমের কবি আমরা অনেক দেখেছি, অনেক দেখবো—কিন্তু প্রেমিক-কবির এই আত্ম উদ্ঘাটন দুর্লভ থাকবে আবহমান কাল।

তবু সে কথাও তো পরের। আরও আশ্চর্য কথা হলো অন্যান্য প্রেমের কবির মতই প্রকল্পিত প্রেমের আবেগোচ্ছল আতিশয্যময় বর্ণনাতেও জীবনানন্দর কুশলতা ছিল একদা। তখন কল্লোলের কাল। সেই উদ্দাম যৌবনোদ্দীপ্ত দিনগুলিতে দেহজ কামনা-প্রসক্তির রূপায়ণে কল্লোল কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে তার সগোত্রতা ছিল। একটা নমুনা রাখছি। দেখা যাবে, শুধু ভাবের বা বিষয়ের গ্রন্থিবন্ধন নয়, প্রকাশ-পদ্ধতিতেও কি নিবিড় একরূপতা এখানে—

পেয়ালায়-পায়েলায় সেই নিশি হয়নি উতলা,
নীল নিচোলের কোলে নাচে নাই আকাশের তলা!
নটীরা ঘুমায়েছিল পুরে পুরে,—ঘুমে রাজবধূ,
চুরি করে পেয়েছিনু ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু,
সম্রাজ্ঞীর নির্দয় আঁখির দর্প বিদ্রূপ ভুলিয়া
কৃষ্ণাতিথি-চাঁদিনীর তলে আমি ষোড়শীর উরু পরশিয়া
লভেছিনু উল্লাস,—উতরোল!

: অস্তচাঁদে

‘ঝরাপালকে’র সম্ভোগাতুর প্রেমের এই মানস উল্লাস ও উত্তেজনা ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’তে এসে স্তিমিত হয়েছে। কবি-স্বভাবের এমন আমূল রূপান্তর সুলভ নয় ইতিহাসে। এবং এর রহস্য আজও অনুদ্ঘাটিত। হয়তো বলা যেতে পারতো তখনকার সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশ কবিকে ঐ রকম উগ্র ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল; বলা যেত, কল্লোল গোষ্ঠীর প্রভাবে তিনি আচ্ছন্ন হয়েছিলেন; বলা যেত, এ হলো প্রথম যৌবনের বয়োধর্ম; অথবা নানা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দুরূহ হতো না। কিন্তু ঐ জাতের কোনো ত্বরিত মন্তব্যে আমাদের আস্থা নেই। কার্যত পূর্বোক্ত কোনো একটি কারণ একক ভাবে নয়, সবগুলিই অল্পবিস্তর মাত্রায় যৌথভাবে কবিচিত্তের সামগ্রিক

কেন্দ্রচ্যুতিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। এবং তাঁর সেই অতীত জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় যাঁরা রাখেন, তাঁরাই কেবল এই কারণগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দেশে সাহায্য করতে পারেন। তাই সে মনস্তাত্ত্বিক জটিল প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আপাতত বলতে পারি কল্পনা থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতায় নেমে এসেছেন ব'লে 'মুড'-এর অবশ্যম্ভাবী রূপান্তর হয়েছে—

তুমি তা জান না কিছু, না জানিলে,—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!

: **নির্জন স্বাক্ষর**

এবার থেকে তাঁর কাম্য হলো—'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়'।

প্রেমিকের দুঃসহ যন্ত্রণা, তার অন্তর-বৃত্তির তীব্র তাড়না এই পর্বে এসে জীবনানন্দ প্রথম এবং মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। প্রেমের অসীম যন্ত্রণার মধ্যেও যে অন্তর্গূঢ় অমৃত আস্বাদ, প্রেমের অবার আনন্দের মধ্যেও যে গভীর বিষাদ নিহিত, তার উপলব্ধিতে তাঁর কবিপ্রাণ স্পর্শমণির সারূপ্য পেয়েছে। এইখানে এসে তিনি জেনেছেন প্রেম এক বিস্ময়ের মতো। পার্থিব কোনো বস্তু তা নয়, অথচ অপার্থিবও বলা চলে না তাকে। প্রকৃতির মধ্যে তার অস্তিত্ব নেই, শুধু হৃদয়ের গভীর গহ্বরে নক্ষত্রের চেয়েও নিঃশব্দ আসনে সে বেঁচে থাকে অন্য এক হৃদয়ের অপেক্ষায়। সময় এসে প্রেমিকের চোখে যখন আগুন জ্বালিয়ে যায়, সেই হিজল কাঠের রক্তিম চিতায় সে নিজেই দগ্ধ হয়ে ভস্ম-শেষ হয়ে যায়। অতীতে যে প্রেম মানুষের চোখে জ্বলে উঠেছিল, নিভে গেছে। আবার নূতন আগুন জ্বলে উঠেছে নূতন নূতন চোখে। পুরানো নক্ষত্র নিভে যায় যেমন, নূতন নক্ষত্র জ্বলে উঠে। ক্রমে ক্রমে জীবনের ধার ক্ষয়ে আসে, অতীতের নিভন্ত প্রেমের শৈত্য এক সময়ে নিজের মধ্যে অনুভব করে সকলে। হেমন্তের শিশিরের জল ঝরে প্রেমের দীপ্ত শিখাকে ম্লানতর ক'রে। অতীতের হিমগর্ভ কবরে শিশিরের জল বুকে নিয়ে সেই দগ্ধাবশিষ্ট স্মৃতি শ্মশানের মতো জেগে থাকে।

প্রেম

জীবনের আলো জ্বালিয়ে রাখতে আমাদের যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম ও শ্রম —এবং জয়, সাম্রাজ্য, সিংহাসন, সাফল্য ইত্যাদি সেই সংগ্রামের যে পুরস্কার, তার সঙ্গে বিমিশ্রিত থাকে অনেক রক্ত ও অশ্রু। তাই এই রণরক্ত সফলতা আমাদের তৃপ্তি দেয় না, মনের গভীরে অবসাদ জমে—আমাদের ক্লান্ত করে। অনেক জেনেছি ব'লে, অনেক মেনেছি ব'লে এক এক সময় আসে যখন আর জানতে ইচ্ছা করে না,

জাগতে চাই না, ঘুমাতে হয়। জ্বরগ্রস্ত জীবনের বিকারের মতো আমরা প্রলাপের জগতে থাকি, বিকারের অবসানে ঘুমিয়ে পড়ি। ক্লান্তির পরে ঘুমের প্রয়োজন, মৃত্যুর মতো শান্তির প্রয়োজন।

মানুষ তার রক্তের মধ্যে এই অস্থিরতা, এই যন্ত্রণার বীজ বহন ক'রে চলেছে। তার বেদনা দুরপনেয়। অন্যকে আঘাত না করলে আমরা নিজেদের জাগিয়ে রাখতে পারি না। আবার এই আঘাতের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু নক্ষত্রের এইভাবে গহ্বরের মতো ঘুমাতে হয় না ; কেননা, নক্ষত্রের আলো, জ্বলতে এই রক্তের মতো অশ্রুর প্রয়োজন নেই, নিজেকে দগ্ধ ক'রেই সে দীপ্ত থাকে। জানার বেদনা, মানার ক্লান্তি, জাগার অবিরাম প্রয়াস তার নেই ব'লে সে সুস্থ, স্বাভাবিক। আমাদের হৃদয়ের অন্ধকারে যদি আমরা নক্ষত্রের মতো আলো পাই, যদি অন্যকে ক্লিষ্ট না ক'রে নক্ষত্রের মতো অন্তরের আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারি, তবে আর ক্লান্তি আমাদের আচ্ছন্ন করবে না। কিন্তু যতদিন মানুষের মতো মানুষের পথে চলেছি ততদিন এই অবসাদ থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

তবু জীবনের এই কোলাহলময় অভিযান, অহংকে ঘিরে এই আড়ম্বরময় আয়োজন —সব কিছু প্রেমের অতর্কিত আবির্ভাবে ও আঘাতে বিপর্যস্ত ও নিরর্থ হয়ে যায়। এবং সেই আঘাতের পরে, সেই বিদ্যুতের মতো চকিত আবির্ভাবে আগুন জ্বলে ওঠার পরেও জীবন বহুক্ষণ অঙ্গারের মতো জ্বলতে থাকে। কারণ একমাত্র প্রেমই এই স্বার্থপরতার, এই আত্মসর্বস্বতার বৃ্যহ থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়—অন্যকে আঘাত না ক'রে বরং নিজে আহত হয়ে অন্যকে সুখী করতে শেখায়। তাই প্রেমিক-মানুষের হৃদয় বজ্রাহত মহীরুহের মতো শতশিখায় দীপ্ত হয়ে ওঠে।

কেননা সূর্যের থেকে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে প্রেমের শক্তি বেশি। আমাদের অন্তর্লীন রক্তের অসুস্থতা মুহূর্তে দূর ক'রে সে মায়ের মতো আমাদের সুস্থ সজীব ক'রে তোলে। তাই একবার তার স্পর্শ যে পেয়েছে, সে বারবার তাকে ফিরে পেতে চায় ; কিন্তু প্রেম বারবার ফিরে আসে না।

অস্খলিত গতিতে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে প্রেম চলেছে, তার পিছনে পড়ে আছে স্মৃতির শীত। প্রেম আমাদের ছুঁয়ে যায়, দোলা দিয়ে যায়, তবু আমরা তাকে ধরতে পারি না। প্রেম ব'লে যা ধরি, তা শুধু প্রেমের ছায়া, ঢেউয়ের মতো তার গতি—যদি আঁজলা ভ'রে আনি, পাই শুধু নিস্তরঙ্গ জল।

তবু তার স্পর্শের সেই লগ্নটিতে আমরা মৃত্যুকে অবহেলা করতে শিখি। সকলেরই ঘুম আছে—ঘুমের মতো মৃত্যু বুকে আছে সকলের, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়, কিন্তু প্রেমের পায়ের শব্দ তবু আকাশে চিরজাগরূক হয়ে বেঁচে থাকে। সুর

কিছু ভুলতে পারে মানুষ—প্রেমকে নয়। তাই মৃত্যুকে পদদলিত ক'রে আকাশের বুকে মৃতেরা আবার জেগে ওঠে। মানুষের যে ব্যথা মুছতে এসে প্রেম আরও ব্যথা, আরো বিহ্বলতা দিয়ে যায়, তা ভুলে কে ঘুমাতে পারে ?

নায়িকা

প্রেমের প্রতিফলনে পুরুষের মনটিকে তিনি যেমন আশ্চর্য স্বাভাবিকতায় আঁকতে পেরেছেন। নারীর মনটিকে ততখানি পারেন নি। তাঁর কবিতার নায়িকারা 'পরস্পর' কবিতার ঘুমন্ত রাজকন্যার মতো যুগে যুগে আপনার অঙ্গলাবণ্য শাণিততর ক'রে চলেছে—কোটি কোটি পুরুষের সাধনা ও আত্মোৎসর্গও তার সুপ্ত-চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারে নি, তার বোবা মনের গোপন বাণীটি অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। এমনি এক রহস্যময় দুর্জ্ঞেয়তার জগতে জীবনানন্দের নায়িকারা ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্তত। 'পরস্পর' কবিতার বাস্তব পৃথিবীর মেয়েটির মতো তাদের শারীরী রূপের বর্ণনা আছে, সেই রূপের ত্বরিত বিনাশের কান্না আছে, কিন্তু তাদের আত্মার বাণীটি দুর্লভ।

একেবারে নেই তা বলি না—'দুজন' কবিতায় যেখানে সব কিছু মৃত্যুর ধূসর বুকে ঝরে পড়েছে, হেমন্তের সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে এসে এক নারী তার সঙ্গীকে বলেছিল :

> 'পৃথিবীর পুরানো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
> জানি আমি ;—তারপর আমাদের দুস্থ হৃদয়
> কী নিয়ে থাকিবে বল ;—একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা,
> তারপর ঝরে গেছে ; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
> হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের—প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা,
> ফুরত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—'
> এই বলে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
> উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।
>
> : দুজন

এই অক্ষম করুণ ইচ্ছার চিত্রটি নারী-স্বভাবের এক গোপন মাধুরীর উৎস অবারিত করেছে। তার হৃদয়ের এ উদ্ঘাটনে শুধু প্রেমিকের নয়, আমাদেরও মনে হয়, 'এই নারী—অপরূপ—'। কিন্তু আর একবারও তার দেখা মিলল না।

মেলেনি তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ নারীকে জীবনানন্দ দেখেছেন পৃথক এক চেতনার আলোকে। ইতিহাসের কুটিল অভিপ্রায় পুরুষকে যতখানি

অস্থির ও স্বভাব-চ্যুত করেছে নারীকে ততখানি নয়। প্রকৃতির সঙ্গে তার অনেক বেশি একাত্মতা। নদীর মতো তার মুখে বিম্বিত হয় সূর্যের বিভা, স্থান ও কালের বিভিন্ন পটপ্রেক্ষিতে তার বর্ণান্তর ঘটে। নদীর মতোই তার সহজ স্বকীয় প্রাণচ্ছন্দ আছে—প্রকৃতির মতো অব্যক্ত দুর্বোধ্য প্রাণচ্ছন্দ। তাকে অনুভব করা যায়, বিশ্লেষণ করা যায় না। তাই তার মুখের দিকে তাকালে মনে হয় যেন যুগ-যুগান্তরের পুরানো কোনো এক নারীকে দেখছি। যেন অখণ্ড কাল প্রবাহের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বয়সিনী এক মেয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা মণিকা-আলো নিয়ে মানুষকে জীবনের পথ দেখায়, সংঘমিত্রার মতো দুঃসাহসী অভিযানে প্রেরণা দেয়, প্রজ্ঞা পারমিতার মতো মহৎ উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ করে।

কিন্তু নারী যদি তার সুস্থ স্বভাবে না থাকে, যদি কোনো অজ্ঞাত কুটিল অভিপ্রায়ের দ্বারা চালিত হয়ে পুরুষের সহজ বিশ্বাসকে প্রতারণা করে, তবে আর পুরুষের নিস্তার নেই। কোনো এক বসন্তের রাতে—জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে—জ্যোৎস্নায় ঘাইহরিণীর মতো তারা এসে পুরুষকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যায়।

মৃত পশুদের মত আমাদের মাংস লয়ে আমরাও প'ড়ে থাকি ;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মত—।
প্রেমের সাহস-সাধ-স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই ;
পাই না কি ?

: ক্যাম্পে

তাই নারীর উপর জীবনানন্দের নির্ভরতা অনেক বেশি। দাবী অপরিমেয়।

এবং নারীমাত্রকেই এইভাবে একটা ভাবদৃষ্টিতে দেখার ফলেই জীবনানন্দের নায়িকারা জীবন্ত ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। এমন কি, 'ঝরাপালকে'র আমলের passive নায়িকাদের প্রকল্পিত সজীবতাও পরবর্তীকালে বজায় থাকেনি। শুধু তাই নয়, 'বনলতা সেন' গ্রন্থে যদিও কবি বলেছিলেন 'এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো'—তবু এই নায়িকাদের অরূপ নারীত্বের প্রতীক মনে করাও ঠিক হবে না হয়তো। তাঁর বনলতা, সুচেতনা, সুদর্শনা, সুরঞ্জনা, সবিতা, শ্যামলী, শঙ্খমালা—সবই যেন পৃথক পৃথক 'আইডিয়া'র প্রতীক। এদিকে এই নামের শব্দগত অর্থও কিছু আলোকপাত করতে পারে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। বনলতা যেমন নৈসর্গিক সৌন্দর্যের রূপক এমন ব্যাখ্যা করা সম্ভব, শ্যামলীকে যেমন বাংলাদেশের প্রতিরূপ ভাবা চলে, তেমনি সুচেতনা, সুরঞ্জনা, সুদর্শনা, সবিতা প্রভৃতিকে বিভিন্ন ভাব বা বৃত্তির রূপক ভাবা চলে কিনা দেখা দরকার। 'ভাষিত'

কবিতাটি পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় সুচেতনা মানুষের নৈতিক শুভ চেতনার প্রমূর্তি মাত্র। এমনি আর কি! তবু যথার্থ মরমী কবির হাতে ভাব রূপকাশ্রিত হয়ে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত হলে তাদের মধ্যে মানবিক বৃত্তিও দেখা দিয়ে থাকে; রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা যেমন কখনো প্রেমিক, কখনো বা প্রিয়ার রূপে বিলসিত হয়েছিল, এখানেও তাই হয়েছে। জীবনানন্দের কবিসত্তার সমান্তরালে থেকে এই সব নায়িকাও আপনাদের রহস্যময় দুর্বোধ্যতা নিয়ে কখনও অনুকূলতা, কখনও প্রতিকূলতা করেছে, কিন্তু কখনও শরীরী হয়নি। এই জন্যেই তাঁর প্রেমের কবিতা কখনোই দুটি সন্নিকৃষ্ট হৃদয়ের সংঘাত-মুখরতা লাভ করেনি। সেখানে শুধু একটি হৃদয়ের অন্য একটি মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়-রোমাঞ্চের অর্ধস্ফুট অভিব্যক্তি অথবা হৃতলগ্ন স্মৃতির বিচ্ছেদাতুর রোমন্থন। ম্যাথু আর্নল্ড একদা লিখেছিলেন, মানুষ এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। আত্মার এমনি নিঃসঙ্গ একাকীত্ব জীবনানন্দ বারবার অনুভব করেছেন। প্রিয়াকে অন্তরের সান্নিধ্যে পেয়েও তাই তাঁকে বারবার বলতে হয়েছে—

> তোমার মুখের রেখা আজো
> মৃত কত পৌত্তলিক খৃষ্টান সিন্ধুর
> অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন;
> কত কাছে—তবু কত দূর।

: **সবিতা**

নারী

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতার আরেক নব রূপান্তর দেখা যাবে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় এসে। ইতিহাসের অগ্রগতির পথে জীবন ও সভ্যতার নানান অবক্ষয়ে আহত কবি শুধু প্রেমকেই আশ্রয় করেছেন। এই পর্যায়ে নারী এবং প্রকৃতিই তাঁর অবলম্বন এবং বলা বাহুল্য এরা প্রায় অদ্বৈত হয়ে উঠেছে। এতদিন তাঁর কবিতায় যে সব ইনডিভিজুয়ালকে পেয়েছিলাম, স্থান কাল দ্বারা চিহ্নিত, নাম পদবী দ্বারা বিশেষিত যে সব নায়িকারা তার কাব্য লোক আলোকিত করেছিলেন তার বদলে নামগোত্রহীন 'নারী' অথবা 'মহিলা' অথবা কেবলমাত্র তুমির আনাগোনা। অর্থাৎ এতদিনের প্রেমিক পুরুষ সত্তার বিপরীতে এই প্রথম 'প্রেমিকা' স্ত্রী অথবা সঙ্গিনীকে দেখতে পেলাম। এখানে এসেই প্রথম শুনলাম প্রেমিক কবির গভীর বিশ্বাসের বাণী—

মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
মুখে যা বলনি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি স্বর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

: মাঘ সংক্রান্তির রাতে

দেহকে ছাড়িয়ে এখানেই প্রথম মন, মুখের কথা ছড়িয়ে নারীর মনোভাবনা এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে নারীর জ্যোতির্ময় অস্তিত্বের উপাসনা দেখতে পাচ্ছি। স্বীকৃতি পাচ্ছি কবির কণ্ঠের—

তবুও তোমায় জেনেছি, নারি, ইতিহাসের শেষে এসে; মানব প্রতিভায়
রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে
মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

: তোমাকে

আকণ্ঠ বিষকেও অমৃতে রূপান্তরিত করার শক্তি প্রেমের মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু সে প্রেম সার্বজনীন বিশ্ব প্রেম নয়। সেই নীলকণ্ঠ প্রেম কেবল নারীকে অবলম্বন করেই জন্ম নেয় বেড়ে ওঠে।

জীবনানন্দের ক্লান্তপ্রাণ নাবিক 'বনলতা সেনে'র চোখ একদিন আশ্রয়ের শান্তিনীড় খুঁজে পেয়েছিল। দশ পনেরো বছর পরে এখন 'পটভূমি'র রণক্লান্ত অবসন্ন নাবিকেরা নিশিত নারী মুখের অন্তর্যামী দৃষ্টিতে বিষাদ ও ভৎর্সনা দেখতে পাচ্ছে। কেননা সময় কোথাও নিবারিত হয় না, একদিন প্রত্যূষে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম, আপতিক কাল আজ আমাদের যুবাদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে, ধর্মালোকের পথে নয়—পাপের পথে, লুণ্ঠনের পথে, নিস্প্রেম অন্ধকারের অভিমুখে আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু সময় নারীকে কলুষিত করতে পারেনি। নারীই এখনো এই অন্ধ জগতে অতীতের সূর্যবলয়ের নিদর্শন। অথচ কবির অভিজ্ঞতা হচ্ছে একালের মানুষ—

"কোথায় শিবিরে গিয়ে পৌঁছলাম আমি।
সেখানে মাতাল সেনানায়কেরা
মদকে নারীর মত ব্যবহার করছে,
নারীকে জলের মতো;
... ...

সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, নারি,
অবাক হলাম না।
হতবাক হবার কী আছে ?
তুমি যে মর্ত্যনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল
স্বর্গীয় শিখার মতো ;
সকল সময় স্থান অনুভবলোক অধিকার ক'রে সে তো থাকবে
এইখানেই,
আজ আমাদের এই কঠিন পৃথিবীতে।”

: সময়ের তীরে

তাই নারীকে আজ আর মিনারে, জানালার নানা বর্ণীল কাচের দিগন্তে দেখা যায় না। বনচ্ছবির ভিতরেও সে নেই, নিঃসঙ্কোচ রৌদ্রে, বা ঝর্ণার জলে নগরীর সমুৎসুকতায় তাকে পাওয়া যাবে না। তাকে আমরা দেখতে চাই আমেরিকার কংগ্রেসে, ভারতের পারলামেণ্টে, ক্রেমলিনে শান্তি-শক্তি-শুভ্রতার সপক্ষে ; কোনো রাষ্ট্র কি নেই আজ আর, অথবা কোনো নগরী যা সৃষ্টির মরালীকে মধু বাতাসে নক্ষত্রলোক থেকে সূর্যলোকান্তরে বহন করে নিতে পারে ? কবি তাই নারীকে দেখতে পেয়েছেন সময়ের জলন্ত তিমিরের মধ্যে, শুনেছেন শ্বেতপক্ষিসূর্যের ডানার উড্ডীন কলরোল ; আগুনের মহান পরিধি গান করে উঠছে।

শেষপর্ব

কবি-জীবনের শেষ-পর্বে জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় ছান্দিক বৈচিত্র্য এসেছিল। তাঁর সেই অতিপরিচিত আপ্লুত ঢঙের ধীরবিলম্বিত অক্ষর-মাত্রিক বা গদ্য-ছন্দ নয়, নূতন এক প্রাণ-স্পন্দিত ছন্দ এলো, পংক্তি-বিন্যাসে কারুকার্য এলো, এক সজাগ শিল্পীমনের স্পর্শে নূতন হয়ে উঠলো কবিতা ; ছন্দে সঙ্গীতে যেন ‘ঝরাপালকে’র সেই হারানো দিনগুলি আবার ফিরে এলো। আর সবাই জানেন, কবিতার নূতন আঙ্গিক কখনো শুধু তার বেশ-বৈচিত্র্য বর্ধনে নিঃশেষিত হয় না, বরং তা কবির বাণীতে নূতন অর্থ-সঙ্কেতেরই দ্যোতনা করে। জীবনানন্দের কবিতার এই ছান্দিক বিবর্তন, আশ্চর্য, শুধু প্রেমের কবিতা ছাড়া আর কোনও বিষয়েই এতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এই পর্বের কবিতার এই রূপকর্মগত বিশ্লেষণ আলোচ্য প্রসঙ্গে অবান্তর হওয়ায় সে কথা বাদ দিয়ে শুধু তার ভাব-মূল্যগত দিকটুকুই যদিও আমরা পর্যালোচনা করছি, তবু তাতেও একটা মস্ত অসুবিধা রয়ে গেছে। তাঁর এই পর্বের কবিতাগুলি এখনও

নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে, এর সামান্য কিছু একত্র সংগ্রথিত ক'রে শ্রীযুক্ত গোপাল রায় 'সুদর্শনা' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন সম্প্রতি। যাইহোক যা পাওয়া গেছে তার উপর নির্ভর ক'রে আমরা যে সিদ্ধান্তে আসবো তাকে উপযুক্ত দৃষ্টান্তে-প্রমাণে নির্ভুল ক'রে তোলার উপায় নেই। তবু আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ ক'রে তুলতে সাবধানে এগোবার ঝুঁকি নিতে হবে।

ভাল কবির কাব্যে নূতন ছন্দ যদি নূতন ভাবনারই দ্যোতক হয় এবং জীবনানন্দের শেষ জীবনের সব কবিতার মধ্যে প্রেমের কবিতাতেই যদি নূতন আঙ্গিক সবচেয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে, বুঝতে হবে, প্রেমের কবিতাতেই তিনি এক নূতন ভাব-ক্ষেত্র অধিকারে নিযুক্ত ছিলেন। এই নূতন ভাবনাটির প্রকৃতি নির্ণয়ই আমাদের লক্ষ্য।

'লোকেন বোসের জার্নাল' কবিতাটিকে এই জন্যেই জীবনানন্দের প্রেমের কবিতার একটি 'মাইল-ষ্টোন' হিসাবে নিতে হবে ; শুধু ছন্দের বিচিত্রতা আছে ব'লে নয়—এর ভাবের মধ্যে কবিমানসের যে অন্তর্গূঢ় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার জন্যেই। 'ঝরাপালকে'র আমলে তাঁর প্রেমের কবিতার বিচিত্রতা ছিল রঙে, রসে, ছন্দে, ভাবে, কল্পনায়। কল্পনার উচ্ছলতা ছিল মাত্রাতীত সেখানে। যেন নানান রঙচঙে মাটির পুতুল ছিল সব—বিচিত্র আকার-আয়তন-বেশ-বাস। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-রঙ ছুটের কাল। বিচিত্রতা ঝরে গেছে। কবি এখন ভাবে গভীর, আবেগে বিশুদ্ধ। পুতুল ছেড়ে প্রতিমা রচনায় মন দিয়েছেন তিনি। রঙ নেই, কিন্তু একরঙা মেটে সাজেই শ্রী এসেছে, সুষমাও। 'মহাপৃথিবী'-'বনলতা সেন' একই পর্বকাল ধরতে হবে। এখনও এক রঙ—সে রঙ মাটির নয়, খড়ি-মাটির। শুভ্রতার প্রলেপ পড়েছে শুধু। মুখশ্রী অঙ্গরাগ আরো মার্জিত, আরো নিটোল। শেষ পর্বে আবার রঙ এসেছে, বিচিত্র ছন্দ, বিচিত্র রস—কিন্তু 'ঝরাপালকে'র পুতুলের মতো অতো চটকদার অতো চোখ ধাঁধানো স্থূল বর্ণলেপ নয়। রঙে, রেখায় সূক্ষ্ম কারিগরি, আলতো তুলির টানে নাক-মুখ-চোখ এঁকে তোলার নিপুণ দক্ষতা। তবু লাল-নীল-হলুদ-সবুজ রঙের ছড়াছড়ি নেই আগের মতো—স্মিত শ্রীর জন্যে যে রঙ যেটুকু দরকার, সেটুকুই।

বস্তুত, 'ঝরাপালকে'র কবিতার সঙ্গে এই পর্বের কবিতার মিল আছে—বর্ণের, ছন্দের মিল ; মাঝে ওই পুতুল আর প্রতিমার সমুদ্র প্রভেদ।

এল আমার ছায়া-প্রিয়া
কিশোর বেলার সই গো।
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে ;

মনের মধু,—মনোরমা,—

কই গো সে মোর,—কই গো !

কিশোর বেলার সই গো !

: ছায়াপ্রিয়া

এমন নিপুণ নিটোল মিষ্টি ছন্দ এই পর্বে এসেও পাওয়া যাবে না। তবু যা পাওয়া যাবে তা—

পুরোনো চিঠির ফাইল কিছু আছে :

সুজাতা লিখেছে আমার কাছে,

বারো তেরো কুড়ি বছর আগের সে-সব কথা ;

ফাইল নাড়া কি মিহি কেরাণীর কাজ ;

নাড়ব না আমি,

নেড়ে কার কি সে লাভ ;

মনে হয় যেন অমিতা সেনের সাথে সুবলের ভাব,

সুবলেরই শুধু ? অবশ্য আমি তাকে

মানে এই—এই অমিতা বলছি যাকে—

কিন্তু কথাটা থাক ;

কিন্তু তবুও—

আজকে হৃদয় পথিক নয় তো আর,

নারী যদি মৃগতৃষ্ণার মতো—তবে

এখন কি ক'রে মন কারাভান হবে ?

প্রৌঢ় হৃদয়, তুমি

সেই সব মৃগতৃষ্ণিকা তালে ঈষৎ সিমুমে

হয়তো কখনো বৈতাল মরুভূমি,

হৃদয়, হৃদয় তুমি !

তারপর তুমি নিজের ভিতরে ফিরে এসে তবু চুপে

মরীচিকা জয় করেছো বিনয়ী যে ভীষণ নাম রূপে

সেখানে বালির সৎ নীরবতা ধূ ধূ

প্রেম নয় তবু প্রেমেরই মতন শুধু।

: লোকেন বোসের জার্নাল

কর্কশ পাথরে তীক্ষ্ণ-মুখ ভাস্কর্য যেন। 'ঝরাপালকে'র কবিতাটিতে ছন্দের চতুর-চটুল জলতরঙ্গ ধ্বনি ছিল, চিত্রল সৌন্দর্য ছিল, ভাবের দিকে ছিল বিরাট শূন্যতা। এখানে আধুনিক প্রেমিক চিত্তের নিষ্ঠাহীন প্রেমকলাবিলাসের ছলনারঅন্তস্থলে হৃদয়ের চাপাপড়া হাহাকার যে নিস্তব্ধ ধ্যানময়তায় সমাহিত হয়েছে, তার ব্যঞ্জনা সাহিত্যে দুর্লভ। প্রতিমায় যেমন বর্ণ লক্ষ্য নয়, মূর্তি লক্ষ্য নয়, প্রতিমার অন্তরালে যে প্রত্যয় রূপায়িত হয় তাই লক্ষ্য, সত্যিই যিনি শিল্পী, তিনি প্রতিমার রঙ-রেখাকে প্রকট ক'রে তোলেন না, মূর্তিকে প্রমূর্ত করেন না—লক্ষ্য রাখেন অন্তরের প্রত্যয়টাকে আড়াল ক'রে এরা যেন সামনে এসে না দাঁড়ায়, তেমনি এখানেও ছন্দ-গৌরবে দৃষ্টি নয়, চিত্ররূপে মোহ নয়,—এর অন্তরস্থিত ভাব-বস্তুর গাম্ভীর্যেই আমাদের পরম বিস্ময়।

এবং শিল্পের মধ্যে ঐ প্রত্যয়ই শেষ কথা। জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে এসে জীবনানন্দ এই প্রত্যয়টুকুই অঙ্গীকার করেছিলেন। এই প্রত্যয়কেই আমরা এর পর বোধি বলে উল্লেখ করবো। জীবনানন্দের কবিতায় এই বোধির আবির্ভাব এবং তার স্থান ও রূপ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। আপাতত শুধু এইটুকু জেনে রাখলে চলবে যে, আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খণ্ডিত উপলব্ধিগুলি পেরিয়ে যেখানে সমগ্র ব্যক্তি সত্তার নিশ্চিত উপস্থিতিতে একীভূত হয় এবং পরে সেই স্বানুভূত প্রত্যয়ের আরোপে অনুরূপ বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলি এক নূতন অখণ্ড তাৎপর্যে অন্বিত হয়ে ওঠে, সেখানেই বোধির সক্রিয় অস্তিত্ব রয়েছে। আরও সহজ ক'রে বলতে গেলে, সামাজিক মানুষের হৃদয়ের অনুভূতি গভীরতম বিশ্বাস যে কেন্দ্রে সমন্বিত হয়ে চেতনায় রূপ পায় তাকেই বোধি বলে।

প্রেমের কবিতার মধ্যে এই কবিতাটিতেই প্রথম বোধির আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেল। ক্ষণস্থায়ী হাল্‌কা নাগর-প্রেমের বর্ণনার মধ্যেও নামরূপের নিঃসঙ্গ অনুধ্যানে প্রেমের অতীত যে এক ভীষণ শুদ্ধতার জগতে কবি আমাদের উপনীত ক'রে দিলেন তা ধ্যানেরই জগৎ—নিত্যকার অভিজ্ঞতার জগৎ নয়।

প্রেম-সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আমরা কবির যে আত্মনিষ্ঠ চেতনার পরিচয় পেয়ে এসেছি এ কবিতাটি যেন তার স্পষ্ট ব্যতিক্রম। এখানে পাত্রপাত্রীদের সামনে রেখে কবি প্রেক্ষা-পটের অন্তরালে সরে দাঁড়িয়েছেন—নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে তাদের সমাচ্ছন্ন করেন নি। প্রেম সম্পর্কে স্বাভাবিক বিহ্বলতা ও ভাবাবেগের বদলে একটা সরস ব্যঙ্গদিগ্ধ ভঙ্গি যে মাঝে মাঝে ফুটে উঠছে, তাও কবির নির্লিপ্তির সাক্ষ্য দেবে। কবিতাটির আবেগ যেখানে সবচেয়ে গভীর, সেখানেও বৈজ্ঞানিক বস্তুমুখিতা অস্তিত্ব হারায় নি।

হেমন্তে ঘাসে নীল ফুল ফোটে—
হৃদয় কেন যে কাঁপে,

'ভালোবাসতাম'—স্মৃতি—অঙ্গার—পাপে
তর্কিত কেন রয়েছে বর্তমান।
সে-ও কি আমায়—সুজাতা আমায় ভালোবেসে ফেলেছিলো?
আজো ভালোবাসে না কি?
ইলেকট্রনেরা নিজ দোষগুণে বলয়িত হ'য়ে রবে;
কোনো অন্তিম ক্ষালিত আকাশে এর উত্তর হবে?

: লোকেন বোসের জার্নাল

নইলে এই স্মৃতি-অঙ্গার-পাপ-বোধ এই অতীতের প্রেম আর বর্তমানের আত্মদংশন ও জ্বালা—সব কিছুকেই বস্তুজগতের একটি নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধবার প্রয়াস কেন? প্রেমের সেই একচ্ছত্র ভাবাকুলতার দিন আর নেই, বরং সৌর বিশ্বের আদিম নিয়মতন্ত্রের (system) মধ্যে তাকে সংস্থিত ক'রে তিনি যেন বিহ্বলতা থেকে মুক্তি চাইছেন; প্রাচীন ভক্তেরা যেমন ঈশ্বরের শুভঙ্করত্বে আস্থা রেখে দুর্বহ বাধা-বেদনা এড়াতে পারতো। তবু কবিতাটির শেষ পংক্তিতে এসে তিনি আবার বলছেন—

সময়ের এই স্থির একদিক,
তবু স্থিরতর নয়;
প্রতিটি দিনের নতুন জীবাণু আবার স্থাপিত হয়।

: ঐ

এ শুধু তাঁর বৈজ্ঞানিক ভাবনার অঙ্গীকার নয়, অস্থির চিত্তেরই পুনঃপ্রকাশ। তবু এমনভাবে কোনো প্রেমের কবিতা সমাপ্ত হতে পারে, ভাবতেও বিস্ময়। ইউরোপীয় ভাষায় হয়তো মিলবে—কিন্তু তাদের কাব্য-ঐতিহ্য ও সংস্কারে এবং আমাদের সংস্কারে যুগান্তরের ব্যবধান।

এই আপাত আত্মপ্রক্ষেপহীন পাত্রপাত্রী-সমন্বিত লৌকিক প্রেমের বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপন-রীতি দেখে মনে হতে পারে—ইতঃপূর্বে তাঁর প্রেমের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যত কিছু আলোচনা করা হয়েছে, সব—ভুল যদি নাও হয়—একদেশদর্শী। প্রেম সম্পর্কে তিনি পুরাপুরি আত্মনিষ্ঠ হলে অথবা ঝরাপালকের যুগের বস্তুনিষ্ঠা তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র না হলে তিনি 'লোকেন বোসের জার্নালে'র মতো কবিতা কি ভাবে লিখতে পারলেন? কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে এবং আলোচ্য কবিতাটি একটু তলিয়ে দেখলে স্পষ্টই প্রতীত হবে আমাদের প্রতিটি উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। পাত্রপাত্রীর কয়েকটি নাম সামনে তুলে ধরলেও এবং নির্লিপ্তির অন্তরালে আত্মগোপন করতে চাইলেও অতীত প্রেমের স্মৃতি এবং জীবন্ত দ্বন্দ্ব-মুখর প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষত প্রেমিকচিত্তের আত্মানুবীক্ষাই এর মূল কথাবস্তু। তখন আর সেই প্রেমিকটিকে কবির

আত্ম-প্রতিকৃতি বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। আর সেই জন্যেই এই একটি কবিতা ছাড়া এই পর্বে আর কোনো কবিতায় লৌকিক প্রেমের চিত্র মেলে না—অন্ততঃ আমাদের হাতের কাছে নেই।

বরং অন্য একটি কবিতায় জীবনের পরিণত অধ্যায়ে এসে, রক্তের মধ্যে বয়সের শৈত্য অনুভব ক'রেও এই চির-হেমন্তের কবি হৃদয়ে এক নূতন বসন্তের আবির্ভাবের বিস্ময় ব্যক্ত করেছেন।

আলো যেন কমিতেছে—বিস্ময় যেতেছে নিভে আরো
আকাশ তেমন নীল? আকাশ তেমন নীল নয়,
মেয়ে মানুষের চোখে নেই যেন তেমন বিস্ময়,
মাছরাঙা শিশুদের পাখি আজ; শিশুরাও কারো
রেশমি চুলের শিশু নয় আজ; ভাবিতে কি পার
প্রেমে সেই রক্ত আছে? আঘাতে রয়েছে সেই ভয়?
কুয়াশায় সেই শীত? কে সাজায় কে করে সঞ্চয়
আজ আর! জীবন তবুও যেন হয়েছে প্রগাঢ়!

নতুন সৌন্দর্য এক দেখিয়াছি—সকল অতীত
ঝেড়ে ফেলে—নতুন বসন্ত এক এসেছে জীবনে;
শালিখেরা কাঁপিতেছে মাঠে মাঠে—সেইখানে শীত,
শীত শুধু—তবুও আমার বুকে হৃদয়ের বনে
কখন অঘ্রাণ রাত শেষ হ'ল—পৌষ গেল চ'লে
যাহারে পাইনি রোমে বেবিলনে, সে এসেছে ব'লে।

: সে

বাইরের শীতকে অগ্রাহ্য করে সৌন্দর্যের, বসন্তের প্রগাঢ় অনুভব যার আবির্ভাবের ফল, সে প্রেম ছাড়া অন্য কিছু কি? যোগমগ্ন মহাদেবকে ঘিরে হিমালয়ের তুহিন শুদ্ধতা মদনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন উচ্ছল প্রাণোন্মাদনায় মুখর হয়ে উঠেছিল তেমনি অকাল-বসন্তের হাওয়া লেগে কবির মনোভূমিও নূতন স্পন্দনে জেগে উঠেছে না কি?

এসব কবিতায় ভাবনার বিশিষ্টতা শুধু নয়, শব্দ প্রয়োগের প্রতীকী ব্যঞ্জনাও আশ্চর্য শিল্প-সিদ্ধি লাভ করেছে।

আরো পরের পর্যায়ে বোধ হয় স্পষ্টতারই সাধনা করেছেন কবি। ছন্দের মাধুর্য ও ভাষার প্রসাদগুণ এসব কবিতার আকর্ষণ বাড়িয়েছে। ভালবাসায় যে চিরন্তন

কৈশোর সারল্য মিশে থাকে তার স্বাদ পাওয়া যায় এই কবিতাগুলিতে। সহজ কথা সহজে বলা যায় না, এটাই দুর্লভতম গুণ, কবির মহত্তম সিদ্ধি, এগুলি পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত আবার মনে করতে হবে।

'বনলতা সেন' কবিতার অনুষঙ্গে যেমন 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় এসে জীবনানন্দ 'পটভূমির' কবিতাটি লিখেছিলেন ঠিক তেমনই 'দুজন' কবিতার অনুষঙ্গে পরে লিখেছিলেন 'নদী নক্ষত্র মানুষ'। এখানেও প্রকৃতির সমুদার প্রান্তরে পাতাঝরার হলুদ পটভূমিতে নারী ও পুরুষের বিগত প্রেমের স্মৃতিচারণা। অনুস্মৃতিতে মনে পড়বে ব্রাউনিং-এর 'লাষ্ট রাইড্ টুগেদার' কবিতাটি। কিন্তু এ কবিতা দুটির স্বাদ আর চরিত্র ভিন্ন। এখানের প্রেমিক প্রেমিকা বিচ্ছেদের চরম সত্যকে স্বীকার করে নিতে ব্যথা পায়। হারানো প্রেমের নূতন কোনো সার্থকতা খোঁজে। বিশ্বাস করে :

> সে বল্লে—'শেষ সত্য নদী নয়—মন—'
>
> আমি তাকে : 'হয়তো নতুন কোনো রূপে
> আমাদের ভালবাসা পথকেটে নেবে এই পৃথিবীতে ;—
> ... ...
> একদিন তুমি এসে তবু এই হলুদ আঁচল রেখে ঘাসের ভিতরে
> শান্তি পাবে ; সন্ধ্যার জলের দিকে শূন্য চোখে রবে নাক' তাকিয়ে এমন,
> অস্পষ্ট সংকটে এসে—মুখে কথা ফুরাবে না—এখন যা গভীর গোপন
> প্রাণের চারণা পাবে অন্ধকারে ; ব্যাপ্তি পাবে ; যেই সব কথা
> ভুলে গেছ—যে নিয়ম অনুভূতি সহজ স্পষ্টতা
> হারিয়েছে—নতুন জীবন পাবে তারা সব ;'

: নদী নক্ষত্র মানুষ

নদী যেমন আপন গতির প্রবাহ থেকে বিচ্যুত না হয়েও জীবনের কল্যাণে আত্ম নিয়োজিত ঠিক তেমনই নারীও আপন বাস্তবতা নিয়ে স্বভাব থেকে চ্যুত না হয়ে প্রেমের প্রয়োজন আত্মোৎসর্জন করতে চায়।

একটি কবিতায় কবি লিখেছেন—

> ভেবেছিলাম একথা স্থির মেনে নিতে পারি :
> নিউট্রন ও ইলেকট্রনের অন্ধ সাগরে
> ওদেরি জাদুবলে তুমি হয়েছ আজ নারী ;
> ওদেরি দয়ার ফলে আমি প্রেমিক তোমার তরে।

এ তবু ভুল হৃদয়ঙ্গম—মহাসৃষ্টির মানে
হয়তো ঠিক এমন ভাবে উৎসারিত নয়।
তা যদি হ'ত তবে যেদিন নিজেরি পরামর্শে সজ্ঞানে
আমাকে তুমি দিয়েছিলে অব্যর্থ হৃদয় ;—
সে স্বাদ হয়ে যেত কি আজ হেমন্তে আবার ক্ষয়।

: তোমাকে

জড় বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মে নিউট্রন-ইলেকট্রনের পরস্পর আপেক্ষতার মতো নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় কবির এই ভ্রান্ত ধারণা আজ নিরসন হয়েছে। মহাসৃষ্টিকে এত সহজে হয়তো ব্যাখ্যা করা যায় না। তা যদি হতো তবে কেউ নিজের বুদ্ধিতে সজ্ঞানে ভালবাসতো না অথবা সেই ভালবাসা কালক্রমে আর নষ্ট হয়ে যেত না।

আজও যেমন প্রকৃতির নিয়মে ফসল ফলছে, জলের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে নদীতে, কিন্তু সে ধারা রক্তের মিশ্রণে আবিল, আজকের নারী পুরুষ শূন্য থেকে শূন্যের অভিমুখে আঁধার থেকে অপরিসীম অন্ধকারের দিকে নিরুপায় অনিবার্যতায় ছুটে চলেছে, এর ভিতরে আরো এক গভীরতর নিরুপায়তা হলো প্রেম—এই বোধ মানুষ বা মানবতা ছাড়া কেউ জানে না। এই প্রেমের উৎস দুর্জ্ঞেয় নারী প্রকৃতি। আদি পৃথিবী থেকে আজ পর্যন্ত সব গ্লানি রক্ত বিহ্বলতার মধ্যেও নারীই এই প্রেম রহস্য বহন করে চলেছে, তার গালের অসীম সুন্দর তিলবিন্দুর মতো।

'তোমাকে ভালবেসে' আর 'তোমায় আমি' (তোমায় আমি দেখেছিলাম ব'লে) কবিতা দুটিকে একই কবিতার পাঠান্তর বলে মনে হয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী। সেই ক্ষণস্থায়ী জীবন আশ্রয় করেও প্রেম তার স্বচ্ছতায় গভীরতায় এবং সৌন্দর্যে অনন্তকাল স্থায়ী হতে পারে। পদ্মপাতার উপরের উজ্জ্বল চঞ্চল জলকণার মতো—কালের মহাসাগরের বুকে দুটি প্রাণকণার যে মিলন, তা স্থায়ী না হোক, তাতে সুন্দর পৃথিবীর সম্মতি আছে। 'তোমার আমার' কবিতায় প্রেমকে তিনি দেখেছেন শাদা-পাখির রূপে, সময় সেখানে কালো-পাখির মতো। তারা এক সাথে দেশে দেশে উড়ে চলেছে। এই—

সাদা পাখিই কালো পাখি কি না
চিনিনা আমি চিনিনা চিনিনা ;
কালো সাদার ধাঁধার ব্যথা সব
ফুরিয়ে গেছে তোমায় ভালবেসে।

: তোমার আমার

ভালবাসার যে নিবিড় সমাহিতির মধ্যে সব প্রেমচেতনা, কালচেতনা, প্রশ্ন, ব্যথা ডুবে যায় সেই প্রগাঢ়তার স্বাদ এই সব কবিতায়। এমনই একটি কবিতায় কালের কালো মহাসাগরের কাছে এসে ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাঁর মনে হয়েছে—

অনেক দূরের জলের আলোড়ন
যেন তোমার মন;
সেই নদীরই জল
যেন আমার মনের কোলাহল;
তোমায় খুঁজে পায় না, তবু
ঘুরছে আমরণ।

: **তোমাকে আমি দেখেছি ঘুরে ফিরে**

আবার অন্য একটি কবিতায় জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি হারিয়ে ফেলে তিনি অনুভব করেছেন—

একদিন এ-জীবন সত্য ছিল শিশিরের মতো স্বচ্ছতায়;
কোনো নীল নতুন সাগরে
ছিলাম— তুমিও ছিলে ঝিনুকের ঘরে
সেই জোড়া মুক্তো মিথ্যে বন্দরে বিকিয়ে গেল হায়।

: **রাত্রিদিন**

জীবনের সেই অমূল্য মুক্তোগুলি এইভাবে বিকিয়ে গেলেও ভালবেসে তিনি এই সান্ত্বনা সঞ্চয় করতে পেরেছেন যে সময় অনন্ত হলেও প্রেমের সার্থকতার জন্যে অনন্ত সময়ের প্রয়োজন নেই। যদি একটি মুহূর্তেও কেউ হৃদয় মেলে দিতে পারে তবে প্রেমের অমৃতস্পর্শে এই অকূল মৃত্যুর সমুদ্রে শ্যামল দ্বীপের মতো সে জেগে থাকবেই।

প্রকৃতি

প্রকৃতি

প্রকৃতিই সেই স্বচ্ছ সমতল মসৃণ দর্পণ যাতে কবি-স্বভাবের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি পড়ে। প্রকৃতির সংস্পর্শে ই শুধু জৈবিক আলোড়ন বিলোড়ন নেই, স্বার্থের রঙ লেগে হৃদয়ে রাগ-বিরাগের দাগ ধরে না। তবু প্রকৃতির কাছে এলে কবিদৃষ্টির যে বিপুল পার্থক্য দেখা যায় তার মূল স্বভাবের অন্তরতম প্রকোষ্ঠে। সমালোচকরা প্রকৃতির সান্নিধ্যে কবির অনুভাবনার যে অশেষ মূল্য দেন এই প্রজ্ঞানই তার মুখ্য হেতু।

বর্তমান প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গ অবতারণার ভিন্নতর সার্থকতা আছে। জীবনানন্দের প্রতিভা সেই জাতের, যা নাগরিক জীবনের আলোড়ন-উদ্দীপনা, সমস্যা ও সঙ্কটের ব্যাস্কূট ছাড়িয়েও প্রকৃতির অনাবিল সারল্যে সংলগ্ন হয়ে আছে। তাঁকে যখন প্রকৃতির কবি বলি, তখন একথাই মনে রাখি যে এই কবি-সত্তার প্রকৃতিতেই স্থিতি, প্রকৃতিতেই শান্তি, জীবনের আঘাতে আক্ষোভে আশ্রয় পেতে তিনি প্রকৃতিতেই বারবার ফিরে ফিরে আসেন। এখানেই সেই অক্ষয় শুশ্রূষা ও শক্তির উৎস যেখান থেকে তাঁর ক্লান্ত উৎসাহ নিত্যই নূতন প্রাণনে উৎসারিত হয়। জীবনের প্রতিকূল আহবে আহত সেনানী তিনি, তবু এই দুর্ভেদ্য বর্মের প্রসাদেই পরাভূত নন।

যেমন প্রেমের কবিতায় তেমনই প্রকৃতির কবিতায় কবির মনোধর্মের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের অনুভবনীয় ধারাবাহিকতা আছে। 'ঝরাপালকে' প্রধান ভূমিকা কবির ব্যক্তি-আমির। একটা মূঢ় কিশোর অহং প্রবল সেখানে। প্রকৃতি ক্বচিৎ কদাচিৎ সেই অহংয়েরই পটপ্রেক্ষিত হয়েছে মাত্র। অন্য স্বস্থ, স্বতন্ত্র মর্যাদা নেই তার। একটি দৃষ্টান্ত—

> আমি প্রজাপতি,—মিঠা মাঠে মাঠে সোঁদালে সর্ষে ক্ষেতে ;
> —রোদের শফরে খুঁজি নাক' ঘর
> বাধি নাক' বাসা,—কাঁপি থরথর
> অতসী ছুঁড়ির ঠোঁটের উপর
> শুঁড়ির গেলাসে মেতে !

: যে কামনা নিয়ে

প্রকৃতির এই যে রূপ, সাহিত্যের হাটে এর রস নোতুন নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোনো চিহ্ন নেই। 'ছায়া-প্রিয়া'র মত কবিতায় সেই সত্যদৃষ্টির পরিচয় ছিল। কিন্তু সেখানেও প্রকৃতির মহৎ সৌন্দর্য কোনো বিস্ময় বা সন্ধিৎসার জন্ম দেয়নি। প্রকৃতির

কবি মাত্রই যে অতন্দ্র সমীক্ষা ও সম্ভ্রমে প্রকৃতিকে নব নব রূপে পান সেই অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ হয়নি তখনো।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রথম প্রতিষ্ঠা প্রেমের। প্রকৃতি এসেছে তার পরিবেশ হয়ে। তবু তার মর্যাদা ও সার্থকতা এসেছে। অনেকখানি স্বয়ং সম্পূর্ণতাও। কবির ব্যক্তি-আমি আড়ালে যাওয়ার সঙ্গে অনুভূতির বিকাশ ও বিষয়ের বিস্তার সম্ভব হয়েছে। এখানে প্রেমে যেমন প্রবলতা, প্রকৃতিতেও তেমনি পূর্ণতা।

এখানেই তিনি প্রথম জেনেছেন নারীকে ভালবেসে ব্যথা। প্রকৃতিকে ভালবেসে ব্যথা নেই, শান্তি! নারীকে ভালবাসার স্মৃতিতেও ব্যথা। প্রকৃতির নির্মল শুশ্রূষায় তবু শেষে শান্তি আসে।

এই উপলব্ধি তাঁকে আরো গভীর অনুভাবনার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। জীবনের নগ্ন অভিজ্ঞতা পরিহার ক'রে আমরা রক্ত-ক্লেশ-রোমহর্ষের কাহিনী সঞ্চয় ক'রে পাণ্ডুলিপি গড়ছি। তার বোঝা টেনে চলেছি। মিউজিয়মের ছায়া বিবর্ণতা, চামড়া আর কাগজের বিষণ্ণতা নিয়েই আমাদের জগৎ। কিন্তু আমাদের জীবন এমন হবার কথা ছিল না। ফড়িং, পতঙ্গ বা পাখিদের জীবন যেমন কাটে সেই স্বাভাবিক জীবন মানুষের নেই কেন? কেন তারা চিন্তা কাজ সমারোহে মন শুদ্ধ ক'রে রাখে? পায়রারা যেমন ভোরের উজ্জ্বল বিশাল রোদে উড়ে গিয়ে আকাশ আরো নীল ক'রে দেয়—তাই কি জীবন নয়? নূতন নূতন আরো বেশি দামী জ্ঞান ও চিন্তার অন্বেষণে ক্লান্তি আসে। এই প্রত্যাশার কথা পায়রারা জানে না। শুধু নীল আকাশের রোদ বুকে নিয়ে তারা কি ব্যথা পায়!

এই সব কোলাহল সমারোহ রীতি রক্ত ক্লান্তি নিয়ে আসে। অনেক জানার মূঢ়তা, জীবনের মানে খোঁজার দায় থেকে মুক্তি নিয়ে তিনি প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়েছেন। শহরে চিন্তার ব্যথা,—তিনি চেয়েছেন শান্তির আকাশ। কথা কাজ প্রশ্ন শুধু ভুল করে, ব্যথা বয়ে আনে। প্রকৃতির নানা রূপ দেখা—এই নিয়ে ভাবা, ছবি আঁকা—প্রাকৃতিক মৃদু নরম উচ্ছ্বাসের ছবি—এর মাঝে শান্তি আছে। এই ধূলো-খড় গাড়ি-হাঁস জোৎস্না—এরা হৃদয়ের নীড় যেন, হৃদয় এরই শান্ত আশ্রয়ে চুপ করে শুধু রঙ, ঘ্রাণ, শান্তি, নিঃশব্দতা আবিষ্কার করে। এই সব সঞ্চয়ের মধ্যেই জীবনের সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়—এরই ফলে জীবন আরো নিবিড়তর রস রূপ হয়ে ওঠে। প্রকৃতিচিত্রের এই নিবিড় আনন্দরস তাঁর চেতনায় মদির হয়ে এসেছে এই পর্বে:

> দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
> হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
> ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,

চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু' বেলা
নির্জন মাছের চোখে,—পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে ;

: মৃত্যুর আগে

মৃত্যুর আগেই কেবল বিচ্ছেদাতুর মানুষের চেতনায় পৃথিবীর সব রূপ এমন কোমল সুন্দর মধুময় হয়ে ওঠে, এত খুঁটিনাটি ছবি, এত শুভ্র রঙ ইন্দ্রিয়ানুভূতির এত সূক্ষ্ম কল্পনাতীত কারুকার্য ধরা পড়ে তখন। 'চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান।' এই রূপ রস এই ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার কি ক'রে জীবনানন্দের কাছে অবারিত হলো—কিভাবে পাঠকের কাছে দু'হাতে বিতরণ ক'রেও সে ঐশ্বর্য ফুরালো না সে প্রশ্ন এখন থাক। তাঁর কবি-দৃষ্টি ও সৃষ্টির সেই রহস্য পরে উদ্ঘাটন করা হবে। এই সম্পদের স্বীকৃতি এলো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনা প্রতিষ্ঠিত হলো।

প্রকৃতি সম্পর্কে এই অনুভব 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র শেষ সীমায় যখন এলো তখন এর পরিণাম হিসাবেই 'রূপসী বাংলা'র সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে উঠলো। 'রূপসী বাংলা'য় প্রকৃতি শুধু প্রধান নয়, একমাত্র নায়ক। এখানে কোনো বিশিষ্ট ভাবের (idea) মধ্যে দিয়ে নিসর্গকে চেনার চেষ্টা নেই ; বরং কবিমানসের সম্পূর্ণ আত্ম অবলোপের সাধনা রয়েছে। তাঁর সমগ্র সত্তা গ্রাস ক'রে প্রকৃতি সর্বৈব হয়ে আছে। অনেকে জীবনানন্দের প্রকৃতি-মুখিতার এই পরিণতি পলায়নী মনোপ্রসূত বলবেন। এ কিন্তু আদৌ পলায়ন নয়। বাংলা দেশে দুটি পৃথক জীবনধারা বয়ে চলেছে, একটি গ্রাম-বাংলার আবহমানের প্রবল ধারা ; আর একটি নাগরিক কুলিশ-কুটিল সংকীর্ণ সাম্প্রতিক ধারা। জীবনানন্দ যদি এই নাগরিক জীবন পরিহার ক'রে সেই সার্বিক জীবন অঙ্গীকার ক'রে থাকেন, তাহলে তিনি বৃহত্তর সমাজ চেতনাকেই বরণ করেছেন।

প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর এই মনোভাব অবলম্বনের পিছনেও দুটি দিক ছিল আমরা তা আগেই চুম্বকে বিবৃত করেছি। একদিকে তিনি নগর থেকে ক্লান্ত হয়ে নিসর্গের দিকে গিয়েছেন, কারণ প্রকৃতিই নাগরিক মানুষের আত্মশোধনের বিষ-চুম্বক। অন্যদিকে সভ্যতার আকর্ষণ ভুলে প্রকৃতির অমেয় রূপ ও আকর্ষণে তন্ময় হয়েছেন। শহরের দিক থেকে প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজন, আর হৃদয়ের দিক থেকে প্রকৃতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ। আর তারই ফল নগরের প্রতি তাঁর স্পষ্ট অনীহা।

অথচ 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলিতে এক বিষণ্ণতা জড়িয়ে আছে—সেটি বোধহয় এদেশের মাটির সঙ্গে ওতপ্রোত। বাংলার গ্রামীণ সভ্যতার বর্তমান সংক্রান্তি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিবিড় নৈরাশ্য ও ভয় এই যন্ত্রণা-পাণ্ডুর ছায়া ফেলেছে। চিলের কান্নার মতো এক অস্ফুট বোবা কান্না নীল আকাশে রোদে জলে মাঠে ছড়িয়ে রয়েছে।

দেশ

জীবনানন্দের সমস্ত প্রকৃতি কবিতার মধ্যে এককভাবে 'রূপসী বাংলা'র একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। অন্যত্র প্রকৃতি কবিতায় যেমন দেশ-কাল-নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক রূপ 'রূপসী বাংলা' তেমন নয়। এতে বাংলার গ্রামীণ সভ্যতার পটদীপে যে উজ্জ্বল আলো জ্বলেছে, জীবনানন্দের সমস্ত কবিজীবনে তার আভা; তাই 'রূপসী বাংলা' যতদিন প্রকাশ হয়নি, তাঁর কবিস্বভাব অনুভব করেও আমরা পুরোপুরি সতর্ক ছিলাম না।

'রূপসী বাংলা'র এই বিশিষ্টতাই এই পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে। দেশকে, প্রকৃতিকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখেছেন সেই পরিচয় উদ্ঘাটিত হবে এখানে।

কবিতার বিষয় হিসাবে দেশপ্রেম যদিও এদেশে ইংরাজি সাহিত্য-সংস্পর্শের ফল, তবু এর ঐতিহ্য দুর্বল নয় অথবা কবিতাও অপ্রচুর নয় বাংলা সাহিত্যে। এই সব দেশাত্মবোধক কবিতায় সুস্পষ্ট রাজনৈতিক জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রয়োজন ও সঙ্কটের ছবিই অত্যন্ত স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ। বাঙালী দেশপ্রেমিক কবিদের সততা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হয়—ভালবাসা হৃদয়বৃত্তি বলেই তার অন্তরের অমেয় অতলতা সমস্ত জ্ঞান বিশ্বাস প্রয়োজন ও সঙ্কটের অতীত। প্রতিটি স্বদেশী কবির মনোভঙ্গির বিশ্লেষণের অবকাশ নেই; কিন্তু চিন্তার কি সমসূত্রে তাঁদের মন গাঁথা নীচের গান বা পংক্তিগুলি স্মরণে আনলে নজরে পড়বে—

১। নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশীয় ভাষা
পুরে কি আশা?

: রামনিধি গুপ্ত

২। নানা রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৩। স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?

: রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!

: মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৫। বাজ্ বাজ্ শিঙ্গা, বাজ্ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!

: হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।

: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৭। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মধ্যে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৮। ও আমার দেশের মাটি'
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।

: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯। মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা—

: অতুলপ্রসাদ সেন

এই সব মহৎ চারণের কাছে বাংলার রূপ ছিল অখণ্ড। কারণ তখনো পল্লী ও শহরের বিচ্ছেদ এমন আত্যন্তিক হয়ে ওঠে নি। তাই দেশের বন্দনা গানে তাঁদের গলার স্বর গম্ গম্ করে বেজেছে। দেশকে ভালবাসার নিবিড় আত্মপ্রসাদের ব্যঞ্জনা তাঁদের সুরে গমকে। আমরা দেখেছি জীবনানন্দ দেশকে এমন অখণ্ড আকারে পাননি। গ্রাম ও নগরের বিচ্ছেদ তাঁকে বিষণ্ন করেছে। ইয়েটসের আইরিশ লোকগীতির অনুরক্তির পিছনে দেশের সংস্কৃতিবান মানুষের আন্তরিক সমর্থন ছিল। কিন্তু পল্লী-বাংলাকে ভালবেসে রসিক সমাজে তাঁর লজ্জা, গৌরব নেই কিছু। মায়ের

ভালবাসায় যেমন আত্মপ্রসাদহীন নিবিড়তার স্বাদ—তাই এখানে। অন্য কবিদের মতো উচ্ছ্বসিত উচ্চারণ পাওয়া যায় না।

বাংলার তীরে এসে প্রকৃতির কি রূপ দেখলেন তিনি? এই কিশোরী শ্যামলীর মুখের কোন মায়া তাঁকে মুগ্ধ করলো? তিনি দেখেছেন বাংলার রূপের অবিনাশী আবহমানতা। সভ্যতার অভ্যুদয় ও বিলয় আছে, কিন্তু প্রকৃতি তার সোনার স্বপ্নের সাধ নিয়ে পুরাণো গল্পগুলো নিয়ে বেঁচে থাকবে। বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে মনে হয়, যেন মানুষ প্রাণী সকলেই এই সজীব প্রকৃতির বুক থেকে জন্মেছে, এখানে নীরবে কাজ সেরে কুয়াশার নিরুদ্দেশে হারিয়ে যাবে ব'লে। তবু তারা হারায় না। কারণ, বাংলার তীরে কিছুরই নিঃশেষ অবসান নেই। বাংলার এই মুখ যে দেখেছে পৃথিবীর রূপ সে খুঁজতে যায় না। পৃথিবীর পরিবর্তমান রূপে কোনো স্থির সত্য নেই। কিন্তু চাঁদ সদাগর শ্রীমন্তের বাংলার রূপের কোনো আত্যন্তিক বিকৃতি হয় নি।

বাংলার এই গাঢ় বিষণ্ণ রূপ তিনি ভাল বেসেছেন বলেই তাঁর মনে এক আশঙ্কার ব্যথা ছড়িয়ে আছে। সেই অতীতের শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মাণিকমালার বাংলার আশ্চর্য রূপ মানুষের অবহেলায় অত্যাচারে নষ্ট হতে চলেছে। যেখানে তাদের কাঁকন বাজতো সেই ভাঙ্গা ঘাটলায় এক একটি ইট ধ্বসে ডুব জলে ডুব দিয়ে হারিয়ে যায়। আজ কেউ বাসমতী চালধোয়া ভিজে হাতে বিনুনি খসায় না, কড়ি খেলার ঘর গোখুরের ফাটলে মিশে যায়। সেই সব রাঙা রাজকন্যারা আর কেউ ফিরে আসে না।

অনেক বছর আগে শৈশবে যেমন আমে জামে হৃষ্ট এক ঝাঁক দাঁড়কাক দিনরাত দেখা যেত সেই দাঁড়কাকও আর নেই। তবু পৃথিবীর কোথাও এমন বিজন শাদা সোঁদা পথ বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে শ্মশানের পারে চলে যেতে দেখা যাবে না। প্রান্তরে এমন বিজন সবুজ ঘাসও কোথাও নেই। লক্ষ লক্ষ ঘাস পাড়াগাঁর নরম কান্তারে অতীতের স্মৃতি নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। যখন কেশবতী কন্যার মতো নীল সন্ধ্যা আসে, সবার চোখের উপরে তার চুল ভাসে, অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে অবিরাম ঝরে, তখন রূপসীর চুলের বিন্যাসে এত গন্ধের আয়োজনে বিস্মিত হতে হয়। নরম ধানের গন্ধে, কলমীর ঘ্রাণে, হাঁসের পালকে, শরে, পুকুরের জলে, সরপুঁটিদের মৃদু ঘ্রাণে, কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাতখানিতে, কিশোরের পায়ে দলা মুথা ঘাসে, লাল বটফলের ব্যথিত গন্ধের মধ্যে বাংলার প্রাণ টের পাওয়া যায়।

এই ডাঙ্গা ছেড়ে রূপ খুঁজতে কেউ পৃথিবীর পথে ঘুরে বেড়ায় না। বটের শুকনো পাতায় এখানে যুগান্তরের গল্প ছড়ানো—এ সব উপেক্ষা করে কে ভিন্‌দেশে যাবে? কোন দেশে পাম গাছ সমুদ্রের গানে মাথা দোলায় অথবা কোথায় এলাচি ফুল দারুচিনি

বারুণীর প্রাণে বিনুনি খসিয়ে বসে থাকবার স্বপ্ন আনে, জেনে লাভ নেই। পৃথিবী কোথায় সফলতা শক্তির ভিতর ব্যস্ত রয়েছে, কোথায় আকাশের গায়ে রূঢ় মনুমেণ্ট জেগে উঠেছে, কোথায় মাস্তুল তুলে জাহাজেরা ভিড় জমিয়েছে—জানার কি দরকার! বাংলার পাড়াগাঁর রূপই আমাদের বিহ্বল করেছে।

যে কবি সাত-সমুদ্রের জলে স্নান করেন, ঘোড়া নিয়ে ধূম্র নারীদেশে অর্জুনের মতো যেতে পারেন, অথবা সুপর্ণের মতো আরো দূর ম্লান নীল রূপের কুয়াশা অনায়াসে ভেদ ক'রে যান, আমাদের কালীদহ গাঙুড়ের গাঙচিল তাঁর কাছেও ভালবাসা চায়। এই দহে, এই চূর্ণ মাঠে, এই জীর্ণ বটে বাসা বেঁধে তিনি নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দিন —এই দাবী করে। অথবা তাও ভুল। কীর্তি-নাশা কতজনের কীর্তি ভেঙেছে তবু পদ্মার রূপ একুশ রত্নের চেয়েও গাঢ়, আরো ঢের প্রাণ তার—বেগ তার—আরো ঢের জল—আরো জয়। সেই দুর্বার আকর্ষণই কবিকে নক্ষত্রের পাশা খেলার মতোই, অনুরাধা রোহিনীর ভালবাসার মতোই শঙ্খমালার ভালবাসা চাইতে ব্যগ্র করে, তাকে ভালবাসতে বাধ্য করে।

যে ইঙ্গিতে আকাশের নীলাভ নরম বুক থেকে হিমের ভিতর নক্ষত্র ঝরে পড়ে সেই ইঙ্গিতে কবি যখন বাংলার বুক ছেড়ে একদিন চলে যাবেন তখনও এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ তাঁর চোখে মুখে লেগে থাকবে। মনে কোনো ক্ষোভ নয় বরং সান্ত্বনা থাকবে এই কীর্তন ভাসান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর নরম নিবিড় ছন্দে তৃপ্তি পেয়েছেন —রূপহীন প্রবাসের পথে বাংলার মুখ ভুলে নষ্ট শুকের মতো কাল কাটাননি। বেহুলা লহনার মধুর জগতে বাঙালী নারীর চালধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধানমাখা চুল, কস্তাপাড় শাড়ির কাছে মন বিকিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে শ্মশানে বঁইচি শেয়াল-কাঁটা তাঁর দেহ ভালবেসে চিতার ছাইয়ে নিবিড় হবে; আরো অনেক পরে সেখানে বাসকের গন্ধে আনারস ফুলে মৌমাছির গুঞ্জরণ শোনা যাবে। তারপর একদিন—

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;

: আবার আসিব ফিরে

সেই দিন এই কিশোরীর সঙ্গে আবার কার ভালবাসা হবে কে জানে? মৃত্যুকে কে মনে রাখে? শুকতারা নিভে গেলেও আকাশ কাঁদে না। কীর্তিনাশা কীর্তি খুঁড়ে খুঁড়ে নতুন ডাঙার দিকে এগিয়ে যায়—পিছনের অবিরল মৃতচর ছাড়াও তার দিন কাটে।

'রূপসী বাংলা'র একটি কবিতায় এক রহস্যময় ইঙ্গিত মুখরতা আছে। পল্লী বাংলার সৌন্দর্যের মদির আকর্ষণের কথা বলতে গিয়ে তিনি যখন আকস্মিক ভাবে উল্লেখ করেন,

মাঠের আঁধার পথে শিশু কাঁদে—লালপেড়ে পুরোনো শাড়ির
ছবিটি মুছিয়া যায় ধীরে ধীরে—কে এসেছে আমার নিকট ?
'কার শিশু ? বল তুমি' : শুধালাম ; উত্তর দিল না কিছু বট ;
কেউ নাই কোনোদিকে—মাঠে পথে কুয়াশার ভিড় ;
তোমারে শুধাই কবি : 'তুমি ও কি জান কিছু এই শিশুটির' ।

: **তবু তাহা ভুল জানি**

তখন বিস্মিত হতে হয়। বাংলার প্রকৃতির বুকে সন্ধ্যার আঁধারে এই অজ্ঞাতকুল শিশুর আবির্ভাব—এর সাঙ্কেতিকতা অব্যর্থ মনে হয়, কিন্তু কবির মনোভাবের হদিশ মেলে না।

'রূপসী বাংলা'তে এ ছাড়াও যেটি লক্ষ্য করবার সেটি হলো এর সনেট রূপ। প্রকৃতির কবিতা লিখতে তিনি এই বিশিষ্ট আঙ্গিকটি বেছে নিয়েছেন—অনর্থক নেন নি। এই ধ্রুপদী প্রযুক্তিটি প্রকৃতি কবিতার একতান স্বল্পায়তন রূপময় ভাবনা গুচ্ছকে সংহত সুষমায় যেমন ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে অন্য আঙ্গিকে তা দুরূহ হতো।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে সনেট-ছন্দের যে গাঠনিক বৈশিষ্ট্য ছিল এখানে তিনি তাও বর্জন করেছেন। সেখানে সনেট চারটি ত্রিপদী (terza rima) আর একটি পয়ারের (couplet) সমাহার। সনেটের এই নূতন প্রকরণ কবির সতর্ক কলাকুশলতা ও বিষয় বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সেখানে সুন্দর খাপ খেয়েছিল। তবু এখানে সেই স্বাতন্ত্র্য বর্জন করে প্রকৃতির তন্ময় মূর্ছনায় আত্মলীন হয়ে গিয়েছেন বলে এই কাব্যেব গুরুত্ব ও রসরূপ উজ্জ্বল হয়েছে। প্রকৃতি কোনো কিছুরই প্রতিবাদ করে না, আঘাত করে না, বরং বৃক্ষের মতো অসীম ধৈর্যে সব আঘাত মেনে নিয়ে তার মধ্যেই নিজের প্রবল প্রাণ-সত্তা সঞ্চারিত করে দেয়। কোনো সুরের সঙ্গেই প্রকৃতির বিরোধ নেই—সব সুরের মধ্যেই সে অনায়াসে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আঙ্গিক যখন বিষয়ের সঙ্গে সমন্বিত হতে চায় না, আরো সার্থক অভিব্যক্তির জন্যে যখন তার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে, ভাবের সেই

অনমনীয়তা কবিতার সান্দ্রতার হানি ঘটায়। পাঠকের মন ভাব-গভীরতা থেকে ছন্দ চাতুর্যের দিকে সরে যায়। বিষয়ের উপযোগিতার বিচারে তাই পুরোনো আঙ্গিকের ব্যবহার এখানে অসামান্য সার্থকতা পেয়েছে।

তবু 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলিতে ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিকতা ছিল। তার বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিক্রিয়াতেই পরবর্তী কবিতাগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতি-মুগ্ধতা বিরল হয়ে এসেছে। কিন্তু ভাবনা বৈচিত্র্যে আর অনুভবের ঐশ্বর্যে এই কবিতাগুলি তুলনা হীন।

'মহাপৃথিবী'-'বনলতা সেন' পর্যায়ে প্রকৃতি আর প্রেম অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে। প্রেম যখন মানুষকে কাঁদায় প্রকৃতি তখন ব্যথার প্রলেপ, প্রেম যখন মানুষকে জাগায় প্রকৃতি তখন নিবিড় জীবন হয়ে থাকে। মানুষের হৃদয়-বৃত্তির সঙ্গে প্রকৃতি, প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয় ওতপ্রোত হয়ে মিশে যায়। প্রেম যখন আসে তখন—

সেই সব বাসনার দিনগুলো ; ঘাস রোদ শিশিরের কণা
তারাও জাগিয়ে গেছে আমাদের শরীরের ভিতরে কামনা
সেই দিন ;

: জার্নাল : ১৩৪৬

আবার অন্যদিকে—

চেয়ে দেখ ঘাসের শোভা কি
লাগেনি সুন্দর আরো একবার তোমার মুখের থেকে ফিরে
যখন দেখেছি ঘাস ঢেউ রোদ মিশে আছে তোমার শরীরে

: পৃথিবীতে থেকে

হৃদয়ের প্রেম-ব্যথা-স্মৃতি-আনন্দের অনুষঙ্গে তাই প্রকৃতির রূপ-রস-রঙ-রেখা নির্ণিত, নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কোথাও বা প্রেম আর প্রকৃতি প্রতীকী রূপারোপ করেছে পরস্পরের উপর ; যেমন ক্যাম্পে, শিকার, জনান্তিকে ইত্যাদি কবিতায়। এই সব বিচিত্র-স্বাদী কবিতার একটু আস্বাদ—

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি ;···
তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।

হয়তো গুলির শব্দ :
আমাদের তির্যক গতিস্রোত,
আমাদের পাখায় পিস্টনের উল্লাস,
আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ার গান!

: আমি যদি হতাম

প্রাণীর মধ্যে উদ্ভিদের মধ্যে জীবনের স্ফুটতর সার্থকতা অনুভবের লোভটা আবার নূতন করে জেগেছে। প্রকৃতির মধ্যে শরীরের আস্বাদ ও অনুভব বিস্ময়কর তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে কোনো কোনো ছোট কবিতায়।

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে,
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে;
যেই খানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে।

ফিরে এসো, একদিন নীল ডিম করেছে বুনন;
আজো তারা শিশিরে নীরব;
পাখির ঝর্ণা হয়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব।

: ফিরে এসো

মানুষ প্রকৃতির নীড়ে একদিন যে ডিম বুনে এসেছিল সেই নীড়ে ফিরে গিয়ে সেই সব শিশিরে শীতল ডিমগুলিতে প্রাণের উত্তাপ সঞ্চার করলেই একদিন ঝর্ণার কলধ্বনির মত অজস্র প্রাণের কলকাকলিতে জীবনের স্বাদ অনুভব করতে পারবে, শহরে নয়।

এমনিধারা মননের আরো বিচিত্র বিকাশ হয়েছে আরেকটি ছোট কবিতায় তার চিহ্ন—

আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

: কমলালেবু

মুমূর্ষু পরিচিতের বিছানায় কমলালেবুর করুণ হিম মাংস হয়ে আসবার আকাঙ্ক্ষা শারীরী আবেগেরই আরেক চমকপ্রদ পরিণাম।

ক্বচিৎ কোনো কবিতায় প্রকৃতির রূপ কল্পনার স্পর্শ লেগে আশ্চর্য সঙ্কেতবহ হয়ে উঠেছে। 'অবশেষে'র অরণ্য-প্রান্তরে এক জৈবশক্তির খেলা। দুপুরের সূর্যের আঁচ যখন সবুজ পাতার উপর নেমে আসে উঁচু উঁচু গাছগুলো তখন প্রশান্ত মনে খেলা করে। বিকেল এলে অতিকায় হরিণের মতো শান্ত হয়ে থাকে। ঝড়ের সঙ্কেতে হাওয়ায় বাঘের ঘ্রাণ পাওয়া চকিত হরিণের মতো স্তব্ধ দেখায় তাদের, তখনই সেই নিলীম বিন্যাস ত্রস্ততায় নড়ে ওঠে। মনে হয়, হরিণের মতোই দ্রুত ঠ্যাঙের তুরুকে একযোগে তারা পালিয়ে যেতে পারে; কিন্তু না পালিয়ে বাঘিনীর মতো সাহসে সেই ঝোড়ো বাতাসকে আলিঙ্গন করে।

দু-একটি কবিতায় অস্বাভাবিক নিসর্গ দৃশ্যও রয়েছে দেখা যায়। তার মধ্যে খুব সাধারণ একটি হলো রাত্রে পাখির ওড়ার বর্ণনা। যেমন :

> শাদা শাদাছিট কালো পায়রার ওড়াউড়ি জ্যোৎস্নায়—ছায়ায়,
> রাত্রি ;
> নক্ষত্র ও নক্ষত্রের
> অতীত নিস্তব্ধতা।

: আমাকে তুমি

এই দৃশ্য বার বার ফিরে এসেছে এই পর্যায়ের নানা কবিতায়। আবার কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত দৃশ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কবির কল্পনার বলিষ্ঠতার অগ্নি পরীক্ষা এইখানে। যেমন—

> নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,

: আমি যদি হতাম

অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেবার কথা নয় এটা। খইয়ের ক্ষেত যদি সম্ভব হতো জগতে তবে তার সোনালি ফুলের মতো প্রক্ষিপ্ত ও সংখ্যাতীত মনে হতো আকাশের অজস্র তারাকে। খইয়ের পূত শুভ্রতার অনুষঙ্গে আকাশের সোনালি তারার সৌন্দর্য নিষ্কলুষ পবিত্রতার স্পর্শ পেয়েছে এখানে।

যুদ্ধকালীন পর্বে তাঁর প্রকৃতি কবিতার পরিণতি অত্যন্ত অলক্ষিত। অন্তত নূতন কোনো দিকের ইঙ্গিত হাতে নেই। গ্রাম থেকে নগরে কবিতার পটপ্রেক্ষিত সরিয়ে আনার ফলে প্রকৃতি নেপথ্যে পড়ে গেছে। অপরপক্ষে তথ্যবহুলতা, মননআধিক্য আর বিবৃতিপ্রাধান্য চিত্রগুণকে আঘাত করেছে। কল্পনা ও অনুভবের ঐশ্বর্যে ক্রমিক ঘাটতি কবিতাগুলিকে বর্ণনাপঞ্জীর মতো নীরস, অসংলগ্ন ও প্রবন্ধ-সদৃশ করে তুলেছে। যে কোমল স্পর্শাতুর-চেতনা প্রকৃতি-কবির অমূল্য ঐশ্বর্য, সেই

সহজ স্বীকৃতির মন কোনো না কোনো কারণে তাঁর চরিত্র থেকে লোপ পেতে বসেছে। এই পর্বে অন্তজাতের কবিতায় তাঁর সিদ্ধি হয়েছে, কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটি কবিতা ছাড়া প্রকৃতি-চিত্রণে তাঁর আগের সাফল্যের পুনরাবৃত্তি হয়নি।

কিন্তু জীবনের ব্যাসকূট ছাড়িয়ে অন্তিম অধ্যায়ে এসে তিনি আবার প্রকৃতিকেই অঙ্গীকার করেছেন। তিনি জেনেছেন যদিও পৃথিবীভরা আলো আমাদের জীবনকে উদ্ভাসিত করছে তবু সুদূর ইতিহাসের থেকে যে সব গ্লানি জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল ঐতিহ্য সূত্রে তার ভার ক্রমেই দুর্বহ হয়ে উঠছে—

ঢেরদিন বেঁচে থেকে দেখেছি পৃথিবী ভরা আলো
তবুও গভীর গ্লানি ছিল কুরুবর্ষে, রোমে, ট্রয়ে,
উত্তরাধিকারে ইতিহাসের হৃদয়ে
বেশী পাপ ক্রমেই ঘনালো

: আলো-পৃথিবী

সভ্যতার এই ঐতিহ্যজাত গরল ভবিষ্যতের মানুষ ও মনীষীদের সমবেত সাধনায় হয়তো একদিন দূর হবে, কিন্তু তার আগে এই সভ্যতার কৃত্রিমতার গ্লানির বাইরে একটি অন্তহীন শুশ্রূষার স্থান তিনি চিনিয়ে দিয়েছেন। 'আছে' শীর্ষক কবিতায় কবি বলেছেন, পৃথিবীর পথে মানুষের কাজ বা ইচ্ছা বড় জোর একশো শরতের সঙ্গে জড়িত থাকে। অনন্তকাল ও ইতিহাসের বিবর্তনের দিকে সভ্যতার জন্মমৃত্যুর দিকে তাকালে বোঝা যায় মানুষের কামনা বেদনা কত অকিঞ্চিৎকর, প্রাপ্তি আর বিচ্ছেদ সাফল্য ও ব্যর্থতার তারতম্য তিলপরিমাণ। কিন্তু সনাতন অন্ধকারে ডুবে থেকে নরম ঘাসে শুয়ে উদার নক্ষত্রময় আকাশের দিকে তাকালে অনুভব করা যায় "কিন্তু এই চেয়ে থাকা, স্থিতি, রাত্রি শান্তি—অফুরান।"

নিচের এই শুদ্ধ মাটিতে অনেক জ্ঞানী বন্ধুর মৃত শরীর মিশে আছে—আমরাও মিশে যাবো—একথা বুঝেও নীল আকাশে চোখ রেখে পৃথিবীর মাধুরীর এই ঘাসে শুয়ে থাকাই বরং ঢের ভাল। তিনি বলেছেন আজকের নীলকণ্ঠ মানুষও যদি পরস্পরকে ভালোবেসে স্পষ্ট হতে পারে, যদি মাটির কোলে নেমে আসে, যেখানে—

আমাদের পৃথিবীর পাখলীও নীলডানা নদী
আমলকি জামরুল বাঁশ ঝাউয়ে সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন; হৃদয়কে সেখানে করেনা অবহেলা
বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন শক্তি;—শতকের ম্লান চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি
নরনারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে—

অশ্রু রক্ত নিষ্ফলতা মরণের খণ্ড খণ্ড গ্লানি
তাহলেও রবে, তবু আদি ব্যথা হবে কল্যাণী
জীবনের নব নব জলধারা উজ্জ্বল জগতে।

: আলো-পৃথিবী

মানুষের আদি ব্যথাই তো ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির বিচ্ছেদ, বুদ্ধি আর হৃদয়ের বিচ্ছেদ। আমরা আত্মকে সর্বস্ব জেনেছি, হৃদয়ের থেকে বুদ্ধির প্রাধান্য মেনেছি—তাই পৃথিবীর এই রক্তাক্ত রূপ। কিন্তু আজকের মানুষও যদি নাগরিক সভ্যতার এই আত্মঘাতী অভিশাপ থেকে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত সবুজের পথে এসে দাঁড়ায় তাহলে যদিও সেখানে মানুষের নিষ্ফলতা মৃত্যু ও হাহাকারের অবসান হবে না, তথাপি হৃদয়ের অনাবিল সাহচর্যে তারা আবার পরস্পরের বিচ্ছেদ বেদনা ভুলে উজ্জ্বলতর জগতের অভিমুখে অগ্রসর হতে পারবে।

কেননা মানুষের মূঢ়তায় যদিও এই প্রকৃতি আবিল, যদিও নিসর্গের কাছ থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে তবু নদী মানুষের মূঢ় রক্তে ভরে যায়—তবু মানুষের হৃদয়ের গ্লানি ক্ষয় কালিমা মুছিয়ে তাকে নিষ্পাপ পবিত্র করে তুলতে পারে সেই-ই।

প্রকৃতি আবিল কিছু, তবু মানুষের
প্রয়োজন-মতো তাতে নির্মলতা আছে।
আরো কিছু আছে তাতে; যেন মানুষের সব রকম প্রার্থনা
নিঃশব্দ শিশির কণা—সব মূল্য বিনাশের তীরে।

: এইখানে সূর্যের

বিনাশের তীর থেকে সব মূল্য মিটিয়ে নিতে গিয়েও—মানুষের প্রয়োজনের দাবীর বাইরে প্রকৃতির এই স্বতন্ত্র স্বচ্ছ মহিমা, এই 'আরো কিছু'র রূপ ও তাঁর নজর এড়ায় নি।

ঋতু

বাংলায় প্রকৃতির কবিতা লিখেছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ঋতুতে ঋতুতে তাকে প্রদক্ষিণ করলেন রবীন্দ্রনাথ—গানে কবিতায়। একই প্রকৃতি ঋতুর জাদু লেগে নব নব রূপে এলো প্রাণে, এলো গন্ধে বরণে গানে। হেমচন্দ্রের প্রকৃতির অচঞ্চল মৃত মুখশ্রী রূপ-রাগের বিচিত্র বিভায় চঞ্চল স্পন্দিত জীবন্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে।

হেমচন্দ্রের মতো প্রকৃতির অখণ্ড রূপ নয়, রবীন্দ্রনাথের মতো ঋতুর বিচিত্র বিন্যাস নয়—জীবনানন্দের প্রকৃতি-কবিতা আরো বিস্ময় নিয়ে এলো। ছয় ঋতুর সবচেয়ে অখ্যাত অবজ্ঞাত ঋতুটি—রবীন্দ্রনাথের প্রচুরবর্ষী দাক্ষিণ্য অপর্যাপ্ত ঝরেছে অপাত্রেও, কিন্তু পাতাঝরার ব্যথা ছাড়া আর কোনো গাঢ় অনুভবে বা কবির মনকে নাড়া দেয় নি—শিশিরের মতো বিরল-রূপ, শিশিরের মতো স্বল্পায়ু এই শিশিরের ঋতুই জীবনানন্দের মন কেড়ে নিল, আমৃত্যু এই ঋতুটির রূপ-রস-রঙ ছুঁয়ে-ছেনে তাঁর তৃপ্তি হলো না, ক্লান্তি এলো না। আমরা যারা বাংলাদেশে জন্মে প্রকৃতির নিবিড় ছোঁয়ায় বুক ভরেছি। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, বসন্তের আকাশ-পৃথিবী, শরতের জল-বাতাসের বর্ণে গন্ধে মন রাঙিয়েছি—আমরাও কি হেমন্তের রূপ দেখেছি? বসন্তের আলোর ঘুঙুর, গ্রীষ্মের হাওয়ার হাহা, বর্ষার বনের মাদল, শরতের কাশের হাসি, শীতের তারার কাঁপন আমাদের মনের দুয়ারে জানান দিয়ে হাঁটে। এদের কোলাহলের ভিড়ে হেমন্ত এমন লাজুক ছেলের মতো চুপি-সাড়ে দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায় যে তার মুখ চিনিনি আজও। সেই হেমন্তকেই জীবনানন্দ বন্দী করেছেন অসংখ্য ছবির অ্যালবামে। শব্দ-গন্ধময় সেই সব ছবির দিকে তাকিয়ে আমাদের চমকে উঠে আবিষ্কার করতে হয় এক পরিচিততম মুখের আদল—যা দেখেও দেখিনি কোনোদিন। ভাবিনি, এই শিশিরের মতো স্বচ্ছ রূপেই বিম্বিত হলে পৃথিবীর শ্যামলিমা মরকত হয়ে ওঠে, সূর্যের আলো ছড়ায় হীরকের দ্যুতি, আকাশের নীলিমা আনে ইন্দ্রনীলের আভা, উষার মেঘের গোলাপী বিভাই দেয় পদ্মরাগের কান্তি, রাত্রির তারার তিমিরে তাই হয় চোখের মণির মতো টলটলে কালো।

হেমন্তের এই রূপ, এই রূপের বিচিত্র মাদকতা জীবনানন্দই প্রথম আবিষ্কার করলেন। প্রকৃতিতে যে রূপের বৈচিত্র্য—ইন্দ্রিয়ানুভবেই তার স্বীকৃতি। তার মধ্যে বর্ষার প্রকাশই সবচেয়ে স্থূল—আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে সে তার কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে চলে। সবচেয়ে ভোঁতা মানুষও তাকে এড়িয়ে থাকতে পারে না। ঋতুর বাসরে সবচেয়ে সূক্ষ্ম সংবেদনা হেমন্তের। বর্ষার রূপে, বসন্তের সৌন্দর্যে মাতোয়ারা কবি দেশে দেশে কালে কালে সংখ্যাতীত, কিন্তু শরতের মাধুরী মন মাতালো ক'জনের? হেমন্তের আরও কম—নেই-ই বলা চলে। শরতের মহৎ কবি আছেন ইংরাজীতে কীট্‌স্‌, বাংলায় রবীন্দ্রনাথ। কীট্‌স্‌ বেশি লেখেন নি। রবীন্দ্রনাথেরও শরতের কবিতা অঙ্গুলিমেয়। আর জীবনানন্দ শুধু হেমন্তের কবিতা লিখলেন, হেমন্তের কবিতা ছাড়া আর প্রায় কিছুই লিখলেন না।

শুধু তাই নয়—এই একটি ঋতুই তাঁর হাতে কত রূপে ধরা দিল। হেমন্তের রূপের মধ্যে নানা বৈপরীত্যের মিশ্রণ আছে। এ একাধারে ফসল ও ফাঁকামাঠ,

পূর্ণতা ও রিক্ততা, জীবন ও মৃত্যুর ঋতু। তাঁর কবিতার সূচনা থেকেই হেমন্তকে কবি কতরূপে চিনলেন, চেনালেন। 'ঝরাপালকে' অন্য সব ঋতুর সঙ্গে হেমন্ত আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এলো—অতি সাধারণ তার রূপ। 'হেমন্তের হিমঘাস' আর 'ঝর ঝর কামিনীর ব্যথার শিয়র' তার বাইরের ছবিটাই ফুটিয়েছিল। কিন্তু তারই পাশাপাশি সে গ্রন্থেই ছিল তার অন্তরঙ্গ রূপ। 'আলেয়া' কবিতায় হেমন্ত শীতলতার, নির্জনতার, পরিত্যক্ত কালের প্রতীক। 'পিরামিড' কবিতায় হেমন্তই আবার মৃত্যুর, বিচ্ছেদের, ব্যথার লগ্ন—

> মোদের জীবনে যবে জাগে পাতা-ঝরা
> হেমন্তের বিদায়-কুহেলি
> অরুন্তুদ আঁখি দুটি মেলি'
> গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
> দু-দিনের তরে শুধু ;

: **পিরামিড**

হেমন্তের শিশির-সিক্ততায় বিচ্ছেদ ব্যথাতুর হৃদয়ের আহ্বানও শুনেছেন কবি—

> মোর তরে পিছু ডাক মাটি-মা—তোমার ;
> ডেকেছিলো ভিজে ঘাস,—হেমন্তের হিম মাস, জোনাকির ঝাড় !

: **সেদিন এ-ধরণীর**

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এই বিষণ্ণ বিচ্ছেদের ঋতুই হয়ে উঠেছে প্রত্যাসন্ন ফসলের কাল।

> আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
> বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝ'রে পড়ে তার,—
> শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে !

: **অবসরের গান**

শব্দের আশ্চর্য ব্যঞ্জনা, রূপের এমন বিস্ময়কর আধিকারিক প্রয়োগ সত্ত্বেও কোনো কোনো রুচিবাগীশ সাহিত্য-রসিকের এই অংশটি মনঃপূত হয়নি। 'বিয়োবার' শব্দটাই তাঁদের বিরাগের কারণ। সন্তান-সম্ভবা নারীর রূপের মধ্যে যে আশ্চর্য মর্যাদা ও সৌন্দর্য রয়েছে তা মহাকবি কালিদাস জানতেন বলেই রঘুবংশ কাব্যে গর্ভিণী সুদক্ষিণার রূপের বর্ণনায় ইতস্ততঃ করেন নি, রসজ্ঞ পণ্ডিতেরাও তা অনুমোদন করেছেন, কিন্তু একালের সমালোচকদের দুর্ভাগ্যবশত সেই উদার্য বা কল্পনাশক্তি দেখা গেল না, বোঝা গেল শব্দের শ্লীলতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ফরাসী চিত্রবিচারক রাজার মতোই আদিম পর্যায়ে রয়ে গেছে।

হেমন্তের পরিপূর্ণ ফসলের সৌন্দর্যের সঙ্গে ওতপ্রোত অলস ক্লান্তির রূপ এই কবিতাতেই রয়েছে—

> হেমন্তের ধান ওঠে ফ'লে,—
> দুই পা ছড়ায়ে বস এইখানে পৃথিবীর কোলে।

: **অবসরের গান**

কখনো ফসল উঠে যাওয়া শূন্য মাঠের দৃশ্য—

> প্রথম ফসল গেছে ঘরে,—
> হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে—
> শুধু শিশিরের জল ;

: **পেঁচা**

এমন খণ্ড খণ্ড ছবিই শুধু বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো আছে তা নয়, অনেক কবিতাতেই হেমন্তের বিষণ্ণ বেদনাতুর পরিপূর্ণ রূপ এঁকেছেন। আমরা বিশেষ ক'রে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি একবার সম্পূর্ণ পড়তে বলবো।

'বনলতা সেন' বইটিতে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের বেদনা আর বিগত প্রেমের স্মৃতির মন্থনে হেমন্ত করুণ হয়ে উঠেছে।

> যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
> হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে-ক্রমে যেখানে মানুষ
> আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে :
> সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন ; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
> হেমন্ত আসিয়া গেছে ;—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;
> ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,
> হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমাবে সে শিশিরের জলে ;
> ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

: **দুজন**

(জীবনে হেমন্তের অভিসঞ্চার প্রকৃতির মতোই এক পরিব্যাপ্ত নিয়মের ফল, এ যেমন কবি এখানে বুঝেছেন, তেমনই অন্যত্র অনুভব করেছেন প্রকৃতিতে হেমন্তের আবির্ভাবের মতো আমাদের হৃদয়েও হেমন্তের আস্বাদ পাওয়া যায় কখনো কখনো :—

> অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে ;
> এ সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
> হেমন্ত এসেছে তবু ;

: **অঘ্রাণ প্রান্তরে**

সেই মনসিজ হেমন্তের বেদনা, ক্লান্ত-প্রশান্ত-নির্লিপ্ত বেদনা, করুণ সুরের আবেশে এ সব কবিতায় জড়িয়ে আছে।

'মহাপৃথিবী'র একটি কবিতায় ফলবান হেমন্ত জীবনের আস্বাদের প্রতীক হয়েছিল।

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'লো;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো?

: আট বছর আগের একদিন

মানুষের চেতনায় একই ঋতু নানা সময়ে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া আনতে পারে। কবির কাছে সুপক্ক যবের ঘ্রাণ মাখা হেমন্ত যখন জীবন বোধে উদ্বুদ্ধ করেছে চিত্তকে তখন অন্য কেউ যে এই পরিবেশকেই অসহনীয় মনে করে মৃত্যুকামনা করতে সক্রিয় হবে—এটা বিস্ময়কর কিন্তু এটাও সত্য এখানের জীবনের রহস্য। সেই রহস্যের উপলব্ধি এখানে এক স্বচ্ছ কবিতার জন্ম দিয়েছে।

'সাতটি তারার তিমির'-এ হেমন্তের ব্যবহার আরও সংহত, আরো প্রতীকী। সারা কবিতা জুড়ে আর তার স্থিতি নেই—দু-একটি পংক্তির মধ্যে কোনো বিশেষ অবস্থা ব্যক্ত করতেই তার প্রয়োগ। কোথাও বা হেমন্ত জীবনের পরিশিষ্ট ক্ষয়িষ্ণু দিনগুলির প্রতীক—

এই সেই সঙ্কল্পের পিছে ফিরে হেমন্তের বেলাবেলি দিন
নির্দোষ আমোদে সাঙ্গ ক'রে ফেলে চায়ের ভিতরে;
চায়ের অসংখ্য ক্যান্টিন।

: সোনালি সিংহের গল্প

কোথাও সঞ্চিত ফসলের প্রতীক—

হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে;
এ-রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায়;

: নাবিকী

এই ভাবে একই ঋতুকে আমাদের অরণ্য ও প্রকৃতি, জগৎ ও জীবন, জন্ম ও মৃত্যুর অসংখ্য মূর্তির মধ্যে অক্ষয় ক'রে আমাদের হাতে তিনি দিয়ে গেলেন। আমরা অন্তহীন বিস্ময়ে সেই ঋতুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

প্রসঙ্গ

অধুনা যাঁরা কবিতা লেখেন জীবনানন্দের কবিতা তাঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খ ক'রে দেখতে হবে। দেখতে হবে আধুনিক কবিতার অসংখ্য দুর্বলতা প্রথাসক্তি, দীনতা ও তুচ্ছতা অবলীলায় অতিক্রম ক'রে তিনি কেমন সবল স্বাধীন, নিবিড় ও ঋজু হয়ে উঠেছিলেন। জীবনের কোনো নূতন দিক আধুনিকেরা দেখতে পাই না, দেখতে ভয় পাই। ছন্দে একটু মোচড় কষে, ভাবের উপর একটু চকচকে করে বুরুশ ঘষে ভাবি যথেষ্ট কারিকুরি হলো। কিন্তু জীবনানন্দের দিকে যখন তাকাই নিজের অকৃতার্থতা অন্তত আত্মার কাছে গোপন থাকে না।

অথচ দেখবার চোখ থাকলে কতো নতুন আলো জগৎকে রাঙিয়ে দিয়ে যায় তাঁর কবিতায় তার নানান প্রমাণ পাবো। তবু, তার পরেও আমরা হাল ফ্যাশানের কবিতা লিখবো—ষ্টাইল গড়ে তুলতে পারবো না।

ধরা যাক্ এই প্রকৃতির কথাই—এই ফুল ফল, গাছপালা, পাখি, পোকা, জীবজন্তু—তাঁর কবিতা থেকে এদেরই একটা তালিকা করা গেলে,—বিলেতী আলোচনায় এমন তালিকা করার রেওয়াজ আছে—তাচ্ছিল্যের ব্যাপার নয় সেটা,—এমন একটা নূতন জগতে গিয়ে পৌঁছাবো বাংলা কবিতা আগে কখনো সেখানে এসে দাঁড়ায়নি। আমরা তো প্রকৃতিকে কখনো কবিতাতে ঢুকতে দিইনি,—আদিম অরণ্যের বদলে একটা শৌখিন বাগান গড়েছি সেখানে। জীবনে আমরা বর্ণভেদ মানি। কবিতাতেও বন্য অন্ত্যজদের দূরে সরিয়ে রেখেছি। ভেবেছি, গোলাপ-চামেলি, ময়না-বুলবুলির জগতে ওদের ঢুকতে দিলে কোলাহলে কি কবিতা থাকবে? কবিতা যে বিষয়ের গৌরবে নয়—অভিব্যক্তিতে, এ বোধ কিছুতেই হলো না। জীবনানন্দের লেখায় সেই উদ্যানের বাইরে এসে দাঁড়াতে হলো; ব্রহ্মার বিস্ময় নিয়ে দেখতে হলো—

> একদিন কোনো এক আঞ্জির গাছের ডালে সকালের রোদের ভিতর
> সোনালি সবুজ এক ডোরাকাটা রাক্ষুসে মাকড়কে আমি
> একটি মিহিন স্ুতো নিয়ে দুলে নির্জন বাতাসে
> দেখেছি স্বর্গের থেকে পৃথিবীর দিকে এল নেমে,
> পৃথিবীর থেকে ক্রমে চ'লে গেল নরকের পানে;
> হয়তো সে উর্ণনাভ নয়,
> অগস্তের মতো নানা আয়ুর সন্ধানে
> চোখে তার লেগেছিল ব্রহ্মার বিস্ময়।

: ইতিবৃত্ত

আঙ্গির গাছের ডালে ঝুলন্ত ডোরাকাটা মাকড়ও কবিতা হলো—কবিত্ব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হলো না। দেখলাম গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, করবী, রজনীগন্ধা, কামিনী, যূথিকা, মধুমালতী, কদম, অতসী, মোতিয়া, অপরাজিতা, পদ্ম, বেলকুঁড়ি, চাঁপা, ভুঁইচাপা, অশোক, পলাশ, ডালিম, এলাচি, নার্গিস, হেলিওট্রোপ, ক্যানা ফুলের পাশাপাশি মোরগ, ভেরেণ্ডা, কেয়া, সজিনা, আনারস, বাবলা, পিয়াল, আপেলের ফুল, শশাফুল, নারিকেল ফুল, ভাটফুল, দ্রোণফুল, মচকা, আকন্দ, মরা শিউলি আর কলমীফুল মিলে মিশে রইল। অভিজাত অনভিজাত কাউকেই দূরে ঠেলা হলো না;

বাস্তবিক, কবিতার পুরানো কর্ষিত বাগানটিকে উচ্ছেদ করলেন না কবি, তার সঙ্গে একটা বিশাল আরণ্য-ভূখণ্ড জুড়ে দিলেন। তাই গাছের মধ্যে হিজল, আমলকী, বট, পলাশ, আম, কাঁটাল, নিম, মহানিম, জাম, হরিতকী, শাল, পিয়াল, তমাল, পিয়াশাল, সুন্দরী, জলপাই, অর্জুন, অশ্বত্থ, তেঁতুল, জামরুল, বাতাবী, সেগুন, কৃষ্ণচূড়া, নাগেশ্বর, ঝাউ, দেবদারু, টার্পিন, মেহগিনি, অলিভ, মার্টল, ইউ, উইলো, পাম, দারুচিনি, এলাচি, আঙুর, সরো, প্রভৃতি গাছের সঙ্গে জারুল, নোনা, ক্ষীরুই, ফলসা, কদম, পেয়ারা, নারকেল, খেজুর, বাবলা, শাইবাবলা, আশশ্যাওড়া, ফণীমনসা, জামির, হোগলা, শর, শেয়ালকাঁটা, বঁইচি, গুপুবি, জিউলি, গাব, পিপুল, চালতা, ডুমুর, সজনে, মাদার, বাঁশ, বেত, পাট, আকন্দ, ধুধুল, মাকাল, বাসক, বকুল, অপরাজিতা, উলু, বন, পানবন, পেঁপে, কলা, শিমলতা, নটেগাছ, আনারস, হেলেঞ্চা, পদ্ম, শেওলা, পানা, ভাট, তৃণ, মধুকূপী, মুথাঘাস, খড়, নাড়া—সব এসে গেল।

কবিতার মধ্যে হাটজমালো নোনা, কুল, করমচা, কচি তাল শাঁস, আতাফল, ডাঁশা আম, আমলকী, জামরুল, কামরাঙা, আপেল, দাড়িম, জলপাই, কমলা নেবু। সেই সঙ্গে হাজির হলো কাঁটাবহরের ফল, নাটাফল, বেতফল, ঝাউফল, নীবার, মহুয়া, ধুতুরা, শিম, সরিষা, তিসি, টম্যাটো, লাল বটফল, নষ্ট শাদা শশা, সবুজ সিঙ্গাড়া, চিনাবাদাম, পচা চালকুমড়া, দারুচিনি ছাল এমন কি তরমুজ মদ আর লুপ্ত নাসপাতির গন্ধও চলে এলো কবিতার আসরে। হেমন্তের ভাঁড়ার খুলে ছড়িয়ে পড়লো অজস্র ধানের গন্ধ; গোধূম, যব, মটর, মৌরী, আর রাইসর্ষের অমেয় সৌরভ।

পাখি এলো। কোকিল, খঞ্জনা, দোয়েল, কাকাতুয়া, তোতা পাখি, ফিঙে, টুনটুনি, বুলবুলি, হরিয়াল, হীরামন, শ্যামা, চড়ুই, ঘুঘু, ময়ূর, চাতক, পাপিয়া, তারুই, মনিয়া, নীলকণ্ঠ, সারস, রাজহাঁসই শুধু নয়। পেঁচা এলো, লক্ষ্মীপেঁচা, চিল, গাঙচিল, সিন্ধুসারস, মরাল, সুদর্শন, শঙ্খচিল, শালিক, গাঙশালিক, হাঁস, বালিহাঁস, বুনোহাঁস, কাক, দাঁড়কাক, পায়রা, জল পায়রা, ডাহুক, চকোর, জলপিপি, মাছরাঙা, কোরালী, চামচিকা, শকুন, গৃধিনী, বাদুড়, শ্যেন এমন কি ডোডোপাখি অবধি কিছুই বাদ পড়লো না।

যেন এক নূতন জগতের দরজা খুললো। অথবা কবিতার সেই আজগুবি সংকীর্ণ জগৎ যেন আমাদের চেনাজানা পৃথিবীর সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। কবিতার সোনারতরীতে এতকাল বাছাই করা সোনার ধানই শুধু ধরে আর কিছুরই 'ঠাঁই নেই' এই জানতাম। এখানে 'আছে আছে স্থান' শুনে উঠে এসে দেখি নোয়ার নূতন নৌকায় সবাই 'বসিয়া আছে আগে ভাগে উঠি নিশ্চিন্ত নীরবে'। 'তুই হেথা কেন ওরে?'—এ প্রশ্নে তারা হটবে না। কেননা উট্‌কো রবাহুত তো কেউ নয়; নিজের জায়গাতেই তারা এসেছে। ছাগল, রামছাগল, ভেড়া, ইঁদুর, বেজি, কুকুর, বিড়াল, গাধা, বলদ, ঘোড়া, বানর রয়েছে। খরগোস, সজারু, খচ্চর, গাড়ল, শুয়োর, হরিণ, চিতলহরিণ, নীলগাই, উট, শম্বর, শেয়াল, ফেরু, বাঘ, চিতাবাঘ, সিংহ, বেবুন, গরিলা এমনকি ঘাইহরিণী অবধি আছে। ম্যামথ আছে, ডাইনোসর আছে। জোনাকি রয়েছে, বোলতা, ভীমরুল রয়েছে, গুবরে, ভোমরা, কাঁচপোকা, পিঁপড়ে, মৌমাছি, ঝিঁঝিঁ, সাপমাসী, ফড়িং, মাছি, নীলমাছি, মশা, রাতচরা ডাঁশ, পঙ্গপাল, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা, দেয়ালী পোকা সব রয়েছে। মাকড় তো আগেই দেখেছি। আদিম জীবাণু, অ্যামিবা থেকে শুরু ক'রে, কৃমি, চুলের এঁটিলি, শামুক, গুগলি, ব্যাঙ, কাঁকড়া, সরীসৃপ, কুমীর, বৃশ্চিক, গোক্ষুর, কেউটে, শঙ্খচূড় সাপ আছে। বাটামাছ, চাঁদা, সরপুঁটি, চিতল, চুনোমাছ, ট্যাংরা, শক্‌রী, পমফ্রেট, হাঙ্গর থেকে তিমি অবধি এসেছে। ভাঙ্গা ডিম, মাকড়ের ছেঁড়া জাল, প্রবাল, হাতির দাঁত, সাপের খোলস, ঘোটকীর লেজ, মৃগনাভি, সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি, চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শাল; কি আছে, কি নেই?

জীবনানন্দের এই আরণ্য জগতের সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যকে'র অরণ্য-সম্পদের আশ্চর্য মিল আছে। সেখানেও এমনই অনভিজাত প্রকৃতি এমন মর্যাদার আসন পেয়েছিল। চোখের ঠুলি খসিয়ে তিনিও জীবনানন্দের মতোই এই বাস্তব পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে নেমে গিয়ে তাকে ভালবেসে ছিলেন। তাঁদের মিল তাই সমধর্মী বস্তুদৃষ্টির মিল। সাহিত্যের চৌহদ্দীর বাইরে যে সত্যিকারের বনকান্তার তা বাংলার গ্রামে প্রান্তরেও যেমন উড়িষ্যার অরণ্য খণ্ডেও তেমনই। সেই পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে রইল বিভূতিভূষণের উপন্যাসে, জীবনানন্দের কবিতায়। তাঁদের কাছেই আমরা নূতন ক'রে শিখলাম প্রকৃতি আর সাহিত্য দুটি ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নয়—প্রকৃতির সবুজ সতেজ শ্যামলতা যতই সাহিত্যের বিবর্ণ বিশুষ্ক পাতাগুলো বদলে দিতে পারবে সাহিত্য ততই সতেজ সমৃদ্ধ প্রাণবান হয়ে উঠবে।

আলো

ইম্প্রেশানিষ্ট শিল্পী এদুয়ার মানে বলতেন, তাঁর ছবিতে আলোই প্রধান ব্যক্তি। নিজের কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দও একথা বলতে পারতেন। তাঁর কবিতা শুধু 'চিত্ররূপময়' তাই নয়, ইম্প্রেশানিষ্ট শিল্পীর মতো আলোর রহস্যময় খেলা এখানে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখবার।

নিসর্গ দৃশ্যমাত্রেই আলোর একটি স্থান আছে। ভোর, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, চাঁদনী বা আঁধার রাত, মেঘলা বা বর্ষণ-মেদুর দিন—আলোক সম্পাতে দৃশ্যকে নানারূপ প্রাণবন্ত ক'রে তোলা যায়। ইম্প্রেশানিষ্ট শিল্পীরা দৃশ্যকে পূর্ণাঙ্গ করতে আলো আঁকেন নি—আলোকেই বর্ণনীয় ক'রে তুলতে দৃশ্য এঁকেছেন, যেমন ক্লোদ মনে একই দৃশ্য বারবার আঁকতেন শুধু সময়ের অনুযায়ী আলোর বৈচিত্র্য বোঝাতে।

জীবনানন্দের কবিতায় প্রতিটি নিসর্গ দৃশ্যে নানা সময়ের আলোর বর্ণনাই শুধু নেই, আলোর বিন্যাসে দিন-রাত্রির রৌদ্র-জ্যোৎস্নার ক্রমিক অবস্থান্তর ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'সাতটি তারার তিমিরে'র 'হাঁস' কবিতায় সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যার নদীর ছবি আশ্চর্য আলোমাখা হয়ে আছে। ভোরে তার জলপাই পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জল, দিনমানে জলের গভীরে শাদা মেঘ, লঘুমেঘের ডুবে যাওয়া, বিকেলে অনেক সময় স্থির থেকে হেমন্তের জল নীল আকাশ বলে প্রতিপন্ন হলো আবার অপরাহ্নে খইয়ের রঙের মতো রোদের ঝিলিক ঝরে পড়লো—সব মিলিয়ে আলোর মায়াই দেখতে হবে।

তবু তাঁর কবিতায় আলোর ভূমিকা এতটুকু হলে উল্লেখযোগ্য হতো না। আরো বড়ো কথা, নিসর্গের আলো ছাড়াও আরো এক মনোভব আলোর দ্যুতি সেখানে জাদুর মতো কাজ করে যায়, 'আলো'-এই শব্দটি জীবনানন্দের কবিতায় যে মরমী তাৎপর্য বহন করে তার কথা এখানে বলা হচ্ছে না। সেখানে আলো হচ্ছে নির্মল সভ্যতার প্রতীক একটি তত্ত্ববহ শব্দ-শরীর। যে প্রসঙ্গ পারে আসবে, এখানে আলো বলতে আমরা ইন্দ্রিয়ানুভবের কথাই বলছি, যদিও তা নৈসর্গিক নয়, মনোময়।

> আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
> আরো এক আলো আছে : দেহে তার বিকেল বেলার ধূসরতা ;
> চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির :
> পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর ;
>
> : মৃত্যুর আগে

চোখের দেখার হাত ছাড়িয়ে এই যে আলো ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়, সেই চেতনার আলোর কথাই আমরা বলছিলাম। উল্লাস, বিষণ্নতা, খুশি, শোক, অথবা উদ্যমের আবহ গড়তে কবিতায় আলোকেই সাঙ্কেতিক ভাবে উজ্জ্বল, ম্লান, তীব্র, স্তিমিত, ফিকে অথবা গাঢ় ক'রে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। এই ভাবেই আলোর ব্যঞ্জনায় কবির অভিপ্রায় কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আর এই চেতনার আলো যখন জ্বলেছে সেই আলোর উজ্জ্বল অভিঘাতে মনে হয়েছে 'অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো।' নিসর্গর আলো-কে অতিক্রম ক'রে অন্তরের আলোয় তাকে উদ্দীপিত ক'রে তোলা—এই প্রবুদ্ধ নৈপুণ্যের শিল্প-তাৎপর্য যিনি বোঝেন—তাঁর অন্তরে অকুণ্ঠ সাধুবাদ কবির প্রাপ্য।

জীবনানন্দের কবিতার এই স্মরণীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। তিনিই দেখিয়েছেন কিভাবে 'মাঠের গল্প,' 'হায়চিল,' 'বনলতা সেন,' 'কুড়ি বছর পরে,' 'শঙ্খমালা' ইত্যাদি কবিতায় আলোর ম্লান ছায়াঘন কুয়াশার পর্দা ঝুলে আছে। অথবা 'অবসরের গান,' 'ঘাস,' 'শিকার,' সিন্ধুসারস'—আলোর যেখানে প্রবল উজ্জ্বল অবয়ব; কিম্বা সেই সব কবিতা যেখানে দিনের থেকে রাতে অথবা রাত থেকে দিনে পৌঁছে কবিতার সমাপ্তি; যেখানে রাতের কবিতায় দিনের উজ্জ্বলতা—দিনের কবিতায় রাতের ম্লানিমা। 'হাওয়ার রাত' অথবা 'অন্ধকারে'র মতো কবিতা—

> "যেখানে তারা ভরা অন্ধকারের কথা বলতে বলতে কবির হৃদয় দিগন্ত প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে ভরে যায় যেখানে অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে কবি হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে জেগে ওঠেন, দেখতে পান 'রক্তিম আকাশে সূর্য' আর সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী। ভাবছিলাম 'নগ্ন নির্জন হাতে'র বিস্ময়কর গঠনের কথা—কবিতাটির আরম্ভ অন্ধকারে—তার পটভূমিকাই ফাল্গুনের অন্ধকার, অথচ শেষের অংশে 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' আর রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ আমাদের মনে এমন একটি প্রদীপ্ত সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায় যে মনেই হয় না পুরো কবিতাটিতে আলো ছাড়া, উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ আছে। যেমন 'হায়চিল'এ দুপুর বেলাতেই সন্ধ্যা নেমে আসে, তেমনি 'হাওয়ার রাতে'র অন্ধকারটাই আলোর উল্লাসে উতরোল হয়ে উঠলো।"

: **কালের পুতুল**

বুদ্ধদেব বসু স্পষ্টই লক্ষ্য করেছেন এসব ছবি স্বপ্রতিষ্ঠ নয় এগুলি কবির ভাবনার-বেদনারই প্রতিফলন। আবার 'মৃত্যুর আগে'র মতো কবিতাও রয়েছে, স্বপ্রতিষ্ঠ ছবির কবিতা, যেখানে

> "হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি যদিও একবার দেখা যায় আর ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ ভোর বেলাটিকেও চিনতে পারি, তবু এর পক্ষপাত নৈশতার দিকেই। পড়তে পড়তে আমাদের মন বারে বারেই ছায়াচ্ছন্ন গাঢ়তায় মন্থর হয়ে আসে।"

ইন্দ্রিয়-চেতনা

শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে শারীরিক। বাস্তবিক, তাঁর কবিতার অমেয় আকর্ষণের উৎস তাঁর তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়-চেতনা। বাঙালী কবিদের মধ্যে এক্ষেত্রে তিনি এতই অনন্য বিশিষ্টতাময় যে এই দৃষ্টিকোণে যে কবিতার আলোচনার কোন সূত্র থাকতে পারে, তাঁর আবির্ভাবের আগে এদেশী কাব্যরসিকেরা তা ভেবে দেখেন নি।

আমাদের ইন্দ্রিয় বোধের এমন মূঢ়তা আছে যে বস্তুর সংস্পর্শে এসেও আমরা সব ইন্দ্রিয় দিয়ে সম্পূর্ণভাবে তাকে উপভোগ করি না। কবিদেরও প্রায়ই দেখা যায় এক অনুভূতির তীব্রতায় অন্য অনুভূতিগুলি ভোঁতা হয়ে যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ কবিই মূখ্যত দু-একটি ইন্দ্রিয়-রসিক কবি। সুইনবর্ণের কবিতায় শুধু কান দিয়ে চেনা পৃথিবীকে পাই। রসেটির কবিতায় রূপের আল্পনা। কীটসের কাব্যে পৃথিবীর বর্ণ-গন্ধময় প্রকৃতির উদ্ঘাটন—যদিও রসের ভোজে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আমন্ত্রণ সেখানে অবারিত, রবীন্দ্র কাব্যে প্রধানত ছবি ও গানের অত্যাশ্চর্য সমাহার। জীবনানন্দের কবিতায় সবচেয়ে বিস্ময়সূচক শৈলী হলো ইন্দ্রিয়সাধনার সর্বমুখী সূক্ষ্ম মার্জিত অনুশীলন। রৌদ্রের রূঢ়তা, ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের চেতনায় আসে না,'শিশিরের শব্দ অথবা নক্ষত্রের জ্যোৎস্নাও জীবনানন্দের অনুভবে সাড়া জাগায়।

তারপর ঘাসের ভিতর
শাদা শাদা ধুলোগুলো প'ড়ে আছে, দেখা যায়; খইধান দেখি একরাশি
ছড়ায়ে রয়েছে চুপে; নরম বিষণ্ণ গন্ধ পুকুরের জল থেকে উঠিতেছে ভাসি,
কান পেতে থাকো যদি, শোনা যায়, সরপুঁটি চিতলের উদ্ভাসিত স্বর

মীনকন্যাদের মতো ; সবুজ জলের ফাঁকে তাদের পাতালপুরী ঘর
দেখা যায়—রহস্যের কুয়াশায় অপরূপ—রূপালি মাছের দেহ গভীর উদাসী

: রূপসী বাংলা

সবুজ ঘাসের মধ্যে ধুলোর শাদা রং, চিত্রের স্তব্ধতা, পুকুরের জলের গন্ধের কোমলতা ও বিষণ্ণতা, মাছের উল্লসিত কণ্ঠস্বরের ধ্বনি সবুজ জলের মধ্যে তাদের রহস্যময় রৌপ্যোজ্জ্বল সঞ্চরণ, সবকিছুই কবির চেতনায় এবং সমৃদ্ধকল্পনায় মৃদু মৃদু অভিঘাত তুলেছে। এই সহজ অনুভবের কথা, রঙ-দেখা-গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদের পৃথিবীকে এমন একান্ত ক'রে ছুঁয়ে থাকার পরিচয়, বাংলার প্রকৃতিকে এত নিবিড় ভাবে পাওয়া, আর কোনো কবির ক্ষেত্রে এত স্বভাব সত্য নয়। তাঁর হাতে প্রকৃতি যত পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে ফোটে, যে রঙের রসের ভোজে আমাদের মন মাতাল হয়ে ওঠে তেমনটি আর কোথায় মিলবে? এই শক্তি সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সজাগ বলেই কোনো বর্ণনা, কোনো ভাবনা প্রকৃতিকে সংলগ্ন না ক'রে তিনি করেন না। এ সত্য এত পরিজ্ঞাত যে উদ্ধৃতি দিয়ে আক্রান্ত করবো না প্রবন্ধ-শরীর; শুধু প্রকৃতি চিত্রের মদির আনন্দ রস কবির চেতনায় কি নিবিড় হয়ে আসে তার একটি দৃষ্টান্ত তুলবো—

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুল্‌বুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে ;—পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে ;

মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;

: মৃত্যুর আগে

এই আশ্চর্য শারীর অনুভবে তাঁর পাশে দাঁড় করানো যায় এমন কবি বাংলায় নেই। জীবনকে এমন সহজ ইন্দ্রিয় বোধের মধ্যে পেয়েছিলেন ইংরেজ কবি ইয়েটস্। আর এটি এতোই দুর্লভ প্রাপ্তি, সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভবের মধ্যে এমন সজাগ সমতা রাখতে পারা

এত দুঃসাধ্য, যে ইংরেজী কবিতার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে তাঁকে প্রায় নিঃসঙ্গই থাকতে হয়েছে। 'চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান'—এউক্তি জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে যেমন প্রযোজ্য তেমন আর কোনো কবি সম্পর্কে নয়। অথবা এই মন্তব্যকে একটু শোধন করে বলা উচিত এর সমতুল ইন্দ্রিয় ঐশ্বর্য যদি বাংলা সাহিত্যের কোনো প্রকৃতি চিত্রের মধ্যে থাকে তবে তা কোনো কবিতায় নয়, অবনীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্যের ক্বচিৎ কোনো বর্ণনায় অথবা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র গ্রাম্য পাঠশালার রূপচিত্রণে আর 'আরণ্যকে'র ইতস্তত খণ্ডাংশগুলিতে। এইভাবে এঁদের সঙ্গে সমকক্ষতার পরিচয় দিয়েও এক জায়গায় জীবনানন্দ এঁদের ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন। বস্তু ও কল্পনা, রূপ ও রূপকথার অন্তহীন সঞ্চরণ ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ পাড়ি জমান সহজেই। আর বস্তু জগতের সীমা পেরিয়ে বিভূতিভূষণ আশ্রয় নেন অলৌকিকতার। কিন্তু সেই বল্গাহারা স্বপ্নের হাতছানি অথবা অতীন্দ্রিয়ের আকর্ষণে পথ না হারিয়েও জীবনানন্দ ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমেই বস্তুর অতীত লোকে আমাদের পৌঁছে দিতে পেরেছেন। মাঠ ছেড়ে চাঁদের আহ্বানে ডানায় সাঁই সাঁই শব্দ তুলে যে অজস্র অপার বুনো হাঁস উড়ে যায়, কবি লক্ষ্য করেছেন—

> রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
> এঞ্জিনের মত শব্দে ; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা।
>
> তার পর পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
> হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ—দু-একটা কল্পনার হাঁস,

: বুনো হাঁস

পৃথিবীর হাঁস উড়ে যায়—রূপ হারিয়ে যায়। কিন্তু হৃদয়ের শব্দ-হীন জ্যোৎস্নায় একঝাঁক কল্পনার হাঁস অম্লান ভাস্বর হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়ানুভবেব এই অন্তহীন আনন্দলোকেই সব পার্থিব সৌন্দর্যের শেষ উত্তরণ।

প্রতীক

বোধি

।

বিপরীতগামী দুটি শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে এক জায়গায় গভীর নৈঃশব্দ্য থাকে, বিপরীত দুটি আলোক-তরঙ্গের মধ্যে এক জায়গায় বিরাজ করে নিরন্ধ্র অন্ধকার। খোলা কানে, খালি চোখে আমরা তা অনুভব করতে পারিনা বলেই তা নেই এমন নয়। এক আলোক-ক্ষেত্র অতিক্রম ক'রে অন্য একটি আলোক-ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে গেলে অনিবার্যভাবে আমাদের সেই সূক্ষ্ম তিমির-স্তরটি অতিক্রম করতে হয়।

সাধারণ কবিতা ও জীবনানন্দের কবিতার মধ্যেও এমন এক আপাত দুর্লক্ষ্য ব্যবধান আছে। সেই অন্তর্বর্তী-তিমির স্তরটি যদি আমরা উদ্ঘাটন করতে না পারি, জীবনানন্দের কবি প্রকৃতিও আমাদের কাছে পরিস্ফুট হবে না। এই প্রবন্ধে আমরা সেই প্রয়াসেই ব্রতী হবো।

জীবনানন্দের বেশ কিছু কবিতায় হৃদয়ানুভূতি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার সমধিক এমন কথা বলা হয়ে থাকে। বস্তুত যে জাতীয় কবিতা প্রসঙ্গে সাধারণত এই উক্তি করা হয় তাকে ঠিক বুদ্ধিবৃত্তির কবিতা বলা চলে না। ইতঃপূর্বে অন্যত্র তাঁর কবিতা আলোচনা ক্রমে 'বোধি'র উল্লেখ করেছিলাম। জীবন সম্পর্কে এক অখণ্ড বোধ মানুষের যখন জাগে তখন গভীর অনুভবশীল চিত্তের হৃদয়াবেগ তার নিবিড় সংশ্লেষে এক প্রত্যয়ে রূপায়িত হয়। এখানে 'প্রত্যয়' শব্দটি, বলা বাহুল্য, এক নিগূঢ় অর্থ বহন করছে। সৃষ্টি রহস্যের যে গোপন প্রত্যূষে সৃষ্টি উপাদানসমূহ কেন্দ্র ক'রে স্রষ্টার সমগ্র পুরুষীয় সত্তার উদ্বোধন ঘটে এবং এক নিবিড় রসচেতনায় বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত উপাদান অন্বিত হয়—স্রষ্টা-মানসের সেই গভীর গোপন অথচ ক্ষণিক অনুভবটি এখানে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। ক্ষণিক এই অর্থে, যে সার্থক সৃষ্টির লগ্নেই এই সংশ্লিষ্ট প্রত্যয় অনুভূত হয়—অন্যকালে না হতেও পারে। এই প্রত্যয়কেই এখানে বোধি বলা হয়েছে। একেই জীবনানন্দ বলেছেন 'কল্পনা ও কল্পনার ভিতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তা।' এই কল্পনা ঈশ্বর-প্রদত্ত নয়, সজ্ঞান মনেও একে পাওয়া যায় না। বাস্তবতার সমগ্র চেতনা ডুবে গেলে এই প্রতিভা উঠে আসে। কথাটা বোঝাবার জন্যে জীবনানন্দের ব্যঞ্জনা-গভীর ভাষাই তোলা যাক—

> যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কাব্য বেষ্টনীর ভিতর চমৎকার রূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে, কবিতা রচনা করতে হবে, তাঁদের এ দাবীর মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে

পারলাম না। কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে খণ্ড বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়,—একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন জ্বলে ওঠে হৃদয় এবং ধীরে ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায় সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়।

: **কবিতার কথা**

কবিতার সৃষ্টিলগ্নের অভিজ্ঞতার এই আশ্চর্য দুর্লভ বিবরণী এত সার্থক পরিভাষায় এখানে ব্যক্ত হয়েছে যে ব্যাখ্যার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যাঁরা পদ্যকার নন, যাঁরা কবি, তাঁরা কবিতায় নিজের ইচ্ছার উপর এক অন্ধ ব্যক্তিত্বের অনিবার্য নিয়ন্ত্রণ অনুভব করেন। আর সেই ব্যক্তিত্ব যখন কথা বলে তখন কবিতাকে দৈববাণীর মতো মনে হয়। কবির ইচ্ছার উপর প্রতিভার সেই নিয়ন্ত্রণের কথাও এখানে নয়—এখন বলা হচ্ছে সেই ব্যক্তিত্বের কথা বলা, সেই দৈববাণী, সেই mysterious oracle-এর কথা। একেই এখানে বোধি বলা হয়েছে। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে হয়তো—

> যদিও গভীর ভাবে সময়ের সাগর উজ্জ্বল—
> কি এক নিঃশব্দ নিবিড় আবেগে তাকে কালো
> দু'টি তুরঙ্গম যেন অনন্তের দিকে টেনে নেয়;
> নিরন্তর এরকম অগ্রসর হ'য়ে যাওয়া ভালো।

: **দুটি তুরঙ্গম**

এই যে অভিমত, 'নিরন্তর এরকম অগ্রসর হ'য়ে যাওয়া ভালো,'—এ শুধু বুদ্ধির বিচার নয়,—এর পিছনে জীবনানন্দের সমগ্র মগ্ন-ব্যক্তিত্ব, অনুভূতি ও বিশ্বাসের সুনিবিড় উপস্থিতি রয়েছে। দার্শনিক তত্ত্বদৃষ্টি থেকে এই মন্তব্যটির জন্ম হয়নি—হতে পারতো না, কারণ কবিতার সামগ্রিক অনুভবটি তত্ত্বমুখী নয়—মিষ্টিক।

নিজের মধ্যে বোধির উপস্থিতি তিনি প্রথম তীব্রভাবে অনুভব করেছেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেই। যদিও তার যথার্থ পরিণতি হয়েছে আরো উত্তর জীবনে—প্রায় জীবনের প্রান্তসীমায় এসে। উপরের দৃষ্টান্তটি সেই অন্তিম-পর্ব থেকেই উদ্ধৃত হয়েছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'বোধ' কবিতায় প্রথম সেই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার বর্ণনা। এই বোধ আমাদের স্পষ্ট চেতনার ব্যাপার নয়। মনের সংজ্ঞান ও অসংজ্ঞান সত্তার অন্ধকারে তার জন্ম বলেই তার অর্থ স্থূল-বুদ্ধির অগম্য। বোধি-সমন্বিত মানুষ তাই আপনাকে বুঝতে পারে না। অন্যকে বোঝাতেও পারে না। সাধারণ জীবনের স্থূল নিয়ম-

শৃঙ্খলার সঙ্গে আপনাকে খাপ খাওয়াতে না পেরে সে অস্থির হয়ে ওঠে। জীবনের যেখানে দুর্বোধ্যতম বিকাশ, জটিলতম গ্রন্থি—সেই প্রেম অথবা স্বপ্নও এক দূর পরম্পরা-সূত্রে গাঁথা। কিন্তু এই বোধ যাবতীয় বিশ্লেষণের অতীত, তাই

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?
জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মত হয়ে,—
সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিম্বা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের; কিম্বা যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে,
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় নাকি?—তাহাদের মন
আমার মনের মত না কি?—
তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী!

*　　*　　*

মাথাও ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে:
সে কেন জলের মত ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকবার স্বাদ
পাবে না কি?

: বোধ

এই তীব্র দুর্বোধ্য অস্বস্তি বহন ক'রে প্রতিটি কবিপ্রাণের যাত্রা শুরু হয়। নতুবা পরিচিত জীবন-সত্য অতিক্রম ক'রে তিনি নূতন কিছু দিতে পারেন না। সত্তার গহনে গাহন ক'রে যখন কবি উঠে আসেন তখনই তাঁর বাণীতে সেই পবিত্র মন্ত্রগুণ থাকা সম্ভব যা আমাদের চৈতন্য অতিক্রম ক'রে আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে।

জীবনানন্দের কবিতার এক বিশেষ পর্বে যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, মানবাত্মার নিরন্তর অপমান-অবক্ষয়ে, যখন কবি-মননে গভীর নৈরাজ্য, প্রবহমান কালক্রমের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অগ্রগতি নিদারুণ সন্দেহ-সঞ্জাত প্রশ্ন তুলেছে, 'একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে?' সভ্যতার মর্মে যখন 'কি এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুনে'র অভিসঞ্চার, তখনো সেই নৈরাশ্যের ধূসরতা ছাপিয়েও তাঁর কণ্ঠে গান বেজে ওঠে—

> নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
> অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
> হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে!
> সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
> চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়,
> জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

: **সময়ের কাছে**

তখনই এই সহজ প্রত্যয়টিকে, প্রজ্ঞার অতীত, আশাবাদীর সামান্য বিশ্বাসের অতীত অনুভবটিকে স্পষ্ট চিনতে পারি। বুঝতে পারি কবির সজ্ঞান সত্তা যে সংক্রান্তিতে 'দলিলে না মরে তবু এরকম মৃত্যু অনুভব' করেছে, কবির অন্তর্লীন ব্যক্তিত্ব কবির বোধি ঠিক সেই মুহূর্তে, তারই পাশাপাশি নব নব সূর্যে জেগে উঠেছে।

যে দুর্ভেদ্য দেয়ালে বুদ্ধি নিরন্তর মাথা খোঁড়ে, যে অন্ধকারের ওপারে দৃষ্টি হারিয়ে যায়—ইথরের তরঙ্গের মতো বোধি সে দেয়াল অনায়াসে টপকে যায়, আকস্মিক উদ্ভাসের মতো সেই অন্ধকার অবলীলায় ছিন্ন ক'রে দীপ্ত ক'রে তোলে। আমরা অবাক-বিস্ময়ে ভাবি কবির কণ্ঠে এই নির্দ্বন্দ্ব প্রত্যয়ের সুর এই অম্লান ঘোষণার পরিভাষা এলো কি ক'রে? কি ভাবে কবি এত সংশয়াতীত, এত নিশ্চিত, এত প্রশ্নহীন হতে পারেন?

এই রহস্যাবৃত প্রশ্নকে কবিদের দুর্লভ কোনো ঐশী বিভূতি বলে ব্যাখ্যা করা না হয় যেন। কারণ, এতদিন এইভাবে ব্যাখ্যা করেই প্রশ্নটিকে হাল্‌কা ভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। কবিদের এই শক্তির আলোকসামান্য, কিন্তু অনৈসর্গিক বা ঐশ্বরিক কিছু নয়, এ একরকম আন্তর অভিজ্ঞতা (inner experience) যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে

সকলে পুরোপুরি সচেতন না হতেও পারে। বুদ্ধিবাদীরা বিশ্লেষণশীল ও বিচক্ষণ বলেই এই শক্তিকে স্বীকার করতে লজ্জিত। কিন্তু যাঁরা এই শক্তির সত্যতা সম্পর্কে সজ্ঞান, অথবা এই শক্তি যাদের মধ্যে প্রবল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তাঁরাই শুধু কবিস্বভাব পেলে এই জাতের কাব্য রচনা করতে পারেন।

কারণ, অনেক কিছুই লেখা যায় কবিতায়—কিন্তু যা অনুভবের মধ্যে স্থিত হয়নি, প্রত্যয় হয়ে জন্ম নেয়নি, তা শব্দসঙ্গীত হয়ে বাজবে না কিছুতেই। শব্দই আমাদের কানে ভাঙা কাঁচের মতো চেরা আওয়াজ তুলে চিনিয়ে দিয়ে যাবে কোথায় সাচ্চা, কোথায় ঝুটো। নইলে আত্মার অতল থেকে যে কবিতা উঠে আসে তা যতই দুর্বোধ্য যতই অস্পষ্ট হোক—তার উচ্চারণের মধ্যে অনুভবের প্রসাদ সুর হয়ে গম্ গম্ করে বাজবেই। তার অভাব চিন্তার ব্যাপ্তিতে ভরা যায় না, সে দৈন্য কল্পনার ঐশ্বর্যে ঢাকা পড়ে না। এই আশ্চর্য শব্দমন্ত্র আছে লালন ফকিরের গানে, রামপ্রসাদী কীর্তনে, উপনিষদে, গীতায়, মীরার ভজনে; ক্বচিৎ রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে, রিল্‌কের কবিতার ভাষায়। জীবনানন্দের এই সব কবিতায় সেই প্রত্যয়ের স্বরগ্রাম আমরা শুনেছি। তবু একথা স্বীকার করা ভালো এই সব কবিদের মতো সেই আশ্চর্য প্রত্যয়ে জীবনানন্দের কবিসত্তার অচঞ্চল স্থিতি হয়নি। এঁদের সৃষ্টিতে বোধির সঞ্চার সাময়িক উপলব্ধি-মাত্র নয়। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় বোধির কখনো নির্বিকল্প প্রতিষ্ঠা হয়নি। সচেতন মনন আর বোধির পাশাপাশি সংস্থান অথচ বিরোধ এখানে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখবার জিনিষ।

উপলব্ধির আলোর-ছায়ায় মেশা, ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে আসার সন্ধ্যালগ্ন এখানে। একসুর একছত্র হয়ে ওঠেনি কখনো। ধূপছায়া শাড়ির মতো দুটি রঙের সংলগ্ন সমাবেশে বিশিষ্ট আবেদন তার। তাই জীবনানন্দের কবিতার স্বাদই আলাদা। চেতনা আর বোধির সন্নিকট সাযুজ্যে তার বিন্যাস জটিল, তবু এই জটিলতার প্রসাদেই তিনি সাধারণের নিকটগম্য ও বিশ্বাসভাজন—পূর্বোক্ত কবিদের মতো সরল অথচ সেই জন্যেই রহস্যাবৃত নন।

তবু জীবনানন্দের ব্যাপ্ত চেতনায় যা বোধির অন্তর্গত, আমাদের পরিমিত চেতনার তা বুদ্ধিরই বিসার-ক্ষেত্র; কারণ, আমরা বোধিতে অভ্যস্ত নই। অথচ বুদ্ধির সাধ্য কি বোধির সেই দুর্জ্ঞেয় বলয়টি স্পর্শ করে। তাঁর কাব্যের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার তীব্র অভিযোগের এটাই হেতু। সমকালীন অন্য কবিদের সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নয়। তাঁরা কাব্যকে হৃদয়বৃত্তির বেড়া ভেঙে বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গনেই মুক্তি দিতে চান—তাই জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁদের সাদৃশ্য সমগোত্রীয় নয়। সেই জন্যেই জীবনানন্দের কাব্যে যে জাতের প্রতীকী কবিতা রয়েছে সে জাতের কবিতা অন্য কারো পক্ষে লেখা সম্ভব

হয় নি। ইতপূর্বে অন্যত্র 'হাওয়ার রাত' কবিতাটি আলোচিত হয়েছে। এমন আশ্চর্য কবিতা বাংলা সাহিত্যে অনন্য। তবু স্বীকার করা দরকার, এজাতীয় কবিতার ঐতিহ্য আমাদের ভাষায় আজো গড়ে ওঠেনি বলেই এর পূর্ণ মূল্য ও যোগ্য সমাদর আমরা দিইনি। ভাব যেখানে গভীর, প্রকাশ সেখানে জটিল হবেই। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক সর্বজনপ্রিয়, রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক নয়; কারণ গিরিশচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা মহত্তর। বাংলা দেশে জীবনানন্দের থেকে গভীর ও জটিল বিষয় নিয়ে কবিতা সৃষ্টির দুঃসাহস কেউ করেনি। এই জটিল ভাবনার রূপ দিতে তাঁকে প্রায়শই যে সব প্রতীক এবং সঙ্কেতের আশ্রয় নিতে হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। সাঙ্কেতিক কবিতা সবদেশেই আপাত-দুর্বোধ্য হয়ে থাকে। উপরন্তু এ উপলব্ধির জন্যে যে মানস প্রস্তুতির দরকার তার অভাবে এই সব আশ্চর্য কবিতার আবেদন ব্যর্থ হয়। মানস প্রস্তুতির প্রয়াস যদি আমরা না করি, তাঁকে দুর্বোধ্য জেনে যদি দূরে সরিয়ে রাখি তাহলে বিশ্ব সাহিত্যের কয়েকটি মহত্তম কবিতার আস্বাদ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবো।

কবিতা

হয়তো দেখেছেন ওজন করার আগে কিভাবে স্যাকরারা অ্যাসিড ঢেলে সোনা পুড়িয়ে খাঁটি করে নেয়, আমাদেরও সেইভাবে এখন কবিতা সম্পর্কে ধারণাটুকু পুড়িয়ে নিখাদ করে নেবার দরকার হবে। তবেই আমরা প্রতীকী কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে পারবো।

কবিতা বলতে যে ছন্দোগ্রন্থ ভাব শুধু বোঝায় না—এতো কাব্য বিচারের বর্ণ-পরিচয়। কবিতায় ভাব অনুভূত হয়ে ওঠে, কবিতা হৃদয়ের অব্যক্ত আবেগস্পন্দনটুকু অনুরণিত অনুকম্পিত করে তোলে পাঠকের হৃদয়ে। হৃদয়ের এই অনুকম্পাই কবিতা। 'তবু এহ হয় আগে কহ আর'—বলে এগিয়ে এলে আরো গভীর অতলে নামতে হয়।

ভাষার উপাদান হিসাবে শব্দের দুটি অঙ্গ আছে—আওয়াজ আর অর্থ। ধ্বনি-চাতুর্যের মধ্যে যদি কবিত্ব কোথাও থাকে, আছে ধ্বন্যুক্তি এবং অনুপ্রাসে। অনুভূতিময় আবহ গড়ে তুলতে এই দুটি মাত্র শব্দালঙ্কার-ই আমাদের কাজে আসে। শ্লেষ, যমক ইত্যাদি কবিতাকে ঋদ্ধ করে না আদৌ।

অন্যদিকে অর্থ অভিধার দ্বারা সীমায়িত। অভিধার বন্ধন থেকে লক্ষণা তাকে

মুক্তি দেয়—যেন ঘরের দেয়াল পেরিয়ে দোতলার বারান্দাটায়। ওই বারান্দাটুকুতেই আপনার গতিবিধি—তার বাইরে নয়। ফিরতে হলে ফিরতে হবে ঘরেই। ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি ওই অর্থের পরিধি স্বীকার করে নিয়েই আপনাকে নূতন কিছুর ইঙ্গিত দেবে যা চির পুরাতন, চির পরিচিত, চিরমোহময়, উন্মাদনায় বিভোর। অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর—কিন্তু ভাবের গহন লোকে ?—নৈব নৈব চ। শব্দের অর্থকে স্বীকার করে নিলে ভাবের পরিচিত উপরিতল থেকে গভীরে আমরা কিছুতেই নামতে পারবো না।

অথচ চিত্র-শিল্পীরা কেমন অবলীলাক্রমে পারেন। পারেন কারণ রেখার সঙ্গে, রঙের সঙ্গে ভাবের কোনো অব্যবহিত যোগ নেই। শব্দ যেমন উচ্চারণ-মাত্রই অর্থ টেনে আনে, রেখা বা রঙ তেমন ভাবকে বহন করে না। তাই সমস্ত রেখাগুলো একটা অখণ্ড পরিকল্পনার মধ্যে অন্বিত হবার আগে এবং পরেও পৃথকভাবে শিল্পীর ইচ্ছার বাইরে কোনো অর্থ দাবি করে না। অথচ যে কোনো কবিতায় প্রতিটি শব্দের স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে, কবিতার সামগ্রিক তাৎপর্য ছাপিয়েও সেই শব্দার্থ আপন অস্তিত্ব অটুট রাখবে।

উপরন্তু বৈয়াকরণিক অন্বয়ের দাবি। ব্যাকরণ একটু ভেঙেছে কি ভাঙেনি অমনি ক্ষেপা পাঠক ও সমালোচকরা তেড়ে আসবেন দুর্বোধ্যতা আর ভাষার অনাচারের অভিযোগ নিয়ে। কবিতার মানে বুঝতেই হবে এমন কি কথা? মালার্মে বলতেন Poetry is written with words, not ideas. অর্থাৎ শব্দগুলো মিলেই একটা পরিপূর্ণ ভাবদেহ গড়ে তোলা চাই, ব্যাকরণের অন্বয় না হোক ক্ষতি কি? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কবিতা বোঝাবার জন্যে নয়, বাজবার জন্য'। হায়, যদি অর্থকে বিসর্জন দিয়ে কয়েকটি কবিতাও তিনি লিখতেন তবে তাঁর মতের চেয়ে সেই দৃষ্টান্ত অনেক বেশি জোরদার হতো।

অবশ্য প্রত্যেক কবিই যে সবরকম কবিতা লিখবেন এমন কোন কথা নেই। আর রবীন্দ্রনাথ না লিখলেও এমন কবিতা যে আদৌ লেখা হয়নি এমন নয়। প্রসঙ্গক্রমে আমরা ইংরেজ কবি ব্লেকের অনবদ্য কবিতাগুলির উল্লেখ করতে পারি। এই জাতীয় কবিতা প্রসঙ্গেই হাউসম্যানের দেওয়া কাব্যের সংজ্ঞা—Poetry is not the thing said, but the way of saying it.······Meaning is of the intellect, poetry not.—পুরোপুরি খাটে।

মালার্মের মতো কবিতাকে যাঁরা গীতধর্মী ক'রে তুলতে চান তাঁরা আবার বিপরীত কোটিতে কবিতার বিশিষ্ট প্রকৃতি অতিক্রম ক'রে চলেন। গানের উপাদান স্বর—যা রঙ রেখার মতোই অর্থহীন। এই অর্থ বিহীন স্বর-সমন্বয়ে অর্থবহ সুরসঙ্গতি গড়ে

তোলাই গানের কাজ। এই জন্যে যন্ত্র-সঙ্গীতও সঙ্গীত। এই জন্যে ছবির মতোই গান দেশ-কাল-জাতির সীমা সহজেই লঙ্ঘন ক'রে যায়। কিন্তু কবিতার প্রকৃতি স্বরূপত পৃথক। কারণ আগেই বলা হয়েছে কবিতার উপাদান শব্দের দুটি অঙ্গ আছে আওয়াজ আর অর্থ। অর্থকে অস্বীকার করতে গেলে শব্দের স্বভাবচ্যুতি হয় বলেই কবিতা আপন ভাষার সীমায় বদ্ধ। নইলে স্বরলিপিও কবিতা বলে গণ্য হতো।

এই বাঁধন অতিক্রম করে নয়—এই বাঁধন মেনে নিয়েই কবিতার মুক্তি দিতে হবে। কবির মনের অনুভূতি, আবেগ, আকুতি অবিকৃত রেখে পাঠকের মনের দরবারে ঠিক ঠিক পৌঁছে দিতে হবে। সংবাদশালিতায় ত্রুটি ঘটলে চলবে না। পাঠকের মনটি প্রথমেই আকৃষ্ট করা চাই—স্পর্শ করা চাই। পাঠক অবশ্যই সংবেদনশীল, স্পর্শচেতন ও সহৃদয় হবেন,—অসহিষ্ণু অথবা প্রথানুগ পাঠক আধুনিক কবিতার পাঠক হতে পারেন না। কিন্তু মনোহরণের গুণটি কবিতাতেই থাকা দরকার।

এলিয়ট এই কথাটাই সুন্দর ক'রে বলতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, কবিতার অর্থ একটু আধটু রাখা ভালো, তাই নিয়ে পাঠকের সচেতন মনটা ব্যস্ত থাকবে যেমন কুকুর ব্যস্ত থাকে চোরের দেওয়া মাংসের টুকরো নিয়ে, ওদিকে কবিতাটি পাঠকের মনের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়ে আপন কাজ হাসিল করবে।

যদি মেনেই নিই কবিতা এই সজাগ মনটার জন্যে নয়, তাহলে কবিতা জিনিসটা কি? তার অস্তিত্ব, তার প্রয়োজন সম্পর্কে এক বিপুল বিস্ময় আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। কবিতা সম্পর্কে সমস্ত পুরোনো সংস্কার ঝেড়ে ফেলে আমাদের নূতন ক'রে ভাববার জন্যে জানবার জন্যে তৈরি হতে হয়।

যাবতীয় সাহিত্য-প্রয়াসের মধ্যে কবিতাতেই স্রষ্টার ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ ন্যূনতম। কারণ কবির সজাগ সত্তা ছাপিয়েও এখানে কবির নির্জ্ঞান সত্তা কথা বলে। একটি ভাবকে কেন্দ্র করে কেন ঐসব বিশেষ বিশেষ উপমা, বিশিষ্ট শব্দ, রূপ, রস, রঙ, ধ্বনি, ছন্দ আসে কেউ তা বলতে পারে না। কবিতা তাই এক হিসাবে মানুষের অবচেতনার অবয়ব। সজ্ঞান সত্তা দিয়ে তাকে অনুভব করতে যাওয়া দুরাশা। কবিতা মানুষের অবচেতনায় মগ্ন হতে ভালবাসে। কিছু বুঝিনা অথচ ভালো লাগে, প্রেম ছাড়া শুধু কবিতা সম্পর্কেই মানুষ একথা বলতে পারে, কারণ এ দুই-ই মানুষের মগ্নচেতনার উদ্বর্তন।

জীবনের এই পরিচিত চেতনার বহির্বলয় ছেড়ে কবিতা যেখানে ডুব দিয়েছে চৈতন্যের গভীরে সেখানেই প্রতীকী কবিতার জন্ম। প্রতীকী কবিতা রূপক নয়। রূপক কবিতা সজ্ঞান মনের সৃষ্টি—একটা চতুর কাব্য-কৌশল মাত্র। তাতে দুটো অর্থ, দুটোই পরিচিত, পরিস্ফুট। কিন্তু প্রতীকী কবিতা সঙ্কেতময় ও একার্থক।

বাইরের উপকরণ দিয়ে সে শুধু ইঙ্গিত ক'রে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়—তারপর তুমি সেই রহস্যময় অবাঙ্‌ অনুভবের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াও। স্তব্ধ হও, বিস্মিত হও। বুঝবার চেষ্টা করে লাভ নেই, কারণ তা বোঝা যায় না। যা বোধাতীত, যা অস্ফুট, যা অপরিজ্ঞাত তাই প্রতীকী কবিতার বিষয়।

প্রতীক

আধুনিক বাংলা কবিতা যে ইউরোপীয় কবিতার প্রাণরসে পুষ্ট একথা অনস্বীকার্য। রোম্যান্টিক কবিতার উচ্ছ্বাস আতিশয্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন হিসাবে ফ্রান্সে প্রতীকী কবিতার জন্ম হয়। অথচ 'পারনাসিয়ান' * কবিতার সূক্ষ্ম সংবেদনা-হীন, বক্তব্য-প্রধান স্থূল প্রগাঢ়তা এঁদের কাম্য ছিলনা। বরং ইংরাজী কবিতার ইঙ্গিতময়তা আকৃষ্ট করেছিল এই আন্দোলনের নেতাদের। এড্‌গার অ্যালান পো'র আলোচনায় কবিতার শব্দসঙ্গীত সৃষ্টির এবং অনির্দেশ্য ইঙ্গিতমুখরতার জয়ধ্বনি করা হয়েছিল। তাঁর কবিতায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির মিশ্রণ যেভাবে দেখা গেছে তাই আকৃষ্ট করেছিল ফরাসী প্রতীকবাদীদের।

এঁরা বলতে চাইলেন, আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা, চেতনা ও অনুভূতি, শুধু স্বতন্ত্রই নয়, প্রতি মুহূর্তে তার রূপান্তর আছে। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষায় সেই তাৎক্ষণিক অনুভূতিকে ব্যক্ত করা অসম্ভব। প্রতিটি মুহূর্তের যে স্বতন্ত্র সুর, প্রতিটি ব্যক্তির যে প্রাতিস্বিক-চেতনা ও অনুভূতি, তাকে প্রকাশ করতে গেলে কবিকে একটি স্বকীয় পরিভাষা রচনা ক'রে নিতে হবেই। এই অনুভূতি এত স্বতন্ত্র, এত গতিশীল, এত অস্পষ্ট, যে একে ব্যক্ত করতে গেলে শব্দ ও চিত্রকল্পের প্রবাহের মধ্য দিয়ে, প্রতীকের মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করতে হয়।

এঁরা বিশ্বাস করতেন, প্রাতিভাসিক এই জগৎ—এটি বাস্তবিক পক্ষে সত্য নয়। এক অতীন্দ্রিয় পূর্ণতর অরূপ জগতের এটি প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সেই বাস্তবতর জগৎ অনুভূতি-গম্য, কিন্তু বুদ্ধির অগোচর। সেখান থেকে নিত্য উৎসারিত হচ্ছে সব শিল্প ও সঙ্গীত। তাই অনুভূতির মধ্য দিয়ে এই অপরূপ জগৎকে স্পর্শ করতে হবে, ভেদ করতে হবে, তবেই সেই উৎসে পৌঁছানো যাবে।

এমনকি এই জাগতিক বিষয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাম থেকে যে অনুভূতির আভাস মিলছে

* Le-Parnase Contemporin নামক কাব্যসঙ্কলনের মাধ্যমে বোদেলেয়রের নেতৃত্বে এই ফরাসী কবিগোষ্ঠীর উদ্ভব। এঁরা শিথিল বাকবহুল পদ রচনার বিরোধী ছিলেন।

তাও প্রায় অলৌকিক। তাও কবিতার বিষয়। কিন্তু সেই অলৌকিকতার ব্যঞ্জনা আনতে হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে আশ্রয় করতে হবে। তার বস্তু-রূপটুকু নয়, ভাব-রূপ টুকুকেই। এই জগৎকে অবয়ব দেবার আয়াসে, অনুভূতিগম্য এই ধ্বনিময় জগৎ-সৃষ্টির প্রয়োজনে, কবিরা সঙ্গীত-সূত্রে-সংবদ্ধ চিত্রকল্প-পরম্পরা এমন ভাবে উপস্থিত করবেন যে, যে কোনো mood বা myth পাঠকের সচেতন জ্ঞানের কাছে নয়—অসংজ্ঞান মনের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হবে।

আমরা 'প্রতীক' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করি, বলা বাহুল্য, তার থেকে প্রতীক-বাদের ব্যবহার কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র। যখন আমাদের রাষ্ট্রের প্রতীক হিসাবে অশোক-চক্রের উল্লেখ করি, তখন সে প্রতীক একটি 'আইডিয়ার' প্রথাগত অপরিবর্তনীয় বিকল্প মাত্র। প্রাচীন প্রতীকী নাটকের, কাহিনীর 'প্রতীক'ও এ নয়। সেখানে র প্রতীক ঐতিহ্য-মূলক, যুক্তি-নির্ভর ও নির্দিষ্ট। কিন্তু প্রতীক-বাদের (symbolism) প্রতীক কবির বিশিষ্ট ভাবনার বাহন বলে কবিনির্বাচিত ও যথেচ্ছ। কবির ব্যক্তিগত ও সাময়িক ভাবনার বাহন বলেই নিয়ত-পরিবর্তমান। এই মুহূর্তে যে বস্তু, শব্দ বা চিত্রকে ভাবনাটির প্রতীক বলে কল্পনা করা হচ্ছে পরমুহূর্তেই তাকে ত্যাগ ক'রে কোনো নূতন প্রতীককে আশ্রয় করতে পারে কবি-কল্পনা, নূতন কোনো দৃষ্টি-কোণ উন্মুক্ত করার তাগিদে। এখানে প্রতীকের স্থায়িত্ব বড় নয়—আসল কথা কবির অন্তরের একান্ত ব্যক্তিগত অপরিস্ফুট আকুতিকে তার সূক্ষ্মতা ও দুরূহতা সমেত পাঠকচিত্তে পৌঁছে দেবার সাধনা। এর জন্যে ব্যবহার-যোগ্য যে কোনো মাধ্যমই প্রতীকবাদের হাতিয়ার! কবি অবশ্য এজন্যে কবিতার সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনা বিন্দুমাত্র খোয়াতে প্রস্তুত নন। সেই জন্যে বস্তুর নামের সরাসরি উল্লেখ নয়, তার আভাস দিতেই ভালবাসেন প্রতীকী কবি। সরাসরি উপস্থাপনের ফলে 'পারনাসিয়ান'দের কবিতার রহস্যময়তাই খোয়া যেত। পড়ার সময় পাঠক যেন বস্তুটিকে সৃষ্টি করে নিচ্ছেন এমন অনুভূতির যে স্বাদ, যে আনন্দ—তাই যদি লোপ পেল তবে কবিতার রইল কি? উল্লেখ না ক'রে আভাসের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা, বস্তুকে যেন আবাহন ক'রে আবির্ভূত ক'রে তোলা, এখানেই ব্যঞ্জনার আসল আনন্দ।

প্রতীকী কাব্যের ভাবানুষঙ্গ ও প্রযুক্তিতেও জীবনানন্দ পশ্চিমী প্রতীকী কবিতার উত্তরসূরী। ওদেশের প্রতীকী কবিতার সঙ্গে তাঁর লেখায় চিন্তার সাদৃশ্য ও মনোভঙ্গিগত একাত্মতা কতখানি তা খুঁজে খুঁজে বার করতে হয় না অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে নজরে আসে।

ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম জীবনানন্দের রচনায় ইন্দ্রিয়চেতনার আশ্চর্য বৈভব দেখা গেছে।

জীবনানন্দের কবিতায় এই আধুনিক প্রতীক লক্ষণের প্রথম উন্মেষ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'মৃত্যুর আগে' কবিতায়। মৃত্যুর প্রাক্‌লগ্নে মানুষের চোখে এই প্রিয় পৃথিবীর যে রহস্যময় মোহনীয় রূপ উদ্‌ঘাটিত হয় তার সাংকেতিক প্রকাশ ঘটেছে সেখানে। এডগার এলান পো' যেমন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে উলটে পালটে ইন্দ্রিয়-চেতনার আশ্চর্য বৈভব রচনা করতেন সেই পদ্ধতি দেখা গেল সেখানে।

চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে।

: মৃত্যুর আগে

চালের গন্ধের ধূসরতা, রূপের ঝরে পড়া, মাছের চোখের বিশ্লেষণে নির্জন শব্দের উল্লেখ, ঘুমের ঘ্রাণ ; স্পর্শ যেন মানুষের মতো এসে হাঁসকে তুলে নিয়ে গেল—এই সব চিত্রকল্প ইন্দ্রিয়ানুভূতির এমন মিশ্র প্রয়োগে এক রহস্যমাখা কবিত্বময় মাদকতা সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে অভিনব ছিল। তবু মনে রাখতে হবে প্রতীকী কবিতার প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে এখানে, এটি কিন্তু প্রতীকী কবিতা হয় নি। যেখানে প্রতীকের ব্যবহার সাঙ্কেতিকতার নিগূঢ় তাৎপর্যে অন্বিত সেখানেই যথার্থ প্রতীকী কবিতার সাক্ষাৎ মিলবে।

'ক্যাম্পে', 'পাখিরা' এবং 'শকুন' কবিতাকে কেউ কেউ প্রতীকী কবিতা বলতে চেয়েছেন। এগুলিও প্রতীকী লক্ষণযুক্ত কবিতা, প্রতীকী কবিতা নয়। 'ক্যাম্পে' কবিতার হরিণ শিকারের কাহিনীকে মানব হৃদয় শিকারের রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এই তাৎপর্য কবি পরিণামে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রতীকী কবিতায় এ জাতীয় ব্যাখ্যার কোনো স্থান নেই। 'পাখিরা' কবিতায় পাখিদের জীবন সমস্যার রূপকে মানব জীবনের শাশ্বত আকাঙ্ক্ষাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে যেমন রূপক ও প্রতীক একাত্ম হয়ে মিশে আছে এ কবিতাও প্রায় তাই। তবে রূপক লক্ষণই প্রবল।

'শকুন' কবিতায় বরং প্রতীক লক্ষণ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। সমস্ত এশিয়া এখানে ভাগাড় যেন। এই কুৎসিত দিকহস্তীরা নানা দেশ থেকে আগত লোভার্ত আগন্তুক। ইতিহাসের ধারাস্রোত বেয়ে যে সব লোভার্ত অভিযান বারবার এই ভূখণ্ডে হয়েছে তাকে এক প্রতীকী ভাবনার মধ্যে অন্বিত করতে চেয়েছেন কবি—এ অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এই চিন্তার সঙ্গে মিশে আছে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কিত-রহস্যময় অনুভূতি।

'বনলতা সেন' কবিতায় এই প্রতীকী ভাবনা আরো পরিণত।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;

: **বনলতা সেন**

শিশিরের শৈত্য আছে জানি, কিন্তু শব্দ আছে কি? অথচ এখানে সেই শব্দের সঙ্গে সন্ধ্যার আসার উপমা! অথবা রৌদ্রের গন্ধ! আমরা বর্ণ মুছতে পারি—কিন্তু গন্ধও কি মোছা যায়? বিভিন্ন ইন্দ্রিয়চেতনাকে এমনি মিশ্রিত ভাবে অনুভব—এটি প্রতীকী কবিদের আগে কারো কবিতায় দেখা যায়নি। আর ইন্দ্রিয় চেতনায় বিচিত্র বিন্যাসেই শুধু নয়—হাজার বছর পথযাত্রী কবির যুগান্তরীণ সত্তার সমান্তরালে পৃথিবীর বয়সিনী নায়িকা 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'—চিত্রকল্পময় এই কবিতায় ফরাসী প্রতীকবাদের লক্ষণ স্পষ্টতর।

এমনই সত্য ও কল্পনার মধ্যে বিভ্রম রচনায় প্রতীকী কবিদের মতো জীবনানন্দেরও অসামান্য সাফল্য।) প্রতীকী কবিরা আমাদের অনুভূতি ও আকাজ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তবদৃষ্টি ও ক্রিয়ার মধ্যে বিভ্রম ঘটিয়ে তোলেন—এ প্রায়ই দেখা গেছে। জীবনানন্দের 'নগ্ননির্জন হাত,' 'স্বপ্ন' বা 'হাওয়ার রাত' কবিতাগুলিকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। মালার্মে 'ফন্নের দিবাস্বপ্নে' যেমন অনুভূতি ও আকাজ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তবদৃষ্টি ও ক্রিয়ার মিশ্রণ ঘটিয়ে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি জীবনানন্দ 'নগ্ন নির্জন হাতে'র নগরীর এক কাল্পনিক বাস্তবতা আনতে পেরেছেন বস্তুতঃ বুদ্ধিব জগৎ বর্জন করে অনুভূতির জগৎ আশ্রয় করায় এটি সহজ সাধ্য হয়েছে।

'অন্ধকার' কবিতায় কবি এই কাজের পৃথিবীকে বোদেলেয়রের মতই ঘৃণা করে "অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর, অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে" থাকতে চেয়েছেন।

তথাপি আসল আন্তর লক্ষণে সে সব কবিতা প্রতীকী সংজ্ঞাবাচ্য যা বাস্তবকে অতিক্রম করে পরাবাস্তবতার লোকে বিলীন হয়েছে। যার সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বুদ্ধির সংশ্লেষ একেবারেই অবলুপ্ত, ভাষায় ব্যাকরণ ও যুক্তি-বিন্যাস একেবারেই অনুপস্থিত। অন্তরের অনিবার্য তাগিদে যা মন থেকে প্রলাপের মতো উঠে আসে তা 'সাতটি তারার তিমির'-এর আগে পূর্ণরূপে কখনো ধরা পড়েনি। তবু 'মহাপৃথিবী'র 'বিড়াল' কবিতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করবো। সমস্ত কবিতাটি এখানে তোলার অবকাশ নেই শুধু পরিণতিতে এসে সেটি কি রকম সঙ্কেত গভীর হয়ে উঠেছে তাই দেখা যাক্—

হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরাণ-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা ঝুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে

তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

: বিড়াল

এ বিড়াল বলাবাহুল্য, কোনো বাস্তব পৃথিবীর বিড়াল নয়; প্রকৃতির কোন দুর্জ্ঞেয় প্রাণ সত্তাকে এখানে বিড়ালের রূপকে বেছে তুলে ধরা হলো তা বলা কঠিন। এমনই 'আমিষাশী তরবার', 'সন্ধিহীন স্বাক্ষর বিহীন', 'সমুদ্র পায়রা,' প্রভৃতি কবিতা এই পর্বে উল্লেখযোগ্য প্রতীকী রচনা। বাস্তব অপরিচিত তুচ্ছ বস্তুর আধারে নৈর্ব্যক্তিক ভাবনার রূপ ধরে দেবার কুশলতাই এইসব কবিতার আস্বাদনের অনন্যতার হেতু। অথবা হয়তো এর আপাতঃ দুর্বোধ্যতার অন্তরালে আমরা ভাবলোকের এক পূর্ণতার বলয় অনুভব করতে পারি।

'সাতটি তারার তিমিরে'র 'ঘোড়া' কবিতায় সত্য ও কল্পনার এই বিভ্রম, বুদ্ধির জগৎ বর্জন করে অনুভূতির কাছে আত্মসমর্পণ ও সাংকেতিকতার অন্তর্গূঢ় রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। কালপ্রবাহের মধ্যে বিচরণশীল মহীনের ঘোড়াগুলি 'নিওলিথ' যুগের অধিবাসী হয়েও এ যুগের আলোকিত সভ্যতার মধ্যে বিচরণশীল। নব নব দৃশ্যের পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে প্রাণশক্তির প্রতীক এই ঘোড়া প্রস্তর যুগের প্রাণহীনতা থেকে কামনা পরবশ হয়ে এই যান্ত্রিক জগতে ঘাসহীন খড়ের শব্দে সমাচ্ছন্ন আস্তাবলে ঘোরাঘুরি করছে।

> আমরা যাইনি মরে আজো—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়
> মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্না প্রান্তরে,
> প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
> পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।

: ঘোড়া

জীবনের নিরন্তর পট-পরিবর্তনের মধ্যেও যেন যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকতা আর প্রাগৈতিহাসিক নিথরতা লুকিয়ে আছে। এক আদিম ক্ষুধার আকর্ষণে যেন অতীতের জীবেরা আমাদের পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসে, আবার পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে দীপনেভা অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়।

এইসব কবিতার আশ্চর্য সাঙ্কেতিকার উৎসে রয়েছে জীবনে সম্পর্কে তাঁর একান্ত স্বকীয় দৃষ্টি। এই দৃষ্টির প্রসাদেই তিনি সমস্ত পাশ্চাত্য প্রতীকী কবিদের স্বগোত্র হয়েছেন, অনুকারী হন নি। বাস্তবিক প্রতীকী কবিতা কখনো অনুকৃত হতে পারে না, যার মধ্যে এক অখণ্ড অনুভবের মুখরতা আছে তিনিই শুধু ইচ্ছা করলে প্রতীকী

কবিতা লিখতে পারেন। অনুকরণ করতে গেলে বহিরঙ্গের খোলসটাই শুধু থাকবে—অন্তরের সেই বিপুল রিক্তত ঢাকা পড়বে কি ভাবে ?

মহীনের ঘোড়াগুলোর পশ্চাৎপটে হামিদের মরখুটে ঘোড়াগুলোর দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

কে যেন উঠিল হেঁচে,—হামিদের মরখুটে কানা ঘোড়া বুঝি!
সারাদিন গাড়ি-টানা হলো ঢের,—ছুটি পেয়ে জ্যোৎস্নায়
নিজ মনে খেয়ে যায় ঘাস ;
যেন কোনো ব্যথা নাই পৃথিবীতে—আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি ?

: নিরালোক

মৃত্যুর আঘাত প্রতিহত ক'রে এখানে জীবনের উল্লাস ও আনন্দ বহন করেছে। এই বাস্তব জীবন্ত ঘোড়ার সঙ্গে মহীনের প্রস্তর যুগের ঘোড়াকে সমীকৃত করা ভুল হবে। আরো একটি কবিতায় দেখেছিলাম উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত নারীকে যে কুয়াশা ঘোড়ায় তুলে নিতে আসবে সেই ঘোড়াটিকে

তাহার ধূসর ঘোড়া চরিতেছে নদীর কিনারে
কোনো-এক বিকেলের জাফরান দেশে।

: স্থবির যৌবন

বাস্তব পৃথিবীর ঘোড়া কিভাবে প্রাণশক্তির প্রতীক এবং আরো পরে মৃত্যুর দূর-অভিযাত্রার বাহন হিসাবে মৃত্যুর প্রতীক হয়ে উঠেছে তা লক্ষ্যণীয়। ভাবনার ক্রম-পরিণতিতেই যে জীবনানন্দের কাব্য-প্রতীকের জন্ম তাতে সন্দেহ নেই। টি. এস. এলিয়ট একদা এমনই এক আন্তর উপলব্ধিকে ভাষা দিতে প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার একটু নমুনা রাখা যেতে পারে। দেখা যাবে প্রযুক্তিতে কতখানি আত্মীয় হয়েও জীবনবোধে কতখানি দূরত্ব রাখা সম্ভব। লক্ষ্য করুন এই দুইজনই ইতিহাস-চেতন কবি, তবু আমরা দেখেছি জীবনানন্দের ইতিহাস-চেতনার মর্মে মৃত্যু আর করুণার অভিজ্ঞান কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত পর্বে জীবনের নিষ্প্রেম নিরর্থকতা থেকেহতাশ বিতৃষ্ণায় উপনীত হয়েছিলেন এলিয়ট—

Lady three white leopards sat under a janiper tree
In the cool of a day, having fed to sotiety
On my legs my heart my liver and that
which had been contained
In the hollow round of my skull. And god said
Shall these bones live ? shall these
Bones live ?......

: Ash. Wednesday

এখানে কবির বিক্ষত শরীর ও আত্মার এই উপলব্ধির অভিব্যক্তির প্রয়োজনে প্রতীক নির্বাচনে যতখানি উচ্চাঙ্গের কুশলতা দেখা গেছে বক্তব্যের মধ্যে ততখানি নিগূঢ় সঙ্কেতময়তা নেই। তুলনায় জীবনানন্দের কবিতার নিবিড়তা ও শিল্পিতা প্রশ্নাতীত।

সে-আগুন জ্ব'লে যায়—দহেনাকো কিছু।
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায়—দহেনাকো কিছু।
নিমীল আগুনে ওই আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মতো।
পৃথিবীর রাজহাঁস নয়—
নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত
সন্ধ্যায় নদীর জলে এক ভিড় হাঁস অই—একা;
এখানে পেল না কিছু, করুণ পাখায়
তাই তা'রা চ'লে যায় শাদা,—নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হ'লো মুখ দেখা।

: একটি কবিতা

শুধু পংক্তির পুনরুক্তি প্রবণতাতেই এলিয়টের প্রভাব নয়—সমস্ত কবিতার ভাবনা কল্পনাতেও সারূপ্য রয়েছে। তবু সব সত্ত্বেও পাশাপাশি রেখে পড়লে দুজনের শক্তি দুর্বলতায় ও কবিধর্মের বিশেষত্ব নজরে আসবে। এলিয়টের দক্ষতা মননের বলিষ্ঠ বৈদগ্ধ্যে, প্রকরণের নিটোল নিপুণতায়,—জীবনানন্দের ঐশ্বর্য অন্তরেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম স্পর্শচেতনায়। জীবনানন্দ যে অর্থে যথার্থ প্রতীকী কবি, এলিয়ট সেই আত্মার অতলতা ছুঁয়ে আসতে পারেন কি?

সার-রিয়্যালিজম

খেতে বসে যখন জলের গ্লাস উল্টে যায়, তাড়াতাড়ি আঙুল দিয়ে একটা ভিজে দাগ কেটে দেন আপনি—যাতে জলটা ইচ্ছে মতো গড়িয়ে না চলে। আমাদের প্রাণও এমনি অভ্যাস ও জড়ত্বের দাগকাটা পথে বয়ে চলছে। তার দুরন্ত অনির্ণেয় এলোমেলো স্বভাব-ছন্দে গড়িয়ে পড়তে পারছে না। আমাদের জীবন-যাত্রা, অভিজ্ঞতা, চিন্তা, কল্পনা সব কিছু এতই ছককাটা হয়ে গেছে যে কোন উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ-বিস্ময়েই আর অভাবিতের স্বাদ নেই। সচেতন বুদ্ধি ও অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্ত

ক'রে জীবনকে যদি এলোমেলো পথে বইয়ে দেওয়া যেত, পাহাড়ী ঝরণার দুরন্ত জলধারার মতো সব কিছু যদি ডুবিয়ে ভাসিয়ে, সরিয়ে পাশিয়ে ছুটে চলতে পারতো তবে বোধহয় আত্মার মুক্তি সম্ভব হতো।

জীবনের প্রথানুগ স্থবিরতা থেকে মুক্তির আকুতিতেই, আত্মার সেই সলীল রহস্যময় গতিচ্ছন্দটি অনুভবের ইচ্ছাতেই সার-রিয়ালিজমের উদ্ভব। পাবলো পিকাসো (Pablo Ruiz Picasso) এবং আপোলিনেয়র (Guillaume Appollinaire) যখন দৃশ্যমান বস্তু-রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে তার আন্তর রূপের সন্ধানে কিউবিজমের (Cubism) পত্তন করেছিলেন তখন কেউ কল্পনা করতে পারেন নি কি অসীম রহস্যের মায়াপুরীর খিল খুলছেন তাঁরা। বস্তুর একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে যা আমাদের দৃষ্টির পরিধিতে ধরা পড়ে না। একে তো আমাদের দৃষ্টির মধ্যেই অপূর্ণতা আছে; বস্তুর পরিপূর্ণ রূপে তাতে ফোটে না। অর্থাৎ তাতে 'ফোর্থ ডাইমেনশান' নেই। উপরন্তু সেই দেখাটাও আমরা নির্বিকার নিরাসক্ত হয়ে দেখতে পারি না। আমার ব্যবহারিক প্রয়োজনের আলোতে দেখি বলেই খানিকটা দেখি, খানিকটা বাদ দিই।

আমাদের চোখের সামনে বস্তুর যে রূপ রয়েছে আমাদের মনের সামনে তার সেই রূপ নেই। টেবিলের যে অংশটি আমার দৃষ্টির আড়ালে তা আমার কল্পনার আড়ালে নয়। সুতরাং বস্তুকে যদি তার স্বরূপে আঁকতে হয় তাহলে দৃশ্যের সঙ্গে ওই কল্পনাও যুক্ত করা চাই।

পিকাসো তাঁর কিউবিষ্ট চিত্রে এটা করেছেন দুই উপায়ে। এক,—বস্তুটিকে নানা কোণ থেকে যেমন দেখায় সেই জ্যামিতিক দৃশ্যগুলিকে একই ছবির মধ্যে গেঁথে রেখেছেন। এইভাবে বস্তুর সম্পূর্ণ অবয়ব পরিদৃশ হয়েছে—চতুর্থ আয়তন ধরা পড়েছে। এইভাবে জ্যামিতিক রেখার সাহায্যে ছবি আঁকাতে সুবিধা হয়েছে এই যে—শিল্পীর মনোভাব হৃদয়াবেগের স্পর্শ-বিমুক্ত হওয়ায় ছবি বস্তুর নৈর্ব্যক্তিকতা লাভ করেছে।

পিকাসোর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আরো বিচিত্র। কোনো একটি অতিপরিচিত বস্তুর রূপও যখন আমরা ভাবি তখন তা আমাদের স্মৃতিতে একেবারে পরিপূর্ণ আকারে আসে না, আমাদের মানসিক পক্ষপাত, প্রয়োজনগত তাগিদ এবং ভাবানুষঙ্গ হিসাবে কিছুটা আগে আসে, কোনো অঙ্গ পরে, কিছু বা একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। সুতরাং বাইরের ওই জ্যামিতিক আকৃতিটা হটিয়ে দিয়ে আমাদের মনের চিন্তাগুলিকে যদি পরপর পৃথক পৃথক রূপে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলি তাহলে সব কিছু অত্যন্ত আজগুবি মনে হবে।

এক কথায়, কিউবিজম ও উত্তর-কিউবিজম চিত্রধারায় বস্তুর পরিদৃশমান রূপের অন্তরে যে স্বকীয় সত্তা রয়েছে তারই উদ্ঘাটন লক্ষ্য ছিল। কোথাও বস্তুর বিভিন্ন-

দৃষ্টিকোণগুলি একত্র গেঁথে চতুর্থ আয়তন ফোটাবার প্রয়াস, কোথাও বা মনের প্রতিফলনে বস্তুর প্রতিলিপি রচনার সাধনা। প্রথম পদ্ধতির দৃষ্টান্ত পিকাসোর 'কুবেলিকের প্রতিমূর্তি' বা 'ফনের মাথা', দ্বিতীয় পদ্ধতির দৃষ্টান্ত 'এসরাজ'।

আপোলিনেয়র, মাক্স জাকভ ইত্যাদিরা সাহিত্যে কিউবিজমের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জীবনের আন্তর রূপের সন্ধানে ব্রতী হলেন। তাঁরা দেখলেন জীবনে এমন এক এক রহস্যময় অভিজ্ঞতার মুহূর্ত আসে যখন বস্তুর চিরপরিচিত রূপ মুছে যায়—তখন এক বিস্ময়কর উল্লাস অন্তরে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেই সব মুহূর্তে আমরা হঠাৎ অনুভব করি আমাদের এই চেনা জানা জীবনটার বাহ্য আবরণের নিচে রহস্যাবৃত জীবন-সত্য নিহিত আছে—তিমির রাত্রে বিড়ালের জ্বলন্ত চোখের হিংস্রতায় যেমন পোষমানা কোলের মিনিটার আন্তর-সত্তার সন্ধান পাওয়া যায়।

সার-রিয়ালিষ্টরা (Surrealist) এই পথেই আরো এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা ভাবলেন, আমাদের কল্পনায় বহির্বস্তুর যে রূপান্তর হয়, তার মূলে আমাদের মগ্নচেতন সত্তার সক্রিয়তা আছে। এই মগ্নচেতন জগতের রহস্যের উদ্ঘাটনই সার-রিয়ালিজমের লক্ষ্য। যে বিষয়েই আমরা চিন্তা করি সেই চিন্তাটা প্রথমে কতকগুলি বস্তু বা 'আইডিয়া'-বহ শব্দের সমাবেশ হয়ে আসে। সেই শব্দ-সমাবেশকে আমরা ব্যাকরণের এবং যুক্তির বিচারমতো বিন্যাস ক'রে লোকের বোধগম্য করে তুলতে ঠিক যেন অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করি। নিরন্তর প্রকাশের তাগিদে মনের এই অনুবাদ-ক্রিয়ায় আমরা অত্যন্ত অভ্যস্ত বলেই সেই অগোছালো, আনকোরা, কার্য-কারণ-ক্রিয়ার পারম্পর্যহীন অবস্থাটি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু এই অনুবাদের সচেতন দক্ষতা যখন লোপ পায়,—যেমন জ্বরের প্রবল বিকারে যখন আমরা প্রলাপ বকি, তখন মনের সেই অসংজ্ঞেয় স্তরটি উদ্ঘাটিত হয়। জাগতিক বস্তু বা ভাব-প্রসঙ্গে আমাদের বিক্ষিপ্ত চিন্তা সমূহকে যখন আমরা বোধগম্য ভাষায় সাজাই তখন স্বতঃই কিছুটা বাদ পড়ে যায়—যা আমরা ভাষায় ঠিক বোঝাতে পারি না, যা আমাদের সজ্ঞান মনের স্বীকার করতে বাধে, যা আমরা অবান্তর ভেবে বর্জন করি, তুচ্ছ মনে ক'রে বাদ দিতে চাই অথচ আদৌ তা অবান্তর নয়, তুচ্ছ নয়, কারণ এইগুলিই আমাদের ব্যক্তিত্বের এবং চরিত্রের যথার্থ এবং পূর্ণতর স্বাক্ষর বয়ে থাকে। তাই আমাদের ভাব-কল্পনা সেই চেতন অনুবাদের স্তরে পৌঁছনোর আগেই শিল্পীরা সেই চিন্তাবহ শব্দ-সমষ্টি, চিত্র, রূপক ইত্যাদিকে যথাযথ অমার্জিত অবস্থায় তুলে ধরতে চান। যে কোনো ভাবনার অনুষঙ্গে মানুষের মনে চিন্তা, শব্দ, রূপক, চিত্রকল্প স্বতঃই আসে তা যতই অর্থহীন, আত্মবিরোধী, অবাস্তব মনে হোক, অবশ্যই গভীর নিহিত তাৎপর্য আছে; তাই সার-রিয়ালিষ্ট কবিতায় এইসব চিন্তা-চিত্র-শব্দ-রূপককে তার অমূল্য জ্ঞান করা হয়। মন যে স্তরে বুদ্ধির শাসনে

আসে নি, যখন সে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়—সার-রিয়ালিজম সেই স্তরের পরিভাষা। সার-রিয়ালিষ্ট কবি তাই যে চিত্রকল্পগুলি আঁকেন তার মধ্যে এমন প্রবল দুর্লঙ্ঘ্য আত্মতা আছে, এমন অন্ধ আবেগ বা মূঢ় শক্তি আছে যা আমাদের ব্যক্তিত্বের মূল-ধাতুতে গিয়ে আঘাত ক'রে গভীর ক্ষত রেখে যায়, সেই আঘাতে আমাদের আত্মার কেন্দ্র নড়ে চড়ে স্থিততর হয়ে আসে।

সার-রিয়ালিষ্ট শিল্পসৃষ্টি দুরূহ বলেই এখানে বিকৃতি বেশি। সাধারণ পাঠক-দর্শকের অজ্ঞানতা ও বিমূঢ়তার সুযোগ নিয়ে এখানে আসর জমিয়ে বসা সহজ এবং হয়ও তাই। যার উপহাস্য রূপ এতদূর অবধি পৌঁছেছে যে, কোনো শিম্পাঞ্জির আঁকা উচ্চাঙ্গের (?) সার-রিয়ালিষ্ট চিত্রসমূহ আমেরিকায় উচ্চমূল্যে বিক্রয় হচ্ছে! এই ভাবেই এই শিল্প-পদ্ধতি রসিকের শ্রদ্ধার ক্ষেত্র থেকে সরে যাচ্ছে।

তবু মনে রাখতে হবে নকল ও আসলের নির্ধারণ কঠিন হলেই আসল ঝুটা হয়ে যায় না। বরং প্রকৃত জহরীর মতো নকলের ভিড় থেকে আসলটি চিনে নিতে শিখলে আমরাই লাভবান হবো। আমরা দেখেছি সার্থক সার-রিয়ালিষ্ট শিল্পের আপাত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে এমন এক নিহিত চরিত্র থাকে—যা আমাদের চেতনার গভীরে অনুপ্রবেশ ক'রে আমাদের আত্মাকে প্রবলবেগে নাড়া দিয়ে যায়। এই সংবাদ-শালিতায় যেখানে ত্রুটি ঘটে সেখানেই শিল্পের ব্যর্থতা। সেই সৃষ্টিকে আমরা কিছুতেই সার্থক শিল্প বলে স্বীকার করতে পারি না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে বাংলা কবিতায় সার-রিয়ালিজমের যে প্রচণ্ড প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, স্বীকার করতে আপত্তি নেই তাতে বিকারই ছিল বেশি। নয়তো আমাদের সমস্ত চেতনার বিরোধিতা সত্ত্বেও সেই সব কবিতা লুপ্ত হতো না, আমাদের সত্তার গভীরে আশ্রয় পেতো। কিন্তু সেই ব্যর্থ আন্দোলনের গর্ভেই অন্তত কিছু উজ্জ্বল কবিতার জন্ম হয়েছিল, যা প্লাবনের ঘোলা জল সরে গেলেও আমাদের আত্মার আশ্রয়চ্যুত হয় নি! এই সব কবিতার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক কবিতা যে জীবনানন্দের, একথা বলাই বাহুল্য। তাঁর অধিকাংশ সার-রিয়ালিষ্ট কবিতা, যার এক বৃহৎ অংশ তাঁর জনপ্রিয় 'সাতটি তারার তিমির' এবং শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে—আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, অনুভব ও অভিজ্ঞতার উচ্চরোল প্রতিবাদ নিরস্ত ক'রে অন্তরে আসন পেতে নিয়েছে। এই সব কবিতার আপাত-নিরর্থ বিক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-সমূহের গুঞ্জরণময় কলতানের ভিতরে এমন এক দুর্বোধ আকর্ষণের ঐকমন্ত্র আছে যা আমাদের সংজ্ঞান চিত্তের অংশী হয়ে আছে। একটি অতি বিখ্যাত কবিতার কিছুটা দেখা যাক্—

> বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হ'য়ে নিভে যায়—তবু
> ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হ'য়ে গেছে :

হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে ;
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে ;
সচ্ছল কঙ্কাল হ'য়ে গেছে তারপর ;
বিলোচন গিয়েছিলো বিবাহ-ব্যাপারে ;
প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে
সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল ।
সমস্ত আচ্ছন্ন সুর একটি ওঙ্কার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায় ।
এ-বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরণময় !
যুগে-যুগে মানুষের অধ্যবসায়
অপরের সুযোগের মতো মনে হয় ।
কুইসলিং বানালো কি নিজ নাম,—হিটলার সাত কাণাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হ'য়ে গেল লাল :
মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল,···

: সৃষ্টির তীরে

অর্থের অতীত কোনো মন্ত্রের জাদুতে আমাদের অনুভব-শক্তির উপর ক্রিয়া করে ব'লেই চেতনার সাময়িক আবেশের ছিদ্রপথে এই সব কবিতা আমাদের অন্তরে অনুপ্রবেশ করতে পায় । নতুবা একে প্রলাপোক্তির মতো বাতিল করা চলতো ।

উপমা

সুর-রিয়ালিষ্ট শিল্পীর হাতে রূপক-চিত্রকল্পের মধ্যে যে এক অন্ধ শক্তি, প্রচণ্ড আবেগ জন্ম নেয় তা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি । সেখানে দেখেছি কোন সচেতন কাব্যশ্রী-সাধনা থেকে নয়, অন্তরের দুর্জ্ঞেয় অতলতা থেকে দুর্নিবার তাগিদের বসে এই সব চিত্রকল্প উৎসারিত হয় । তাই প্রচলিত কাব্য-কলা বিধির মতো এই সব কাব্য-প্রকরণকে কবিতার রসবিচারে বহিরঙ্গ জ্ঞানে তাচ্ছিল্য করা যায় না ।

বাংলা কাব্যে চিত্রকল্পের (Image) প্রবর্তনা কার হাতে হয়েছিল বলা কঠিন । তবে এটা ঠিক, এর আবির্ভাব ইউরোপীয় কবিতার অনুস্মৃতি-ক্রমে । পূর্বতন বাংলা কাব্যেও খুঁজলে চিত্রকল্প পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই,—কিন্তু চিত্রকল্প রচনার বিশুদ্ধ প্রয়াস সেখানে অবশ্যই অনুপস্থিত ছিল । চিত্রকল্প হলো রূপক বা অতিশয়োক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ । ভাবকে কোন চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাই চিত্রকল্পের অন্তর্নিহিত

কৌশল। চিত্রকল্প কি জিনিষ অনেকের কাছে তার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। অনেকেই রূপক বা সমাসোক্তি এবং চিত্রকল্প একই বস্তু মনে করেন। বস্তুত এদের মধ্যে পার্থক্য দুস্তর। রূপক দুইটি পৃথক বস্তুর ভাব-গ্রন্থি, সমাসোক্তি কোন বস্তুতে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ব্যবহারের আরোপ। চিত্রকল্প এর কোনটাই নয়। সেখানে কোন একটি অরূপ ভাবকে প্রকাশ করতে একটি চিত্রের সৃষ্টি শুধু। চিত্রকল্পে দুই অঙ্গ—এক, চিত্র, দুই, কোনো ভাবের পরিবর্তে সেই চিত্রটির কল্পনা অর্থাৎ প্রয়োগ।

বাংলা কবিতায় সার্থক এবং অজস্র চিত্রকল্প-সৃষ্টিতে জীবনানন্দ আশ্চর্য সিদ্ধ-হস্ত। বাংলা কাব্যে তিনি যদি এর প্রবর্তক নাও হন—এর নির্বিকল্প প্রতিষ্ঠা যে তাঁর হাতে তাতে সন্দেহ নেই। 'বনলতা সেনে'র চিত্রকল্পগুলির দূর-প্রসারী ব্যঞ্জনা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন তবু তারই একটি নমুনা নেওয়া যাক্—

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকায

এখানে শুধু মুখের নিখুঁত নিটোল গঠনই কবির বাচ্য নয়, অথবা সেই সৌন্দর্যকে বক্রোক্তিতে কাব্যময় করে তোলাই উদ্দেশ্য নয়, প্রাচীন ভারতের এক শিল্প-সমৃদ্ধ স্বর্ণ-যুগের অভিজ্ঞানও এতে আছে, যার ফলে একটি নারীর মুখশ্রীতে ভারতীয় সৌন্দর্য-পিপাসা এবং প্রেমের কালাতিসরণও ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'শ্রাবস্তী'র অনুষঙ্গে আর্য-নারীত্বের ব্যঞ্জনা পেয়েছেন শ্রদ্ধেয় সঞ্জয় ভট্টাচার্য। কারুকার্য কথাটিতে গ্রীক-ভাস্কর্যের সংহত সুষমা ও শারীরী লাবণ্যের স্মৃতি আসে না কি?

'আকাশলীনা' কবিতায় মুগ্ধ প্রেমিক নায়িকাকে অনুযোগ জানিয়ে সতর্ক করেছিল—

মৃত্তিকার মতো তুমি আজ
তার প্রেম ঘাস হ'য়ে আসে।

: আকাশলীনা

মৃত্তিকার নীরব সহিষ্ণুতাকে ঘাস যেমন নিঃশব্দ-সঞ্চারী ব্যাপ্ত আবরণে ধীরে ধীরে আবৃত আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে ওই যুবকের প্রেম তেমনই নায়িকাকে গ্রাস করতে চলেছে।

নৈঃশব্দ্যের একটি ভয়াবহ চিত্রকল্প আছে আরেকটি কবিতায়—

এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোন-এক নিস্তব্ধতা এসে।

: আট বছর আগের একদিন

ক্রন্দনরতা নারী / পিকাশো

লে রেপো দু মোদেল / মাতি

রজনীর স্মৃতি / রুশোলা
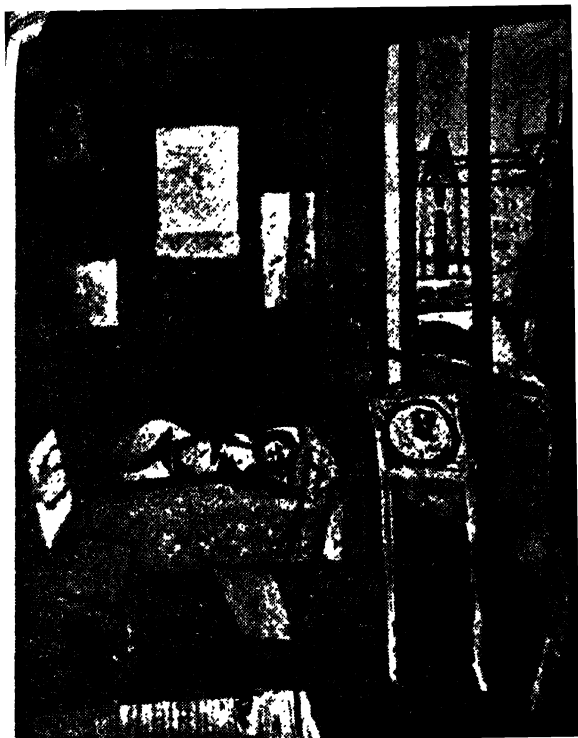
অন্ধকার জানালায় হঠাৎ উটের দীর্ঘ কদাকার গ্রীবাটুকু দেখলে অলস্কৃত মানুষ যেমন চমক, ভয় ও অস্বস্তি বোধ করে ক্লান্ত লোকটির চেতনায় দুঃসহ নিস্তব্ধতা তেমনি আত্মহত্যার প্রলোভন নিয়ে এসে দাঁড়ালো।

একদা জীবনানন্দ বলেছিলেন 'উপমাই কবিত্ব'। উপরিউক্ত চিত্রকল্পগুলি তারই অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে। বস্তুত উপমা নির্বাচনের অনবদ্যতার মধ্যে জীবনানন্দের শিল্পী-সত্তার অবিনশ্বর পরিচিতি লুকিয়ে আছে। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে উপমা কবিত্বের অপরিহার্য অঙ্গ, আরোপিত অলঙ্কার-মাত্র নয়, এ কথার যাথার্থ্য জীবনানন্দের কবিতায় বার বার উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাঁর সৌন্দর্য-পিপাসু কবি-মন যে অনবদ্য কৌশলে উপমার সাহায্যে কাব্যের উপযোগী আবহ সৃষ্টি করে তার দৃষ্টান্ত সর্বত্র মিলবে।

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল,—
ডালিম ফুলের মত ঠোঁট যার,—রাঙা আপেলের মত লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ,—আর আঁখি গোধূলির মত গোলাপী রঙীন,
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে,—স্বপ্নে—কতদিন !

: ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল

কিশোর চিত্তের মুগ্ধরাগ এখানে বর্ণময় উপমার মধ্যে ধরা পড়েছে। আবার শির শির করা শীতল সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি হয়েছে অন্য একটি কবিতায়—

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম ;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।

: শঙ্খমালা

এই সব উপমা-চিত্রকল্পের মধ্যে জীবনানন্দের পরিণত শিল্পী-স্বভাব উদ্ঘাটিত হয়েছে। শুধু একথা বললেও যথেষ্ট হয় না, তাঁর কবি জীবনের পর্বে পর্বে এই শিল্পী-প্রাণের ক্রমোন্মেষ ও ধারা-বদলের ইতিহাসও নিহিত আছে। বস্তুত জীবনানন্দের চিত্রময়তা, বর্ণময়তার উৎস কোথায়, ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। 'ঝরাপালকে'র আমল বর্ণানুরাগের কাল। এত উজ্জ্বল, এত সুন্দর চিত্র 'রসেটি'র কাব্য ছাড়া আর কোথাও মিলবে না। তবু সেই বর্ণোজ্জ্বলতা হৃদয়-রাগ রঞ্জিত হলেও তার ভাব-রস ক্ষীণ; রসেটির কবিতার মতোই সে চিত্রশালা মূক।

'বনলতা সেনে'র স্তরে এই রূপের মধ্যে ভাষার, রঙের মধ্যে প্রাণের, রেখার মধ্যে ব্যথার উৎসার হয়েছে। বাংলা শিল্পকলার যে সূক্ষ্ম সংবেদনা, কবি-সুলভ মনোময়তা

ও যে বর্ণিল উজ্জ্বল উজ্জীবন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায়ের হাতে, তার সাথে জীবনানন্দের চিত্রকুশলতার কোনো আত্মিক যোগ অন্তত এই পর্বে খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। 'ঝরাপালকে'র বর্ণাঢ্য উজ্জ্বলতা নেই আর। বরং এক মনোভব চেতনার অনুষঙ্গে কবিতাগুলি রূপময় এখন।

১। মা-মরা শিশুর মতো আকাজ্ক্ষার মুখখানা কি যে;
ক্লান্তি আনে, ব্যথা আনে, তবুও বিরল কিছু নিয়ে আসে নিজে।

: জর্ণাল : ১৩৪৬

২। শুকনো অশ্বত্থ পাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের;

সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর;
হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।

: শিকার

আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থ-বিষণ্ণতা ব্যক্ত করতে মা-মরা শিশুর করুণ বিমর্ষ মুখের ছবিটিকে আমাদের মনে এমন গেঁথে দেবার শিল্পিতা আশাতীত ছিল প্রথম পর্বে। আগুনের অনুষঙ্গে কুঙ্কুমের কল্পনাই কেবল আসতে পারতো তখন—এখন নূতন এক অনুভবের আলোয় সেই কুঙ্কুমের রঙ মুছে গিয়ে সেই আগুনই হয়ে উঠেছে রোগা শালিকের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।

আরো পরের কালে তাঁর মনে আধুনিক শিল্পীদের প্রভাব যে কত গভীর হয়েছিল তার প্রমাণ আগেই পেয়েছি। এযুগের চিত্ররূপের মধ্যে সেই প্রভাবের বিস্তার কি ভাবে হয়েছে নীচের উদ্ধৃতিতে তার দৃষ্টান্ত মিলবে—

অনেক ফাটল নোনা আরসোলা কৃকলাস দেয়ালের 'পর
ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেয়ে ফেলে অনুরাধাপুর—ইলোরার;
মাতিসের—সেজানের—পিকাসোর;
অথবা কিসের ছবি? কিসের ছবির হাড় গোড়?
কেবল আধেক ছায়া—
ছায়ায় আশ্চর্য সব বৃত্তের পরিধি র'য়ে গেছে।

: অবরোধ

এখানে শুধু অবান্তরভাবে আঁরি মাতিস্ ১৮৬৯—১৯৫৪, পল সেজান ১৮৩৯—১৯০৬ ও পাবলো পিকাসোর মতো মহান শিল্পীর নাম বা কয়েকটি শিল্প-প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে এমন মনে করলে ভুল হবে। কবি এখানে শিল্প-চেতনার যুগ-যুগব্যাপী বিবর্তনের সংক্রান্তিতে দাঁড়িয়ে তার ব্যর্থতাকেই ইঙ্গিত করেছেন। তবু এখানেও

এই ধ্বংসমান ঐতিহ্যের যে ছবিটি কবি শব্দের আখরে এঁকেছেন তাও কি আধুনিক শিল্পরীতি স্মরণ করিয়ে দেবে না? ইতঃপূর্বে উল্লিখিত 'সৃষ্টির তীরে' কবিতায় তিনি আলোছায়ার জাদু শিল্পী পল গগ্যাঁর ছবির প্রসঙ্গ যেভাবে এনেছেন তার মধ্যে আধুনিক শিল্পের আরো নিগূঢ় উপলব্ধি নিহিত আছে—

…নানা রূপ জ্যামিতিক টানের ভিতরে
স্বর্গ মর্ত্য পাতালের কুয়াশার মতন মিলনে
একটি গভীর ছায়া জেগে ওঠে মনে;
অথবা তা' ছায়া নয়—জীব নয় সৃষ্টির দেয়ালের 'পরে
আপাদ মস্তক আমি তার দিকে তাকায়ে রয়েছি;
গগ্যাঁর ছবির মতো—তবুও গগ্যাঁর চেয়ে গুরু হাত থেকে
বেরিয়ে সে নাক-চোখে ক্বচিৎ ফুটেছে টায়ে-টায়ে,
নিভে যায়—জ্ব'লে ওঠে, ছায়া, ছাই, দিব্যযোনি মনে হয় তাকে।

: সৃষ্টির তীরে

এখানে আধুনিক কিউবিষ্ট ও সার-রিয়ালিষ্ট ছবির আভাস খুঁজে পাওয়া যাবে।

আধুনিক শিল্পীর মতোই জীবনানন্দের কবিতায় চিত্রকল্প ও উপমা সর্বদাই সৌন্দর্যমুখী নয়, প্রয়োজন মতো বীভৎস ও ঘৃণ্য দৃশ্যও তিনি এঁকেছেন। সমালোচকদের বিদ্রূপ করতে গিয়ে তাঁর কলম যখন খরশান হয়ে উঠেছে সেখানে তার রূপ—

কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক; দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;

: সমারূঢ়

পিঁচুটি আর মাংস কৃমি খোঁটার বর্ণনায় যে অকুণ্ঠ ঘৃণার নগ্নতা—বাংলার সাহিত্য ঐতিহ্যে তাকে চূড়ান্ত কল্পনা-প্রতিভা ব'লে স্বীকার করতে বাধা নেই।

এই সব চিত্রকল্পগুলি পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীত হবে—তাঁর চিত্রকল্পগুলি ফরাসী প্রতীকী বা পরাবাস্তববাদী কবিদের চিত্রকল্পের মতো নয়। শেষোক্তদের চিত্রকল্প বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্ত্রণহীন অবচেতনার উন্মোচন। ভাবনা-কল্পনা ও চিত্রের এমন বিশৃঙ্খল স্বচ্ছন্দ সমাবেশ জীবনানন্দের কবিতায় খুব বেশী দেখা যায় না। ইংরেজ ও মার্কিন চিত্রকল্পবাদী (Imagist)রা এই ফরাসী রীতিকে সমর্থন করেন নি। তাঁরা বরং চেয়েছিলেন বর্ণনাকে আরো বস্তুনিষ্ঠ, ভাবনাকে আরো ঘনীভূত, ভাষাকে আরো সহজ বোধ্য ও কথ্য ক'রে তুলতে। তাঁরা চেয়েছেন স্বয়মাগত ভাবনা প্রবাহ ও চিত্র

পরস্পরকে পাঠকে অনুভূতিগম্য এক তাৎপর্যগভীর কাঠামোর মধ্যে ধরে দিতে। সার-রিয়ালিষ্টরা পাঠকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নির্বিকার, কিন্তু ইমেজিষ্টরা ততখানি নন। তবু তাঁদের চিত্রকল্প সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টতর হ'লেও আবেগময়তা বা অর্থের সঙ্গে যুক্ত না হওয়ায় অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। 'সাতটি তারার তিমিরে' শেষ দিকের রচনায় চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে এই ধরনের বাঞ্ছিত বিবর্তন দেখা যায়। তিনি তাঁর কবিতাকে অর্থ বা আবেগময়তা থেকে খুব বেশী সরে যেতে দেন নি। সাতটি তারার তিমিরের 'দীপ্তি', 'সূর্য প্রতিম,' বেলা অবেলা কাল বেলার 'সময় সেতু পথে,' 'আমাকে একটি কথা দাও' প্রভৃতি কবিতা প্রসঙ্গত স্মরণ করতে হবে। তাঁর চিত্রকল্পের দ্বিতীয় বিশেষত্ব অন্যান্য কবির মতো বস্তু-জগৎ ও জীবন তাঁর অনুভূতিতে কোনো তত্ত্ব হ'য়ে আসেনি; অথচ বস্তু সম্পর্কে কবির সদা-জাগ্রত কৌতূহল এবং সন্ধিৎসাই অনুভবের আকারে অজস্র ত্বরিত উপমার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ভাব থেকে রূপে অর্থাৎ রূপকে চ'লে যেতে কবির কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি চিন্তাই অনুষঙ্গ-ক্রমে এক একটি চিত্র এনে দেয়; সেই চিত্র আবার নূতন পরিবেশের সৃজনে ভাবটিকে উজ্জীবিত ক'রে তোলে। এই সলীল দ্বিমুখী প্রক্রিয়া যেন সর্বদাই চলেছে। অর্থাৎ একদিকে ভাব চিত্রকে বহন ক'রে আনছে, অন্যদিকে চিত্র আবহ সৃষ্টি ক'রে ভাবকে মূর্ত ক'রে তুলছে। কবির সতর্ক রূপচেতন মনের কাছে কোনো শক্তিই অপব্যয়িত হচ্ছে না।

কবির এই রূপচেতনা বিচ্ছিন্ন অনুভূতি হয়েই নেই। মনের গোপন মনিকক্ষে পরস্পরে সংযোগ তারা যে এক অখণ্ড সমান্তরাল রূপজগৎ গড়ে তুলেছে তার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আছে 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতাটিতে। যদিও জীবনানন্দের মধ্যবয়সের অধিকাংশ কবিতায় একটা মনঃকল্পিত সৌন্দর্যলোকের ইশারা পাওয়া যায়—তবু সেগুলি থেকে এই কবিতাটি স্বরূপত ভিন্ন—সেই জন্যেই এর বিশেষ মূল্য আছে। ঐসব কবিতায় প্রায়শই কোনো বিশেষ দেশ ও কালের চিহ্ন আছে অথবা পরিবর্তন-শীল ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অনশ্বর জীবন-স্রোতকে ধরার প্রয়াস আছে। অপরপক্ষে আলোচ্য কবিতাটির পটভূমি মনের অবচেতনে এবং ভূমিকা নৈর্ব্যক্তিক। হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে যে সৌন্দর্যলোকের জন্ম এ সেই অমর্ত্য-লোকের কাহিনী। অথচ নৈর্ব্যক্তিক হ'লেও এর যেন একটা স্থান ও কাল ছিল এমন বিশ্বাস কবি প্রায় সৃষ্টি করতে পেরেছেন। যেন মনে হয়, এমন একটা জগৎ ছিল অতীতে। সেই জগৎ থেকে কবি নির্বাসিত হয়েছেন স্বর্গচ্যুত আদমের মতো। জাতিস্মরের স্পষ্ট চেতনা ও দৃঢ় বিশ্বাসই কবিতাটির ভিত্তি। এবং কবিতাটির পর্দায় পর্দায় রূপ-রং-স্পর্শগন্ধময় আবরণ খুলে খুলে যে সম্মোহনের অন্তহীন ক্ষেত্রে কবি আমাদের পৌঁছে দেন সেখানে বাস্তবিকই—

কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

: নগ্ন নির্জন হাত

দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যের সমাপ্তি নেই—নেপথ্যে রহস্যময় দৃশ্যান্তরের ইঙ্গিত—এখানেই সৌন্দর্য-শিল্পীর প্রতিভার অমেয়তা। ঠিক এমনই ইঙ্গিত মুখর রূপ-জগতের অনুভূতি ছিল কোলরিজ, ভ্যালেরি প্রমুখ পাশ্চাত্য কবির। সেই কচিৎ-দৃষ্ট শিল্প-বৈশিষ্ট্যে জীবনানন্দের অমরতা।

মরমিয়া

মরমিয়া

এক জাতের কবি আছেন, রসের কবি। কাব্যের বিষয় ঘিরে তাঁদের অনুভবের ব্যাপ্তি, কল্পনার দীপ্তি, আলোকিত হৃদয়ের প্রসন্নতা ছড়িয়ে থাকে। তাঁরা মনসিজ—মন্মথও। কালিদাস এমনই একজন।

অন্য এক জাত—বলছি, মনীষী কবি। তাঁরাও রসিক—কিন্তু রসের অন্তরে কঠিন বস্তুসারও থাকে কিছু। রক্ত-মাংসের গভীরে থেকে কঙ্কাল যেমন দেহের আকার দেয়, চিন্তা ও মনীষার কাঠিন্য তেমনই তাঁদের কাব্য-শরীর গেঁথে রাখে। সেই কাঠিন্য কোথাও জীবন দর্শন, কোথাও সমাজ-চেতনা, কখনো বা অন্য কিছু। যা-ই হোক্ তা কবিতার শিল্প সর্বৈবতা ঘুচিয়ে তাকে মহত্তর সার্থকতা দিতে পারে।

তৃতীয় এক জাতের কবি আছেন—সচেতন চিন্তা-মনীষা তাঁদের থাকতেও পারে, নাও পারে—কিন্তু মনের মর্মকোষে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের বিদ্যুৎ-বিকাশ। বলবো, মরমী কবি। হাড়ের ভিতরে যেমন লুকানো থাকে মজ্জা, তেমনই কবিতার ভাব বা বিষয়ের অন্তরে অন্তঃশীল অব্যক্ত চেতনার খেলা দেখা যায় সেখানে। তার তাৎপর্য পুরোপুরি ব্যক্ত হয় না কখনো। কবির কাছেও নয়। তবু তার অনিবার্য অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় যখন স্নায়ুতে তার অনুরণন বাজে।

বাউল কবিরা, সুফী কবিরা ইউরোপের 'মিষ্টিক্' কবিরা অনেক সময়েই কবিতায় এই দিব্য-চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। সকলেই নয় অবশ্য। অনেক অনুকারক কবি প্রথানুগভাবে রহস্য ঘনিয়েছেন কবিতাতে। তাঁদের কথা বাদ দিলে দেখা যাবে এঁদের প্রত্যেকের অন্তরে এক আশ্চর্য অন্তর্বাণীর লুকোচুরি খেলা। পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় না। খানিকটা আলোয় থাকে কিছু বা আঁধারে ঢাকা। সেই অন্তর-রহস্য উদ্ঘাটনেই জীবন কাটতো তাঁদের।

জীবনানন্দ দাশকে এমনই এক মরমী কবি বলবো আমরা। তাঁর কবিতায় রসের দীপ্তি, অনুভবের বিস্তার, কল্পনার লীলা-শক্তি, আলোকিত হৃদয়ের উত্তাপ কতদূর সঞ্চারিত—পর্যাপ্ত আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে, সে তাঁর রসিক সত্তার পরিচয়। তাঁর ইতিহাস-দৃষ্টি, সমাজবোধ, বস্তু-ভাবনা—এসবও আলোচিত কিছু কিছু—এ তাঁর মনীষার দিক। কিন্তু তাঁর কবিতার সেই মিষ্টিক মর্মবাণী সেই মরমিয়াবাদ—শ্রদ্ধেয় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ঈষৎ অঙ্গুলি-সঙ্কেত ছাড়া সেদিকে কেউ লক্ষ্য করেন নি।

জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য-শরীরকে যদি একটি এককোষী প্রাণীদেহের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে তার 'নিউক্লিয়াস' ওই 'মিষ্টিক্' চেতনা। আলো এবং অন্ধকারকে

কেন্দ্র ক'রে তাঁর এই মরমী বিশ্বাস আবর্তিত ও আলোড়িত হয়েছে। তাঁর যে ইতিহাস-দৃষ্টির কথা বলা হ'য়ে থাকে তাও এই বিশিষ্ট চেতনার অঙ্গ মাত্র। কবি-জীবনের সূচনা থেকে আলো আর অন্ধকারকে তাঁর কবিতায় যেভাবে পাওয়া যায় তার মধ্যে রহস্যময় প্রতীকী-দ্যোতনা লুকিয়ে ছিল। অথচ এই সঙ্কেতটিকে সজ্ঞান চেতনায় পেতে জীবনানন্দকেই 'সাতটি তারার তিমির' অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাই শ্রীযুত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো প্রবীণ আলোচককেও জীবনানন্দের কবিতায় এই ব্যঞ্জনা-গর্ভ বিষয়টির আকস্মিক আবির্ভাবের মূলে 'ভারতীয় মনের প্রাঙ্-নিবিষ্ট রতি'র কথা ভাবতে হয়েছে।

বাস্তবিক, 'ঝরাপালকে'র আমলে তাঁর কবি-চরিত্র যখন সবদিক থেকেই অপরিণত ও অগভীর ছিল, তখন তাঁর চেতনায় একটি অস্ফুট অনুভবের এমন প্রবল উন্মেষ মনকে নাড়া দেবেই। 'সেদিন এ ধরণীর' কবিতায় আলো ও অন্ধকার সম্পর্কীয় মরমী অনুভবটি তাঁর অসংজ্ঞান সত্তায় এলো তখন থেকেই তাঁর মধ্যে দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের বিরোধ। তাঁর একসত্তা অতিদূর নক্ষত্রের কামনায় অধীর—আরেক সত্তা এই পৃথিবীর মায়ায় মুগ্ধ। এই দুই বিরোধী সত্তার যুগ্মতায় তাঁর কবি-চরিত্রের ভিত্তি। একদিকে 'অনন্তের শুক্র অন্তঃপুরে'র আহ্বান, অন্যদিকে সদ্য প্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধরার আচ্ছন্ন আবরণ। দুই মিলিয়ে পৃথিবীর 'আধো আলো আধেক আঁধারে'র আশ্চর্য মায়া মমতা।

এই আশ্চর্য আলো-অন্ধকারের কাহিনী, এই আলোক-অভীপ্সা ও তিমির পিপাসার গান জীবনানন্দের অন্তর্জীবনের এক গভীর রহস্যের আবরণ উন্মোচন করবে। আলোক ও অন্ধকারের এই রহস্য-নিবিড় সাঙ্কেতিক দ্যোতনার মধ্যে কবিচেতনার উদয়-বিলয়ের নূতন পরিমিতি খুঁজে পাওয়া যাবে।

কিন্তু সেতো পরের কথা। আশ্চর্য এই যে 'ঝরাপালকে'র মধ্যেই এই পরিণত চিন্তাবলয় কি ক'রে ছায়া ফেলে যায়? আমাদের যেন বিশ্বাস করতে বাধ্য করে প্রতিটি কবি এক একটি অন্তর্বাণীকে রূপ দিতে পৃথিবীতে আসেন—সেই বাণী যতদিন না পরিস্ফুট হয় ততদিন তাঁর কবিজীবনের ব্যাপ্তি, ততদিনই তাঁর সৃষ্টি-যন্ত্রণা—আর তা ব্যক্ত হ'লেও প্রকৃত অর্থে তাঁর মৃত্যু। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে সেই অন্তর্বাণী অভিব্যক্তির প্রান্তবলয় স্পর্শ করার আগেই শারীরী মৃত্যুর আঘাতে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। যদিও তার পরম উচ্চারণ আমরা শুনতে পেলাম না, তবু তাঁর কবিতার ধারানুসরণে সেই সাধনার রূপ, চরিত্র ও লক্ষ্য স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পারো।

জীবনানন্দকে যখন মরমী কবি বলি তখন প্রাচীন কবিদের যে অর্থে মরমী বলা হতো সে অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে না। মধ্যযুগের মরমী কবিরা লৌকিক প্রেমের অভিসারের রূপকে এক রস-নিবিড় আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ের রূপ দিতেন। তাঁদের মতো গভীর ভাগবত-বিশ্বাস অবশ্যই জীবনানন্দের কবিতায় মিলবে না। কেননা আধুনিক মননে তাঁর বৈপরীত্য আছে। এ যুগ সংশয়ের যুগ। বস্তু-পৃথিবীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করতে আমরা স্বভাবতই নারাজ। আমাদের অজ্ঞতার মোহ কেটে কেটে সৃষ্টির অন্তর্লীন রহস্য যতই বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে, স্রষ্টা-ঈশ্বরের অনিবার্য স্থিতি সম্পর্কে আমরা ততই নিঃসন্দিগ্ধ অবিশ্বাসী হ'য়ে চলেছি। এই আধুনিক বস্তু-নির্ভর বিজ্ঞান-বোধ জীবনানন্দের পুরোমাত্রায় ছিল ব'লেই তিনি কখনোই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কিছুতেই বিশ্বাসী নন।

আমরাও কেউ অলৌকিকতায় বিশ্বাসী নই। কিন্তু বস্তু-নির্ভর চেতনা আর বস্তু-সর্বস্ব চেতনার মধ্যে প্রভেদ আছে। বস্তুতন্ত্রতার বাইরে আর কিছুতেই আমাদের শ্রদ্ধা নেই। অথচ এই ইন্দ্রিয়গম্য পৃথিবী ঘিরেই এক বৃহত্তর চেতনাবলয় রয়েছে যা অতিলৌকিক কিছু নয়—তবু শুধু পরিশুদ্ধ চেতনায় তার ছায়া পড়ে। যা কিছু দেখি তাতেই তার অন্ত নেই ; তার অন্তঃস্থিত গভীর পরিচয় আমাদের অনুভবে ধরা পড়ে। বস্তু-দৃষ্টি থেকে আসে অভিজ্ঞতা, কিন্তু খণ্ডিত অভিজ্ঞতা সমূহকে সমন্বিত ক'রে অখণ্ড আকারে পাওয়াই প্রজ্ঞা। সেই প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে পৃথিবী এক নূতন আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

জীবনানন্দের মিষ্টিক ভাবনা এই পরিশুদ্ধ চেতনা-সঞ্জাত। তাই আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ের বদলে সেখানে রয়েছে এক প্রাচীন ঐতিহ্যবোধ। জীবাত্মার অধ্যাত্ম অভিসারের কাহিনী আর নয়। বরং ইতিহাসের-অতীত অন্ধকারে দৃষ্টি ফেলে তিনি দেখতে পেয়েছেন প্রথম প্রাণবিন্দু আলো-কণার অভিসার যাত্রা। অন্ধকারের উৎস হ'তে উৎসারিত এই সব আলোকবিন্দু অনেক প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক স্তর-পরম্পরার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তাদের অক্লান্ত বন্ধুর যাত্রাপথ অন্ধকার অতীত থেকে আলোকিত বর্তমান, বর্তমানের রূঢ়শিখা দহন থেকে শুভ্রজ্যোতি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। পিছন ফিরে তাকালে মনে হয় তিমির-সাগরের মধ্যে কয়েকটি আলোক-বলয়। প্রাণকণা প্রবুদ্ধ নাবিকের মতো তিমির-সমুদ্রের সেই আলোকিত বলয়গুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসেছে ;

তাদের আলোয় দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে সেই বিস্মৃত অতীত। কখনো সাগরের নিবিড় অন্ধকারে প্রাণকণারা বিলীন হ'য়ে গেছে—কোনো উজ্জ্বলতর আলোকতীর্থে আবার ফিরে আসবে ব'লে।

অথবা কখনো এই ইতিহাস-চেতনাকে মনে হয়েছে পাখির মতো। সেই আলোকের পাখি—কোন দূর অতীতের লুপ্তশেষ ডোডা পাখি নয়। মৃত্যুর সাগর লঙ্ঘন ক'রে সে বর্তমানের প্রাণময়তায় পৌঁছেও অক্লান্ত পাখায় ভবিষ্যতের উষ্ণতর জগতের অনুসন্ধানে চলেছে।

তবু এই যাত্রাই শেষ কথা নয়। পথেরও এক ইতিহাস আছে। সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতি আশায়-বেদনায় রক্তাক্ত এক ইতিহাস। যুগের পর যুগ আসে। এক সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর আরেক সভ্যতা গ'ড়ে ওঠে। জীবনের উত্তরাধিকার কখনো নিঃশেষে ধ্বংস পাবার নয়। যে দৃষ্টিতে জীবনানন্দ অতীতকে দেখেছেন তাতে মৃত্যুর স্থান গৌণ। 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়'। সভ্যতা ধ্বংস হয়, রক্তের ভিতরে তার অনুরণন রেখে যায়। যা অতীতে ছিল বর্তমানে নেই তা লুপ্ত হয় নি, অবচেতনার গভীরে সুপ্ত হয়ে আছে।

নানা অন্ধকার ও আলোকক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে অতিক্রম ক'রে আসতে আসতে যে বিষ, যে মালিন্য প্রাণকণাকে আচ্ছন্ন করেছে আমরা উত্তরাধিকারে রক্তের ভিতরে সেই বিষ বহন ক'রে চলেছি। তাই আমাদের হিংসা, আঘাত, ঘৃণা ও মৃত্যুর বেদনা। পরকে আঘাত না ক'রে আমরা সুখী হ'তে পারি না—অথচ সেই আঘাতের ব্যথা মর্মে গিয়ে বাজে। পরস্পরের আলো আড়াল ক'রে আমরা আলোকিত হ'তে চাই—সেই লোভ সেই হিংসা এক অদ্ভুত আঁধারে আমাদের ঢেকে ফেলে। অজ্ঞানতার আদিম তিমির ছিন্ন ক'রে এসেও হিংসার আমিষ তিমিরে আমরা আবিল হ'য়ে আছি।

অতীতেও নানা অজ্ঞতা ও কুসংস্কার জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল। কুটিল বুদ্ধির দ্বারা আবিল হয়নি ব'লে সেই অন্ধতাও সভ্যতার অগ্রগতিকে বেগ দান করেছে। আজকের বিজ্ঞানী মন দিয়ে তাকে অন্ধকার ব'লে চিনলেও সেদিন তার অশেষ সার্থকতা ছিল। 'কি এক অশেষ কাজ করেছিল তিমি' (—উন্মেষ)। অথচ এখন তিমির শিকারী নাবিককে হারিয়ে তিমির-পিপাসী রমণীকে হারিয়ে যখন নিজেদের অস্তিত্ব ও সবকিছুর সঙ্গতি হারিয়ে বসেছি, তখন অতীতের ঐ সৎ অন্ধকারে নিষ্ক্রমণও ভালো মনে হয়। সেই নির্মল অন্ধকারে অন্তত আজকের মতো মৃত্যু-রক্ত-কোলাহল ছিল না।

আলো অন্ধকার

অতীতে এই সৃষ্টিকে ঘিরে আশ্চর্য এক আভা দেখেছিল কেউ কেউ। তারা বলেছিল, 'মানুষের প্রয়াণের পথে অন্ধকার ক্রমেই আলোর মতো হ'তে চায়।' পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের আড়ালে আরেক বড়ো আলো তারা দেখেছে। আজ আর সেই আলো দেখা যায় না। আজ আর সে-কথা বিশ্বাস করে না কেউ। অতীতের মানুষেরা যে আলো দেখেছে তা কি তবে লুপ্ত এক বড়ো পৃথিবীর আভা? অথবা তাদের দৃষ্টিভ্রম, তাদের হৃদয়ের দোষ?

বিশ শতাব্দীতে, আলো আর অন্ধকারের অন্যরকম মানে। আধুনিক মানুষেরা সূর্যের আলো, নক্ষত্রের বা প্রদীপের আলোর বাইরে আর কোনো আলো স্বীকার করে না। যেখানে জাগতিক আলো নেই—সেখানেই ওদের মতে অন্ধকার। এ যুগের মনীষীরা এভাবে শুদ্ধ চিন্তা করে, সমাজকল্যাণ চায়, দিক্ নির্ণয় করে। এঁদের বস্তুমুখী জ্ঞান ও ধারণা স্থূল চিন্তার বাঁধ দিয়ে নিসর্গকে টেনেসী, দামোদর, কোশীর মতো বাঁধতে চায়। কিন্তু জল, আগুন, বাতাস, প্লাবনের একটি মাত্র অর্থ—বাঁধ ভেঙে নূতন সেতু গড়া। তাই মাঝে মাঝে বাসুকীর মাথা টলে। প্রলয় কম্পনের ফলে চিন্তার বাঁধে চিড় ধরে; ক্লান্তি যায়, শান্তি আসে। পৃথিবীর বন্দিনীরা হেসে ওঠে।

এই জন্যেই বিজ্ঞানের অন্তহীন কার্যকারিতায় সুখ আছে, স্বস্তি নেই। অনেক প্রসাদ আছে, প্রেম নেই। অনেক কল্যাণশীল নগর হয়েছে, দিনে সূর্যের জ্যোতি, রাত্রে নিয়ন টিউব, গ্যাসের দীপ্তি। তবু আজকের—

> সূর্য ভারত চীন মিশরের ক্যালডিয়ার আদিম ভোরের
> প্রাথমিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে?

: এইখানে সূর্যের

অথচ সমুদ্রের নীলপথে যখন মহেন্দ্রের অভিযান চলেছিল, সমস্ত ভারত শিলালিপির উদ্যমে আনন্দে ভ'রে উঠেছিল। তেমন উৎসাহের দিন আজতো আর নেই। আজ শুধু ছক, ছলা, শব্দ-যোজনার সতর্ক সঙ্গতি; ততটুকু চিন্তার সাধুতা; হৃদয়ের খুচরো টুকরো ব্যবহার। এযুগে মহৎ হ'তে গেলে মহত্বের প্রয়োজন নেই। শাদা কালো রঙ বারবার এসে কেবলি অন্ধকারে মিশছে।

তবু তার মধ্যেও মানুষের অবিরাম প্রয়াণ চলেছে। শব্দের অঙ্গার থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন শববাহনের শক্তি থেকে প্রেম পাওয়া

যায় কিনা তারই সন্ধান অবিরত। মহাযুদ্ধ শেষ হলে আবার যুদ্ধের ছায়া, পটভূমি দ্রুত স'রে গেলে রূঢ় দেয়ালের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছি। অথচ চীনে, কুরুবর্ষে, গ্রীসে, বেথলহেমে আমরা যে সূর্যের প্রাণ-উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছি, যে শিশুসারল্যকে মূর্খের আরাধ্য স্বর্গ ভেবে অবজ্ঞা করেছি, তার থেকে, এমনকি তার মতো, 'সূর্যের মধ্যদিন বড়ো ভাস্বরতা' এখনো খুঁজে পাইনি।

এখানে দিনের স্পষ্ট বড়ো আলো নেই। আমাদের আহত নগরী সকাল-বিকালের কাকজ্যোৎস্নার ছায়ার মধ্যে মৃত ব'লে মনে হয়। অথচ মৃত্যুর মধ্যে যে শেষ শান্ত দীন পবিত্রতা আছে পৃথিবীর মানুষ নগর সে রকম আন্তরিক-ভাবে মৃত নয়।

অথচ ধ্যানের সনির্বন্ধ অন্ধকার এখনো আসেনি এখানে। রাত্রির মায়ের মতো নিঃসৃত অন্ধকার নেই—যা মানুষের বিহ্বল দেহের দোষ ক্ষালিত করে—বিহ্বল আত্মাকে ক্লান্তিকর পুরানো প্রশ্নে বিক্ষত না ক'রে শব্দহীন মৃত্যুহীন অন্ধকারে ঘিরে রাখে। সব অপরাধ, ক্লান্তি, ভয়, ভ্রান্তি, পাপ, কামনা বিনষ্ট হয় যাতে; জীবন ধীরে ধীরে বীতশোক হয়। আজ এই পৃথিবীতে এমন মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার আর নেই। বাতাসের গভীরতা ও পবিত্রতা নেই। তবু আজকের মানুষ যে অন্ধ দুর্দশা থেকে কান্তিময় আলো, স্নিগ্ধ আঁধারের প্রয়োজন অনুভব ক'রে সেদিকে আজও অনবনমনে চলেছে তাতে বোঝা যায় তার হৃদয়ের ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার বলয়ের নিজ গুণ র'য়ে গেছে।

তিমির-পিপাসা

আমরা দেখেছি, 'ঝরাপালকে' নক্ষত্রের শুক্ল আলোর অভিমুখে অভিযান ব্যর্থ হবার পরে ক্লান্ত নির্বেদ কবিকে আচ্ছন্ন করেছিল। বসুন্ধরার প্রগাঢ় অন্ধকারে আপনাকে নিঃশেষে সঁপে স্তব্ধ ছিলেন তিনি।

আমরা বলেছি, 'ঝরাপালকে'র এই প্রগাঢ় অনুভবের মর্মে পৌঁছাতে কবিকে 'সাতটি তারার তিমির' অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কেন এই আলোক সন্ধান কেন এই অন্ধকারের গর্ভে ক্লান্ত নিবিড় ঘুম, কেনইবা তিমির-সাগরে-সাগরে নাবিকের মতো অক্লান্ত অভিসঞ্চার কিছুই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি তখন। এমন কি 'বনলতা সেন' বইটি অবধি এসেও।

'বনলতা সেনে'র নাম কবিতায় যে ক্লান্ত-প্রাণ নাবিক নিশীথের অন্ধকারে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে ঘুরেছে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে যার আনাগোনা, হাজার বছর ধ'রে পথ হেঁটে সেই প্রাণ সন্ধ্যার

কুহেলি-ছায়ায় নারীর চোখের গভীরে শান্তির নীড় খুঁজে পেলো। সেই আধো-চেনা নারীর রূপেও যেন ছড়িয়ে রয়েছে কালান্তরীণ স্মৃতির অন্ধকার। তার চুলের অন্ধকারে বিদিশার রহস্যময়তা, তার দেখার লগ্নে গোধূলির আচ্ছন্ন আবেশ। জীবনের ক্লান্ত-লেনদেন অন্ধকারে বনলতা সেনের নির্জন মুখশ্রী।

অতীতের অন্ধকার পথে পথে যে ক্লান্ত প্রাণের যাত্রা, তার সামনে কোনো স্থির লক্ষ্য ছিল না—অন্তত তার উল্লেখ নেই এখানে। এক তিমির সাগর থেকে আরেক তিমির-তীর্থে শুধু তার অনবচ্ছিন্ন আনাগোনা। সেই চিরন্তন নাবিকের শ্রান্তির জন্য কদাচিৎ কোনো নারীর চোখে দু'দণ্ডের নীড়ের শান্তি শুধু। এ যাত্রা কোথাও তাকে উত্তরিত করে না—এ অন্ধকার কোনো প্রসন্ন আলোর হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে না।

'অন্ধকার' কবিতায় কবির চেতনা কিন্তু নদীর ছল ছল শব্দে জেগে উঠেছে। তবু 'ঘুমের আস্বাদে লালিত আত্মা' অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চায়। হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারে সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চায়। যেন তার নিদ্রা-বিলাসী চেতনায় ভোরের আলোকে 'মূর্খ-উচ্ছ্বাস' ব'লে মনে হয়। রক্তিম আকাশের সূর্যের নির্দেশে জেগে উঠে তাঁর হৃদয় ঘৃণায় আক্রোশে ফেটে যায়।

বোঝা যায়, 'ঝরাপালকে' অনন্তের শুক্র-অন্তঃপুরে যে সত্তা ছুটে গিয়েছিল—সেদিনের ব্যর্থতার অভিঘাতে সে নির্বেদ আশ্রয় করেছে। অন্ধকারের অতলে নিদ্রার মধ্যে সে নিজেকে সঁপে দিয়ে মৃত্যুর নিশ্চল শান্তি উপভোগ করেছে। জেগে থেকে ঘুমোবার সাধ যিনি ভালোবেসেছেন, যাঁর মনে হয়েছে স্থবিরতা সবচেয়ে ভালো—স্পন্দন-সংঘর্ষ-গতি, উদ্যম-চিন্তা-কাজ তাঁর শক্তিকে আহত ক'রে তাকে শুধুই বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে।

অথচ আসলে তিনি নিশ্চেতনার কবি নন, আসলে তিমির-বিনাশই তাঁর মুখ্য চরিত্র। এই অনুভব 'সাতটি তারার তিমিরে' এসেছে। এখানেই তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছেন তিমির শিকারে যারা এসেছে তিমির পিপাসা তাদের সাজে না।

> তিমির হননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
> আমরা কি তিমিরবিলাসী ?
> আমরা তো তিমিরবিনাশী
> হ'তে চাই।
> আমরা তো তিমিরবিনাশী।

তিমির হননের গান

এখন থেকেই মরমী চেতনার পথে তাঁর সজ্ঞান পদক্ষেপ

সূর্যতামসী।

শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ন মিত্র 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক মূল্যবান নিবন্ধে 'সাতটি তারার তিমিরে'র প্রতীকায়ণের তাৎপর্য সুন্দর ক'রে বিশ্লেষণ করেছিলেন। দুই মহাযুদ্ধের সমকালীন ও অন্তর্বর্তীকালে মানুষের বিপর্যস্ত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতিফলন বিরোধাভাস অলংকার সমৃদ্ধ এই কাব্যে কিভাবে হয়েছে তা তিনি দেখিয়েছেন। মানুষ তার সৌরজ্ঞানের শৈশব থেকে উত্তরাকাশের সধ্রুব সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দিশারী বান্ধব ব'লে জেনেছে। আবহমানকাল এর আলো পথভ্রান্তের কাছে পথ-নির্দেশ করেছে। সাতটি তারার আলো তাই আশ্বাসের দ্যোতক—দিশাহীনতার নয়। কবি কিন্তু এ কাব্যের নাম দিলেন সাতটি তারার আলো নয়, তিমির। তিনি বোঝাতে চাইলেন, যুগযুগান্তর ধ'রে যা কিছু আমাদের কাছে সত্য ব'লে, ধ্রুব ব'লে গণ্য ছিল, মানব ইতিহাসের চালিকাশক্তি বা দিশারী সেইসব বিশ্বাস সংস্কার আজ অচল ব'লে প্রতিভাত হচ্ছে। সভ্যতার এই সংক্রান্তিতে যন্ত্রণাক্ষুব্ধ মানুষের নূতন অভিজ্ঞতায় সনাতন মানদণ্ডগুলির আকস্মিক স্থানবিচ্যুতি ঘটেছে। বহুমুখী এই বিপর্যয় একদিকে যেমন ব্যক্তি মানবের ক্ষেত্রে, অন্যদিকে তেমন বিশ্বের অস্তিত্বের কেন্দ্রে নিসর্গেও সম্প্রসারিত।

সুতরাং যা কিছুকে আমরা সত্য ব'লে, আলো ব'লে চিনতাম, তাতেই এখন তমসার অভিসঞ্চার। এই বক্তব্য শুধু কাব্যটির নামকরণে নয় ভিতরেও নানা পংক্তিতে অভিব্যক্ত হয়েছে।

১। তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক

: তিমির হননের গান

২। সনাতন সত্যে অন্ধ হয়ে-তবু-মিথ্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে

: বিস্ময়

৩। অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার

: নাবিকী

৪। অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে

: রিষ্টওয়াচ

'সূর্যতামসী' শীর্ষক আরেকটি কবিতাতেও এই একই বিরোধাভাস আভাসিত। 'epigram'-এর বৈশিষ্ট্যই হ'ল আকস্মিক আপাতবিরোধের আঘাতের তীব্রতায়

আমাদের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলা। জীবনানন্দই সমকালকে বারবার যুগসন্ধি, ক্রান্তিকালি বা সঙ্কট মুহূর্ত ব'লে অভিহিত করেছেন।

এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়

: **উত্তর প্রবেশ**

নাটকের সঙ্কট সমস্যা বা crisis সচেতন কবি 'রিরংসা, অন্যায় রক্ত উৎকোচ কানাঘুষা ভয়' কণ্টকিত বর্তমানকে এইভাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পৃথিবী ক্রমেই বিচ্যুত হ'য়ে আসছে।

সূর্য অনেকদিন জ্বলে গেছে

: **রাত্রির কোরাস**

সূর্যালোক নেই

তিমির হননের গান

বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে

: **বিভিন্ন কোরাস**

আবার বিকেল বেলা নিতে যায় নদীর খাড়িতে

: **খেতে প্রান্তরে**

এই সূর্য যে সবসময়ে প্রাকৃত সূর্য নয়, তা সহৃদয় পাঠককে উপলব্ধি ক'রে নিতে অসুবিধে হবে না। সত্যসন্ধ মানুষের সামনে এই আলো নিভে আসা যে ভয়াবহ পরিবেশের আশঙ্কা জাগায় তা এসব কবিতায় লক্ষ্য করা যাবে। আবার কিছু কবিতায় কবিকে পৃথিবীতে নিরন্ধ্র অন্ধকারের কথা রাতের তমসার কথা বলতে শুনি—সেও এই একই অভিজ্ঞতার রূপভেদ।

এখন গভীর রাত হে কালপুরুষ
তবু পৃথিবীর মনে হয়।

মকর সংক্রান্তির রাতে

একি ভোর?
অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু।

: **সূর্যতামসী**

সূর্যালোক নিভে গেছে বলেই এখন রাত। কিন্তু এ রাত নক্ষত্র খচিত বা চন্দ্রালোকদীপ্ত নয়। এ রাত্রি বিদিশার অন্ধকার নিশার মতই বিভ্রান্তির জনক। অথবা যদি নূতন প্রত্যূষের সূচনা হ'য়েও থাকে, নূতন আলোর উন্মেষ ঘ'টে থাকে কোথাও, তার খবর আমাদের চেতনায় এসে পৌঁছায়নি।

এইজন্য কবি বিভিন্ন কবিতায় বিচিত্র অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত নিয়ে অসংখ্য অনুপুঙ্খের মধ্য দিয়ে বিশ্বনিয়মের এই বিপর্যয়টাই বোঝাতে চেয়েছেন, কার্যকারণের বৈপরীত, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির উদ্ভট আকস্মিকতা উপস্থাপনই তাঁর উদ্দিষ্ট :

অন্ন নেই। হৃদয়বিহীনভাবে আজ
মৈত্রীয় ভূমার চেয়ে অন্ন লোভাতুর।

: দীপ্তি

আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস
মিড্‌ল্‌ম্যানদের কাছে পর নয়।
তাহারা চেনায়ে দেয় আমাদের ঘিঞ্জি ভাঁড়ার।

: সোনালিসিংহের গল্প

শতাব্দী আবেশে অস্ত যায়
বিপ্লবী কি স্বর্ণ জমায়।
আকণ্ঠ মরণে ডুবে চিরদিন
প্রেমিক কি উপভোগ করে যায় স্নিগ্ধ সার্থবাহদের ঋণ

: সূর্যপ্রতিম

হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে ;

: সৃষ্টির তীরে

প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে।

: ঐ

রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেড-বাস্কেট খেলো শেষে

: ঐ

সেইখানে ধোপা আর গাধা এসে জলে
মুখ দেখে পরস্পরের পিঠে চড়ে জাদুবলে।

: লঘুমুহূর্ত

তবু
মধ্যবিত্ত মদির জগতে
আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে

: তিমির হননের গান

'আমরাও মরে গেছি সব'—
দলিলে না মরে তবু এ-রকম মৃত্যু অনুভব
করে তারা।

: সূর্যপ্রতিম

মৈত্রেয়ীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অন্নের প্রলোভনের উর্দ্ধে তিনি উঠবেন। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ও হাহাকার তাঁকে নিচে নামিয়ে এনেছে। আমাদের পরিশ্রমের ফসল আমাদের অভাব মিটাতে পারে না, মিডলম্যানদের কল্যাণে তা আমাদের হাতছাড়া হ'য়ে বিদেশের বন্দরে পাড়ি জমায়। এই আবিষ্ট শতাব্দীতে বিপ্লবীর মধ্যে দেখেছি অর্থলোভ, প্রেমিকের মধ্যে দেখেছি কামুকতা ও নিষ্ঠাহীন দেহাসক্তি। বিপর্যস্ত বিশ্ব-নিয়মে যা বিপরীত তাই ঘটছে। তৃণভোজী হরিণ যেন আমিষাশী শিকারীকে খাচ্ছে। যারা রুটি খেতে চায় তারা তার বদলে ব্রেড-বাস্কেট খেয়ে তৃপ্ত হ'লো। নানা আশ্চর্য ও বিপরীত ব্যাপার যেন মায়াবলে যুগপৎ চলছে; ধোপা আর গাধা একই সময়ে পরস্পরের পিঠে চড়ে রয়েছে; চারিদিকের এই বেদনাময় পরিবেশেও আমরা মধ্যবিত্তরা অনুভূতিহীন বেদনাহীন, কেননা শারীরিক ভাবে না মরলেও আন্তরিকভাবে দেখলে আমরা যে মৃত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু শুধু এই বিপর্যয় ও বিনাশের ছবিই নয় উদ্বেগ ও আশংকার ভয়াবহ মুহূর্তগুলিকে কবি নানা কবিতায় নানা চিত্রকল্পে অভিব্যক্ত করেছেন :

অবরুদ্ধ নগরী কি? বিচূর্ণ কি? বিজয়ী কি?

: মকর সংক্রান্তির রাতে

শত্রু কি শহর ঘিরেছে? শহর কি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'লো? না, নগরবাসীরাই বিজয়ী হয়েছে? এই আক্রান্ত নগরীর চিত্রকল্পে মানুষের উদ্বেগ কণ্টকিত বিনিদ্র অবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছেন। আবার :

আমাদের জানালায় অনেক মানুষ
চেয়ে আছে দিনমান হেঁয়ালির দিকে
তাদের মুখের পানে চেয়ে মনে হয়
হয়তো বা সমুদ্রের সুর শোনে তারা
ভীত মুখশ্রীর সাথে এরকম অনন্ত বিস্ময়
মিশে আছে;

: বিভিন্ন কোরাস

সাধারণ মানুষের এই ভীত বিভ্রান্ত মুখ, তাদের অসহায়তা কবি যেভাবে অনুভব করেছেন তাকে আশ্চর্য রূপময় ক'রে বর্ণনা করেছেন। এই আতঙ্ক ও অস্বস্তি শুধু আমাদের জীবিত মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে চিহ্ন পড়ে আছে,
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।

: ঐ

মৃত্যুতেই মানুষের আতঙ্কের অবসান হচ্ছে না, জীবনের দুর্দশার অবসানে মৃত্যুতে মানুষ যে প্রশস্তি খুঁজে পায় আজকের ভাগ্যহত মানুষ তাও হারিয়েছে।

বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে এইসব উপলব্ধি জীবনানন্দের সৎ-কবিচিত্তকে আলোড়িত ও অভিভূত করেছিল। তিনি সাধারণ মানুষের সর্বব্যাপী কবিমূঢ়তা কাটিয়ে 'মহাবিশ্বলোকের ইশারায় উৎসারিত সময়চেতনার' শোভাভূমিকায় আবহমান মানবসমাজকে স্থাপন ক'রে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান দিয়ে তাকে মূল্যায়িত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই সংশয়িত উদ্বেগাকুল চিত্তের দ্বিধা প্রতীকের সেই বিরোধাভাসের মধ্যেই বিম্বিত। আলো ও অন্ধকার, সত্য ও মিথ্যা, জীবন ও মৃত্যু কোন শক্তি প্রবল সে কথা কে বলতে পারে। The ancient Mariner এর অলৌকিক পাশা খেলায় জীবনজয়ী হয়েছিল। জীবনানন্দের পক্ষে সমাধানে পৌঁছানো অত সহজ ছিল না। তবু তিনিও ক্রমে সংশয় অতিক্রম ক'রে যে মৃত্যু থেকে জীবনের অভিমুখেই অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

'রিষ্টওয়াচ' কবিতাতে এমন এক সর্বাত্মক মৃত্যুর চিত্র পাওয়া যায়। কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হ'য়ে অসংখ্য সৈনিকের শব চন্দ্রালোকে পাহাড়তলীতে আকীর্ণ হ'য়ে রয়েছে। তাদের কারো কারো মনিবন্ধের ঘড়ি এই নির্মানব প্রান্তরে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো গিলে এখনো সময়ের কাঁটা ঘুরিয়ে চলেছে। যাদের কথা বলার কথা, তারা স্তব্ধ। কিন্তু জাগ্রত প্রহরীর মতো ঘড়ি কথা ব'লে চলেছে, যার জন্যে কথা বলা তাদের অভাবে সে কথা অর্থহীন। একইভাবে কাল যে অফুরন্ত রোদের আলো ছড়িয়ে পড়বে তা আর আলোকিত করবে না দশ দিক, কেন না মানুষের দৃষ্টির ভিত্তিতেই সূর্যের আলোকময়তা, রৌদ্র তাই উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ, তা আর তিমির হন্তারক নয়,—তিমির ময়।

'লোকসামান্য' কবিতায় যুদ্ধোন্মাদ জাপানের সাধারণ মানুষের প্রসঙ্গে বলেছেন—

অন্ধভাবে আলোকিত হয়েছিল তারা,

: লোকসামান্য

তারা সামান্য মানুষ অলোক সামান্য নয়, তাই তাদের যা বোঝানো হয়েছে তাই বুঝেছে, বাস্তব সত্যকে লক্ষ্য করেনি। নীলিমার সূর্যকে তাচ্ছিল্য ক'রে নিশানের সূর্যকে মহত্তর ব'লে শেখানো হয়েছিল তাদের। শ্লোগানের আনুগত্যের পরিণামী এই রক্ত মৃত্যু হাহাকার কি তাদের প্রকৃত উপলব্ধির দিকে, চরিত্রসংহতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে? অন্ধ আনুগত্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃত আলোর দিকে পৌঁছানো যায় না একথা মানুষকে বুঝতে হবে।

চারিদিকে "অভিভূত নৃমুণ্ডের ভিড়", "দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক / কেবলই আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়"। এই মৃত্যু হতাশার ঘনঘটার মধ্যে কখনো কখনো মনে হয় "কলকাতা থেকে দূর গ্রীসের অলিভবন"—সেই লক্ষ্যে বোধহয় পৌঁছানো যাবে না, কিন্তু এই চূড়ান্ত আশাহীনতার মধ্যেও কবি উত্তরণ সম্পর্কে বিশ্বাসের কথা বর্ণনা ক'রে গেছেন।

> অভিভূত হয়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
> মহান তৃতীয় অঙ্কে : গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হবে নাকি
> সূর্যে আরো নবসূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও—
> প্রাণ দাও পাখি।

: **মকর সংক্রান্তির রাতে**

প্রত্যাশা করেছেন আবহমানের ইতিহাস চেতনা স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর ক'রে দেবার শক্তি যোজনা করবে।

মহাজিজ্ঞাসা

আলো জল আকাশের টানে দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে কেন কাকে ভালোবেসে প্রাণ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল? তার চিহ্নগুলি জন্মহীন মৃত্যুহীন কুয়াশায় হারিয়ে গিয়েছে। জীবন-মৃত্যুর সাদাকালো অভিজ্ঞতা হৃদয়ে জড়িয়ে এমনই একদিন মানুষেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। আবহমানের রক্ত আর কংকাল, অঙ্গার আর কালির ভিতরে মানুষের যে করুণ ইচ্ছার ইতিহাস সংগুপ্ত রয়েছে তার মধ্যে মানুষই আপন জন্মচিহ্ন চেনাতে এলো। কাকে চেনাতে? আকাশ পৃথিবী, সূর্য ধূলিবর্ষা অণুপরমাণুকে? নাকি নগর বন্দর রাষ্ট্র এসবের ভিতর যে জ্ঞান ও অজ্ঞানের পৃথিবী রয়েছে তাকে?

সৃষ্টি সূচনার কুয়াশা আর ধ্বংসের পরের কুয়াশার অন্ধকার আজকের আলোর বলয়ে বার বার ছায়া ফেলে যাচ্ছে। প্রেম মানুষকে নীলিমার দিকে টানে কিন্তু অজ্ঞতা বারবার সনাতন তিমির সাগরের দিকে নিয়ে যেতে চায়। তবু সূর্য পৃথিবীর

দিকে আলোকেই সঙ্গে ক'রে আনে। প্রকৃতির এই খেলা এই জীবন ও মৃত্যু তাৎপর্য মহা ইতিহাস এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি।

মানুষ নিত্য পদচিহ্নের মতো গ্লানি, প্রেম ক্ষয়ের ইতিহাস রেখে এক লক্ষ্যের অভিমুখে চলেছে। নদীর মতোই মানুষের ধূসর হৃদয়ও নিত্যধাবমান। রাত্রির শেষে ভোর আছে, শতশত ভোর; নূতন সূর্য নূতন পাখি নূতন সভ্যতার চিহ্ন এনে দেয়, নূতন যাত্রীরা এসে প্রাণ যাত্রীদের ভীড় বাড়িয়ে দেয়। চলমান মানবতা হৃদয়ে গতির গান নিয়ে প্রেম নিয়ে অকূলের অভিমুখে এগিয়ে চলবে শাশ্বত যাত্রীর মতো।

আদিম পৃথিবীতে একটিমাত্র আলো লক্ষ্য ক'রে এক একটি সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়। যুগের অভিসরণের সাথে সাথে যুগপৎ অন্ধকার ও আলোর রূপভেদ হয়েছে। একদিকে যেমন আদিম সৎ অন্ধকার, আবিল আমিষ অন্ধকার হ'য়ে উঠেছে; তেমনই যে ম্লান আলোর অভিমুখে প্রাণকণারা প্রথম যাত্রা শুরু করেছিল—তা আর নেই এখন। আলো চাইতে গিয়ে নিজেদের ঘিরে আমরা অগ্নির রক্তিম উল্লাস সৃষ্টি করেছি। তবু প্রতিনিয়ত আমাদের লক্ষ্যের পরিবর্তন হয়। শুভ্র থেকে শুভ্রতর, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর আলোর দিকে গতি আমাদের।

এমনকি আদিম পৃথিবীর মতো একটি মাত্র আলো নিয়ে চিরদিন বসে থাকার দিন চ'লে গেছে। শত শতাব্দীর সঙ্গে আমাদের সৃষ্টি বহুগুণে বেড়ে গেছে, আমাদেরও জটিল ক'রে তুলেছে। অতীতে একদিন মানুষেরা যা চেয়েছে আজ আর তা চাইবে না। সেদিন—

মশালের কেরোশিনে মানুষেরা অনেক পাহারা
দিয়ে গেছে তেল, সোনা, কয়লা ও রমণীকে চেয়ে;
চিরদিন এই সব হৃদয় ও রুধিরের ধারা।

: আবহমান

কিন্তু এখন তাতে আমরা তৃপ্ত নই। এখন—

যদি কেউ এসে বলে: 'এই সেই নারী,
একে তুমি চেয়েছিলে; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ—'
তবু দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ?

: ঐ

আমাদের লক্ষ্যের পরিবর্তন হয়েছে। সে লক্ষ্যও এক নয়, বহু। একই সঙ্গে অনেক কিছুর সাধনা আমাদের এখন—মহৎ কিছুকে চেয়ে।

আদিম পৃথিবীতে নানা সভ্যতার মৃত্যু হয়েছে—আমরা দেখেছি। আজকের

পরিণত সভ্যতায় পৌঁছে আর আমাদের একান্ত মৃত্যু নেই। কিন্তু যে গ্লানি ও মালিন্যের বিষ উত্তরাধিকারে বহন ক'রে চলেছি তার ফলে সভ্যতার মর্মেই আজ অন্ধকারের বাসা।

তমসার থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে সময়ের আজ মর্মস্থলে
অন্ধকারে ভাসে।

কারণ নিরন্তর বহমান সময়ের স্রোতে আমরা আর ভেসে চলছি না, সময়ের জালে জড়িয়ে পড়েছি। মানুষ যেভাবে যে পথে অগ্রসর হয়েছিল সেই পথে আর তারা নেই—

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তা'রা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

: **অদ্ভুত আঁধার এক**

স্বীকার করতেই হবে—এমন বিচিত্র পৃথিবীতে সৎ মানুষের দাঁড়াবার মতো তিলধারণের স্থান নেই আর। তবু প্রজ্ঞার আলোকে দেখলে এতখানি হতাশায় অভিভূত হবার কিছু থাকবে না। ইতিহাসের যে পথ থেকে আমরা উৎক্রান্ত হ'য়ে পড়েছি, সেই পথে আমাদের ফিরে যেতে হবে। 'বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে'—এই সময়টুকুর মধ্যেই আমরা দিকভ্রান্ত পথচ্যুত হ'য়ে পড়েছি। কিন্তু প্রকৃতির বুকে এসে দাঁড়ালে, বুঝতে পারি, সামান্যতম কৃষকও এই সঙ্কট থেকে ত্রাণের পথ জানে। আমাদের হৃদয় অস্বাভাবিক ব'লে আমরা চিনতে চাইনা। সেইপথ—সেই সততা ও প্রেমের পথই বুদ্ধের পথ, প্রজ্ঞাপারমিতার পথ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পথ।

তার মানে নয় যে—এ অত্যন্ত সরল অনুকরণের পথ। অর্থাৎ বর্তমান থেকে অতীতের জগতে ফিরে গেলেই আমরা ত্রাণ পাবো না। 'কোথাও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই'। বর্তমান সভ্যতার জটিল রূপ যে সব সমস্যা ও সঙ্কট তুলে ধরে, তাকে ইতিহাস-পুরুষের সপ্রতিভ আঘাত ব'লে মনে করতে হবে। এই আঘাতের ভিতর দিয়ে সঙ্কটের গিট খুলতে খুলতে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।

বর্তমানের যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আগামী সভ্যতার যে রূপ আমরা দেখি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাজাত দূরদৃষ্টি ছাপিয়েও তার সামনে আরো কিছু আছে মনে হয়। মনে হয়, অতীতে যেমন মূঢ়তার তিমির কেটে এসেছি, বর্তমানে যেমন জ্ঞান-পাপের তিমির কেটে চলেছি তেমনই এর পরে এক মহত্তর তিমিরের মুখোমুখি হ'তে হবে আমাদের। সেই তিমির বিনাশ ক'রে আমরা এক অবিনশ্বর শুভ্র 'আলো-পৃথিবী'তে উপনীত হ'তে পারবো। তাই—

অনেক আঁধারে আলো দেখেছি, তবুও
আরও এক বড় আলো অন্ধকারের প্রয়োজন
এখন গভীর ভাবে বোধ করে মন
আকাশ প্রান্তর পথ নক্ষত্রলোকের কাছে গিয়ে।

: দুটি তুরঙ্গম

সেই আরো কঠিন আঁধার নেমে পড়ার আগে পৃথিবীর বর্তমান সংক্রান্তিতে দাঁড়িয়ে আমাদের সকলকে এক আত্মানুসন্ধানের সম্মুখীন হ'তে হয়। অন্তহীন বেদনার পথে নেমেও যারা বেদনাহীন, জীবনের অসামান্য অপচয়ের মধ্যেও যারা নিঃসাড়, তাদের মধ্যেও দু'একটি লোকের মনে এক মহাজিজ্ঞাসা জেগে রয়েছে—

তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূল সীমা আলোর মতো ;—হয়তো সত্য আলো।

: অবিনশ্বর

তাঁদের মনের পটে আঁকা সেই আলোই সত্য আলো কিনা আজ বলা সম্ভব নয়। তবু কয়েকজনের চেতনা থেকে সেই মহাজিজ্ঞাসা সবার মনে ছড়িয়ে দিতে হবে। "আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।"

কাব্যস্মৃতি-১

ঐতিহ্য

বাংলাদেশের আবহমানের কাব্যধারার মধ্যে জীবনানন্দকে উৎক্রান্ত মনে হয়—এমন কথা বলেছেন অনেকে। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, বিহারীলাল—এঁদের কাব্যচেতনার উত্তরাধিকার সাধারণ অর্থে জীবনানন্দের কাব্যজগতে খুব ক্রিয়াশীল ভূমিকা নিয়ে নেই। সম্প্রতিকালের কোন কবি সম্পর্কেই বা সেকথা বলা চলে, হৃতপ্রভাব কালিদাস রায়-কুমুদরঞ্জন গোষ্ঠির কথা বাদ দিলে! কবিতায় উত্তরাধিকার, টি. এস এলিয়ট যাকে বলেছেন 'ইতিহাসচেতনা'—তার পিছনে আবহমানের অঙ্গীকরণ ও আত্মস্থ করার সাধনা থাকবে, অতীতের নিষ্প্রয়োজন কালচিহ্নের ভার বর্জন ক'রে কবিতার মর্মরস ঘনীভূত করার শক্তি থাকবে, তার গভীরে বর্তমানের যুগ ও জীবনের ভাবনা-বেদনার স্পর্শ থাকবে, আর থাকবে মুক্ত বুদ্ধ ভবিষ্যতের বোধ। ঠিক এই অর্থেই ইতিহাসচেতন ব'লে, জীবনানন্দের মতো স্বতন্ত্র কবিচেতনা নিয়ে বাংলা দেশে কোন কবি কবিতা লেখেননি, আর সেই কারণেই একথাও সমানভাবে সত্য যে জীবনানন্দের মতো ঐতিহ্য-সচেতন উত্তরাধিকার-গর্বিত কবিও কেউ নেই!

কথাটিকে আরো স্পষ্ট ক'রে তোলা যেতে পারে। আমরা যে যুগের মানুষ এ-যুগে কবির মৌল সমস্যাই ঐতিহ্য-ঘটিত। কেননা অতীত যুগন্ধরদের সৃষ্টির বৈচিত্র্য স্মরণে আনলে চিন্তার মৌলিকতা প্রায় অসম্ভবই। সব কবিই তাই প্রভাবমুক্তির অবিরাম আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে বিব্রত। অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে জীবনানন্দ কেমন অবলীলায় এই সঙ্কটের বাইরে দাড়িয়ে আছেন।

জীবনানন্দের কবিতা ভালভাবে পড়লে জানা যাবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ তিনি তো অন্যের মতো সচেষ্টভাবে অতীতের কবিদের প্রভাব এড়াতে চাননি, বরং জেনেছেন, পূর্বতনেরা সৃষ্টির মাধ্যমে কবিতাকে, কবিতার অন্তর্লীন প্রত্যয়কে কোন অভিমুখে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে চেয়েছেন। সাধারণ কবিরা যখন এলোমেলো সৃষ্টি-প্রয়াসের দ্বারা পূর্বসূরীদের বিচরণ-ভূমিতে স্থান ক'রে নেবার দুঃসাধ্য প্রয়াসে ব্রতী—জীবনানন্দ তখন জানেন কোনখানে পূর্বসূরীরা থেমেছেন এবং তারপরে কোন অববাহিকায় কবিতার ধারাটিকে প্রমুক্ত ক'রে নিয়ে যেতে হবে ভগীরথের মতো।

তাই সাধারণ কবিদের মতো সৃষ্টির বিষয় নিয়ে পূর্বতনদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেই—বরং প্রাগ্বর্তী কবিতাই তাঁকে সঙ্কেত দেয় তাঁর কবিতার বিষয় এবং প্রযুক্তির। সেই কারণেই প্রাচীন কবিতার অনুবর্তন তাঁর কবিতায় দুর্লভ, কিন্তু সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দুর্লভ

নয়। এই উত্তরাধিকার বোধ, ঐতিহ্যের এমন সুস্পষ্ট স্বীকৃতি অবশ্যই 'রূপসী বাংলা'য় সবচেয়ে বেশি। কারণ তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মতো 'রূপসী বাংলা' চলমান জীবনের কবিতা নয়, তা বিগত অতীতের সুখস্মৃতির গাথা। গতির চেয়ে স্থিতিই তার লক্ষ্য। গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছে 'আবহমান বাংলা, বাঙালী'কে। 'আবহমান' শব্দের মধ্যে অতীতের দাবীই মুখ্য, ভবিষ্যতের ততটা নয়।

বাস্তবিক, 'রূপসী বাংলা'র মূল সুরটাই তাই। দেশতো কেবল ভূগোলের সীমায় চিহ্নিত মাটি, বা তার মানুষ, উদ্ভিদ, প্রাণী নিয়ে নয়, দেশ হচ্ছে মানুষের হৃদয়ানুভবের রক্তরাগ আলেখ্য, জাতির আবহমানের ঐতিহ্য-চেতনা। কালপ্রগতির সঙ্গে তাই দেশের একটা চরিত্র গ'ড়ে ওঠে। বাংলা ও বাঙালীর জীবনের সঙ্গে তাই ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে পুরাণ-কথার মায়া, লোকগাথা, রূপকথা, কীর্তন, পাঁচালীতে বিধৃত জীবন-তত্ত্বের অঙ্গীকার। বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে প্রাচীন কবি-কথিত এই জগৎ অদ্বয়ভাবে মিশে আছে। স্তম্ভে প্রাকারে পরিখায় উদ্ধত নাগরিক-সভ্যতা খণ্ডকালীন ও ধ্বংসমান। কিন্তু বাংলার গ্রামের এই রূপের মধ্যে এক অবিনাশী সত্তা আছে। যে তার স্বাদ পেয়েছে সে লোভ-লালসার উন্মাদনা, কীর্তি-প্রতিষ্ঠার মোহ ভুলে শান্ত শুকের মতো আত্মলীন তৃপ্তি নিয়ে, তুষ্টি নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে চায়।

'রূপসী বাংলা'র গভীরতম স্তরে তাই রয়েছে প্রাচীন সাহিত্যের পৌরাণিক পটভূমি। অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনায়, উমা-চন্দ্রশেখরের সশ্রদ্ধ উল্লেখে, অনুরাধা, রোহিনী, ইন্দ্র, অর্জুন প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিত্বের প্রতীকী ব্যবহারে এই জগৎ ও জীবনের নিগূঢ় কিন্তু প্রগাঢ় অনুভূতির পরিচয় মিলবে।

> সতীর শীতল শব বহুদিন কোলে লয়ে যেন অকপট
> উমার প্রেমের গল্প পেয়েছে সে,—চন্দ্রশেখরের মতো তার জট
> উজ্জ্বল হতেছে তাই সপ্তমীর চাঁদে আজ পুনরাগমনে ;

: পৃঃ ৩১

অথবা যেমন

> তুমি কবি করিয়াছ স্নান
>
> সাত সমুদ্রের জলে,—ঘোড়া নিয়ে গেছ তুমি ধূম্র নারীদেশে
> অর্জুনের মতো, আহা,…

: পৃঃ ৪৩

পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের এই জগৎ 'রূপসী বাংলা'র খণ্ডকালেই একবার দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেছে এমন নয়। পরেও এমন অজস্র আশ্চর্য প্রয়োগ তাঁর ঐতিহ্য

অবহিতির সাক্ষ্য দেবে। সেখানে কবিতার বিষয়ের মধ্যে তার প্রয়োগ এত বিশিষ্ট, এত উজ্জ্বল-ভাবনাদীপ্ত যে ঠিক অনুরূপ উপস্থাপন নৈপুণ্য সমকালীন অন্য কোনো স্বদেশীয় কবির মধ্যে দেখা যাবে না। সভ্যতার বর্তমান সংক্রান্তিতে মানবাত্মার গ্লানি-মুক্ত হওয়ার, পবিত্রতর হওয়ার রক্তাক্ত সাধনা বোঝাতে যখন কবি সীতার অগ্নি পরীক্ষা ও খৃষ্টের রক্তাতিপাতের উল্লেখ করেছেন তখন তার ব্যঞ্জনা এই ছোট্ট কবিতাটিতে ভাবগত চূড়ান্ত সিদ্ধি এনে দিয়েছে—

প্রতিটি রেশম থেকে সীতা তার অগ্নিপরীক্ষায়— '
অথবা খ্রীস্টের রক্ত করবী ফুলের মতো লাল।

: সাবলীল

অথবা আরো একটি কবিতায়—

ত্রিপাদ ভূমির পরে আরো ভূমি আছে এই বলির হৃদয়ে ?

: অনুপম ত্রিবেদী

প্রবাদের বলি বামনের তৃতীয় পদ ধারণ করেছিলেন মস্তকে। কিন্তু একালের কবিই আবিষ্কার করলেন আরো বিশালতর ভূখণ্ড নিহিত রয়েছে আধুনিক বলির হৃদয়ের অন্তস্তলে।

এমনই আবার সার-রিয়ালিষ্ট কবিতার বিমিশ্র ভাবাবহ সৃষ্টিতে যখন তিনি তাঁর পৌরাণিক প্রজ্ঞা প্রয়োগ করেছেন তার বিচিত্র স্বাদের একটু নমুনা রাখছি—

১। ঘরের ভিতর থেকে খ'সে গিয়ে সন্ততির মন
বিভীষণ, নৃসিংহের আবেদন পরিপাক ক'রে
ভোরের ভিতর থেকে বিকেলের দিকে চ'লে যায়,

: বিভিন্ন কোরাস

২। ধূমাবতী মাতঙ্গী কমলা দশ-মহাবিদ্যা নিজেদের মুখ
দেখায়ে সমাপ্ত হলে সে তার নিজের ক্লান্ত পায়ের সংকেতে
পৃথিবীর জীবনের মতো পরিসর দিতে গিয়ে
যাদের প্রেমের তরে ছিল আড়ি পেতে…

: মহিলা

অথবা আরো পরবর্তী কালে যখন বর্তমানের জগৎ ও জীবন তাঁর চেতনার কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে সমস্ত আলঙ্কারিক রূপ-রীতি বর্জন ক'রে কবি যেন যুক্ত-শুদ্ধ-ঋজু ও অনাড়ম্বর হ'য়ে উঠেছেন, যেখানে কবি প্রায় দৈবজ্ঞের (Prophet) ভূমিকায় দাঁড়িয়ে সময় ও সভ্যতার প্রকৃতি ও গতি-নির্দেশ করছেন তখনো তাঁর পরিণত চিন্তায় প্রাচীন প্রসঙ্গ তাৎপর্য-গভীর ভাবে বারবার এসেছে।

১। সে-হৃদয় মানুষের আধুনিক সভ্যতার পটভূমিকায়
শচীর মতন এসে দাঁড়াচ্ছে ;
অথবা সে ইন্দ্রাণীকে ভেদ করে অহল্যার মতো ;
সহস্র চোখ না যোনি এতদিন পরে আজ কলকাতার ইন্দ্রের শরীরে ?

: **এইখানে সূর্যের**

২। নদী এসে বার-বার যযাতিকে যৌবন দেয়
ঘন জলধন্যা নদী—স্থবিরতা নেই ;

: **কখনও মুহূর্ত (দেশ)**

এমনই দক্ষ প্রজাপতি, কল্কি, মৈত্রেয়ী, সগর, কপিল, নচিকেতা, কীচক, চার্বাক, বরাহ অবতার, ঊষা, অনিরুদ্ধ, তপতীর মতো প্রসঙ্গের উল্লেখ গণনাতীত বার পাওয়া গেছে। বস্তুত অতীতের মহান সাহিত্যের এই ঐশ্বর্য স্বেচ্ছায় ভুলে গিয়ে কবিতা রচনা সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হ'লেও সমীচীন কিনা সেকথা এ যুগের কবিদের বিবেচনার সময় এসেছে বোধ হয়।

লোক-নিরুক্তি

অথচ এই পৌরাণিক পৃথিবীর চেয়ে আমাদের বাংলাদেশের লোকগাথায় প্রবচনে কিম্বদন্তীতে রূপকথায় বিধৃত যে জগৎ, তাই জীবনানন্দের কবি-মনকে প্রগাঢ়ভাবে আকৃষ্ট করেছে। সংস্কৃত সাহিত্য-তত্ত্ব যদি ভূগর্ভস্থ ভোগবতীর মতো তাঁর কবিতার অন্তস্তলে প্রবাহিত হ'য়ে থাকে, এই সব রূপকথা লোকগাথার প্রসঙ্গ তাঁর কবিতার ঊর্ধ্বলোকে আকাশগঙ্গার মতো জ্যোতির্ময় শোভা নিয়ে চন্দ্রাতপের মতো রয়ে গেছে। সেই আকাশে কল্পনার স্বচ্ছন্দ ডানা মেলা। সেই স্বর্গে জীবনের জটিলতা থেকে নিশ্চিন্ত পলায়ন।

আমাদের এই লৌকিক পৃথিবী, এই বাস্তব জীবন, রূপসী বাংলায় কবি এরই পাশাপাশি মিলিয়ে দিয়েছেন এই রূপময় মায়ারাজ্য, এই চন্দ্রমালা শঙ্খমালা, কঙ্কাবতী কাঞ্চনমালার অশ্রুসজল শীতল কাহিনী, মীনকন্যা ও পক্ষীরাজের কল্পিত আশ্চর্য বৈভব। অথচ তাঁর রচনার এই জগৎ এত সত্য, এত বাস্তব যে মনে হয় তিনি সেই সজীব জগতে হারিয়ে গেছেন। সেখানে গেলে—

কান পেতে থাক যদি, শোনা যায়, সরপুঁটি চিতলের উদ্ভাসিত স্বর
মীনকন্যাদের মতো ; সবুজ জলের ফাঁকে তাদের পাতালপুরী ঘর
দেখা যায়—রহস্যের কুয়াশায় অপরূপ—রূপালি মাছের দেহ গভীর উদাসী

চ'লে যায় মন্ত্রিকুমারের মতো, কোটাল-ছেলের মতো,
রাজার ছেলের মতো মিলে
কোন্ এক আকাঙ্ক্ষার উদ্ঘাটনে কত দূরে ;—

: পৃঃ ৬৬

সেই কৈশোরের সবুজ বিশ্বাস ও আশ্চর্য রহস্যবোধ এই সব কবিতার অনুষঙ্গী হ'য়ে আছে। যেন কবির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কৈশোর-সত্তাও সেই সব স্থানগুলি দেখে আসে—

যেইখানে পাটরাণী আর তার রূপসী সখীরা শুনিয়াছে
বহু—বহুদিন আগে ;—যেইখানে শঙ্খমালা কাঁথা বুনিয়াছে
সে কত শতাব্দী আগে মাছরাঙা-ঝিলমিল ;

: পৃঃ ৪০

এইভাবে সেই অতীতের সোনার স্বপ্নকে হারিয়ে ফেলে, তার স্মৃতি তার স্বপ্নকে হাতড়ে ফেরার বেদনায় তিনি কবিতাগুলিকে রসমধুর ক'রে তুলেছেন। আমাদের জীবন থেকে শৈশবের সেই বিস্ময়ের দিনগুলো হারিয়ে গেছে, জগৎ থেকে সেই রূপকথার দিনগুলোও। কোনোদিনই তারা আর ফিরবেনা—তাই কি তারা মিথ্যে হ'য়ে গেছে ?

কবির দৃষ্টিতে এই রূপকথার রূপলোকের সঙ্গে পাঁচালী ও পদাবলীর অর্ধ-প্রাকৃত জগতের বাস্তবিক কোনো ভেদ নেই। বর্তমানের বাংলার অন্তরে তিনি কেবলই সেই হারানো বাংলার পুরানো দিনগুলিকে খুঁজে বেড়িয়েছেন—তাই তাঁর মনে হয়েছে—

ফণী মনসার বনে মনসা রয়েছে নাকি ?—আছে ; মনে হয়।
এ নদী কি কালীদহ নয় ? আহা, ঐ ঘাটে এলানো খোঁপার
সনকার মুখ আমি দেখি নাকি ? বিষণ্ণ মলিন ক্লান্ত কি যে
সত্য সব ;—তোমার এ স্বপ্ন সত্য, মনসা বলিয়া গেল নিজে।

: পৃঃ ১৭

এই বিশ্বাসের ধ্রুব জগৎ থেকে বাংলার নারীকে দেখে তাঁর অনায়াসে সংশয় হয়—

চেয়ে দেখ সুন্দরীরে : গোরোচনা রূপ নিয়ে এসেছি কি রাই
নীল নদে—গাঢ় রৌদ্রে—কবে আমি দেখিয়াছি—করেছিল স্নান—

: পৃঃ ৪২

কেবল রাই-কেই তিনি নীল নদে স্নান করতে দেখেন নি। তিনি যেন স্মৃতির মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করেন সেই দিনটিকেও—

যখন মুকুন্দরাম, হায়,

লিখিতেছিলেন ব'সে দু'-পহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল

কোকিলের ডাক শুনে লেখা তাঁর বাধা পায়—থেমে থেমে যায়,—

অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল

: পৃঃ ৩৯

তারপরে আর পৌরাণিক, রূপকথার, মঙ্গলকাব্যের জীবনের সঙ্গে ইতিহাসের অতীত থেকে বর্তমান অবধি মিলিয়ে নিতে তাঁকে বেগ পেতে হয় না।

মধুকূপী ঘাস-ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌরী বাংলার

এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি—রায়গুণাকর

আসিবে না—দেশবন্ধু আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবার,

কালীদহে ক্লান্ত গাংশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়,

আসিয়াছে চণ্ডীদাস—রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার :

শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা : মৃত শত কিশোরীর কঙ্কণের স্বর।

: পৃঃ ৩১

শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা, ধনপতি, বল্লালসেন, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ থেকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের দেশবন্ধু অবধি সবই তাঁর কবি-দৃষ্টিতে সমান প্রত্যক্ষতা নিয়ে উপস্থিত।

একটি লক্ষণীয় দিক অভিনিবেশী পাঠকের দৃষ্টি এড়াবেনা যে এই রূপকথার রূপলোক, পদাবলীর মধুর মায়া জীবনানন্দকে ততদিনই আকৃষ্ট করেছিল যতদিন তিনি কল্পনার জগতে চিন্তাহীন সৌন্দর্যের স্বর্গে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু যখন চেতনার আলো জ্বললো, মানবভাগ্যের পরিণতির অভিমুখে সন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন তখন এই মায়ালোক তাঁকে আর বাঁধতে পারলো না। 'বনলতা সেন' যেহেতু মিশ্র অনুভূতির কাব্য, যেহেতু এর এক কোটিতে 'অন্ধকার' কবিতার গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে লালিত তাঁর আত্মা, এবং অন্য কোটিতে 'সুচেতনা'র ক্লান্তিহীন নাবিকের সূর্যকরোজ্জ্বল মানব-সমাজ-গড়ার প্রতিজ্ঞা, তাই এই গ্রন্থেও রূপকথার 'শঙ্খমালা'কে আবার দেখা যাবে বিচিত্র আকার, বিচিত্র রূপ নিয়ে, বিচিত্র স্বাদ হ'য়ে আসতে।

চোখ তার

যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার।

স্তন তার

করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার।

এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

: শঙ্খমালা

কিন্তু এবারে হিজল কাঠের রক্তিম চিতার আগুনে শঙ্খমালাকে পুড়ে যেতে হ'লো। বাস্তবিক জীবনানন্দের কাব্যে শুধু একবার 'রূপসী বাংলা'র রূপ-জগতেই রূপকথার মায়ালোককে তার স্বাভাবিকতায় পাওয়া গেছে, পরে আর পাওয়া গেল না।

এই গ্রন্থে রাধিকার প্রসঙ্গও একবার এসেছে বটে কিন্তু কোনো গভীর ব্যঞ্জনা নেই তাতে, সেখানে রাধিকা খণ্ডকালীন সৌন্দর্যের প্রতিমা মাত্র।

তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো!
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।

: মিতভাষণ

বরং এবার থেকে বৌদ্ধযুগের গৌরবদীপ্ত লোকশ্রুতির রাজ্যে তাঁর ক্রমবর্ধমান আনাগোনা। কেননা, পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন, তার তাই শুশ্রূষা ও শান্তি খুঁজে, প্রাণের অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কবিরও সে এক উতরোল সমুদ্রাভিযান—

মনে পড়ে কবে এক তারা ভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল বড় সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো: মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

: সুরঞ্জনা

বলাবাহুল্য সেই শান্তি, সেই শুশ্রূষা প্রেম করুণা ও অহিংসা।

অথচ আমাদের কাল রণ-রক্ত-সফলতাকেই চরম ব'লে মেনে নিয়েছে। মানুষের মৃত্যুর মূল্যে আমরা সোনার ফসল উৎপাদন করি—এই বিমূঢ়তা এই নির্বোধ গৃধ্নুতার বেদনা দুরপনেয়।

সেই শস্য অগণন মানুষের শব;
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরো প্রাণ
মূক ক'রে রাখে;

: সুচেতনা

এখানে বুদ্ধ বা কনফুশিয়স ব্যক্তি নন—অতীতের সেই সব প্রাজ্ঞতা যাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রলোভন ভুলতে পেরেছিলেন সার্বিক কল্যাণের কথা মনে রেখে। বিশ্বমানবের প্রতি পরম করুণায়—'স্বর্গে পৌঁছুবার লোভ সিদ্ধার্থও গিয়াছিলো ভুলে।' কিন্তু

তাতেও, তারপরেও মানুষের দুর্গতির নিরসন হয়নি। তাঁদের সেই সাধনা সেই আত্মত্যাগ কি অর্থহীন হ'য়ে গেছে ?

আরো পরবর্তীকালে জীবনানন্দ অনুভব করেছেন পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের আড়ালে আরো এক আলো আছে। অতীতের মনীষীরা তার কথা উল্লেখ করে গেছেন—

মাদালীন দেখেছিলো—আরো কেউ-কেউ ;
অম্বাপালী সুজাতা ও সঙ্ঘমিত্রা পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের
আড়ালে আর-এক আলো দেখেছিলো ;

: এইখানে সূর্যের

সেই উজ্জ্বলতর আলোকক্ষেত্রকে আমরা আমাদের হৃদয়ের দোষে আজ হারিয়ে ফেলেছি। বুদ্ধের মৃত্যুর পর কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে এই পথচ্যুতি। কিন্তু আজো যদি আমরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পথে, প্রজ্ঞাপারমিতার পথে এসে দাঁড়াই তবে আর ভয় থাকবে না। তাই প্রাচীন ইতিহাসের গভীরে জিজ্ঞাসার ভাষা নিয়ে তাঁর বারবার অভিযান।

একদিন নগরীর ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে
বিজ্ঞানে প্রবীণ হ'য়ে—তবু—কেন অম্বাপালীকে
চেয়েছিলো প্রণয়ে নিবিড় হ'য়ে উঠে !

চেয়েছিলো—
শ্রীমতীকে কম্প্র প্রাসাদে :

: মানুষের মৃত্যু হ'লে

আসলে বৌদ্ধ পুরাতত্ত্ব জীবনানন্দকে জীবনের এই সব মৌলজিজ্ঞাসার শান্তি দিতে পেরেছিল, তাই জীবনের অন্তিমকাল অবধি বারবার উদয়ন, দেবদত্ত, নাগার্জুন, বিম্বিসার প্রভৃতির প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে দেখা দিয়েছে।

সাধারণ বিচারে এইগুলিকে কখনোই প্রভাব ব'লে গণ্য করা হয় না। আমাদের চিরকালীন নির্বোধ পাণ্ডিত্য নিয়ে আমরা পংক্তিতে পংক্তিতে সাদৃশ্য খুঁজে গম্ভীর উচ্চগ্রামে ঘোষণা করবো জীবনানন্দ একান্ত উৎক্রান্ত কবি। বুঝবো না এতে গৌরবেরও কিছু নেই, সত্যেরও সংশ্রব অল্প। কবিস্বভাবের মধ্যে এই যে গভীর অন্তর্লীন একাত্মতা—যার মধ্যে প্রভাবের যথার্থটি নিহিত—তা অনায়াসেই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে।

প্রভাব-পর্ব

প্রথানুগ দৃষ্টিতেও জীবনানন্দ দাশকে সর্বপ্রভাব বর্জিত বলার কারণ আছে কিনা ভেবে দেখতে হবে। একেবারে সূচনায় 'ঝরাপালকে' সে যুগের নামী কবিরা প্রায় সকলেই তাঁর লেখায় ছায়া ফেলেছিলেন তা আজ আর কারো অপরিজ্ঞাত থাকার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলেও—আমরা সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করছি,—এই পর্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি প্রধানেরা কিভাবে তাঁর কবিতার বিষয়ে এবং বিন্যাসে উপস্থিত দু-একটি দৃষ্টান্তে তা প্রতিপন্ন হবে।

সত্যেন্দ্রনাথের 'কিশোরী' কবিতার একটি স্তবক—

তার সিঁথার রাঙা সিঁদুর দেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল,
তার সিঁদুর টিপে খয়ের টিপে
কুঁচের শাখে জাগল ভুল।
নীলাম্বরীর বাহার দেখে
রঙের ভিয়ান লাগল মেঘে,
কানে জোড়া দুল দেখে তার
ঝুমকো-জবা দোলায় দুল;
তার সরু সিঁথার সিঁদুর মেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল।

শুধু ছন্দ নয়, এর সঙ্গে জীবনানন্দের কবিতার বিষয় এবং ভাষা সৌষ্ঠবটাও লক্ষ্য করুন।

খস্‌খসাল শাড়ী কাহার!
উস্‌খুসাল চুল গো!
পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে।
জুলপি কাহার উঠলো দুলে?
দুল্ল কাহার দুল গো!
উস্‌খুসাল চুল গো।

: ছায়াপ্রিয়া

খসখসাল, উসখুসাল ইত্যাদির মতো ধ্বন্যাত্মক নামধাতু ব্যবহার সত্যেন্দ্রনাথেরই প্রিয় রীতি। পূর্বোক্ত 'কিশোরী' কবিতাতেই তিনি এক জায়গায় লিখেছেন 'কুলকুলিয়ে ঢেউগুলি যায়'। শুধু এই রকম সাদৃশ্যই নয়, সত্যেন্দ্রনাথের অনুরূপ বিশিষ্ট ভাবনার কবিতাও 'ঝরাপালক' গ্রন্থে মিলবে—

এ ভারত ভূমি নহেক' তোমার, নহেক' আমার একা,
হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছাপ,—মুসলমানের রেখা;
—হিন্দু মনীষা জেগেছে এখানে আদিম উষার ক্ষণে
ইন্দ্রদ্যুম্নে উজ্জয়িনীতে মথুরা-বৃন্দাবনে।
পাটলীপুত্র শ্রাবস্তী কাশী কোশল তক্ষশীলা
অজন্তা আর নালন্দা তার রচিছে কীর্তি লীলা
—ভারতী কমলাসীনা
কালের বুকেতে বাজায় তাহার নবপ্রতিভার বীণা !

: হিন্দু-মুসলমান

আরো একটু অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এর প্রথম দুটি পংক্তিতে নজরুলের ভাষারীতির চিহ্ন রয়েছে। আর শেষ দুটি পংক্তির পর্ববিন্যাসে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাগুচ্ছের বিশিষ্ট পর্ববিন্যাসের ভঙ্গি স্মরণে আসবে।

বাস্তবিক 'কল্লোলে'র যারা কবি তাঁদের চিন্তা-চেতনায় নজরুলের ব্যক্তিত্ব যেন প্রাণের নিবিড়ে মিশে আছে। নজরুলের মতো আরবী ফারসী শব্দপ্রয়োগ ও ভাষাবিন্যাস জীবনানন্দের প্রথম জীবনে কত প্রবল ছিল তা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। উপাদানে নয় কেবল, 'ঝরাপালকে'র কোনো কোনো কবিতায় নজরুল ইসলামের বক্তব্যও ক্বচিৎ অনপনেয় ছাপ রেখেছে। আমরা দুটি নমুনা রাখলাম।

১। অনাথের বেশে ভগবান এসে তোমার তোরণ তলে
বার বার যবে কেঁদে কেঁদে গেল কাতর আঁখির জলে
অর্পিলে তব প্রীতি-উপায়ন প্রাণের কুসুম দলে !
কোথা পাপী ? তাপী কোথা ?
ওগো ধ্যানী, তুমি পতিত-পাবন যজ্ঞে সাজিলে হোতা !

বিবেকানন্দ

২। গাহি মানবের জয় !
—কোটি কোটি বুকে কোটি ভগবান আঁখি মেলে জেগে রয় !
সবার প্রাণের অশ্রু-বেদনা মোদের বক্ষে লাগে,
কোটি কোটি বুকে দেউটি জ্বলিছে,—কোটি কোটি শিখা জাগে,

প্রদীপ নিভায়ে মানব-দেবের দেউল যাহারা ভাঙে,
আমরা তাদের শস্ত্র, শাসন, আসন করিব ক্ষয় !
—জয় মানবের জয় !

: নব নবীনের লাগি

নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছের প্রতিধ্বনি এখানে মিলবে, এ তথ্য বিদগ্ধ পাঠকের কাছে বাহুল্য বিবেচিত হবে।

'বনলতা সেন' কবিতার প্রতিতুলনায় স্মরণে আসবে নজরুলের একটি বিখ্যাত গান—

দূরদ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি
দারুচিনির দেশের তুমি বিদেশিনী গো
সুমন্দ ভাষিণী।
প্রশান্ত সাগরে তুফানে ও ঝড়ে
শুনেছি তোমারি অশান্ত রাগিণী।

জীবনানন্দের অতিদূরে সফেন সমুদ্রের হাল ভাঙা দিশাহারা নাবিক দারুচিনি দ্বীপের মত আশ্রয় খুঁজে পায় পরিচিতা বনলতার কাছে। নজরুলেরও তুফানে ও ঝড়ে বিপন্ন নাবিক দূর দ্বীপবাসিনী দারুচিনি দেশের বিদেশিনীর মধ্যে পরিচিতাকে খুঁজে পেয়েছে। এতখানি সমতাকে আকস্মিক মনে করা কঠিন।

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্টির অনুবর্তন নেই। তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতির প্রভেদও দুস্তর। তাই এই আকস্মিকতাকে বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে 'ঝরাপালকে'র একটি কবিতায় যেন প্রমথ চৌধুরীর গোপন স্পর্শ নিহিত। তাঁর শ্লেষের তীর্যক তীক্ষ্ণতা নয়, শুধু বর্ণনার ভঙ্গিটুকু। তাঁর বিখ্যাত 'ব্যর্থজীবন' সনেটটির রীতি ছিল নঞর্থক বর্ণনার মাধ্যমে বর্ণনীয়ের চারিত্র্যধর্ম ফুটিয়ে তোলা।

মুখস্থ প্রথম কভু হইনি কেলাসে।
হৃদয় ভাঙেনি মোর কৈশোর-পরশে।
কবিতা লিখিনি কভু সাধু-আদিরসে।
যৌবন-জোয়ারে ভেসে, ডুবিনি বিলাসে।...

: ব্যর্থ জীবন (প্রমথ চৌধুরী)

জীবনানন্দের আলোচ্য কবিতাটিরও রীতি একই। আংশিক তুলছি—

সুধার সন্ধানে লক্ষ বিষ পাত্র চুমি'
সাজনিক' নীলকণ্ঠ ব্যাকুল বাউল !

অধরে নাহিক' তৃষ্ণা, চক্ষে নাহি ভুল,
রক্তে তব অলক্ত যে পরে নাই আজো রাণী,
রুধির নিঙাড়ি তব আজো দেবী মাগে নাই রক্তিম চন্দন !
কারাগার নাহি তব, নাহিক বন্ধন ;

: কিশোরের প্রতি

এই সুদীর্ঘ কবিতাটি আনুপূর্বিক প'ড়ে দেখতে পারেন আগ্রহীরা।

প্রবীণ সমালোচক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'ঝরাপালকে'র সমকালীন, গ্রন্থে অসংগ্রথিত একটি কবিতা উদ্ধৃত ক'রে প্রমাণ করেছেন করুণানিধান-কুমুদরঞ্জন-যতীন্দ্রমোহন-কালিদাস রায়েরা যে পল্লী-রোমান্সের বর্ণনায় খ্যাতি পেয়েছিলেন সে যুগে জীবনানন্দও তেমন কবিতার চর্চা করেছিলেন। সার্থকও হয়েছিলেন বলতে হবে।

পাড়ার মাঝারে সবচেয়ে সেই কুঁদুলী মেয়েটি কই !
কতদিন পরে পল্লীর পথে ফিরিয়া এসেছি ফের ;—
সারাদিনমান মুখখানি জুড়ে ফুটিত যাহার খই
কই কই বালা আজিকে তোমার পাই না কেন গো টের !

তোমার নখের আঁচড় আজিও লুকায়ে যায়নি বুকে,
কাঁকণ-কাঁদানো কণ্ঠ তোমার আজিও বাজিছে কানে !
যেই গান তুমি শিখায়ে দিছিলে মনের সারিকা-শুকে
তাহারি ললিত লহরী আজিও বহিয়া যেতেছে প্রাণে !

কই বালা কই !—প্রণাম দিলে না !—মাথায় নিলে না ধূলি !
—বহুদিন পরে এসেছি আবার বনতুলসীর দেশে
কুটিরের পথে ফুটিয়া রয়েছে রাঙা রাঙা জবাগুলি,—
উজান নদীতে কোথায় আমার জবাটি গিয়েছে ভেসে !

: পলাতকা (বঙ্গবাণী)

'বনতুলসী', 'উজান-নদী' 'জবা',* ইত্যাদি শব্দগুলি প্রয়োগের কৌশল থেকেই বোঝা যায় এই ঋণকে প্রচ্ছন্ন রাখার বিন্দুমাত্র প্রয়াস কবির নেই ; বরং তাঁদের কাব্যের স্মৃতিকে পাঠক চিত্তে জাগিয়ে ধ্বনিময় ক'রে তোলাই তাঁর অভিপ্রায়।

উজানি—কুমুদরঞ্জন মল্লিক রচিত কাব্যগ্রন্থ
বনতুলসী—ঐ
জবা—কালিদাস রায় রচিত কাব্যগ্রন্থ

কিন্তু এই ঋণ-প্রমাণের জন্যই এই পরিত্যক্ত কবিতাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে বসিনি। করছি এই কারণে যে 'রূপসী বাংলা'র পল্লী-প্রীতির আদি উৎসে এই নিবিড় রসের কবিতাটি পাওয়া গেল। 'রূপসী বাংলা'র ভাবভূমির পশ্চাৎপটে যে এই সব কবিদের পরোক্ষ স্পর্শ র'য়ে গেছে তারই ছিন্ন সূত্রটি এই কবিতাতে উদ্‌ঘাটিত হ'লো। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে প্রাগুক্ত কবিগোষ্ঠী যেখানে পল্লী-প্রকৃতি এবং গ্রামীণ মানুষের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার রসে কবিতাকে ঋদ্ধ করতে চেয়েছেন জীবনানন্দ সেখানে সেই জীবনের মধ্যে আত্মলীন হ'য়ে গিয়েছেন ব'লেই গভীর আন্তরিকতার স্বতন্ত্র স্বাদ এসেছে।

ভাব-সারূপ্য

হাঁসের পিঠের জল যেমন ডানা ঝাড়লেই ঝরে যায় সম-কালীন কবিদের প্রভাব 'ঝরাপালকে'র পরে জীবনানন্দ নিঃশেষে কাটিয়ে উঠেছেন। তবু পরের পর্যায়ের কবিতাতেও ক্বচিৎ কখনো কারো কারো কবিতার একটি দুটি পংক্তি বা ভাবের খণ্ডাংশের চিহ্ন পাওয়া যাবে। 'বনলতা সেনে'র 'অন্ধকার' কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি স্মরণে আসে—

হে সময় গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘ নিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া
আমাকে জাগাতে চাও কেন ?

: **অন্ধকার**

অথবা প্রেমের ক্ষণিকতা এবং স্মৃতির দহন বোঝাতে গিয়ে জীবনানন্দ যখন লেখেন—

১। সব শেষ হবে ;—তবু আলোড়ন,—তাকি শেষ হয়।

: **অনেক আকাশ**

২। আগুন জ্বলিয়া গেলে অঙ্গারের মত তবু জ্বলে
আমাদের এ-জীবন !

: **প্রেম**

তখন আমরা অনুভব করি এই বক্তব্যই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাবেই তুলে ধরেছিলেন 'ত্রিযামা'য়।

তোমার যৌবন গেছে
তবু আমি আছি বেঁচে—এ বড় বিস্ময়
আজি ওই তনুমন
কানুহীন বৃন্দাবন—শুধু স্মৃতিময়।

: **শপথ ভঙ্গ**

এ কোনো সাদৃশ্য নয়—কিন্তু চিন্তার সাযুজ্য যেন চেতনার অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে। এক একজন কবি এক একটি বিষয়ের উপর নিজের প্রতিভার এমন দৃঢ় মুদ্রাঙ্কন ক'রে যান যে জেনেও আমরা ভুল করি, বুঝি ওই বিষয়টাতেই কবির অধিকার। কিন্তু বিষয়মাত্রই সর্বজনের। কোনো কবির তা একান্ত হ'তে পারে না। আরো একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। মোহিতলালের কবিতার দেহবাদের এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রচিত হয়েছিল। সমকালীন 'কল্লোলে'র অনেকের মতোই জীবনানন্দও সেই দেহচেতনায় উদ্দীপিত হয়েছিলেন, কিন্তু সে তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে। কিন্তু তবু যখন আমরা দেখি মোহিতলালের মতোই, দেহজ দুঃখ আর জীবন যে অদ্বৈত, জীবনকে ভালবাসা দুঃখকে স্বীকার ক'রে নেবার অন্য নাম, মোহিতলালের ভাষায়—

'প্রাণের খেলায়
দুঃখেরে ডরে না কেহ'

কেননা 'যত দুঃখ, যত শোক—তত সত্য এ ভব-ভবন'

: নারী স্তোত্র (মোহিতলাল)

এই বক্তব্য জীবনানন্দের লেখাতে রয়েছে দেখি, তখন আশ্চর্য মনে হয়।

আজ শুধু দেহ—আর দেহের পীড়নে
সাধ মোর ;—চোখে ঠোঁটে চুলে
শুধু পীড়া,—শুধু পীড়া !—মুকুলে-মুকুলে
শুধু কীট,—আঘাত,—দংশন,—
চায় আজ মন !

* * * *

আমি তবু ব্যথা দেই,—
ব্যথা পাই ফিরে !—
তবু চাই সবুজ শরীরে
এ ব্যথায় সুখ !

: পিপাসার গান

এইভাবেই 'বনলতা সেনে'র 'শঙ্খমালা' পড়তে পড়তে যখন অজিত দত্তের 'পাতাল-কন্যা'র স্মৃতি জেগে ওঠে, মনে হয় পাতাল কন্যার স্নিগ্ধ মাধুর্য এখানে কালের প্রেত-স্পর্শে বীভৎস রসাপ্লুত হ'য়ে উঠেছে, তখন অনুভব করা যায় এক কবির সঞ্চরণভূমিতে ভিন্ন জাতের প্রতিভা এলে কি ফল ফলে উঠতে পারে।

কিন্তু সে কথা অবান্তর। জীবনানন্দের কবিতা পড়তে পড়তে কচিৎ কখনো

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা স্মরণে আসে। মনে হয়, অনেক সময়েই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা তাঁর সৃষ্টির পিছনে অন্তর্লীন প্রেরণার মতো। জীবনানন্দের দুটি অল্পখ্যাত কবিতা থেকে তুলছি।

১। শহর ও গ্রামের দূর মোহানায় সিংহের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে ;
সার্কাসের ব্যথিত সিংহের।

*   *   *   *

সিংহ হুঙ্কার করে উঠছে ;
সার্কাসের ব্যথিত সিংহ,
স্থবির সিংহ এক—আফিমের সিংহ—অন্ধ—অন্ধকার।
চারদিককার আবছায়া সমুদ্রের ভিতর জীবনকে স্মরণ করতে গিয়ে
মৃত মাছের পুচ্ছের শৈবালে, অন্ধকার জলে, কুয়াশার পঞ্জরে হারায়ে
যায় সব।

সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
পাবে না আর
পাবে না আর।

: **শীত রাত**

২। আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও : মরি নাকি মোরা মহাপৃথিবীর তরে ?
পিরামিড যারা গড়েছিল একদিন—আর যারা ভাঙে—গড়ে :
মশাল যাহারা জ্বালায় যেমন জেঙ্গিস্ যদি হালে
দাঁড়ায় মদির ছায়ার মতন—যত অগণন মগজের কাঁচামালে ;
যে সব ভ্রমণ শুরু হ'ল শুধু মার্কোপোলোর কালে ;
আকাশের দিকে তাকায়ে মোরাও বুঝেছি যে সব জ্যোতি
দেশলাই কাঠি নয় শুধু আর—কাল পুরুষের গতি ;
ডিনামাইট দিয়ে পর্বত কাটা না হ'লে কি ক'রে চলে,—
আমাদের প্রভু বিরতি দিও না ; লাখো লাখো যুগ রতি বিহারের ঘরে
মনোবীজ দাও : পিরামিড ভাঙে গড়ে।

: **প্রার্থনা**

প্রথমটিতে প্রেমেন্দ্রের 'বাঘের কপিশ চোখে' কবিতার প্রতিচ্ছায়া স্পষ্ট। দ্বিতীয়টিতেও তাঁর কবিতার অনুভাবনা অলক্ষিত নয়।

ইতিহাসের অতীত প্রেক্ষাপট উন্মোচন করতে প্রেমেন্দ্র মিত্র ভালবাসেন।

পৃথিবীর স্তরে স্তরে কত ঘুম অগাধ গভীর,
স্তমের, মেম্ফিস, উর, নিনেভে, ওফির,
মরুর বালুকালুপ্ত গাঢ় ঘুম
কত নগরীর ;

: বিনিদ্র (প্রেমেন্দ্র)

স্তমের, উর, নিনেভে, জীবনানন্দেরও প্রিয় স্থানবাচক নাম। মৃত্যু কবলিত অতীতের রূপক হিসাবে 'ঘুম' কথাটিকে জীবনানন্দ বারবার ব্যবহার করেছেন। ইয়েট্সের কবিতাতেও অনুরূপ ভাবনার দেখা মিলবে। যেমন—

Out of dark night where lay the crowns of Nineveh.

মনে হয়, এই একই উৎস থেকে উদ্দীপিত হওয়ায় উভয় কবির ভাবনাতেই এই ঐক্য এসেছে।

'রূপসী বাংলা'কে উদ্দেশ্য ক'রে জীবনানন্দ লিখেছেন তাঁর যখন মৃত্যু হবে, তাঁর আজকের এই গভীর ভালবাসা মুছে যাবে, তখন এই রূপসী বাংলার সঙ্গে—

আবার কাহার সাথে ভালবাসা হবে তার আমি তা জানিনা ;—
মৃত্যুরে কে মনে রাখে? ...কীর্তিনাশা খুঁড়ে খুঁড়ে চলে বারোমাস
নতুন ডাঙার দিকে—পিছনের অবিরল মৃত চর বিনা
দিন তার কেটে যায়—শুকতারা নিভে গেলে কাঁদে কি আকাশ ?

: পৃঃ ২৬

'মৃত্যুরে কে মনে রাখে?' এই উক্তিটি কি প্রেমেন্দ্রের ঐ নামের কবিতাটিকে স্মরণে আনবে না!

জীবনানন্দের 'পাখিরা' কবিতার সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের 'সাগর পাখীরা' কবিতার আরো গাঢ়তর সাদৃশ্য নজরে পড়বে। 'বনলতা সেন' গ্রন্থের 'বুনোহাঁস' কবিতাকে প্রেমেন্দ্রের 'মৃত্যুত্তীর্ণ' কবিতার প্রেরণায় লেখা বলে মনে হবে। কিন্তু দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে যেটা বলা প্রয়োজন তা হ'লো ভাবনার বিচিত্র নূতনত্ব প্রেমেন্দ্রের কবিতায় থাকলেও ভাব যে পর্যায়ে ও পদ্ধতিতে রসায়িত হ'য়ে ওঠে সেই পরিণতির অভাব আছে একথা স্বীকার করা ভালো। তাঁর কবিতা অনেক ক্ষেত্রে স্মরণীয় ভাষণ মাত্র। সেই উপকরণ দিয়েই জীবনানন্দ রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি করেছেন। উভয় কবির উদ্ধৃত নাম চারটি কবিতা পাশাপাশি নিয়ে পড়লে বোঝা যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভাব কোথায় আর কোথায় জীবনানন্দের সার্থকতা।

রবীন্দ্রানুসৃতি

কেউ কেউ বলেন, জীবনানন্দের কাব্যে রবীন্দ্র-প্রভাব একেবারেই অনুপস্থিত। তাঁদের এমন উক্তি নিঃসন্দেহে বিস্ময়-উদ্রেকী। একথা সত্য—শিল্পী জীবনানন্দের রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ খুব সামান্য। কাব্যের আঙ্গিকে এবং প্রকাশ-পদ্ধতিতে তিনি একান্ত স্বকীয়তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। হয়তো পাশ্চাত্য আঙ্গিকের অনুসরণ করেছেন কখনো কখনো। কিন্তু ভাবনা-কল্পনার অন্তত কিছু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রচ্ছন্ন নেই। এই সাধর্ম্য যে শুধু অনুকরণাত্মক হবে এমন কোনো কথা নেই, বিরোধাত্মকও হ'তে পারে। আমরা অন্যত্র প্রেম প্রসঙ্গে, প্রকৃতি প্রসঙ্গে, ঋতুবর্ণনায় জীবনানন্দের এই স্বাতন্ত্র্য—রবীন্দ্রকাব্যের ভাবাষঙ্গের অনমুরূপ আবহ গ'ড়ে তোলার শক্তি ও সাধনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি। তার পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখিনা। 'কল্লোলে'র আমলে এই ইচ্ছা সমকালের কবি মহলে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার প্রাণ ও প্রয়োজন প্রমাণ করার জন্যে উদগ্র হ'তে দেখা গিয়েছিল।

'ঝরাপালকে'র 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' কবিতাটির নাম রবীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তি তুলেই করা হয়েছে শুধু স্পষ্ট প্রমাণ করতে যে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজমের পথ থেকে এ কবিতা ভিন্ন পথের। ডাঃ সুকুমার সেন প্রথম তুলে ধরলেন—রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুপারে' কবিতার বিপরীত চিত্র রয়েছে 'ঝরাপালকে'র 'অস্তচাঁদে'। তিনিই দেখিয়েছেন—'ধূসর পাণ্ডুলিপি' রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মতোই নিঃসঙ্গ দুর্বোধ কবি-আত্মার অস্পষ্ট আত্মানুভব ব'লেই শুধু 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' ব্যবহৃত নানা উপমা ও চিত্রকল্প এই পর্যায়ে ফিরে ফিরে আসছে এমন মনে করার কারণ নেই।* বরং 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র ভাব ও সুরই এখানে এবং এর পরের কবিতা গ্রন্থগুলিতে অভিব্যক্তি পেয়েছে।

আরও পরে দেখা যাবে—এমন আপাত সদৃশ মনোভঙ্গির মূল আরো গভীরে

* ডাঃ সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে নীচের পংক্তিগুলি উদ্ধার করেছেন—

১। শত শত মৃত তারকার/মৃতদেহ রয়েছে শয়ান। (তারকার আত্মহত্যা)

২। শুনিতে পারিনে আর একই গান, একই গান। (হৃদয়ের গীতিধ্বনি)

এর সঙ্গে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র এই পংক্তিগুলির যথানুক্রমিক মিল দেখিয়েছেন।

১। যে-নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত। (নির্জন স্বাক্ষর)

২। সে কেন জলের মত ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়! (বোধ)

প্রোথিত। প্রাণের যে অভিযাত্রার কাহিনী জীবনানন্দের কাব্যের মূল উপজীব্য, উত্তরসূরী হিসাবে তার উপকরণ তিনি রবীন্দ্রকাব্য থেকেই সংগ্রহ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় জীবনের উদ্বর্তন সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবনার সংশ্রব ছিল। জীবনানন্দের রচনায় তাঁর স্বকীয় মরমী-রীতিতে প্রাণের বন্ধুর পথ-ক্রমার ইতিহাস রচিত হয়েছে যেন। তাঁর কাব্যের নায়ক জীবনের প্রতীক আলোকণা। প্রাণ-কণা আলোকমুখী, তবু তার গতি সরল নয়। অনেক চড়াই উৎরাই, পাকদণ্ডীর বেদনা সহ্য ক'রে তার অগ্রযাত্রা। অনেক অন্ধকারের আবহ অঙ্গীকার ক'রে তার আলোক-তপস্যা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই ভূমিকায় তাঁর যে ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ, এতখানি অন্য কোন আধুনিক কবির সঙ্গে দেখা যায় না। একথা খোলাখুলি স্বীকার করায় জীবনানন্দের কবিকৃতিকে কোন ভাবে খাটো করা হবে মনে হয় না। বিশেষত, মনের অসংজ্ঞান লোকে অভিসঞ্চারে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে গিয়েছেন।

উপরি উক্ত কথাগুলির বিস্তৃততর ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। প্রাণের অভিযাত্রার কাহিনী ঠিক রবীন্দ্রকাব্যের মূল কথা নয়—তা রবীন্দ্রনাথেরই প্রাণ সম্পর্কিত ভাবনা-কল্পনার প্রসারণ মাত্র। রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধানতত্ত্ব—জড় থেকে চেতনার ক্রমবিকাশবাদ। জড় থেকে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে জঙ্গম জীবের মধ্যে চেতনা ক্রম-বিকশিত হয়েছে। মানুষের মধ্যে চেতনা এমন প্রবল প্রকাশ পেলেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন নিম্নতর জীব, উদ্ভিদ এমন কি জড় স্থাবর বিশ্বের মধ্যেও এই চেতনাই সুপ্ত আকারে নিহিত আছে। তাই রবীন্দ্রকাব্যের একটা বিশেষ প্রবণতা—চেতনাগত ব্যাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বকে আত্মস্থ করার সাধনা। তাঁর অনুভূতির কেবলই ছড়িয়ে পড়তে চায়। তাই সকল প্রাণীর সাধর্ম্যের উপরেই তিনি জোর দেন, বৈষম্য এড়িয়ে চলেন। নিখিল বিশ্বের মধ্যে একই প্রাণময় আনন্দ-সত্তার স্পন্দন তিনি অনুভব করেন। 'অহল্যার প্রতি', 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রমুখ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের চেতনা সমস্ত স্বকীয় প্রাণীগত বিশেষত্ব বর্জন ক'রে নিখিল প্রাণ ও প্রাণের উৎস জড়-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে। তার ফলে ধরিত্রীর গোপন বেদনা তিনি যেমন হৃদ্স্পন্দনে অনুভব করেছেন তেমনই বনস্পতি প্রমুখ জীবজগতের অন্যান্য প্রকাশের সঙ্গে আপনার চেতনাগত সাযুজ্য অনুভব করেছেন।

জীবনানন্দের কবিতাতেও ঠিক এই ভাবনা অদ্ভুতভাবে ক্রিয়াশীল। মানুষের সমস্ত বাহ্য-বৈষম্য পরিহার ক'রে তিনি প্রাণীজগতের সামান্য লক্ষণ অঙ্গীকার করতে পেরেছেন ব'লেই ঘাস, পাখি, কমলালেবু কিম্বা হরিণের সঙ্গে আত্মলীন হ'য়ে যেতে পারেন। তাদের আনন্দ বেদনাকে আপন অন্তরে অনুভব করতে পারেন। শকুন বা পেঁচা কিম্বা গলিত স্থবির ব্যাঙকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজন হয় না। তার

মধ্যেই আপনার প্রতীকী রূপ খুঁজে পান। তিনিও অহল্যার মতোই 'পৃথিবীর ক্লান্ত বেদনা' অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতার মতোই মানব-শিশুর জন্য 'মাটি-মা'র আর্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'ঝরাপালকে'র একটি কবিতায়—

আমার এ শিরা-উপশিরা
চকিতে ছিঁড়িয়া গেল ধরণীর নাড়ীর বন্ধন,
শুনেছিনু কান পেতে জননীর স্থবির ক্রন্দন—
মোর তরে পিছু ডাক মাটি-মা—তোমার ;
ডেকেছিলো ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিম মাস—জোনাকির ঝাড়,

* * * *

ভ্রূণভ্রষ্ট সন্তানের তরে
মাটি-মা ছুটিয়া এলো বুকফাটা মিনতির ভরে ;

: সেদিন এ ধরণীর

ভাবনার নৈকট্য সত্বেও একথা স্বীকার্য যে এর প্রকাশরীতিতে দৈন্য আছে। রবীন্দ্র-নাথের সেই বিশিষ্ট দার্শনিকতার পরিমণ্ডল এ কবিতায় গ'ড়ে ওঠেনি। তবু অনুভবের তীক্ষ্ণ-সততায় শব্দ-প্রয়োগ ঋজু ও বিশিষ্ট হ'তে পেরেছে।

জীবনানন্দের কাব্যজীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ব্যবধান আরো বেশী হয়েছে। তখন যদিবা কোনো কবিতায় দুই কবির যৎসামান্য চিত্র বা ভাবগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়—মনোভাবনার এমন সারূপ্য আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতার পৃষ্ঠপটে রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতার অস্তিত্ব সমালোচকরা নির্দেশ করেছেন। বাস্তবিক আগন্তুকের প্রতি সকরুণ আঁখি মালবিকার জিজ্ঞাসা 'হে বন্ধু আছ তো ভাল ?' আর বনলতার প্রশ্ন 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?' পরস্পরের উক্তির পরিপূরক যেন। 'কুলায় প্রত্যাশী সন্ধ্যায় পাখীর মত' এই রাবীন্দ্রিক চিত্রকল্পটি জীবনানন্দের কবিতায় দুবার দুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে বনলতার চোখের উপমায় 'পাখির নীড়ের মত' বিশেষণ রূপে আর পরিণামী সান্ধ্য পরিবেশ রচনায় 'সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী' পংক্তিটিতে। কিন্তু এইটুকু মাত্র। বিষয় বা মানসিকতায় এঁদের কোনো সাধর্ম্য পাওয়া যায় না।

কেননা উভয় কবির মনোগঠন এবং কাব্য-প্রেরণাই বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের মনোগঠনটাই সার্বভৌমিক—cosmic. বিশ্বকে সহজেই তিনি তাঁর বিশাল হৃদয় এবং কল্পনায় টেনে নিতে পারেন।—এই সর্বানুভূতি প্রায় আধ্যাত্মিক। অপর পক্ষে জীবনানন্দ বিশ্বের থেকে গুটিয়ে এনে, জাগতিক অভিঘাত থেকে নিজেকে আড়াল করতে গিয়ে এক ধরণের কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করেছেন, 'নষ্টালজিক' বেদনার ভিতর দিয়ে

নিজের অন্তরের মধ্যে এক সংকীর্ণ সচ্ছল বিশ্ব গ'ড়ে নিয়েছেন। সেই পলাতকের স্বর্গে, ইন্দ্রিয়লীন মনোরাজ্যে, কমলালেবুর মাংসল রসোচ্ছলতায়, আতার ক্ষীরের ঘনত্বে, গুলিবিদ্ধ প্রেমিক হরিণের যন্ত্রণায়, ঘাসমাতার শরীরের সবুজ সুঘ্রাণ অন্ধকারের সান্নিধ্যে একান্ত হ'তে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষা যেখানে মহত্তম দার্শনিকতায় উপনীত, জীবনানন্দ সেখানে মনোগহনের রহস্যে লীন হ'য়ে অনুভূতির সেই চেতনা-লোকই আবিষ্কার করলেন অন্য এক পথে, পৃথক এক স্বাদে ও সার্থকতায়। একজন অনায়াসে মুক্তবিহঙ্গের মতো নভোলোকচারী, অন্যজন মাটির গভীরে আত্মগোপন করতে গিয়ে মাটি-পাথর গলিত লাভার উত্তাপের ভিতর দিয়ে ভূগর্ভ ভেদ ক'রে আবার মুক্ত আকাশের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। দুজনের অভিজ্ঞতাই সমান স্বাদু হ'তে বাধা নেই।

হৃদয়ানুভূতির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন বলেই 'ব্লিজার্ডের' তাড়া খাওয়া পাখিরা যখন উড়ে চলে উষ্ণতর জগতের সন্ধানে, তাদের প্রত্যাশা ও বেদনা অনায়াসে জীবনানন্দের অনুভূতিতে ধরা পড়েছে।

কোথাও জীবন আছে—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল র'য়ে গেছে—সাগরের তিতা ফেনা নয়,
খেলার বলের মতো তাদের হৃদয়
এই জানিয়াছে ;—
কোথায় রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তা'রা আসিয়াছে।

তারপর চ'লে যায় কোন্ এক খেতে
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে-যেতে
সে কি কথা কয় ?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়।
অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ-মাটির ঘ্রাণ,
ভালবাসা আর ভালবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ—গভীর—গভীর।

: পাখিরা

এই স্বাদের উপলব্ধি তাঁর কবিতায় প্রতীকী তাৎপর্য আরোপ করেছে। তিনি জেনেছেন পাখিদের জীবনের কামনা, বেদনা ও সমস্যা মানুষের জীবন থেকে কিছুমাত্র স্বতন্ত্র নয়। এই গৃহহারা-প্রাণের যাত্রার সাথে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' অথবা 'বলাকা'র পাখিদের উড়ে যাওয়ায় যতখানি সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, তার চেয়ে কম নয়। ঝিলম-তীরের হংস-বলাকা জীবনের এক অনির্দেশ্য গতির দিকেই ইঙ্গিত করছে। এখানে পাখিদের উড়ে যাওয়া জীবনকে ভালবেসে, জীবনের দুঃখ-বেদনা মেনে নিয়ে। 'দুঃসময়ে'র বিহঙ্গটি মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল, জীবনানন্দের পাখিদের এখানে শুধু অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম নয়, বংশধারার মধ্যে প্রাণপ্রবাহকে প্রসারিত ক'রে দেবার আকাঙ্ক্ষাও অনুস্যূত। 'বলাকা' তত্ত্ব, 'পাখিরা' প্রাণের স্পর্শ পেয়ে সত্যতর; জীবনানন্দ তাই মানুষের নিকটতর লোকের কবি।

কাব্যস্মৃতি-২

বিদেশী প্রকরণ

ঘরোয়া এক আলোচনায় জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকরণের বিজাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন জনৈক কবি বন্ধু। তাঁর বক্তব্য ছিল জোরালো। আর এমন আলোচনায় উপস্থাপনের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আমরা ঠিক সেভাবে বিষয়টি তুলতে পারছি কিনা জানি না।

তিনি বলেছিলেন, জীবনানন্দ দাসের কবিতায় ভিনদেশী চিত্রকল্পের প্রয়োগ সুপ্রচুর, কিন্তু উপযোগিতা ততখানি নেই। নাবিক, সমুদ্র, লেগুন ইত্যাদি চিত্রগুলি আমাদের জাতীয়-মানসে সংস্থিত নয়। 'গঁগ্যার ছবি,' 'পিস্‌টনের উল্লাস' বা 'চক্ষের ফস্‌ফোরেশনস্‌' সাধারণ পাঠকের কাছে বিশেষ কোনো অর্থ বহন করে না। এমন কি 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার সেই বিখ্যাত চিত্রকল্প—'উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা' বাঙালী পাঠকের চেতনায় তেমন দৃশ্যমান হ'য়ে না ওঠার সঙ্গত কারণ আছে। এদের সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞান যখন প্রতীচী পাঠকদের মতো নয়, তখন এগুলি প্রয়োগ না করাই সমীচীন। বরঞ্চ বিদিশা, উজ্জয়িনী ইত্যাদি প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ তাঁর কবিতার পটভূমিকে ব্যঞ্জনাগভীর করতে সহায়তা করেছে!

এ যুক্তি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য কিনা জানি না। অন্তত এর বিরুদ্ধেও অনেকগুলি জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করা চলে। আমাদের মনে হয়, কবির মনে কোন চিত্রকল্প সজীব ও উজ্জ্বল হ'য়ে এসেছে তাই বিচার্য—তার জাতীয়তা বিজাতীয়তা নয়! জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রে শ্রাবস্তী বিদিশা অতীত ঐতিহ্যজ্ঞাপক শব্দমাত্র মনে হয়। নির্বিশেষত্ব এর লক্ষণ। তাই এক নাম অন্য নামকে স্থানচ্যুত করলে ধ্বনিগত পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোনো তারতম্য ঘটে না। যে গভীর ভাবনা-ঐশ্বর্যে একটি নামের উল্লেখ তার স্বকীয় লক্ষণ ও পূর্ণ অবয়ব নিয়ে দেখা দেয় এবং কবিতার বরাঙ্গ হ'য়ে ওঠে তার অভাবে উক্ত নামগুলি অকারণ বাক্‌বিভূতি মনে হ'তে পারে। কোন্‌ চিত্রকল্প পাঠকের পরিচিত, কোনটি নয়, কাব্য-বিচারে সেটা খুব একটা বড় কথা নয়। প্রথমে দর্শনীয়, কবি যা দিতে চেয়েছেন তা ঠিক মতো দিতে পেরেছেন কিনা এবং তা পাঠকের মনে অভিপ্রেত রসসঞ্চার করছে কিনা। ভিন্‌দেশী রূপকল্পে কবিতার সংবেদনার লাঘব হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি নূতন এক রূপলোকের অনভিজ্ঞাত বিস্ময় ও মায়া স্বাদের বৈচিত্র্যও আনতে পারে।

যদি ধ'রেই নেওয়া যায়, এর ফলে সামান্য রসাভাস হয়েছে, তবু একথা অনস্বীকার্য এই সব নূতন চিত্রকল্প তাঁর রচনাতে যত সতেজ ও বলিষ্ঠ, ভারতের প্রাচীন প্রসঙ্গে

তাঁর প্রতিভায় ততখানি স্ফূর্তি নেই। জীবনানন্দের কবিপ্রাণ ইউরোপীয় কবিতার রসে জারিত ব'লেই এগুলি যত সজীব ও স্বচ্ছন্দ, ভারতের পৌরাণিক কল্পকাহিনী কখনই তেমন নয়। তাই, ঐ 'ইমেজ'গুলিতে জীবনের গভীর অনুধ্যান আছে ব'লেই বিজাতীয়তার অজুহাতে ঐ ঐশ্বর্য-সম্ভোগে আমাদের অনীহা নেই। আমরা বিশ্বাস করি, আজকের অপরিচিত ভাবপরিমণ্ডল ক্রমে সাধারণ পাঠকেরও সুপরিচিত মনে হবে—তখন আর আজকের বাধা প্রধান ব'লে গণ্য হবে না।

সুতরাং বিদেশী প্রকরণের বিরুদ্ধে যদি কোনো অসার্থক শিল্পপ্রয়োগের অভিযোগ থাকে তবেই তা গ্রাহ্য হ'তে পারে—অন্য কোন অভিযোগ নয়। 'যেন এক দেশলাই' কবিতায় প্রেমিকের হৃদয়ের দহন যখন দেশলাই জ্বলার চিত্রকল্প হ'য়ে ওঠে—

'যেন এক দেশলাই জ্বলে গেছে—জ্বলিবেই—হালভাঙা জাহাজের স্তূপে'
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চ'লে চুপে।

: যেন এক দেশলাই

তখন দেশলাই জ্বলার রূপকল্পটি যদিও সার্থক,—মনে হয় 'জ্বলিবেই' শব্দটির প্রয়োগ শিথিল, এমন কি অনাবশ্যক, রসহন্তারক।

শব্দের বা বাক্যাংশের পুনঃপ্রয়োগ দ্বারা রসব্যঞ্জনার কৌশলটি দক্ষ প্রয়োগের ফলে টি. এস. এলিয়টের হাতে খুব জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। এই কৌশল প্রয়োগে জীবনানন্দও কোথাও কোথাও আশ্চর্য সফল হয়েছেন। 'নগ্ন নির্জন হাত,' 'আদিম দেবতারা' ইত্যাদি কবিতায় তার প্রমাণ আছে। কিন্তু কদাচিৎ এমন পুনরুক্তি তাৎপর্য-মণ্ডিত হ'য়ে ওঠেনি। যেমন—

একবার নক্ষত্রের দিকে চাই—একবার প্রান্তরের দিকে
আমি অনিমিখে,
ধানের ক্ষেতের গন্ধ মুছে গেছে কবে
জীবনের থেকে যেন; প্রান্তরের মতন নীরবে
বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার;
নক্ষত্রেরা বাতি জ্বেলে—জ্বেলে—'নিভে গেলে—নিভে গেলে?'
ব'লে তারে জাগায় আবার;
জাগায় আবার
বিক্ষত খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে—বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার,
ঘুম পায় তার।

: নিরালোক

এখানে 'ঘুম পায় তার'—এই শেষ বাক্যটি ছাড়া আর কোনো পুনরুক্তি যে খুব সার্থক হয়েছে তা বলা যায় না।

ইউরোপীয় কবিতার কাব্যস্মৃতি এবং আরোপ (Allusion) অলঙ্কার তাঁর কবিতায় কোথাও কোথাও উজ্জ্বল অবয়ব এনেছে। কিন্তু সেজন্য সাধারণের অপরিচয়ের ফলে এগুলির আস্বাদনে যে কোথাও বিঘ্ন হয়েছে এমন কথা স্বীকার করবো না। ধরা যাক 'আকাশলীনা' কবিতাটি—

স্থরঞ্জনা, ওইখানে যেয়োনাকো তুমি,
বলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে ;
ফিরে এসো স্থরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে ;

: **আকাশলীনা**

ইউরোপীয় সাহিত্যমোদীদের কাব্যস্মৃতিতে 'নক্ষত্রের রুপালি আগুন' শেক্সপীয়রের পংক্তি অথবা পুরাতাত্ত্বিকদের প্রাক-বিজ্ঞান কিম্বদন্তী (myth) অথবা ইয়েট্‌সের 'the flame of the blue star of twilight'-এর স্মরণ, যাই ঘটাক না কেন, ওই অ্যালুশান ছাড়াই বাঙালি পাঠক-এর রসাস্বাদ করবে। আরো একটি কবিতায়—

হৃদয়, অনেক বড় বড় শহর দেখেছ তুমি ;
সেই সব শহরের ইট পাথর,
কথা, কাজ, আশা, নিরাশার ভয়াবহ হৃতচক্ষু
আমার মনের বিস্বাদের ভিতর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

: **শহর**

রসগ্রহণে কোনোই বাধা ঘটায় না। কিন্তু এলিয়টের কবিতায় যিনি পড়েছেন—

The eyes are not here
There are no eyes here
In this valley of dying stars.
In this hollow valley
This broken jaw of our lost kingdoms.

* * *

Sightless, unless
The eyes reappear
As the perpetual star
Multifoliate rose

Of deaths twilight kingdom
The hope only
Of empty men.

: The Hollow Men

তিনি জানেন কি অর্থব্যঞ্জনা ওই 'ভয়াবহ হৃত চক্ষু'র পশ্চাৎপটে। তখন ওই কবিতার স্বাদ যায় পালটে।

ভিনদেশী প্রসঙ্গ

বাস্তবিক ইংরাজীসাহিত্যে এলিয়টের সঙ্গে জীবনানন্দের মনোভাবনার একটু আত্মিক নৈকট্য আছে। সভ্যতার দুর্বহ নিরর্থকতা জীবনানন্দের মতো এলিয়টকেও বিচলিত করেছিল। আমাদের ক্রিয়াকলাপের অর্থহীন অসঙ্গতি এবং তার অন্তস্থলে চক্রনিষ্পিষ্ট মানবাত্মার করুণ ক্রন্দন এলিয়টের কাব্যেরও মূল আখ্যান বস্তু। তবু জীবনকে দেখার ভঙ্গির মধ্যে উভয় কবির মৌল পার্থক্য রয়েছে। এলিয়ট জীবনকে দেখেছেন এক শ্লেষনিষ্ট বুদ্ধি দিয়ে। জীবনকে তিনি যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন অথচ বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে সভ্যতার অন্তঃসার শূন্যতা, তার বৃথা আড়ম্বর উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতে উহ্য হয়েছে কবির নির্মোহ বিতৃষ্ণা। জীবনানন্দের ঠিক এই মনোভাব নয়। আজকের ব্যর্থতা তিনি ছোট ক'রে দেখেন নি, তবু ভবিষ্যতের প্রতি অটুট আস্থা আছে। এমন কি, বর্তমানেও কৃত্রিমতার গ্লানির বাইরে তিনি একটি সান্ত্বনার স্থান, ধ্বংসের রলরোলের বাইরে একটি শান্তির আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন, তা হ'লো প্রকৃতি। বুদ্ধিকে পরিহার ক'রে, হৃদয় আশ্রয় ক'রে প্রকৃতির নিরাবিল সাহচর্যে মানুষ সাময়িক সান্ত্বনা পেতে পারে—জীবনের শেষপর্বে এ বিশ্বাস তিনি সঞ্চয় করেছিলেন।

এলিয়টের প্রতিভাকে অবশ্য জীবনানন্দ যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন না। তাঁর 'কবিতার কথা' বইটিতে তার অনেক নিদর্শন আছে। কিন্তু যে কবিকে অশ্রদ্ধা করা হয় তার সঙ্গে গভীরাত্মক মিল সাহিত্যের ইতিহাসে এই একক মাত্র নয়। মধুসূদন 'কৃষ্ণনগরের সেই লোকটার' প্রতি প্রচণ্ড অশ্রদ্ধা পোষণ করতেন, কিন্তু আজ সাহিত্য পাঠকদের অজানা নেই যে অন্তত প্রযুক্তির দিক থেকে ভারতচন্দ্রের কাছে মধুসূদনের ঋণ অনেকখানি। এমন দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া চলে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্যের প্রয়োজন নেই। মনস্তত্ত্বে নাকি বলে ঘৃণা প্রীতিরই পর্যায়ভেদ। অন্তত সাহিত্যে তার

নিদর্শন রইল। এই মিল জীবনানন্দের নিকট উদ্ঘাটিত হলে তিনি বিরক্ত হতেন নিঃসন্দেহে।

Waste land বইটিতে আধুনিক জীবনের সাঙ্কেতিক স্বরূপ এবং তার পূর্বনির্দিষ্ট পরিণাম নির্দেশ করতে গিয়ে এলিয়ট জ্যোতিষ-বিদ্যার সাহায্য নিয়েছিলেন। জীবনানন্দও 'মহাপৃথিবী,' 'সাতটি তারার তিমির,' 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যায়ে সমকালীন জীবনের রূপচিত্র আঁকতে রাশিচক্রের আখর কেটেছেন—

১। নিরাশার খাতে ততোধিক লোক উৎসাহে বাঁচায়ে রেখেছে ;
অগ্নি পরীক্ষার মতো কেবলি সময় এসে দ'হে ফেলে দিতেছে সে সব।
তোমার মৃত্যুর পরে আগুনের একতিল বেশী অধিকার
সিংহ মেষ কন্যা মীন ক'রেছে প্রত্যক্ষ অনুভব!

: প্রেম অপ্রেমের কবিতা

২। হে কালপুরুষ, ধ্রুব, স্বাতী, শতভিষা,
উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহের মতো যারা তাহাদের দিশা
স্থির করে কর্ণধার ?—ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা।

: পরিচায়ক

৩। যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হ'য়ে গেছে সব ; বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক—কর্কট—তুলা—মীন।

: গোধূলি সন্ধির নৃত্য

৪। স্বাতিতারা শুকতারা সূর্যের ইস্কুল খুলে
সে-মানুষ নরক বা মর্ত্যে বাহাল
হ'তে গিয়ে বৃষ মেষ বৃশ্চিক সিংহের প্রাতঃকাল
ভালোবেসে নিতে যায় কন্যা মীন মিথুনের কূলে।

: সৃষ্টির তীরে

এর আগেও 'রূপসী বাংলা' ইত্যাদিতে নক্ষত্রমণ্ডলের উপর জীবনানন্দের কৌতূহল ছিল। কিন্তু এখানে তার সঙ্গে সাঙ্কেতিকতা যুক্ত হয়েছে। এইখানেই এলিয়টের প্রভাব। কিন্তু এলিয়টের কবিতায় জ্যোতিষের ইঙ্গিত সব মিলিয়ে অবশ্যম্ভাবী অপমৃত্যুর সূচনা করেছে, জীবনানন্দের কবিতায় বৃষ ও মেষের পাশবিকতা, বৃশ্চিক ও সিংহের হিংস্রতা প্রেমের ছোঁয়া পেয়ে কন্যা মীন মিথুনের কূলে গিয়ে উপনীত হয়েছে।

ভিনদেশী প্রসঙ্গের এ জাতের অঙ্গীকরণ নিয়ে আলোচনার বিশেষ কিছু নেই।

বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেখানে বিদেশী কবিতার প্রভাব কোনো বিশেষ কবিতা সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছে সেগুলি সম্পর্কে কিছু মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। 'সিন্ধু সারস' কবিতায় শেলীর To a Skylark কবিতার প্রভাব কিছু মাত্র প্রচ্ছন্ন নেই।

অনেক গহন ক্ষতি

আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে—হারায়েছি আনন্দের গতি;
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
হৃদয় বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান?
জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
তুমি পিছে চাহোনাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই, বুকে নেই
আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে ব্যথা আর
কুয়াশার ঘর।
যে-রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নেই তব; নেই নিম্নভূমি—নেই আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

: সিন্ধু সারস

শেলীর কবিতাটিকে নিজের চিন্তা এবং অনুভবের মাধ্যমে যেন ব্যাখ্যা করা হয়েছে এখানে। কিন্তু To a skylark কবিতা থেকে পরিণামে এ কবিতা একেবারেই স্বতন্ত্র। সৌন্দর্য-সাধনাকে যে ক্ষুধার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়, মানুষের ইন্দ্রধনু ধরবার আয়োজন যে নিশ্চিত ব্যর্থতায় নিরসিত হয়—সেই বেদনার করুণ রূপ লিপ্ত হ'য়ে থাকে পৃথিবীতে।

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই—আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,

: ঐ

এবং এই পার্থিব সুখ-ব্যথারও একটা আকর্ষণ আছে। স্নিগ্ধ সূর্য থেকে শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায় যে পাখি উড়ে বলেছে, এই ব্যথাতুর স্বাদ তার অনায়ত্তই থেকে যায়। শেলীর স্কাইলার্কে শুধু অভাব আর অতৃপ্তির সুর, 'সিন্ধু সারসে' চরম অভাবের মধ্যে একটা পরম প্রাপ্তির আনন্দও মাখানো আছে।

আমরা ইতঃপূর্বেই আলোচনা করেছিলাম ইন্দ্রিয়ানুভবের প্রখরতায় আর স্বভাবের সমজাতীয়তায় কীটসের সঙ্গে জীবনানন্দের মিল গভীরতর। দুই জনেরই শারীরী

চেতনার কবি। আর কীট্সের কবি-প্রাণ ইংল্যাণ্ডের দ্বীপভূমিতে জন্ম নিয়েও হেলেনিক সৌন্দর্য রসেই যেমন সঞ্জীবিত, তেমনি জীবনানন্দের সাহিত্য পটপ্রচ্ছদের অন্তরে বিধ্বস্ত প্রাচীন আর্যসভ্যতার ঐতিহ্যের অনুধ্যান। তাই তাঁর কবিতার স্তরে স্তরে দ্বারকার বিচূর্ণ থামের চিহ্ন প'ড়ে থাকে, কাঞ্চীবিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝ'রে যায়, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগত বার বার ছায়া ফেলে।

শুধু এমনই নয় জীবনানন্দের অনেক কবিতাতেই কীটস্ সজীবভাবেই প্রত্যক্ষ। নমুনা হিসাবে কয়েকটি পংক্তি তুলছি আমরা। জীবনানন্দ লিখেছেন—

রোগীর জ্বরের মতো পৃথিবীর পথের জীবন

: **জীবন**

কীট্সের কবিতায় পাই—

The wearines, the fever and the fret
Here, where men sit and hear each other groon ;

: **Ode to a Nightingale**

মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি তো,—প্রিয়ার মতন!—
চকিত শিশুর মত তার কোলে লুকায়েছি মুখ ;...

: **জীবন**

পরের স্তবকেই আবার

মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধ'রে।

: **ঐ**

এ পংক্তিগুলি কি কীট্সের সেই স্মরণীয় কবিতাটিকে মনে করিয়ে দেয় না?

Darkling I listen ; and, for many a time
I have been half in love with easeful Death,
Called him soft names in many a muse'd rhyme,
To take into the air my quiet breath ;

: **Ode to a Nightingale**

আবার অন্য একটি কবিতায়—

ভুলে গিয়ে রাজ্য—জয়—সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিলো তুলে নেবো তার শীতলতা ;
ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব ;—
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে—
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।

: **অবসরের গান**

এর সঙ্গে কীট্‌সের পূর্বালোচিত কবিতার—

O, for a draught of vintage! that hath been
Cooled a long age in the deep-delve'd earth,
Tasting of Flora and the country green,
Dance, and Provencal song, and sunburnt mirth!

: **Ode to a Nightingale**

আবার ঐ কবিতারই শেষের অংশে—

এইখানে কাজ এসে জমেনাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে;
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর,
রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর;
ভালোবাসা আসিবে না—
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর!

: **অবসরের গান**

এর পাশাপাশি কীট্‌সের একই কবিতার—

Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs,
Where Beauty cannot keep her lustrous eyes
Or new love pine at them beyond to-morrow.

ভাবসাম্য দেখিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না। এই কবিতাতেই কীট্‌সেরই Ode on Indolence কবিতারও প্রভাব পড়েছে।

বনলতা সেন এবং এড্‌গার এলান পো-র 'Ta Helen' কবিতাটির সাদৃশ্য কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর উক্তি উদ্ধার করছি—

"বনলতা সেন ও 'Helen, thy beauty is to me' এ দুটি কবিতার সাদৃশ্য স্বয়ংপ্রকাশ, 'চুল', 'মুখ', 'সমুদ্র' ও 'ভ্রাম্যমাণ' এসবই আক্ষরিক অর্থে অ্যালান পো-র। কিন্তু যেমন 'হায় চিল' কবিতায়, তেমনি এক্ষেত্রেও জীবনানন্দ তাঁর উত্তমর্ণকে বহুদূরে অতিক্রম ক'রে গেছেন। জীবনানন্দের প্রথমজিৎ তাঁর নায়িকার স্থানীয়তা ও সমকালীনতায় (ধ্রুপদী সৌন্দর্য পৌরাণিক হেলেনে অপ্রত্যাশিত নয়) এবং দ্বিতীয় ও আরো বড় জিৎ উভয় স্তবকের শেষ পংক্তি দুটির আবেগময় আন্দোলনে, যার তুলনায় পোর শেষ স্তবক বর্ণলিপ্ত পুত্তলির মতো নিষ্প্রাণ।"

: **শার্ল বোদলেয়ার : তার কবিতা**)

এ সবই সত্য এবং তার সঙ্গে আরো স্মরণীয় জীবনানন্দের আরো একটি কবিতাতেও এই কবিতার সুস্পষ্ট প্রতিভাষ লক্ষ্য করা যায়—

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন :
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে
মহিলারি প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূর শয্যার কথা ভুলে
সকালের রূঢ়রৌদ্রে ডুবে যেত কোথায় অকূলে।

: শ্যামলী

এর সঙ্গে তুলনা করুন—

হেলেন, তোমার মুখ নিসিয়ার জাহাজের মতো
পাড়ি দিত গন্ধময় একখানি সমুদ্রের বুকে,
ঘরহারা নাবিকেরে পরিচিত তীরে পৌঁছে দিত,
নিরাপদ নীড়ে তার, জন্মভূমি, উত্তরিত শোকে,
পুরাকালে লক্ষ্যভেদী অমোঘ যাত্রার সুখে-দুখে।

: হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কৃত অনুবাদ

তবে হেলেনের মুখ যেখানে গৃহহারা নাবিককে গৃহের জন্য উন্মুখ ক'রে তুলতো, শ্যামলীর মুখ তার বৈপরীত্যে সুদূরে বাণিজ্য যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করতো। আবার মণিকা-আলো হাতের 'মিত ভাষণ' কবিতার নায়িকারূপে হেলেনের agate lamp হাতে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকার প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করেছেন শ্রীযুক্ত বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায়।

শুধু এঁরা কেন জীবনানন্দের নিত্য অনুশীলিত মনে আরো অনেক ইংরাজী কবিতার ছায়া অবশ্যই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অনেকে এমন আলোচনা করেছেন বা করবেনও। 'ঝরাপালকে'র 'বিশ্বমানবিকতায়' হুইট্‌ম্যানকে খুঁজে পাওয়া যাবে—

নিখিল আমার ভাই
—কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই;
যে প্রাণ গুমরি কাঁদিছে নিরালা শুনি যেন তার ধ্বনি,

*   *   *

আমার গানেতে জাগিছে তাদের বেদনাপীড়ার দান
আমার প্রাণেতে জাগিছে তাদের নিপীড়িত ভগবান,

: নিখিল আমার ভাই

কিন্তু সে না হয় উন্মেষ পর্বের কাহিনী। বনলতা সেনের পরিণতিতে পৌঁছেও অনুভব করা যায় ম্যাথু আর্ণল্ডের অলক্ষ্য উপস্থিতি। আর্ণল্ড লিখেছিলেন—

> Yes ! in the sea of life enisled
> With echoing straits between us us thrown
> Dotting the shoreless watery wild,
> We mortal millions we alone.

The Marguerite

আর জীবনানন্দের রচনায়—

> সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
> বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;
> সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
> নির্জনতা আছে।

সুচেতনা

অথবা—

> তোমার মুখের রেখা আজো
> মৃত কতো পৌত্তলিক খ্রীস্টান সিন্ধুর
> অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন,
> কতো আছে—তবু কতো দূর।

: সবিতা

অথচ অন্তত এসব কবিতায় ইচ্ছে করলেই এই চিন্তাসমতা পরিহার করা চলতো। কিন্তু তার প্রয়োজন কি? ভাবনাই মূল্যবান। আর সেই ভাবনা যাতে উজ্জ্বল অবয়ব পেতে পারে তাই কবির একমাত্র দ্রষ্টব্য। ছুৎমার্গীর মতো ছায়া বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে ভাবনাকে ক্ষুণ্ণ করবেন এইটাই কি আমাদের দাবী ?

এই সব বিচ্ছিন্ন কবিতা এবং কবি ছাড়া সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে সুইনবর্ণ, এড্‌গার অ্যালান পো, লর্কা, সিট্‌ওয়েল এবং ইয়েট্‌স—এরাই জীবনানন্দের মনোভূমি গঠনে সবচেয়ে প্রবল শক্তি। এলিয়ট—অবশ্য আগেই বলেছি, কবিতার রূপ প্রকরণ এবং গঠন বিন্যাসে যতখানি প্রভাব রেখেছেন মনের সমতায় ততখানি নয়।)

জার্মান কবি রিল্‌কের রচনার সঙ্গে জীবনানন্দের ভাবনা কল্পনার মিল প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়তে পারে কোনো সতর্ক পাঠকের। তাই একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই খ্যাতনামা কবির সৃষ্টির সঙ্গে জীবনানন্দের পূর্ব পরিচয় ছিল না। সুতরাং প্রভাবের প্রশ্ন অবান্তর। কবির মৃত্যুর পরে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী একটি চিঠিতে লিখেছেন—

"একবার ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম জীবনের কোন সময়ে রিল্‌কের কাব্য ওঁকে স্পর্শ করেছিল কি না—বললেন, না, রিল্‌কে ওঁর বিশেষ জানা নেই। জীবনানন্দের কাব্যে একটা নির্লিপ্ত গোছের খোলামেলা ভাব ছিল, জার্মান কবি চিন্তায় এবং চৈতন্যের ভাবে অনেক সময় ডুবে যেতেন।"

অন্য উৎস

ইয়েট্‌সের অনেক কবিতা জীবনানন্দের কবিতার মূল উৎসের মতো মনে হয়। কবিতা কখনো অনূদিত হ'তে পারে না। জীবনানন্দের প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থগুলিতে কোথাও অনূদিত কবিতা নেই। কবিতা প্রতিভার স্পর্শ পেলে নূতন ভাষার আঙ্গিনায় এমন নবজন্ম নিয়েই যায়। নইলে সাধারণ অনুবাদ কবিতায় যে মারাত্মক রসবিপর্যয় প্রায়ই দেখা যায়, তার বেদনা থেকে নিষ্কৃতি নেই রসগ্রাহীদের। কিন্তু ইয়েট্‌সের এই সুন্দর কবিতাটি—

O curlew, cry no more in the air
Or only to the water in the West
Because your crying brings to my mind
Passion dimmed eyes and long heavy hair
That was shaken out over my brest
There is enough evil in the crying of wind.

: **He Reproves the Curlew**

যখন জীবনানন্দের রচনায় নূতন ক'রে পেলাম—

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে;
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদোনাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

: **হায় চিল**

তখন শিখলাম নবরূপায়ণই সার্থক তর্জমা। ভাষান্তর এমন ভাবেই হ'য়ে থাকে, হওয়া উচিত।

অথবা ইয়েট্‌সের কাব্য-সঙ্কলন হাতে নিয়ে চমকে উঠতে হয় যখন নজরে পড়ে এই কবিতাটি—

Blad heads forgetful of their sins,
Old, learned, respectable blad heads
Edit and annotate the lines
That youngmen tossing on their beds,
Rhymed out in love's despair
To flatter beauty's ignorant ear.

All shuffle there ; all cough in ink,
All wear the carpet with their shoes ;
All think what other people think ;
All know the man their neighbour knows.
Lord, what would they say
Did their Catullus walk the way ?

: **The Scholars**

বোঝা যায় জীবনানন্দের নিম্নোদ্ধৃত বিখ্যাত কবিতার উৎস কোথায় ? অথচ তা কতো আশ্চর্য সার্থক হ'তে পেরেছে এখানে—

'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে ; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা ;
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক ; দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি ;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

: **সমারূঢ়**

অথবা 'মহাপৃথিবী'র সেই স্বল্প পরিচিত কবিতাটি দেখুন—

একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চ'লে গেল যুবকের দল ;
পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আধেক কথা ;—এই সব বধির নিশ্চল
সোনার পিত্তল মূর্তি : তবু, আহা, ইহাদেরি কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চ'লে গেল যুবকের দল :
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে

: **ইহাদেরি কানে**

যে ব্যঙ্গটি সুপ্ত ছিল ইয়েট্‌সের উদ্ধৃত কবিতার প্রথম স্তবকের শেষ তিনটি পংক্তিতে তা এখানে স্বতন্ত্র হ'য়ে তীক্ষ্ণ শানিত হ'য়ে উঠেছে। অথচ এই অংশটি 'সমারূঢ়' কবিতায় উল্লিখিত না থাকায় সেখানের রস আরও প্রগাঢ় হ'তে পেরেছে। আসলে ইয়েট্‌সের কবিতাটির গঠন শিথিল। তার শেষ স্তবকটির আবেদন তেমন প্রগাঢ় হবার অবকাশ পায়নি, বক্তব্যের স্থূলতা কাটিয়ে রসের নিবিড়তায় যেভাবে জীবনানন্দের প্রথম কবিতাটি পৌঁছেছে তেমন হয়নি ইয়েট্‌সের। আবার 'ইহাদেরি কানে' কবিতায় জীবনানন্দও পুরোপুরি সার্থক হ'তে পারেননি। কবিতাটি আরো সংহত হ'তে পারতো অনায়াসে। কিন্তু সমারূঢ়ের গঠন তীক্ষ্ণ ঋজু এবং অমোঘ।

আরেকটি কবিতায় ইয়েট্‌স লিখেছিলেন—

The trees are in their autumn beauty,
The woodland paths are dry,
Under the October twilight the water
Mirrors a still sky ;
Upon the brimming water among the stones
Are nine-and fifty swans.

: **The Wild Swans at Coole**

এর সঙ্গে 'সাতটি তারার তিমিরে'র 'হাঁস' কবিতার ভাবসাদৃশ্য আকস্মিক নয়—সেখানে ঐ চিত্রটি রূপ নিয়েছে বাংলা দেশের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে—

চারিদিকে উঁচু উঁচু উলুবন, ঘাসের বিছানা ;
অনেক সময় ধ'রে চুপ থেকে হেমন্তের জল
প্রতিপন্ন হয়ে গেছে যে সময়ে নীলাকাশ ব'লে

সুদূরে নারীর কোলে তখন হাঁসের দলবল
মিশে গেছে অপরাহ্নে রোদের ঝিলিকে ;

: হাঁস

মানতে হবে নূতন প্রতিভার আশ্রয় কবিতাটি নূতন ক'রে জন্মেছে আবার। ঠিক এই রকমই হয়েছে আরো একটি কবিতায়—

I would that we were, my beloved. white birds on the
foam of the sea !
We tire of the flame of the meteor, before it can fade
and flee ;

: **The White Birds**

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি।
কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে,

: **আমি যদি হতাম**

এ আসলে প্রভাব নয়, কাব্যস্মৃতি অলঙ্কার। একটি ভাব বা চিত্রের রূপ-সান্নিধ্য স্মরণে আনবে আর একটি কবিতার রূপলোক ; গাঢ়তর হবে পাঠক চিত্তের মুগ্ধতা ও বিস্ময়। প্রসঙ্গক্রমে এর পাশাপাশি মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের 'লুকোচুরি' কবিতা—

আমি যদি দুষ্টুমি ক'রে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি।

অথবা 'ইচ্ছামতী' কবিতায়—

যখন যেমন মনে করি তাই হতে পাই যদি,
আমি তবে এক্ষুণি হই ইচ্ছামতী নদী।

আবার ইয়েট্‌সেরই আরেকটি কবিতার—

Nor know that what disturbs our blood
Is but its longing for the tomb

পংক্তি দু'টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তের ভিতর উদ্ভাসিত হয় জীবনানন্দের কবিতার এই পংক্তিগুলি—

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

: আট বছর আগের একদিন

রক্তের ভিতরের এই তাড়নাই আমাদের মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দেয়। একে দুই কবিই অনুভব করেছেন কিন্তু তার প্রকাশ, আর অভিব্যক্তি কত বিভিন্ন দুজনের ক্ষেত্রে।

জীবনানন্দের প্রিয় কবিদের বিশিষ্ট কবিতার ছায়া-তাঁর অনেক রচনাতেই বারবার এসে পড়ে। ইয়েট্‌সের—

They mauled and bit the whole night through ;
They mauled and bit till the day shone ;
They mauled and bit through all that day
And till another night had gone.

: **The three beggars**

শ্রদ্ধেয় শুদ্ধসত্ব বসু দেখিয়েছেন এই রীতির প্রতিধ্বনি জীবনানন্দের মধ্যে—

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তবে আমি হেঁটে চ'লে যাবো মানে-মানে।

: ভিখারী

তিনি আরো লক্ষ্য করেছেন 'তোমাকে' কবিতার শেষ স্তবকেও এই রীতি প্রযুক্ত হয়েছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মনে হয়েছিল 'এক পয়সার একটি' সিরিজে কবিতা বিক্রির প্রসঙ্গ ও প্রতিক্রিয়া এতে রয়েছে। আমাদের মনে হয় 'লঘু মুহূর্তের তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরী'র কল্পনার ভিত্তিমূলেও ইয়েট্‌সের প্রাগুক্ত কবিতাটি আছে।

ইয়েট্‌সের আরো একটি কবিতার পংক্তি তোলা যাক্—

> Autumn is over the leaves that love us,
> And over the mice in the barley sheaves ;
> Yellow the leaves of the rowan above us,
> And yellow the wet wild-strwberry leaves.

: The Falling of the Leaves

দেখা যাবে জীবনানন্দের কবিপ্রাণকে বার বার উদ্দীপিত করেছে এই কবিতার পংক্তিগুলি—

১। অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে ;
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু ; বললে সে, 'ঘাসের উপরে সব বিছানো পাতার
মুখে এই নিস্তব্ধতা কেমন যে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার
ছড়িয়ে পড়েছে জলে' ;

: অঘ্রাণ প্রান্তরে

২। চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে,—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে ;

: দুজন

৩। দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,

: মৃত্যুর আগে

এই রকম দৃষ্টান্ত অনেক বাড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু কোন সার্থকতা নেই তাতে। বিদগ্ধ পাঠক মাত্রই জানেন উভয় কবির সমমর্মিতার জন্যই ইয়েট্‌সের কবিতার ইন্দ্রিয়ঘন রূপলোক বিচূর্ণ হ'য়ে ছড়িয়ে রয়েছে জীবনানন্দের সমগ্র সৃষ্টিতে। বর্তমান প্রবন্ধে তার সুবিস্তারিত আলোচনা অবান্তর।

সংখ্যা-দ্যোতনা।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। সাধারণত বাঙালী কবিরা কবিতায় সংখ্যা-শব্দের প্রয়োগ করেন না। করলেও, গাণিতিক মান-নির্দেশ ব্যতীত তার কোনো নিহিত তাৎপর্য থাকে না। তবু আমরা জানি, প্রতি ভাষাতেই এমন কতকগুলি সংখ্যা আছে, যার সঙ্গে 'দুর্জ্ঞেয়তার, অলৌকিক রহস্যময়তার, শুভ এবং অশুভের সূক্ষ্ম-সংস্কার জড়িয়ে থাকে। আমাদের কাছেও এক, দুই, তিন, পাঁচ, সাত, নয়, তেরো, একুশ, একশ' এক, হাজার ইত্যাদি শব্দগুলো শুধু সংখ্যা জ্ঞাপক নয়, এর সঙ্গে নানা বিশ্বাস, সন্দেহ, ভয় ও প্রত্যয়ের বিচূর্ণ-বাসনা জড়িয়ে আছে। বহুকালের পূজা অর্চনায়, তান্ত্রিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ও লোকাচারে ব্যবহৃত হ'য়ে হ'য়ে এই সব সংখ্যার সঙ্গে মরমী বিশ্বাস মিশে গিয়েছে। ইউরোপের বহুকবি এমন সব 'মিষ্টিক' সংখ্যার সঙ্গে জড়িত সংস্কারকে কাজে লাগিয়ে কবিতায় সুফল পেয়েছেন। এদিকে ইংরাজ কবি ব্লেকের সার্থকতা স্মরণীয়। বাংলাদেশে জীবনানন্দই সম্ভবত প্রথম কবি যিনি এই সব সংখ্যা শব্দের সঙ্গে যুক্ত বাঙালী মনের প্রাঙ্‌নিবিষ্ট সংস্কারকে কবিতার প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছেন। এমন কি ইউরোপীয় ভাবানুষঙ্গও কোথাও সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন।

তাই তাঁর কবিতায় কোথাও বা 'এক মাইল শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে,' কোথাও দেখা যাবে 'কালো দুটি তুরঙ্গম' উজ্জ্বল সময়ের সাগরকে অনন্তের দিকে টেনে নেয়, কোথাও বা 'তিনজন আধো আইবুড় ভিখিরীর' আনাগোনা, আবার 'দু-তিন ধনু দূরে', সম্রাটহীন বিপ্লবহীন খেতের দুপুরে চাষা বলদের নিঃশব্দতা, কোথাও মানুষ 'পাঁচফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপোষে', অথবা 'আট বছর আগের একদিনে' 'যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ/মরিবার হলো তার সাধ,' কোথাও 'সাতটি তারার তিমির' তরঙ্গ সপ্তর্ষির আলোর আভায় অমেয় রহস্যে নিলীন থাকে, কোথাও জলপাই-পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জলে 'নয়টি হাঁসকে' রোজ চোখ মেলে দেখা যায়। কোথাও একটি চোর সাতজন প্রেমিককে খুন করে যায়, কোথাও দশ-বিশ বছরের আগে এক সূর্যের আলোক কেউ সহসা দেখতে পায়, সেখানে 'কুড়ি বছর পরে' কুয়াশায় কারো সাথে যদি আবার দেখা হয় সেই প্রত্যাশায় দিন গোনা। এমনকি 'হাজার বছর' ধ'রে পৃথিবীর পথে পথে পথ হাঁটা।

এই সব প্রয়োগের মধ্যেও শিল্পী-চেতনার স্পর্শাতুরতা লক্ষ্য করার মতো। তিনজন ভিখিরীর সংখ্যা-দ্যোতনা 'আধো আইবুড়' বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েই সঙ্কেতগভীর

হতে পেরেছে। আবার 'বনলতা সেনের' হাজার বছর আমাদের উপলব্ধিতে সহস্রাব্দের ব্যাপ্তিটুকু মাত্র নয়, যেন অনন্ত অতীত থেকে ক্রমবাহমানতার স্মৃতিভারাতুর অফুরন্ত কালচেতনা। ইয়েট্সের Nine and fifty swans চোখের সামনে অগণ্য হাঁসের একটি মেলা, জীবনানন্দের হাতে মাত্র নয়টি হাঁস হ'য়ে বাংলার স্বাভাবিক শান্ত পল্লী-শ্রীতে সঙ্গতি পেয়েছে, আর স্বচ্ছ জলের স্থিরতায় যেন মায়াবীর জাদুর ছোঁয়া লেগেছে—

> তিনবার তিনগুণে নয় হয় পৃথিবীর পথে
> এরা তবু নয়জন মায়াবীর মত জাদুবলে।

: হাঁস

হাঁসগুলির নানা সংখ্যায় ভাগ হ'য়ে অসংখ্যরূপে সারাদিন সাঁতার কাটার ছবিটি এখানে যেমন আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে ইংরাজী কবিতাটির সংখ্যার ভিড়ে সে ছবি হারিয়ে যাবে।

অবনীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে, ছাত্রস্থানীয় কোনো তরুণ শিল্পীর কাঁচা হাতের ছবিতে তিনি হয়তো তাঁর মায়াতুলির একটি আঁচড় বুলিয়ে দিতেন ছবিটি নূতন আর আশ্চর্য হ'য়ে উঠতো। জীবনানন্দও তেমনই একজন শিল্পী যিনি দেশী বিদেশী উপকরণকে স্বচ্ছন্দে আপন ক'রে নিতে পারেন এমনি আলতো দু-একটা টানে। যাঁর শক্তি কম, স্বকীয়তা অল্প, তিনিই প্রত্যেককে ভয় করেন, সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে গালগোছে চলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিমা গড়তে মাটি কোন দেশের তা যেমন জানা অনাবশ্যক, চোখ টানে শিল্পীর কারুকর্ম; তেমনি সব প্রভাব-প্রকরণের উপর প্রতিভার কি দৃঢ় মুদ্রাঙ্কন পড়ল সেটাই সবিস্ময়ে দেখবার, অন্য কিছু নয়।

হাস্যরস

কৌতুক লক্ষণ

।

সুকুমার রায় লিখেছিলেন—

হুকো মুখো হ্যাংলা বাড়ী তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই দেখেছ ?

: আবোল-তাবোল

বাঙালী কখনো হাসে না। বাংলাদেশে 'হাসির গানের' আসর নেই, হাসির গল্পের শ্রোতা নেই, প্রহসনের দর্শক নেই, আর কৌতুকরসের উপন্যাসের কেউ কখনো নামই শোনেনি। এই রামগরুড়ের ছানার রাজ্যে কৌতুকরসের কবিতা লিখেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। বাঙালী তাঁকে কবি ব'লে গণ্যই করে না বোধ হয়।

বেরসিকের কাছে রসের নিবেদনের মতো দুর্ভাগ্য আর কিছুই নেই। বাধ্য হ'য়ে এদেশে কৌতুক অভিনেতাকে ভাঁড় সাজতে হয়, প্রহসনের লেখককে সিনেমার বিয়োগান্ত গল্প লিখতে হয়। হাস্যরসিকের পক্ষে সেও বিয়োগান্ত ব্যাপার বই কি!

বাংলাদেশে কৌতুকরসের কবিতা তাই দুর্লভ। আর সব সাহিত্য পাঠকের অপেক্ষা না রেখেও লেখা যায়, হাস্যকৌতুক নৈব নৈব চ। কাতুকুতু দিতে হ'লেও মানুষ লাগে। এই জন্যে আধুনিক কবিদের কারো কারো, ব্যঙ্গ রচনায় স্বভাবজ ক্ষমতা থাকলেও বিনা চর্চায় তা নষ্ট হয়েছে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বনফুল, সমর সেন প্রমুখ অনেকে এর উদাহরণ। কবি জীবনানন্দ দাসের মধ্যেও সেই ক্ষমতা ছিল যা উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে পরিশীলিত হ'লে সার্থক বিদ্রূপরসভূয়িষ্ঠ কবিতা রচনা করতে পারতো।

একজন বিদেশী প্রাবন্ধিক লিখেছিলেন হাসির মূলে আছে অবচেতন আত্মপ্রসাদ। কেউ যে অবস্থায় যে আচরণ করেছে আমি হ'লে তা কখনোই করতাম না, এই জাতের আত্মপ্রত্যয় থেকে হাসির জন্ম। লেখক এখানে হাসি বলতে কৌতুকের হাসিই বুঝিয়েছেন। নইলে শিশু যখন মাকে দেখে হাসে তখন তাতে আত্মপ্রসাদের কি থাকতে পারে? অনাত্মীয় অপরিচিত পরিবেশে সে অসহায় বোধ করে। পরিচিত কোনো মুখ দেখলে সে ভরসা পায়, নিশ্চিন্ত হয়, খুশি হয়—সেই তৃপ্তি তার হাসিতে ফুটে ওঠে। আনন্দের হাসিমাত্রই শিশুর হাসির মতো বাইরের অনাত্মীয় পরিবেশে মানবাত্মার অধিকার ঘোষণা!

সাহিত্যের মধ্যে এ হাসির অবশ্য কোনো অভিব্যক্তি নেই। কবির হৃষ্ট মেজাজ কবিতার সুরের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠতে পারে শুধু। সুতরাং সাহিত্যের হাসিমাত্রই

কৌতুকের হাসি। অন্যের দুর্গতিতে, এমনকি নিজের দুর্গতিতে নিজের হাসি। কৌতুকের মূলে থাকে অসঙ্গতিবোধ। যা হওয়া উচিত ছিল অথচ হয়নি, তার উপলব্ধিতেই কৌতুকের উদ্ভব।

কৌতুকের মধ্যেও অবশ্য জাতিভেদ আছে। অন্যকে কিছুমাত্র আঘাত না ক'রেও ঘটনার উদ্ভটত্বে রসসৃষ্টি করা যায়; আবার অন্যের নির্বুদ্ধিতা, দুর্নীতি, অন্যায় প্রভৃতির জন্যে বিদ্রূপে বিদ্ধ ক'রেও রসসৃষ্টি করা সম্ভব।

ড. সুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর বার্ণার্ড শ'র উপর লেখা বইটিতে শ'র স্যাটায়ারগুলিকে আন্তর ধর্মের দিক থেকে হিউমার প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হ'লো যাঁর বিষয়ের উপর মমত্ব থাকে তিনি কখনোই যথার্থ স্যাটায়ারিষ্ট হ'তে পারেন না। কৌতুকহাস্য স্রষ্টা হিসাবে লেখকের শ্রেণীনির্দেশের প্রয়োজনে লেখকের মনোবিশ্লেষণ ক'রে ব্যঙ্গের প্রকৃতি নির্ণয় করা চললেও চলতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক কৌতুক ও বিদ্রূপ এমন ভিন্ন গোত্রীয় কিছু নয় যে একই ব্যক্তির পক্ষে একই বিষয় নিয়ে দুইজাতের হাস্যরস সৃষ্টি করা অসম্ভব হ'য়ে পড়বে।

বাস্তবিক কৌতুক এবং বিদ্রূপ দুটির রস ও রূপ পৃথক। এদের প্রভেদ দেখলেই চেনা যায় সুতরাং কোনো কিছু কৌতুক বা বিদ্রূপ কিনা নির্ণয় করতে হ'লে মনোবিশ্লেষকের কাছে দৌড়াতে হয় না। উভয়ের মধ্যে যা পার্থক্য তা কেবল মনোভঙ্গিগত। সময় ও অবস্থা ভেদে একই বিষয় সম্পর্কে মানুষ কখনো সহানুভূতিশীল কখনো বা নির্মম হ'য়ে উঠতে পারে। সুতরাং কবি কখনো হিউমার সৃষ্টি করেন, কখনো বা স্যাটায়ার। অবশ্য ব্যক্তিভেদে কারো হয়তো শ্লেষ-বিদ্রূপের প্রতি আসক্তি কারো বা কৌতুক-রসের প্রতি। কিন্তু যিনি হিউমারিষ্ট তিনি যে কখনো স্যাটায়ার লেখেন না বা লিখতে পারেন না এমন কথা যুক্তির অনাচার। স্যাটায়ারিষ্টের পক্ষেও ওই কথা।

এমন ধারা মানসিক প্রবণতার কথা তুললে জীবনানন্দের অধিকাংশ হাস্যরসাত্মক কবিতাকে বিদ্রূপের স্তরে ফেলতে হয়। কিন্তু তাঁকে ঠিক স্যাটায়ারিষ্ট বলতে যেন বাধে। বাস্তবিক তিনি এমন প্রগাঢ়-চেতনার কবি, এমন ধীর স্তিমিত মেজাজ তাঁর কবিতার, যে স্যাটায়ারিষ্টের তীব্র চকিত তীক্ষ্ণতা, মনোভঙ্গির ওই তারল্য ও দ্রুততা তাঁর লেখায় যেন ঠিক আশ্রয় পায় না। ট্র্যাজেডির নায়ককে বিদূষকের সজ্জায় দেখলে যেমন আহত হয় মন। বাস্তবিক অনুভূতির সূক্ষ্ম পর্দায় পর্দায় যাঁর আলোকিত সঞ্চরণ, রূপজগতের বিচিত্র বিস্ময়ে যাঁর সাবলীল অধিকার, বুদ্ধির এই শাণিত ছোরা-খেলায় তাঁকে আমরা আশা করবই বা কেন? কীট্‌স্ যদি পোপ্ হ'তে চাইতেন সেটা কি কাম্য হ'তো?

এ প্রসঙ্গে হয়তো মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু একথা সত্য জীবনানন্দের কবিতায় ব্যঙ্গরসের অধিকার-সীমা বিশেষ এক পর্বে সীমায়িত। সমালোচকরা ব'লে থাকেন ব্যক্তিগত জীবনে, হয় মনোজগতে নয় বহির্জগতে লেখক যখন আহত, পরাজিত, হতাশ বা বিতৃষ্ণ, সেই সময়ে মন এক স্বচ্ছতায় স্থিত হ'লে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জন্ম হয়। জীবনানন্দের লেখায় যে বিদ্রূপরসের কবিতা দীর্ঘকালব্যাপী হয়নি তার মূলও নিশ্চয় এইখানে।

জীবনানন্দের ব্যঙ্গ-কবিতার সূচনা কখন থেকে বলা কঠিন। কিছুকাল পূর্বে উত্তরসূরী পত্রিকায় প্রকাশিত 'কবি' কবিতাটিকে এর একটি আদিম নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা চলে। এরপর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের রচনাকাল অর্থাৎ প্রধানত অসহযোগ আন্দোলনের অস্থিরতা থেকে ১৯৪৬-এর যুদ্ধ ও দাঙ্গা পর্যন্ত—এর মধ্যেই তিনি তাঁর প্রায় সব ব্যঙ্গরসের কবিতাগুলি লিখে গেছেন।

কবির ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালে স্পষ্টই অনুভব করা যায় এসময়ে কিভাবে তাঁর উপরে নানাদিক থেকে চাপ আসছিল। অস্থিরতা তখন বাংলার আকাশে বাতাসে, হতাশা, দুর্দশা ও নানা গ্লানি চিন্তাশীল মন অধিকার ক'রে ছিল—কিন্তু আজকের মতো এত গা সহা, এত নিত্য নৈমিত্তিক হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু বাইরের চাপের থেকে মনোজগতের চাপই বেশি মারাত্মক। তবু তার মধ্যেও মনের যে স্থিতিশীলতা থাকলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জন্ম হয়, তা তাঁর ছিল। কিন্তু সেই ব্যঙ্গ প্রবণতাকে কদাচিৎ তিনি তরল লৌকিক রঙ্গ-পরিহাসের স্তরে নামিয়ে আনতে পেরেছেন। ব্যবহারিক জীবনে যাই হোক, কবিতার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ মূলত হিউমারিষ্ট ছিলেন না, স্যাটায়ারিষ্টও নন। কিন্তু আগেই উল্লেখ করেছি, সার্থক স্যাটায়ার লিখতে যে গুণগুলির প্রয়োজন তা তাঁর ছিল।

বিদ্রূপ-স্রষ্টার যে প্রথম গুণটি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা হ'লো তাঁদের বিশিষ্ট পরিভাষা। আমাদের ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে আমরা যে সব শব্দ প্রয়োগ করি ব্যঙ্গ-রসিক তার মধ্যে এমন কতকগুলি বেছে নেন, যাতে তার প্রয়োগমাত্রই আমাদের মনে এক হাস্যোদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শুধু শব্দনির্বাচনে নয়, শব্দপ্রয়োগের বিশিষ্টতাতে এই একই সাফল্য হাস্যরসিকের আয়ত্তে আসে।

১। অল্পায়ু হিমের দিন শতোধিক মিহিন কামিজে
কাটাতেছে যেন অগণন শিরেবাজ।

: বিভিন্ন কোরাস

২। বাইরে রৌদ্রের ঋতু বছরের মতো আজ ফুরায়ে গিয়েছে ;
হোক-না তা ; প্রকৃতি নিজের মনোভাব নিয়ে **অতীব প্রবীণ ;**
হিসেবে বিষণ্ণ সত্য র'য়ে গেছে তার ;
এবং নির্মল **ভিটামিন।**

: প্রতীতি

৩। বিকেলে গা ঘেঁষে সব **নিরুত্তেজ সরজমিনে** ব'সে
বেহেড আত্মার মতো সূর্যাস্তের পানে
চেয়ে থেকে নিভে যায় এক পৃথিবীর
প্রক্ষিপ্ত রাত্রির **লোকসানে।**

: সোনালি সিংহের গল্প

কিন্তু শব্দপ্রয়োগে নৈপুণ্য থেকেও হাস্যরসিক কবির উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব রূপপ্রয়োগে দক্ষতায়। অত্যন্ত অল্প ইঙ্গিতে এমন সব উদ্ভট, অসম্ভব অথবা হাস্যকর দৃশ্য তিনি আমাদের মনের পটে এঁকে দেন যে কৌতুক অনুভব না করাই কঠিন। এই জাতের চিত্রকল্প নির্মাণে জীবনানন্দের পারদর্শিতা অসামান্য। আগাগোড়া শরীরটা দিয়ে কানার তাঁত বোনার অভিলাষ অথবা নুলো শাঁখারীর হাতে করাতের কার্যকারিতা, অনুপম ত্রিবেদীর কান ধ'রে হেগেল ও মার্কসের দুই পথে টেনে নিয়ে যাওয়া, অথবা—

১। তবুও বেদম হেসে খিল ধ'রে যেত ব'লে বেরালের পেটে
ইঁদুর 'হুররে' ব'লে হেসে খুন হ'তো সেই খিল কেটে-কেটে।

: সুবিনয় মুস্তফী

২। ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা।

: পরিচায়ক

৩। ব'লে তা'রা রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব ক'রে নিলো এইখানে চায়ের আমেজে
নামায়েছে তা'রা এক শাঁকচুন্নীকে।
এ-মেয়েটি একদিন হাঁস ছিলো হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।

: লঘুমুহূর্ত

হাসতে হাসতে পেটে যে খিল ধরে ইঁদুরের সেই খিল কাটার প্রচণ্ড প্রয়াস আমাদের সুকুমার রায়ের শ্লেষ-বক্রোক্তিধর্মী কবিতাগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। 'সরিষা'র আগে 'প্রশান্ত' বিশেষণটি এমন একটি মানুষের মুখ চিত্তপটে এঁকে দেয় যে

হাস্যসংবরণ করাই কঠিন। অবশ্যই 'সরষের ভিতর ভূত' এই পরিচিতি প্রবাদটিই এর ভিত্তি। এমনই রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে কথা বলায় ছবি অথবা সেই শাঁকচুন্নী মেয়েটি যে এখন দেখতে হয়েছে 'হাঁসহাঁস'—এই অর্থহীন শব্দটিতে এমন এক মেদবহুল রূপহীনতার আভাস দেয় যা অন্য কোনো অর্থবান শব্দে অসম্ভব হ'তো—এসবই উচ্চাঙ্গের হাস্যরস রসিকতার নিদর্শন ব'লে গণ্য হবে।

হাস্যরসিকের তৃতীয় কৌশল হ'লো উদ্ভট ঘটনা-সৃষ্টি এবং বর্ণনা কৌশলে তাকে রসোপেত ক'রে তোলা। প্রায় অধিকাংশ কৌতুকরস স্রষ্টাই এই কৌশলে পাঠকের চিত্তহরণ ক'রে থাকেন।

> যদিও তাদের দেশে জন্মেছিল অপরূপ নারীমুণ্ড—
> শঙ্খের মতন শুভ্রস্তন।

: এখন রাতের শেষে

স্তনের এবং নারীমুণ্ডের জন্মগ্রহণের অবিশ্বাস্যতা এখানে অদ্ভুত রসের জন্ম দিচ্ছে। জীবনানন্দের কবিতাতেও উপস্থাপন নৈপুণ্য যেমন অনেক বহুবর্ণিত বিষয়ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে তেমনই ঘটনা-কল্পনার মৌলিকতাও বিরলদৃষ্ট নয়। একটি উদাহরণ—

> নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
> গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী ;
> পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
> আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

: রাত্রি

ভিন্ন জাতীয়দের সঙ্গীত সাধনার অক্ষম প্রয়াস নিয়ে ব্যঙ্গ বাংলা সাহিত্যে এর আগেও অনেকে করেছেন। কিন্তু উপস্থাপনের কৌশলটি এখানে জীবনানন্দের নিজের।

পরিসীমা

জীবনানন্দ যে হাস্যরসের পশারী সে হাসি আকর্ণ-বিস্তৃত হ'য়ে প্রচণ্ডবেগে সশব্দে উদ্গীর্ণ হবে এমন আশা নেই। এ সেই জাতের হাসি যাতে মুখে হয়তো ক্ষীণ একটি কৌতুক রেখার আভাস ফুটবে অথবা তাও নয়, অন্তরিন্দ্রিয়ের একটু অলক্ষিত রসানুভব হবে মাত্র। আর সেটুকুই আমাদের প্রত্যাশার পক্ষে পর্যাপ্ত।

অবশ্য জীবনানন্দ আদৌ হাস্যরসের কবিতা লিখতে চেষ্টা করেছিলেন কিনা এ প্রশ্ন উঠতে পারে। আর তর্কের খাতিরে হ'লেও আমরা তাঁর প্রকাশিত সমগ্র রচনা থেকে পাঁচ ছ'টির বেশি পূর্ণাঙ্গ হাস্যরসের কবিতা উদ্ধার করতে পারবো না। আমরাও

ইতঃপূর্বে সেই কথাটাই বলতে চেয়েছি অর্থাৎ হাস্যরসিকের যে চতুর, অন্তর্ভেদী এবং বিশ্লেষণী দৃষ্টি, হাস্যরস-রচনার সর্ববিধ উপকরণের উপর যে অধিকার তাঁর ছিল তাতে তাঁর পক্ষে সার্থক হওয়া দুরূহ ছিল না। কিন্তু এই সব উপকরণকে ঠিকমতো গুছিয়ে প্রয়োগ ক'রে বিদ্রূপ রসের সৃষ্টি তাঁর আর হ'য়ে উঠলো না। লোক-ব্যবহারের অসঙ্গতি, প্রত্যাশা ও পরিণামের অসামঞ্জস্য সম্পর্কে তাঁর মনের বিক্ষোভ কবিতার নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে কুয়াশার মতো ছড়িয়ে থাকলো, ঘন হ'য়ে মেঘের মতো জমাট বেঁধে বিদ্যুতে বর্ষণে নেমে এলো না।

কারণ, জীবনানন্দ মূলত হৃদয়ানুভবের কবি। কিন্তু ব্যঙ্গ-রস বুদ্ধিনির্ভর। কোনো নির্ধারিত মানদণ্ড থেকে বুদ্ধির আলোকে কোনো ব্যক্তি বা সমাজের চিন্তা কার্য ও আচরণের যাথাযথ্য নির্ণয়। যখন কোনো সমাজপদ্ধতি ভেঙে যায় অথচ নূতন সদ্‌বুদ্ধিচালিত পরিণামদর্শী কোনো ব্যবস্থা গ'ড়ে ওঠে না, তখন মানুষের আচরণে যে অর্থহীন আসক্তি, নির্বোধ হঠকারিতা, অহেতুক লোভ, নিষ্ঠুর বৈষম্য ইত্যাদি প্রকাশ পায় যে কোনো স্থিতধী মানুষের স্বচ্ছ-দৃষ্টিতে তা ধরা প'ড়ে ব্যঙ্গের উদ্ভব হ'তে পারে। এই অসঙ্গতি সেদিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছিল সুতরাং জীবনানন্দের প্রবুদ্ধ চেতনায় তা যে ধরা পড়বে তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর নিষ্ফলা আঘাত এবং আক্রোশ তাঁর পথ নয়। 'বিতর্ক আমার মতো মানুষের তরে নয় তবু'। যে cynic মনোবৃত্তির জন্যে লেখকেরা বিদ্রূপকে হাতিয়ার করেন সেই মনোভাব জীবনানন্দের স্বভাবের বিরোধী। বুদ্ধির অতিরেক শুধু ভাঙতেই শেখায়, কিন্তু হৃদয়ানুভূতি মানুষকে চরম দুর্দৈবের মধ্যেও আলোক-বর্তিকার মতো সত্য লক্ষ্যের দিকে নির্দেশ করে। মানসিক গঠনের এই বিশিষ্টতার জন্যই সময়ের সাময়িক উত্তেজনা সত্বেও জীবনানন্দের বিদ্রূপ-সৃষ্টি-প্রেরণা সার্থক হয়নি।

তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিদ্রূপরসের কবিতা ব'লে আমরা 'কবি' রচনাটিকে নির্দেশ করেছি। কবিতাটি দীর্ঘ তিন পাতা লম্বা হওয়ায় এর বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হ'য়ে গেছে। ফলে কবিতাটি বীভৎস রসের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাণীবিন্যাসের যে নৈপুণ্য থাকলে মনের ঘৃণা সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া সম্ভব তা এখানেও দেখা যাবে—

> শীতের সকালে চামসে চাদরখানা ভালো করে জড়িয়ে নেয় গায়
> ঘড়ি ঘড়ি মুখে একবার হাত বুলায়
> মাজনহীন হলদে দাঁত কেলিয়ে একবার হাসে।
> মাইনাস এইট লেন্সের ভিতর আধমরা চুনো মাছের মত দুটো চোখ:
> বেঁচে আছে! না মরে'?

: কবি

দাঁত-কেলিয়ে শব্দটি অত্যন্ত অশ্লীল। কিন্তু ভেবে দেখলে ঘৃণার অভিব্যক্তিতে আশ্চর্যভাবে সার্থকও। শব্দনির্বাচনের এই দক্ষতা যদি ভাবসংহতির সঙ্গে যুক্ত হ'তো আলোচ্য কবিতাটি তবে অনবদ্য হ'তে পারতো।

'মহাপৃথিবী'র 'পরিচায়ক' কবিতায় আগুনকে ব্যবহার করা হয়েছে প্রতীকী অর্থে; যে ভাস্বর আগুনের ইশারায় সভ্যতা এগিয়ে চলে, কবি বলছেন,

আজ এই শতাব্দীতে পুনরায় সেই সব ভাস্বর আগুন
কাজ ক'রে যায় যদি মানুষ ও মনিষী ও বৈহাসিক নিয়ে
সময়ের ইসারায় অগণন ছায়া-সৈনিকেরা
আগুনের দেয়ালকে প্রতিষ্ঠিত করে যদি উনুনের অতলে দাঁড়িয়ে,

দেয়ালের 'পরে যদি বানর, শেয়াল, শনি, শকুনের ছায়ার জীবন
জীবনকে টিটকারি দিয়ে যায় আগুনের রঙ আরো বিভাসিত হ'লে,—
গর্ভাঙ্কে ও অঙ্কে কান কেটে-কেটে নাটকের হয় তবু শ্রুতিবিশোধন।

: **পরিচায়ক**

এইসব কবিতার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ কবির প্রতীকী ভাবনার অন্তরালে চাপা প'ড়ে তার তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে। অবশ্য ঐ জাতের সাররিয়ালিষ্ট কবিতায় ব্যঙ্গের ম্লান সুরটিই কবির অভিপ্রেত, তার উদ্ভাসিত তাৎপর্যময়তা নয়। বোঝা না বোঝার আলোছায়ায় জ্ঞান ও অনুভবের বিমিশ্রতায়, ব্যঙ্গ আর গাম্ভীর্যের সমন্বয়ে এক জটিল ঐকতান রচনাই কবির লক্ষ্য, অর্থগূঢ়তা আদৌ নয়। যেমন বিপ্লবের প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

এরকম চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল
সহসা খিঁচড়ে উঠে খচ্চরের মতন ফলত

অন্য কোনো জ্যামিতিক রেখা হতে পারে;
অন্য কোনো দার্শনিক মত-বিপ্লব;
জেনে তবু মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম এড়ায়ে
স্থির হয়ে রবে নাকি সন্ততিরা, সন্ততির সন্ততিরা সব?

: **বিভিন্ন কোরাস**

এই ধরণের কবিতায় ব্যঙ্গের সুর আরো স্পষ্ট, আরো স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান। কারণ এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনা কম, আর কবির চিন্তার মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক ভাবনার চেয়ে প্রধান হয়েছে সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক সঙ্কট। অপেক্ষাকৃত মনন-প্রাধান্যই কবিতাটির বিদ্রূপধর্মিতাকে বলবত্তর করেছে।

আবার 'প্রেম অপ্রেমের কবিতা'য় বিষয়টি নামেই আরো স্পষ্ট ক'রে নির্দেশিত রয়েছে, তাই এই কবিতায় ব্যঙ্গের সুর সার্থকতর অভিব্যক্তি পেয়েছে।

> শত্রুর অভাব নেই, বন্ধুও বিরল নয়—যদি কেউ চায়;
> সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চ'লে গেছে।
> ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
> হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি ক'রেছে।
> তারপর অনুভব ক'রে গেছে রমনীর ছায়া বা শরীর,
> অথবা হৃদয়,—
> বেরালের বিকশিত হাসির মতন রাঙা গোধূলির মেঘে;
> প্রকৃতির, প্রমাণের, জীবনের দ্বারস্থ দুঃখীর মত নয়।

: প্রেম অপ্রেমের কবিতা

এইসব বিদ্রূপের রসও অবশ্য সর্বসাধারণের জন্য নয়। রসবোধ মার্জিত না হ'লে এবং বৈদগ্ধ্য না থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর বিদ্রূপের আবেদন পাঠকের কাছে ব্যর্থ হবে। তবু কিছু কিছু কবিতায় এর বিপরীত দৃষ্টান্ত মিলবে না এমন নয়। মহা-পৃথিবীর 'ইহাদেরি কানে' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় (দ্রঃ—পৃঃ ২০০) 'মূর্খ-সসম্মানে' বা 'সোনার পিতল মূর্তি'র মতো চমকপ্রদ অলঙ্কার আছে ব'লে নয়, বিষয়বস্তুর স্বচ্ছতার জন্যই এর বিদ্রূপ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে যুদ্ধাহত পৃথিবীর বিচূর্ণ বিশ্বাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে সভ্যতার দন্তুর মুখশ্রীর সামনে তাঁর বিদ্রূপ-প্রবণতা আরো তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী হ'য়ে উঠতে পেরেছিল।

> নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
> লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
> তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
> বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত!

রাত্রি

অথবা

> অগণন লোক ম'রে যায়;
> এম্পিডোক্লেসের মৃত্যু নয়;—
> সেই মৃত্যু ব্যসনের মতো মনে হয়।

দীপ্তি

মানুষের এইভাবে জন্তুর মতো আত্মাবমাননা, অনর্থক অজস্র মৃত্যুর রলরোল কবির মনে ক্লান্ত বিষণ্ণতার ছাপ রেখে গেছে। আবার অন্যত্র যেখানে মানুষের ব্যবহারে বিচিত্র অসঙ্গতি ব্যক্ত হয়েছে সেখানে তাঁর কলম ক্ষুরধার হ'য়ে উঠেছে।

শতাব্দী আবেশে অস্তে চলে যায় :
বিপ্লবী কি স্বর্ণ জমায়।
আকণ্ঠ মরণে ডুবে চিরদিন
প্রেমিক কি উপভোগ করে যায়
স্নিগ্ধ সার্থবাহদের ঋণ।
তবে এই অলক্ষিতে কোনখানে জীবনের আশ্বাস র'য়েছে,

: সূর্যপ্রতিম

আকণ্ঠ-মরণে ডুবে থেকেও বিপ্লবী যদি স্বর্ণের লোভে মুগ্ধ হয়, প্রেমিকের হৃদয়ে যদি বণিক্ বৃত্তি জেগে থাকে তবে জীবনের আশ্বাস কোথায় মিলবে? এই নিরাশ্বাস যে কবির মনকে কত গভীর ভাবে আন্দোলিত করেছিল তার প্রমাণ অন্যত্রও রয়েছে :

একটি বিপ্লবী তার সোনা রুপো ভালোবেসেছিলো ;
একটি বণিক আত্মহত্যা করেছিলো পরবর্তী জীবনের লোভে ;
একটি প্রেমিক তার মহিলাকে ভালোবেসেছিলো ;
তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিলো দশজন মূর্খের বিক্ষোভে।

: ও. কে.

লোক-ব্যবহারের মধ্যে এই প্রবঞ্চনা, আত্মবঞ্চনা ও নির্বুদ্ধির অভিশাপ—এর বেদনা ব্যক্তিগত ভাবে সব চিন্তাশীল মানুষকেই ব্যথিত করে। সভ্যতার বর্তমান উন্নত পর্যায়ে এসে মানুষের কাছে প্রলুব্ধ ব্যবহার যখন আমরা প্রত্যাশা করি, তখন এই জড়তা, এই অসংযম একান্তই দুঃসহ ব'লে বোধ হয়। আবার সুশিক্ষিত মননসম্পন্ন মানুষও যখন নানা বন্ধ্যা রাজনৈতিক আবর্তে প'ড়ে ইতস্তত চালিত হয় তখন সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপে তাদের বিদ্ধ করা ছাড়া করণীয় কিই বা থাকে?

ঈশার শবোত্থান—বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু ক'রে
হেগেল ও মার্কস্ : তার ডান আর বাম কান ধ'রে
দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিলো ;

* * *

জড় ও অজড় ডায়ালেটিক্ মিলে আমাদের দুদিকের কান
টানে ব'লে বেঁচে থাকি—ত্রিবেদীকে বেশি জোরে দিয়েছিলো টান।

: অনুপম ত্রিবেদী

হেগেল ও মার্কস জড় ও অজড় ডায়ালেকটিকের কূটতর্ক নিয়েই যদি আমরা ব্যাপৃত

থাকি, জীবনের ক্ষেত্রে যদি এই সব রাজনৈতিক ও দার্শনিক জ্ঞান প্রযুক্ত না হয় তবে কি এই সব তত্ত্বালোচনা নিরর্থক নয়?

সাম্প্রতিক কালে পৌঁছে জীবনানন্দের মনে একটি চিন্তা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মানুষের সভ্যতা তার অগ্রগতির পথে চলতে চলতে বর্তমান শতাব্দীতে এসে মানুষের স্বার্থপরতা ও অজ্ঞতার জালে আটকে গিয়েছে। আজ যখন সব কিছুই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট ও স্থান-ভ্রষ্ট হ'য়ে গেছে তখনো প্রথানুগ মানুষের চেতনাহীন আচরণের কোনো ব্যত্যয় হচ্ছে না।

আকাশ নিজের স্থানে নেই মনে হ'ল;
আকাশ কুসুম তবু ফুটেছে পাপড়ি অনুসারে।
তবুও পৃথিবী নিজে অভিভূত ব'লে
ইহাদেরো নেই কোনো ত্রাণ;
সকলি মহৎ হতে চেয়ে শুধু সুবিধা হয়েছে;
সকলি সুবিধা হতে গিয়ে তবু প্রধূমায়মান।

: **ভাষিত**

আমাদের লক্ষ্য ছিল সুমহান কিন্তু আজ সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে সুবিধা ও স্বার্থের লোভে আমরা বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ তৈরী ক'রে চলেছি। কারণ আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে উদ্যম ছিল না—কানার তাঁত বোনার অভিলাষের মতো, নুলো শাঁখারীর হাতের করাতের কার্যকারিতার মতো আমাদের শুভেচ্ছার সঙ্গে সামর্থ্যের সমন্বয় হয়নি।

আমাদের কোনো সুষ্ঠু পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছানোর শক্তি নেই—শুধু সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে, সৃষ্টির নামে অনাসৃষ্টিকে স্তূপীকৃত ক'রে তুলতেই আমরা সক্ষম হয়েছি।

পরের ক্ষেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু ক'রে নক্ষত্রে লাগানো
সুকঠিন নয় আজ;

: **সৌরকরোজ্জ্বল**

তবু এই অনাচারের মধ্যেও মানুষ আজ নির্বিকার।

মানুষেরি ভয়াবহ স্বাভাবিকতার সুর পৃথিবী ঘুরায়;
মাটির তরঙ্গ তার দুপায়ের নিচে
অধোমুখে ধ্বংসে যায়;—চারিদিকে কামাতুর ব্যক্তিরা বলে:
এরকম রিপু চরিতার্থ ক'রে বেঁচে থাকা মিছে।

: **প্রতীতি**

আমাদের সর্ববিধ আচরণের মধ্যে এই ভণ্ডামি আজ ধরা পড়ছে। অন্তরে যে কামাতুর, মুখে সে ভাণ ক'রে এই ভাবে রিপু চরিতার্থ ক'রে বেঁচে থাকতে সে লজ্জিত। কবি এই সব কবিতায় এই ভণ্ডামির মুখোসটাকেই অনাবৃত ক'রে খুলে দিয়েছেন।

তিনি দেখেছেন জীবনের সব ক্ষেত্রেই এই অন্যায়, এই অসঙ্গতি, এই অপবুদ্ধি প্রকট হ'য়ে দেখা দিয়েছে। যে চাষী পরিশ্রম ক'রে সোনার ফসল ঘরে তুললো সেই ফসলে তার অধিকার নেই।

আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস
মিড্‌ল্‌ম্যানদের কাছে পর নয়।
তাহারা চেনায়ে দেয় আমাদের ঘিঞ্জি ভাঁড়ার,

: সোনালি সিংহের গল্প

এবং সেই ফসল আমাদের আয়ত্তের বাইরে চ'লে যায়। তাই 'উন্মেষ' কবিতায় যখন কবি বলেন—

দেয়ালে একটি ছবি : বিচার সাপেক্ষ ভাবে নৃসিংহ উঠেছে,
কোথাও মঙ্গল সংঘটন হয়ে যাবে অচিরাৎ।

: উন্মেষ

তখন বিস্মিত হ'য়ে ভাবতে হয় এই নৃসিংহের আবির্ভাব কল্পনা কবির বিশ্বাস না ব্যঙ্গ, তাঁর আশা না উপহাস? কারণ তাঁর পরের স্তবকেই কবি লিখেছেন—

নিবিড় রমণী তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে
অনেক মলিনযুগ—অনেক রক্তাক্তযুগ সমুত্তীর্ণ ক'রে,
আজ এই সময়ের পারে এসে পুনরায় দেখে
আবহমানে ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চ'ড়ে।

: ঐ

নারীর অন্তরতর সত্তা প্রজ্ঞাময় পুরুষের আশ্রয় চায়। কিন্তু তার বদলে যদি সে কেবল আবহমানের গর্দভবাহন ভাঁড়কেই দেখতে পায় তবে তাকে বরমাল্য দিয়ে বরণ করতে কি ঘৃণাবোধ করবে না? প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির এই বিপুল বৈপরীত্যই মনুষ্যপ্রকৃতির চরম নিয়তি ব'লে মেনে নিতে হবে?

এমনি আরো একটি দৃষ্টান্তে জীবনানন্দের বিদ্রূপ-ধর্মিতার স্বরূপ-লক্ষণটি ব্যক্ত হতে পারে—

একসাথে বেড়াল ও বেড়ালের-মুখে-ধরা-ইঁদুর হাসাতে
এমন আশ্চর্যশক্তি ছিলো ভূয়োদর্শী যুবার
ইঁদুরকে খেতে-খেতে শাদা বেড়ালের ব্যবহার,
অথবা টুকরো হতে হতে সেই ভারিক্কে ইঁদুর :
বৈকুণ্ঠ ও নরকের থেকে তা'রা দুইজনে কতোখানি দূর
ভুলে গিয়ে

: সুবিনয় মুস্তফী

শাদা বিড়াল ও কালো ইঁদুরের রূপকে শ্বেত ও কৃষ্ণকায় জাতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সন্দেহ ক'রে অথবা না বুঝে, খাদ্য-খাদকের বিচিত্র ব্যবহারের প্রসঙ্গে স্বর্গ-নরকের প্রশ্ন তুলে, করুণ অনিবার্য ঘটনার শেষ সান্ত্বনাকেও তিনি যেভাবে শ্লেষে বিদ্ধ করেছেন তাতে পাঠক চিত্তে হাসি নয় অথচ ঐ জাতীয় এক ম্লানরস জাগবে নিঃসন্দেহে।

এমনি নানা কবিতায় জীবনানন্দের বিদ্রূপ-পারঙ্গমতার চিহ্ন বিচূর্ণ মর্মরস্তম্ভের কারুকার্যের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রোথিত হ'য়ে রয়েছে। হঠাৎ যখন নজরে প'ড়ে চমকে যেতে হয়, মুগ্ধ হ'তে হয়—কিন্তু রসাপ্লুত হবার অবকাশ থাকেনা, মনে ক্ষোভ জাগে যদি পরিপূর্ণ আকারে পাওয়া যেত, কিন্তু 'সমারূঢ়' কবিতায় কবি পাঠকের এই অতৃপ্তি আশাতীত রকমে পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন। ভাবের সংহত দৃঢ়সংবদ্ধ প্রকাশে, প্রকাশ-ব্যঞ্জনায় এবং বিদ্রূপের মর্মভেদী ঋজুতায় বাংলা আধুনিক কবিতার মধ্যে তা দ্বিতীয়-রহিত। আগে কবিতাটিকে সম্পূর্ণ উধৃত করা হয়েছে (দ্রঃ—পৃঃ ২০৯) সৃষ্টি-ক্ষমতাহীন ছিদ্রান্বেষী সমালোচকের ঘৃণ্য অক্ষম মূর্তিটি তার কুৎসাজীবী পরভোজী স্বরূপ, তার পণ্ডিতমন্যতার ছদ্মবেশ খসিয়ে কবি এখানে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত কবিতাটির এই পংক্তি ক'টিতে আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—

কালি আর কলমের পর
বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর অক্ষর
অধ্যাপক ;

: সমারূঢ়

এখানে কালি কলম পত্রিকার কোনো প্রসঙ্গ নিহিত রয়েছে কি ? তাঁর কোনো কবিতা সম্পর্কে 'কালি কলমে'র সম্পাদকের কোনো মন্তব্যই কি আহত বিক্ষুব্ধ কবিকে এই কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল ? যাইহোক, এর চমকপ্রদ সূচনা, অধ্যাপকের রূপ ও তাঁর জীবিকার স্বরূপ উদ্ঘাটনের মধ্যে যে ঘৃণার সঞ্চরণ হয়েছে তার শিল্পিতা অনন্যসাধারণ। অন্য যে কোনো কবি হ'লে সমালোচকের অনুধৃত উক্তি তুলে হয়তো একে সনেটের আকার দিতেন। কিন্তু তা'হলে এর রসব্যঞ্জনা যে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হ'তো তাতে সন্দেহ নেই।

যিনি সূচনায় একটি সুদীর্ঘ বিদ্রূপ-রসের কবিতায় কবিকে শ্লেষে বিদ্ধ করেছিলেন তিনিই তার শ্রেষ্ঠ এবং প্রায় অন্তিম বিদ্রূপ কবিতায় অধ্যাপককে কশাঘাতে জর্জরিত করলেন। অথচ তিনি নিজে কবি এবং অধ্যাপক দুই-ই ছিলেন। এর অন্তরশায়ী রহস্য অবশ্য খুব বেশি অস্পষ্ট নয়।

বর্ণ বৈভব

বর্ণ পরিচয়

জীবনানন্দের বর্ণচেতনা সম্পর্কে এক সুবিস্তৃত নিবন্ধে ড. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত এক নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন জীবনানন্দকে যারা 'ধূসরতা'র কবি বলেন তারা জীবনানন্দের বর্ণধানুভূতি সম্পর্কে কতখানি অজ্ঞ। তিনি জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যসম্ভার তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ও তালিকা ক'রে দেখিয়েছেন পূর্বাপর সমস্ত জীবন ধ'রে তিনি কত সচেতনভাবে উজ্জ্বল ও আলোকদীপ্ত বর্ণ সম্ভারের পশরা সাজিয়েছেন এবং সেই জন্যেই তাঁর বর্ণ ব্যবহারের বিশেষত্বের সঙ্গে তাঁর কবি মানসের সমীকরণ করা কত কঠিন।

মনস্তাত্ত্বিকরা মনে করেন বর্ণচেতনা মানুষের মনোগহনের অনেক রহস্য উন্মোচিত করতে পারে। মধুসূদনের মহাকাব্য মেঘনাদ বধে যখন আদি ও উজ্জ্বল বর্ণসম্ভার—লাল নীল শাদা কালো হলুদ সবুজ রূপালি সোনালির প্রাচুর্য দেখি, তখন উপলব্ধি করি, এই কবির মনোগঠনে আদিমতা ও সরলতার এক ক্লাসিকসুলভ ভিত্তি আছে। আবার আধুনিক কবিদের রচনায় যখন গোলাপী, বেগুনী, আকাশী, পিঙ্গল, বাদামী প্রভৃতি নানা মিশ্র রঙ প্রাধান্য পায় তখন সহজেই সনাক্ত করতে পারি তাঁদের মানসিক জটিলতা ও নানা প্রবণতার। কেননা যে কোনো রঙ এক একটি স্বতন্ত্র মানসিকতাকে দ্যোতিত করে। তাই বিশেষ কোনো কবির কোন কোন বিশেষ রঙের প্রতি আসক্তি তা নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করতে পারে তাঁর চারিত্রিক কোনো কোনো বিষেশত্বের। সুতরাং জীবনানন্দের বর্ণানুরাগের সূত্রসন্ধানে তাঁর কবিতার পংক্তি-পরিক্রম, পণ্ডশ্রম বিবেচিত হবে না, বরং তাঁর অন্তর-রহস্য উন্মোচনে নূতন পথের নির্দেশ দেবে সন্দেহ নেই।

রসজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন 'ঝরাপালক' গ্রন্থের নামকরণে যে মানসিক পরিণতির চিহ্ন আছে, তার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলিতে ততখানি নেই। 'ঝরাপালক' নামটির অনুষঙ্গে যে বিষণ্নতা, আঘাত, বেদনা ও মৃত্যুর অনুভূতি আছে এর অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তুতেও তা নেই। এই কাব্যে ব্যবহৃত বর্ণসম্ভারও ঠিক একই প্রমাণ দেয়। প্রথমাবধিই তাঁর লেখায় আদি বর্ণের চেয়ে মিশ্র বর্ণ বেশী। তার মানে লাল নীল শাদা কালো এই সব রঙ সরাসরি ব্যবহার করার চেয়ে রঙের নানা মিশ্র সূক্ষ্ম স্তরভেদ তিনি তুলে ধরতে ভালবাসেন। 'ঝরাপালকে' ব্যবহৃত রঙগুলি পর্যালোচনা ক'রে দেখা যায় তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রঙ হ'লো লাল। এ বইয়ের মোট ৩৫টি কবিতার মধ্যে রক্ত-বর্ণ-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বার চল্লিশেক। আবার

সোজাসুজি লাল রঙ ব'লে তাঁর তৃপ্তি নেই—তার নানা সূক্ষ্ম shade ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় নানা বর্ণবাচক প্রতিশব্দ, নানা বিশেষণ, নানা উপমা তিনি ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষার দৈন্য হ'লো বর্ণের অসংখ্য তারতম্যকে আমরা পৃথক পৃথক শব্দ দিয়ে নির্দেশ করতে পারি না। আমাদের ভাষায় মূল কয়েকটি রঙের নাম আছে মাত্র। কিন্তু প্রত্যক্ষদৃষ্ট যে কোনো একটি রঙের নির্দিষ্ট shadeটি যদি ভাষার মাধ্যমে অন্যদের কাছে স্পষ্ট ক'রে তুলতে চাই তাহলে উপযুক্ত পরিভাষা বাংলাতে জুটবে না। জীবনানন্দকে এই দৈন্য পূরণ করতে হয়েছিল প্রাকৃতিক নানা বস্তুর উপমা এবং নানা বিশেষণের যোগে। জীবনানন্দের আজীবনের সমস্ত বর্ণনার রঙগুলিকে যদি স্তরভেদ ক্রমে কেউ বাজিয়ে দেন তাহলে ভাষার একটা বড় অভাব হয়তো পূর্ণ হ'তে পারে।

কিন্তু সে কথা থাক্। ঝরাপালকে লাল রঙের তালিকাটা এই ধরণের: অরুণ, আরক্ত, কুঙ্কুম, খুন, টুকটুকে, নারাঙ্গি, ফাগ, লালিমা, লোহিত, শোনিমা, হিঙ্গুল। এ ছাড়াও রয়েছে নটকান রাঙা, রুধির লাল, রাঙা অঙ্গার মালা, গিরির গোধূলি রঙিন জটা, আঁখি গোধূলির মত গোলাপি রঙিন, ডালিম ফুলের মত রক্তিম, নাশপাতি গাল, রাঙা নার্গিস, আপেলের মত লাল ইত্যাদি ইত্যাদি। রক্তবর্ণের অজস্র স্তরভেদ যথাযথ হবার জন্য উপমা নির্বাচনে তরুণ কবির এই আপ্রাণ প্রয়াস এবং অতৃপ্তিবোধ প্রমাণ করবে জীবনানন্দ বর্তমানে যুগোপযোগী সূক্ষ্ম ও জটিল মননের মানুষ।

এখনো প্রশ্ন থেকে যায়, ঝরাপালকে অন্য সব রঙের চেয়ে লাল রঙের এত প্রাচুর্য কেন? লাল তো কামনার, উত্তেজনার, অনুরাগের, প্রাণপ্রাচুর্যের রঙ। লালের সঙ্গে জড়িত থাকে মুগ্ধতা, ভয়, আঘাত ও বিপদের সঙ্কেত। ঝরাপালকের নামের মধ্যে নিহিত বিষাদ ও মৃত্যুর অনুভূতির সঙ্গে এ রঙের সঙ্গতি কোথায়। নামকরণের সঙ্গে সঙ্গতি পেতে হ'লে এতে বিষাদ আর নৈরাশ্য শোক আর বেদনার রঙ কালো বা ধূসরতার আতিশয্যই তো দেখতে পাওয়া উচিত ছিল। ঝরাপালকে কালো রঙও আছে; তিমির ধূম্র ধূসর পাংশু পিঙ্গল প্রভৃতি শব্দের যোগে তার যথেষ্ট বৈচিত্র্যও রয়েছে কিন্তু অন্যান্য বর্ণসম্ভারের বিচিত্র ও উজ্জ্বল সমারোহের মাঝখানে তাকে বড় নিষ্প্রভ মনে হয়।

ধূসরতা

।

জীবনানন্দকে বলা হয়েছে 'ধূসর কবি'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তো 'ধূসর' নামাঙ্কিত বই। এখানেও কিন্তু একই ইতিহাস। বরং এখানে রঙের তালিকা আরো বিস্তৃত সেই তালিকায় বিশেষণের বৈচিত্র্য আরো বেশি। যে 'কনক' বর্ণ একবার মাত্র দেখা, গিয়েছিল 'ঝরাপালকে' এখানে তারই কত প্রাচুর্য, কত বৈচিত্র্য : পাখির সোনালি চোখ, মেঘের সোনালি চুল, নারিকেল ফুল সোনা, ধানের সোনার ছড়া, রোদের সোনালি রেণু, বিকেলের সোনার ভিতর, এই শেষ বিষণ্ণ সোনালি তুলিটুকু, সোনা আকাশের চাঁদ, সোনালি প্রেমের গল্প—এইসব। হৃদয়ের কত দরদ কত মুগ্ধ আমেজ এতে মিশে আছে। রূপো আর রূপালি এসেছে। শাদা রঙ আরো বর্ণাঢ্য এখানে; আরো বিচিত্র তার ব্যাপ্তি ও বিশেষণ। ঝরাপালকে বিচিত্রবর্ণ নীল ছিল এখানেও আছে। এ বইতে হলদে রঙে বর্ণাঢ্য উজ্জ্বলতা কম পাণ্ডুরতা বেশি। পাণ্ডুরতার সঙ্গে বিবর্ণতা, রোগ ও মৃত্যুর যোগ আছে। পাণ্ডুর রঙ তাই ধূসরতারই অনুষঙ্গী। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নামকরণে এই দুটি বর্ণের সমীকরণ ও সহাবস্থান লক্ষ্য করতে অনুরোধ করি। 'পাণ্ডুলিপি' শব্দে ভিন্ন এক তাৎপর্য আছে। সেই তাৎপর্যই এখানে প্রাসঙ্গিক এবং যথার্থতর সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হ'য়েও এখানে বিশ্লিষ্ট ক'রে আলোচনা করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস জীবনানন্দ নামকরণের সময় এর গৌণ তাৎপর্যের কথা ভুলে যান নি। কবির সজ্ঞান চেতনায় এটি শ্লিষ্ট এবং পুনরুক্তবদাভাস হয়েই ছিল।

যাই হোক্, শ্রদ্ধেয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা শব্দকোষে 'ধূসর'কে শাদা-কালো বা হলদে শাদার মিশ্র রঙ বলেছেন। 'পাণ্ডু' শব্দের অর্থও ঠিক তাই। শাদা কালো বা শাদা-হলুদের সমাহার বিবর্ণ রঙ। রঙের এই পাণ্ডুরতা যে জীবনানন্দের একান্ত প্রিয় ছিল তা আলোচ্য 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অথবা তাঁর সমগ্র কাব্যগ্রন্থের বর্ণ প্রয়োগ প্রমাণ করবে না। তবুও 'ধূসর' শব্দটি তাঁর কাব্য পাঠকদের কাছে অবিস্মরণীয় মনে হয়েছে ঐ প্রতীকী ব্যঞ্জনাটির জন্যে। অস্পষ্ট, বিগত, বিলুপ্ত, দূরস্থিত—এইসব ভাব যেমন ক'রে এই শব্দের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে পাঠক চিত্তে দাগ রেখে গেছে তাঁর কবিতার বহুবার ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য উজ্জ্বলতর বর্ণের অভিব্যক্তি ততখানি সাড়া জাগাতে পারেনি।

কিন্তু 'ধূসর' এই শব্দে পাঠক নয় জীবনানন্দ স্বয়ং কি বুঝতেন, নানা কবিতায় এই শব্দটির প্রয়োগ থেকে আমাদের তা বুঝে নিতে হবে। একটু অনুধাবন করলেই দেখা

যায় কবিতায় রঙকে তিনি দুইভাবে ব্যবহার করেছেন। কোনো বস্তুর রূপের নির্দেশের জন্য রঙকে, অথবা বিশেষ কোনো ভাবের অভিব্যক্তির জন্যও রঙকে জীবনানন্দ ব্যবহার করতেন। 'ধূসর' শব্দে যখন তিনি বর্ণ বোঝেন তখন লেখেন :

পেঁচার ধূসর ডানা
নেউল ধূসর নদী
অনেক ধূসর ঘোড়া
ধূসর সন্ধ্যা
ধূসর বকের সাথে
বিকেল বেলার ধূসরতা
আতার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তি
মাথার সকল চুল হয়ে যায় ধূসর ধূসরতম শন।

ধূসর এখানে সর্বত্রই অন্ধকারের নিকটবর্তী শাদা-কালো-বাদামীর একটা মিশ্র রঙ। ধূসর, আমরাও জানি, ধূলির রঙ, ছাই-এর রঙ। সুতরাং পেঁচার ডানার রঙ, বেজি-র রঙ, বকের পিঠের রঙ, কাঁচা পাকা চুলের রঙ, সন্ধ্যার আবছা আঁধারের রঙ—সবই ধূসরের পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু 'ধূসর' শব্দকে জীবনানন্দ যখন বাচ্যার্থ থেকে প্রসারিত করে নেন ভাবলোকে তখন এক প্রতীকী ব্যঞ্জনা এসে যায়। যেমন :

ধূসর চিবুক
উঁচু গাছের ধূসর হাড়ে
ধূসর বাতাস
তুষার ধূসর ঘুম
ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখ
বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ
বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা (বোন)
ধূসরিম মহিমার।

বুঝতে কষ্ট হয় না 'ধূসর' এখানে ম্লান, বিশুষ্ক, অস্পষ্ট, অচেতন বিলুপ্ত, দূরবর্তী, লোকান্তরিত, মৃত প্রভৃতি অর্থ বহন করে। 'ধূসর' শব্দটি প্রয়োগ না করেও কবি এই একই ভাব নানা কবিতায় ব্যবহারও করেছেন, যেমন : পাণ্ডুর পাতার রঙ, ফ্যাকাশে পাতা, হলদে পাতার মত আমাদের পথে ওড়াউড়ি, মড়ার চোখের রঙ, বিবর্ণ বাদামি পাখি, 'যদিও পিঙ্গল ধূমা কোথাও রয়েছে কাছাকাছি'। তাঁর ক্রিয়াপদ ব্যবহারেও 'এই মৃত্যুমুখী, নেতিবাচক ভাবনার সন্ধান পেয়েছেন ডঃ অমলেন্দু বসু।

ঘুমায়ে গিয়েছে, আসেনি, ঝরিয়া গেছে, ছিঁড়ে, থাকিবে না, নিভায়ে, যেতেছে নিঃশেষ হয়ে, থামিতে হয়, ফুরায়, হাওয়া হয়ে, ভূত হয়ে, ইত্যাদি। তাই 'ধূসর' কথাটি জীবনানন্দের কবিতায় একটি শব্দ-মাত্রে আবদ্ধ নেই একটি বিশিষ্ট চেতনায় পর্যবসিত হয়েছে।

আমরা অন্যত্র উল্লেখ করেছি জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য-চেতনার পিছনে রয়েছে মৃত্যুর প্রসারিত পটভূমি। 'যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,' যে বিলুপ্ত অতীতের প্রিয়দের মুখ এবং স্মৃতির বেদনা কখনো ভুলতে পারে না, 'কবর খুলেছে মুখ বারবার যার ইশারায়,' 'মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর,' দেখে দেখে 'পাঁচফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে' রাখা যে অনিবার্য জানে, নিজের হৃদয়কে যার মনে হয় 'মৃত এক সারসের মত'। সে কবির কাব্যে 'ধূসরতা'র চেতনা পরিব্যাপ্ত হবে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর রচনার শেষ পর্যায়ে বেলা অবেলা কালবেলা-র শেষের দিকে ধূসর শব্দটির প্রয়োগ তো প্রায় আর পাওয়াই যায় না, তবু এই চেতনাকে পরিহার করা গেছে কি? জীবনানন্দের সারা জীবন ভরে এই মৃত্যু বিচ্ছেদ, ব্যথা, স্মৃতি ও বিষণ্ণতা এক ধূসর বর্ণাভা রেখে গেছে। রসদৃক্ষ পাঠকের চেতনায় জীবনানন্দ তাই 'ধূসরতার কবি'।

বর্ণমালা

রঙকে জীবনানন্দ কোন বইয়ের কোন কবিতায় কতবার ব্যবহার করেছেন তার এক নিশ্ছিদ্র তালিকা দেবার প্রয়োজন নেই আমাদের। আমরা বরং দেখতে চাই অভিজ্ঞতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবির বর্ণচেতনার উত্তরণ কিছু হচ্ছে কিনা? তাঁর নিছক রূপদৃষ্টি ভাবের জগতে কোনো স্পর্শ রেখে গেল কিনা।

আমরা দেখেছি ঝরাপালকের কবির মধ্যে সেই সম্ভাবনা ছিল। যিনি লেখেন নীহার নীল, বকের পাখার মত লঘু মেঘ, অথবা কুয়াশার শাদা ডানা, তিনি রঙকে ছাড়িয়ে আরো কিছু দেখতে পান বৈকি। আমরা লক্ষ্য করেছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবির বর্ণানুভূতি আরো পরিণত হয়েছে; বর্ণবৈচিত্র্য বোঝাতে যেমন নানা কৌশল নিয়েছেন, 'অজস্র গভীর রঙ' ছড়িয়ে দিয়েছেন চারপাশে, 'বাদামি সোনালি নীল রোম!' 'বাদামি সোনালি শাদা ফুটফুটে ডানা' বিচিত্র বর্ণের অজস্র পাখির ছবি ফুটিয়েছে আকাশে, অথবা 'মাছরাঙা, তার রঙ', 'প্রজাপতি রাঙা মেঘ,' অথবা 'সন্ধ্যার রঙ' যে বর্ণাঢ্য সুষমা ছড়ায় তার তুলনা অন্য কোথাও নেই। রঙের উজ্জ্বলতা, সুচিক্কণ মসৃণতা ফুটেছে 'ভেলভেট জ্যাকেটের মাছ রাঙা', আবার বিবর্ণতা বা বর্ণহীনতাকে রূপ দিতে একটুও অসুবিধে হচ্ছেনা—। 'বিকেলের রঙ—রঙের শূন্যতা'। এই শিল্পিতা

অবিস্মরণীয়। তার চেয়েও বড় কথা এই পর্বে এসে তিনি রঙকে চেতনা-কল্পনার মধ্যে পেয়েছেন। লাল রঙ বোঝাতে কবি যখন 'মশালের আগুনের রঙ' লেখেন তখন আমরা পাঠকরাও যেন তার উত্তাপ আর জ্বালা অনুভব করতে পারি। অথবা যখন লেখেন 'রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মত লাল' তখন সেই কবোষ্ণ ঈষৎ রক্তাভ রোদটাকে আদর করতে ইচ্ছা করে।

বনলতা সেনে' 'শিকার' কবিতাটি সযত্নে খুঁটিয়ে পড়তে অনুরোধ করবো পাঠকদের। যেখানে 'আকাশের রঙ ঘাস ফড়িঙের দেহের মত কোমল নীল', যেখানে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মত সবুজ', সেখানে রাত্রে দেশোয়ালীরা যে 'মোরগ ফুলের মত লাল আগুন' জেলেছিল 'সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর; হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো'। কুঙ্কুমের মতো আগুনের রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো হয়ে যাওয়ায় উজ্জ্বল দিবালোকে আগুনের নিষ্প্রভতাই শুধু বোঝায়নি, নিভন্ত আগুনের নিস্তেজ অবলুপ্তির ইশারাও ফুটিয়ে তুলেছে।

'সাতটি তারার তিমিরে' বিভিন্ন বর্ণের উপাদান কোথাও কোথাও আরো ব্যঞ্জনাময় ও কাব্যধর্মী 'রিষ্টওয়াচ' কবিতায় দূর সমুদ্রের শব্দ কবির চেতনায় 'শাদা চাদরের মতো'। সপ্তক কবিতায় কবি দেখেছেন 'জাফরান আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে'; অন্যত্র নভশ্চর 'সারস দম্পতির চোখে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতো নদী এসে ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্ব ফেলে যায়'। আর একটি কবিতায় যে নীলিমাকে প্রিয় অভিভাবিকার মতো মনে হয়—

> হাতে তার তুলাদণ্ড;
> শান্ত—স্থির;
> মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।

: অভিভাবিকা

নীল হলো ঔদার্য, মহত্ব, আভিজাত্যের রঙ। 'নীলাভ বৃত্তি' বলতে কবি কোনো উদারতা ও মানবিক মহত্বের আভাস দিতে চান নি কি ?।

রঙের বর্ণনায় আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলছি :

> ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস
> অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।

: বিভিন্ন কোরাস

উজ্জ্বল সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে যে বাতাস বয়ে যাচ্ছে তাকে সবুজ বলেই মনে হচ্ছে। এভাবে যদি বর্ণনা করা হতো, তাহলে ঘাসের সবুজকে এত সুন্দর আমাদের কল্পনায় প্রতিভাত করে তোলা যেত না।

শাদা-কালো

বিখ্যাত বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন বলেছিলেন, মানুষের চোখের দুটি পৃথক ধর্ম আছে। যখন পার্থিব আলো উজ্জ্বল থাকে চোখের পর্দায় বস্তুজগতের রঙিন ছবি ধরা পড়ে। কিন্তু রাত্রে বা অন্ধকারে, আলো স্তিমিত হয়ে এলে ঐ চোখই শাদা-কালো রঙে বস্তুর অবয়বটাকে চিনিয়ে দেয়, তার রঙ চিনিয়ে দিতে পারেনা।

জীবনানন্দের কবিতায় বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। জীবনের শেষ পর্বে এসে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় পৌঁছে রঙ সম্পর্কে এই সব উত্তেজনা, রূপরচনায় এই ঐকান্তিক আগ্রহ ও যাথাযথ্য আর তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। ভাবের আরো গভীরতর জগতে কবির মনোযোগ আকৃষ্ট সুতরাং উপমা ও বিশেষণের প্রাচুর্য দিয়ে রঙকে বিশদ ও লক্ষ্যভেদী করার সাধনা তত প্রবল নয় আর। কাব্যরচনার এই সায়াহ্ন বেলায় তাঁর কবি দৃষ্টি থেকে রঙ যেন মুছে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। একেবারে লুপ্ত হয়েছে বললে ভুল হবে। রাত্রে যেমন উজ্জ্বল আলোক রশ্মি-পাতে মানুষ সব রঙ আবার দেখতে পায় তেমনি এ পর্বের কোনো কোনো কবিতায় বর্ণসুষমা দেখা যায় বৈকি! যেমন, 'এই পথ দিয়ে', 'মানুষ যা ছিল', 'হে জননী হে জীবন' ইত্যাদি। তবু জীবনানন্দের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরাও বলতে পারি—

> আলো যেন কমিতেছে—বিস্ময় যেতেছে নিভে আরো
> আকাশ তেমন নীল? আকাশ তেমন নীল নয়,
> .. মাছ রাঙা শিশুদের পাখি আজ: শিশুরাও কারো
> রেশমি চুলের শিশু নয় আজ:
>
> : সে

বর্ণাঢ্যতার বদলে বরং রঙকে এখন থেকে এক বিশেষ ভাবের বাহন হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। আর এই নূতন ভাবনা প্রধানত শাদা আর কালো এই দুটো রঙকে আশ্রয় করেই রূপায়িত হয়েছে।

> 'শাদা-কালো রঙ এসে কেবলি মিশছে অন্ধকার'।
>
> : এইখানে সূর্যের

শাদা রঙ জীবনানন্দের চেতনায় প্রজ্ঞা, সংস্কৃতি, অগ্রগতি, শ্রম এবং জীবনের প্রতীক। কালো অপরপক্ষে অজ্ঞানতা, সংস্কারাচ্ছন্নতা, হিংসা, হানাহানি এবং মৃত্যুর দ্যোতক। আমরা আগে অন্যত্র আলোচনাও করেছি যে আলো এবং অন্ধকার শাদা

এবং কালো মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে দুই বিরোধী শক্তি জীবনানন্দ এইভাবে বুঝেছেন বা বোঝাতে চেয়েছেন। অন্তিম পর্বের অজস্র কবিতায় শাদা ও কালোকে এই অর্থে আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি। যেমন—

এই দু'রঙই ভালো,
শাদা পাখির কালো
কালের পাখি সাথী
উড়ছে দেশে দেশে।

•

তোমার আমার ভালোবাসা—তাকি
একটি পাখি—একটি শাদা পাখি।

: তোমার আমার

ভালোবাসাই হলো শাদা পাখি আর কালো পাখিই হলো মৃত্যু। অথচ তারা সাথী পাশাপাশি তারা দেশে দেশে উড়ে চলে। কিন্তু শাদা পাখিই কালো পাখি কিনা তা কবির জানা নেই।

আবার—

অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়ার আগে
শঙ্খসাগর এ-রোদ ভালো লাগে
এখুনি ঘুম এল যাবে, কাছে
কালের কালো মহাসাগর আছে

: তোমায় আমি

শঙ্খ শাদা সাগরই হলো জীবন, রৌদ্রই হলো জীবন, কালের মহাসাগরের রূপ হলো কালো। সেখানে ঘুমিয়ে পড়া মানে অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাওয়া। শাদা কালোর এই ধাঁধার মধ্যে জীবনানন্দের বর্ণচেতনার অন্তিম পরিণতি খুঁজে নিতে হবে।

বাক্‌শিল্প

ভাষা

গাছ চিনতে যেমন সাহায্য করে গাছের পাতা ও ফুল, কবিকে বুঝতে তেমনি তাঁর ভাষাও পরখ করা যেতে পারে। প্রাবন্ধিকের মতো বিষয়ের অর্থব্যক্তিই তো কবির লক্ষ্য নয়, রূপময় অভিব্যক্তিই আসল কথা। তাই কোন্ ভাষায়, কি বাণী-বিন্যাসে তাঁর কবিতা রূপায়িত হ'লো তার ভিতরে কবিসত্তার নিগূঢ় পরিচয় লুকানো থাকে।

আমাদের সাংসারিক হাজারো প্রয়োজনে যে ভাষা আমরা ব্যবহার করি, কথা বলি, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করি—অতি-ব্যবহারের মালিন্যে তার উজ্জ্বলতা মুছে গেছে। অর্থের মধ্যে আর নিটোল ব্যঞ্জনা থাকে না, শান না দেওয়া ক্ষুরের মতো ভোতা, কোম্পানীর আমলের তামার পয়সার মতো সিংহের মুখ উঠে গেছে, সব লেখা মুছে গেছে, পুরানো চকমকি পাথরের মতো তার তীক্ষ্ণ কোণগুলি চোট খেয়ে খেয়ে ক্ষয়ে গেছে। দৈনন্দিনের দাবি এতে হয়তো কোনোক্রমে মেটে, কিন্তু যখনই আমরা নূতন কিছু, বিস্ময়কর বা উত্তেজক কিছু বর্ণনা করতে চাই তখন বুঝতে পারি এই ভাষায় কুলাবে না—আমাদের হাতড়াতে হয় তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল আন্‌কোরা কোনো শব্দের জন্য। এই ভাষায় তো আর চেতনার সঙ্কেত-গূঢ়তা, অনুভবের শিলীমুখ তীব্রতা আনা সম্ভব নয়, তাই প্রতি যুগের প্রধান কবিকেই নিজের উপযোগী ক'রে ভাষা বানিয়ে নিতে হয়।

ভারতচন্দ্রের আমল থেকে কবিতার আসরে যে ভাষা চালু ছিল তাতে মধুসূদনের প্রতিভার নবত্ব অভিব্যক্তি পেতো না ব'লেই ভাষাকে নূতন ছাঁচে ঢালতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রতিভার একান্ত ভিন্নধর্মিতার জন্য সে ভাষা পরের কবিরা নিতে পারেননি পুরোমাত্রায়। আবার হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ভাষা-ঐতিহ্য ভেঙে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব তাকে নূতন ক'রে নিয়েছিল।

এমনই হ'য়ে থাকে। যে কবির নূতন চেতনা ও অনুভূতি নেই, তাঁর চিরায়ত কবিভাষাতেই কাজ চলতে পারে। কিন্তু প্রতিভা যাকে স্বতন্ত্র বানিয়েছে তাঁকে পৃথক পরিভাষা গড়তে হবেই। নইলে প্রথাগত ভাব-পরিধির বাইরে কবি যাবেন কি ভাবে?

জীবনানন্দের কবিতার ভাষা বাংলার সার্বজনীন কবি-ভাষা তো নয়ই, এমনকি তাঁর নিজের মুখের ভাষাও নয়। আপাতত প্রহেলিকার মতো মনে হ'তে পারে একথা। জীবনানন্দের কবিতার মনোযোগী পাঠকরা জানেন আমরা কি বলতে চাইছি। একদা

ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতাকে কৃত্রিমতা মুক্ত করতে চেয়ে কবিতার পৃথক চিরায়ত কবি-ভাষাকে পালটে কথ্য ভাষাকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ এই রীতির প্রবর্তন করে গিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ আধুনিক কবিরা সকলেই আরো নিষ্ঠার সঙ্গে এই রীতি অনুসরণ করেছেন। কবিতার ভাষা এবং মুখের ভাষা সেখানে অদ্বৈত, কিন্তু জীবনানন্দ কবিতার এই কথ্যরীতি ছেড়ে দিয়ে এককভাবে সাধুভাষার রীতিতে ফিরে গেলেন। মহাকাব্যের কবিরা ভাষাকে পৃথক বিশিষ্ট গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তুলবেন—ইউরোপীয় অলংকার শাস্ত্রে এই নির্দেশ আছে। তিনি গীতি কবিতার ক্ষেত্রেও কি তাই করতে চেয়েছেন? অথবা তাঁর এ প্রয়াস শুধু কবিতার রসসিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে? তাঁর শব্দ সন্নিবেশ রীতি সম্পর্কেও ঐ একই কথা। ভাবকে আরো স্পষ্ট আরো সুচারুভাবে ব্যক্ত করতেই যে তিনি দেশী বিদেশী শ্লীল অশ্লীল যে কোনো শব্দ প্রয়োগ করেছেন—তা কিন্তু আদৌ নয়, বরং ঐ সব শব্দ প্রয়োগে ভাবকে অস্পষ্ট ও অস্ফুট করে তোলার একটা সচেতন প্রয়াস প্রতীকী কবিদের মতো তাঁর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র অথবা সুরেশ সমাজপতি থাকলে ভাষার এই বিজাতীয়তার জন্য তীব্র কটূক্তি কবির প্রাপ্য হতো। যেহেতু একালের কাব্যবোধ ওঁদের কাল থেকে অন্তত কিছু এগিয়েছে—তাই ভাষা বিচারের মানদণ্ড এখন আলাদা। এখন অন্তত ব্যাকরণগত বিজাতীয়তা নিয়ে পাঠকের অভিযোগ নেই —অভিযোগ অস্বচ্ছতা এবং দুর্বোধ্যতাকে ঘিরে। বলাবাহুল্য, ভাষার বিজাতীয় বিন্যাস তার একটা কারণ হ'তে পারে।

জীবনানন্দ দাসের কবিতার বিরুদ্ধে, 'সাতটি তারার তিমির'-এর একটি সংকীর্ণ অধ্যায় ছাড়া দুর্বোধ্যতার অভিযোগ নেই, আর সাতটি তারার তিমিরে দুর্বোধ্যতার হেতু ভাষা নয়, কবিতারই এক স্বতন্ত্র কলাবিধি। কিন্তু কবিতা যদি দুর্বোধ্য না হয়, তার আবেদন যদি অটুট থাকে, তবে তার ভাষার বিরুদ্ধে বিজাতীয়তার অভিযোগ টিকতে পারে না।

তবু কবিতার ভাষা বিচারে এ প্রশ্ন উঠবেই যে জীবনানন্দ যে ভাষায় কবিতা লিখেছেন তা দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাঁর বা আমাদের কারো মুখ থেকে উচ্চারিত হয় কি না। এ ভাষা এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি-মনের ভাষা, ব্যক্তির অনুভবের ভাষা, যে ইংরাজীতে পড়েছে, ভেবেছে। ইংরাজী মননে মানুষ হয়েছে এমন এক বাঙালী শিল্পী যেন ইংরাজী কবিতার আশ্চর্য স্বাদু অনুবাদ করেছেন এই মনে হবে প্রায়শ তাঁর কবিতা প'ড়ে। অনুবাদই বলবো—কারণ ভাষান্তরিত হওয়ায় তার প্রকৃতি পাল্টায়নি। ভাষার সেই বিশিষ্ট প্রকরণটি এখানে পরিত্যক্ত যাতে স্বচ্ছ বাংলা হয়।

কিন্তু কবিতার তাতে কোনো ক্ষতি হয়েছে কি? কবির কাজ পাঠকের স্তিমিত

চেতনাকে নাড়া দিয়ে হৃদয় এবং প্রকৃতি, বিশ্বের অন্তর্লোক আর বহির্লোক সম্পর্কে সজ্ঞান ক'রে দেওয়া। ক্লাসিক্যাল রীতির প্রবক্তারা তাই ভাষাকে বিজাতীয় ও স্বতন্ত্র ক রে তুলতেই পরামর্শ দেন। বাস্তবিক কবিতাতে ভাষারীতির ততটুকু পংক্তি-লঙ্ঘন মার্জনীয়—এমনকি প্রত্যাশিত, যাতে ভাবের পরিস্ফূর্তি সম্ভব হয়। কবিতায় আমরা একটু কৃত্রিমতা, একটু স্বাতন্ত্র্য, ভাষার একটু নূতন চাল আশা করি ; গদ্যে তা সহজে বরদাস্ত হয় না। জীবনানন্দের বাংলা গদ্য এবং বাংলা কবিতা পাশাপাশি রেখে বিচার করলে দেখা যাবে উভয়েই একই আধারে তৈরি, কিন্তু কবিতায় যা স্বাদু ব'লে গণ্য হয়েছে গদ্যে তাই তিরস্কৃত হবে।

"এই রকমেই চলেছে—অনেক কাল থেকে থেকে ; এবং কবিমানসের প্রমত্ততা বা তার মহাভাবনার দৌরাত্ম্য তাকে যতই নিরাবলম্ব ও অস্পষ্ট ক'রে তুলতে চাকনা কেন—পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহাকবিই এই অস্বস্তি বোধ করেছে—জনসাধারণের নিজেদের বাচনরীতির সফল স্বচ্ছতার দাবি সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি ; এ জিনিষ তাকে—তার অন্তরিন্দ্রিয়কে গঠন ক'রে আসছে অনেক আগেকার যুগ থেকে—এমনই ভাবে, যে কবিতা সৃষ্টি করবার সময় সে তার আদর্শ উপায়কে যতটা স্বায়ত্ব মনে করুক না কেন, ততদূর স্বাধীন তা নয়। যে সময় সে বাস করেছে এবং যে সময় বাস করেনি, যে সমাজে কাল কাটাচ্ছে এবং যেখানে কাটায়নি, যে ঐতিহ্যে সে আছে এবং যেখানে সে নেই—এই সকলের কাছেই সে ঋণী। যদিও শিল্প সৃষ্টি করবার সময় এই ঋণ কঠিন উত্তমর্ণের মতন তাকে আক্রমণ করতে আসে না এবং এই জন্যে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল, তবুও ঋণ বিস্মরণের মানুষ কবি নয় ; এ জিনিষ ঋণও নয়, উপায় বরং—মর্মার্থী হ'য়ে বেঁচে থাকবার ; কবির অনুচেতনায় এবং কখনো কখনো কল্পচেতনার ভিতর সঞ্চারিত থেকে তার প্রতিভাকে সাহায্য করছে তার বিশেষ অভিজ্ঞতাকে দূষিত না ক'রে যতদূর সম্ভব পরার্থপর ক'রে তুলতে।"

: মাত্রা চেতনা

ভাষার এমন জটিল বুনন বাংলার চরিত্র লক্ষণ নয়। জটিলতা সব ভাষাতেই থাকে, কিন্তু তার রূপ যদি এমন হয় যে অর্থনির্ণয়ের জন্য পদে পদে হোঁচট লাগে, চেতনাকে সদাসর্বদা সতর্ক রাখতে হয় পাছে কোথাও কোন বক্তব্য ঘুলিয়ে হারিয়ে যায়—তবে সে ভাষাকে বিজাতীয়ই বলতে হবে। এমন অস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এমন অস্বচ্ছ লেখা বেশিক্ষণ পড়া কঠিন। মন ক্লান্ত হয়। লেখক মাতৃভাষায় লিখলে এবং পাঠক মাতৃভাষায় পড়লে এ বিড়ম্বনা কেন হবে ভাবতে আশ্চর্য লাগে। অথচ এই লেখাটিকেই মনে মনে ইংরাজীতে তর্জমা ক'রে নিলে হয়তো তেমন কঠিন ঠেকবে না। মানি,

সমালোচকের পরিভাষা যথাযথ ও সংহত হওয়া দরকার, কিন্তু ভাষাকে ক্লিষ্ট ক'রে নয়। জীবনানন্দের ভাষার ক্লিষ্টতা শুধু অর্থসংহতির জন্য নয়, ভাষার যে বিজাতীয় চাল রয়েছে তার জন্যেই। তিনি ইংরাজী মননে ভেবেছেন, বাংলা শব্দে সেই ভাবনা সাজিয়েছেন, বাংলা ভাষা-প্রকরণ মানেন নি। এখানেই তাঁর ব্যর্থতার সূত্রপাত। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে বক্তব্য কম। চিন্তার ভিতর একটা অগোছালো ভাব। ব্যাপ্তি অল্প। যদিও বেশ গভীর অনেক জায়গায়। সহৃদয় এবং দুঃসাহসী। শব্দ-প্রয়োগের যাথার্থ্য সম্পর্কে তীক্ষ্ণ-সজাগ। এই শেষ সংগুণটিও ভাষার প্রসাদগুণ বাড়াতে সাহায্য করেনি। অবশ্য সাহিত্য আলোচনার পরিধি ছাড়িয়ে জীবনানন্দ যখন সাধারণ বিষয়ে, প্রবন্ধ লিখেছেন, চিঠিপত্র লিখেছেন, আত্মস্মৃতিময় আলোচনা করেছেন তখন এই ইংরাজী নানান ভাবনার রীতিতে এই রকম অজস্র clause কণ্টকিত পদ্ধতিতে লিখতে আর দেখা যায় না তাঁকে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

"ইংরেজি চলে যাচ্ছে। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা। ভারতীয়দের তা শিখতে হবে। ইংরেজীর তুলনায় হিন্দী ঢের অশক্ত ভাষা—গরীব সাহিত্যের। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের ছোট বড় ব্যাপারে হিন্দীতে অনর্থক সাচ্ছন্দ্যে চলতে হবে বলে এ ভাষা এখন থেকে হয়তো সমস্ত দেশেরই বোধবুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার আশ্রয়ে তৈরী হতে থাকবে। এ ভাষার সম্ভাবনা কতদূর আমি এখনই ঠিক কিছু বলতে পারছি না। তবে হিন্দীও সংস্কৃতের মত বড় ভাষার থেকে জন্মেছে। ফার্সীর কাছেও ঋণী।"

: **বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (দেশ)**

আষাঢ় এসে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু বর্ষণের কোনো লক্ষণই দেখছিনে। মাঝে মাঝে নিতান্ত 'নীলোৎপল পত্রকান্তিভিঃ কচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভৈঃ' মেঘমালা দূর-দিগন্ত ভরে ফেলে চোখের চাতককে দু'দণ্ডের তৃপ্তি দিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই আবার আকাশের 'মেরুলীন ভেকেন্সি', ডাক পাখির চীৎকার, গাঙ শালিকের পাখার ঝট্‌পট্‌, মৌমাছি গুঞ্জরণ—উদ্দাম অলস নিরালা দুপুরটাকে আরো নিবিড় ভাবে যে ভরে তুলবে।

: **অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে লেখা পত্রাংশ**

কিন্তু এই সহজ সাবলীল সারল্য 'কবিতার কথা' বইতে খুবই দুর্লভ।

কিন্তু কবিতাতে এই একই রকমের জটিলতা একটা অস্পষ্ট ব্যঞ্জনার আভাস সৃষ্টি করেছে ব'লেই তার আবেদন আলাদা। প্রবন্ধ-পাঠকের মূল বক্তব্যটা বোঝা চাই—যা এই বক্তব্য বুঝতে বাধা সৃষ্টি করে তা প্রবন্ধের দোষ। কিন্তু কবিতায় বক্তব্যের প্রাধান্য নেই। ছন্দ, ধ্বনি ও রূপ অনুভূতির সঙ্গে মিশে যে আবহ গ'ড়ে ওঠে তাই কবিতায় আস্বাদ্য। তাই সেখানে অভিযোগ উঠবে না। 'মানুষের মৃত্যু হ'লে' নামক বিখ্যাত কবিতায় রয়েছে—

ফসলের পরিবর্তে মানুষের শরীরে মানুষ
গোলাবাড়ি উঁচু ক'রে রেখে নিয়তির
অন্ধকারে অমানব ;
তবুও গ্লানির মতো মানুষের মনের ভিতরে
এই সব জেগে থাকে ব'লে
শতকের আয়ু—আধো আয়ু—আজ ফুরিয়ে গেলেও এই শতাব্দীকে তা'রা
কঠিন নিস্পৃহভাবে আলোচনা ক'রে
আশায় উজ্জ্বল রাখে ; না হ'লে এ ছাড়া
কোথাও অন্য কোনো প্রীতি নেই।

: মানুষের মৃত্যু হ'লে

এখানে আরো জটিল আরো, তরজমা মতো দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া যেত। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। একটি শ্রেষ্ঠ সাবলীল কবিতা থেকেই এই উদ্ধৃতি তোলা হ'লো। একদা আদি আধুনিক কবি মধুসূদনের ভাষা সম্পর্কেও বিজাতীয়তার অভিযোগ উঠেছিল কিন্তু যুগপরিবেশ ও ভাষার পরিণতির বিচারে জীবনানন্দের বিরুদ্ধে যুক্তি তীক্ষ্ণতর হবে। হয় এ অনবহিতি, নয় স্বেচ্ছাচার—এমন তর্কও এড়ানো যাবে মনে হয় না। এখানে আবার স্মরণ করানো ভালো আমাদের বক্তব্য প্রবন্ধের ভাষার বিরুদ্ধে, কবিতার ভাষা সম্পর্কে নয়।

অথচ অনায়াস বাংলা লেখা যে জীবনানন্দের আয়ত্বের মধ্যেই ছিল তার প্রমাণ তাঁর গল্পে র'য়ে গেছে। অত্যন্ত সহজ ঘরোয়া ভাষার আধারে দেশজ বিদেশাগত, শ্লীল, অশ্লীল, সব শব্দ আশ্রয় ক'রেই সংলাপে, বর্ণনায়, মনোবিশ্লেষণে সর্বত্র তিনি এই ভাষাকে স্বচ্ছন্দ ক'রে তুলতে পেরেছেন।

'ডক্টর সেনকে কত দেওয়া হবে ?'

'দশহাজার ওয়ার্ডস্', ঘোষ বললে, 'শ-দেড়েক পাবে। কারণ, গুণে দেখলে ওসব প্রবন্ধে বড় জোর তিন-চার হাজার ওয়ার্ডসের বেশী দম থাকে না লেখকের ; বাকিটা সব কাঁথা সেলাই আর মুড়ি ভাজা—'

'সেন এই রকম লিখছেন বুঝি আজকাল ?'

'সব শালাই লিখছে—ধানাই-পানাই ফেঁদে গলায় গামছা দিয়ে টেনে চেক আদায় করতে পারলে লিখবে কে হে। লেখা ! লেখা তো মামদো হয়ে উঠছে।'

'কিন্তু সেন দেড়শোতে রাজী হবেন বলে মনে হয় না।'

'এখন হবেন; জানেন তো হাডসন নেই; বাঙালী লিখছে, বাঙালী টাকা দিচ্ছে। এক-শোও দেব না সেনকে; পঞ্চাশ দেব কিনা, ভাবছি; পঁচিশেও রাজি করাতে পারব।' ঘোষ ট্রাউজারের পকেট থেকে পাউচ বের করে বললে। টেবিলের উপর পাইপ ছিল, পাশে পাউচ রেখে দিয়ে বললে, 'আপনি প্রুফ দেখুন গিয়ে—আমিই যাব সেনের কাছে।'

: বিলাস/অনুক্ত

শুধু সংলাপেই নয়, বর্ণনার বা আত্মচিন্তার ভাষাতেও এই স্বচ্ছতা রয়েছে।

"পৌষের রাত প্রায় তিনটে হবে। কলকাতায় এবার শীত পড়েছে খুব। শান্তিশেখর যে ঘরটায় থাকে সেখানে দিনের বেলায় খুব কম রোদ পড়ে বলেই রাতে খুব প্রখর ভাবে ঠাণ্ডা। কুঁকড়ে-মুকড়ে নিজের অজ্ঞাতসারে অবোধ ভাবে ছেঁড়া লেপ জড়িয়ে শুয়ে আছে সে। বাইরে কোথাও জল ঝরার শব্দ—প্রায় সারা রাতই শুনতে পাওয়া যায়; কার বিরাট চৌবাচ্চা ভরছে হয়তো—কিম্বা অন্যমনস্ক ভাবে কলখুলে রেখে গেছে কেউ—হয়তো রসাতলবাহী পাইপের জলধারা রাতের নিস্তব্ধতায় মানুষের আধোঘুমের কাছে ছলছলিয়ে চলকে ছলছলিয়ে কোথার থেকে কোথায় চ'লে যাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন। না, তা নয়। তা যদি হ'তো, তা হলে কোলকাতার মাটি ও দেওয়ালের ভেতরের পাইপগুলোতে কত যে জলদেবী ধরা পড়ত। আধাঘুমন্ত মানুষের হৃদয় এমন নির্জন রাতে দেবিকাকেই চায় তবুও: জলের থেকে উঠে আসুক—উঠে আসুক রাস্তার শামদানের বিদ্যুতের থেকে। কিন্তু কেউই এল না। ঘুমিয়ে পড়ল শান্তিশেখর আবার। বাকি রাতটা কতকগুলো হিজি বিজি হাড়-হাভাতে স্বপ্ন দেখল সে। দিনের বেলা কোন স্বপ্নের কথাই মনে রইল না তার। তার শরীর তাকে বুঝিয়ে দিল রাতে ভাল ঘুম হয়নি—ক্যাজা শরীরটা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকবারও উপযুক্ত নয়—অথচ সারাদিন তাকে লাফিয়ে নেচে রণপায়ে ছুটে ঝকমারি করতে হবে।

: ঐ

এই ভাষা সম্পর্কে অভিযোগ থাকা উচিত নয় কারো। অথচ এ ভাষাও চিরাচরিত নয়—সাধারণ নয়। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া—যাকে বলে 'ষ্টাইল'—এই ভাষার আছে। অথচ প্রথমোধৃত প্রবন্ধের ভাষার দুরূহতা এখানে নেই।

মনে হয়, গল্পের বিষয় জীবন থেকে আসে তখন এক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন তিনি। কিন্তু যখন তা মননে পরিশ্রুত হয়ে দেখা দেয় তখন তিনি এক স্বতন্ত্র

শিল্প-ব্যক্তিত্ব। ইংরাজী সাহিত্যের পরিমণ্ডলে সেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে তাই তার অভিব্যক্তিই আলাদা। জীবনানন্দের রচনায় সেই শিল্পী-ব্যক্তিত্ব কি ভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, 'ঝরাপালক' থেকে শুরু ক'রে পর্যায়ক্রমে সেই পরিণতির স্তরগুলি দেখানো যায়—কিন্তু আমাদের আলোচনায় বর্তমানে তার অবকাশ নেই।

শব্দ

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের চর্চায় যেমন বহিরঙ্গ পর্যবেক্ষণের পরেই আসে অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ, ভাষা বিচারেও তেমনি সাধারণ পর্যালোচনার পরে দরকার পুঙ্খানুপুঙ্খ শব্দ-বিশ্লেষণ। আমরা অবশ্য শব্দ-তত্ত্বের স্থূল আলোচনায় নামবো না। বরং সেই সমস্ত বিষয় ও লক্ষণগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচনা করবো যা কবির মনোজগতের ভূসংস্থান নির্ণয়ে পর্যাপ্ত আলোকপাত করবে।

প্রাচীনেরা বলতেন, শব্দই ব্রহ্ম। কারণ, তাঁরা মনে করতেন, শব্দ অপরিবর্তনীয়, অজর ও অক্ষয়। সুতরাং শব্দ পরিবর্তন বা নামভেদ রূপভেদেরই নামান্তর। কৃষ্ণই কানু, গোপাল, গোবিন্দ, দ্বারকানাথ, যশোদানন্দন বা রাধারমণ বটে, কিন্তু নামান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধ্যানে এঁদের রূপ পাল্টায়। তাই সাধক কখনোই নামান্তর আশ্রয় করবেন না, তাঁর আরাধ্য দেবতার রূপ ভিন্ন নামে ফুটবে না।

আমরা ধর্মের সাধক নই, সাহিত্যের রসের সন্ধানী। তবু অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে শব্দের এই অপরিবর্তনীয়তার তত্ত্বে আমাদের আস্থা আছে। প্রত্যেক শব্দের একটি ধ্বনিমূল্য থাকে, এক স্বতন্ত্র ভাবানুষঙ্গ থাকে। অভিধান থেকে তার অর্থান্তর তুলে দিলে সেই ধ্বনিমূল্য সেই ভাবানুষঙ্গটি আর পাওয়া যায় না। তার স্থান অধিকার করে স্বতন্ত্র এক ধ্বনি, পৃথক এক ভাবানুষঙ্গ। এই কারণেই ভালো কবিতার কখনো ঠিক ঠিক অনুবাদ হ'তে পারে না। প্রতিটি ভাষার এবং প্রতিটি শব্দের একটি বিশিষ্ট চরিত্র থাকে। এই সব মিলে ভালো কবিতায় যে ভাবাবহ গ'ড়ে ওঠে তাকে ভিন্ন শব্দে ভিন্ন ভাষায় অক্ষুণ্ণ তরজমা করা যায় না।

যেমন বাংলা ভাষার কথাই ধরা যাক। এর প্রকাশ-শক্তির মধ্যে বলিষ্ঠতা যতখানি তার চেয়ে লালিত্য বেশি। কর্কশ নির্মম কোনো ভাব উপযোগী গাম্ভীর্য ও সঙ্গতি বজায় রেখে এ ভাষায় সুষ্ঠু ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। এর স্বভাবটি কোমল, আস্বাদ মিঠে মিঠে। এর মেরুদণ্ডটাই দুর্বল; তাই দৃঢ়তার অভাব কিছুতেই যেন দূর হ'তে চায় না। ভাষার এই চরিত্র, তার উত্তরাধিকার—এই সব মিলে ভাষার

এমন এক পৃথক পরিমণ্ডল রচনা ক'রে যেখানে বক্তব্য ঘিরে ব্যঞ্জনার এক জ্যোতির্বলয় গ'ড়ে ওঠে—তার প্রাধান্য অনেক সময়ে ভাবগত অর্থ থেকে বেশি।

এই ভাবেই প্রতিটি বড় কবির হাতে নিজের এক শব্দভাণ্ডার, এক স্বতন্ত্র পরিভাষা গ'ড়ে ওঠে। নিজের বিশিষ্ট-ভাবনার উপযোগী শব্দগুলো ভাষা থেকে বেছে নেন ব'লে চিরাচরিত কবিভাষা থেকে তাঁরা দূরে সরে আসতে বাধ্য হন। কথায় এবং কাব্যে অপরিজ্ঞাত নূতন শব্দ তাঁরা আবিষ্কার করেন, বিদেশী ভাষা থেকে আহরণ করতেও সঙ্কোচ করেন না; প্রচলিত, গ্রাম্য, শ্রুতিদুষ্ট শব্দকেও নূতন অর্থমূল্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ কবিতার বিষয়বস্তুর সাথে সাথে ভাব পরিমণ্ডলকেও নূতন না ক'রে তাঁদের তৃপ্তি নেই। যাঁর মধ্যে এই স্বকীয়তার চেতনা যত উগ্র তার শব্দভাণ্ডার তত বিশিষ্ট হ'য়ে থাকে। বাংলার আবহমানের কবিভাষা তাই মধুসূদনের কাজে আসেনি; নিজের নূতন শব্দ-প্রকরণ তাঁকে সৃষ্টি ক'রে নিতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কাজ হয়নি মধুসূদনের পরিভাষা নিয়ে।

শব্দেরও একটা রূপ আছে। মধুসূদনের ভাষার কথা মনে করলে মনে হয় রুক্ষ তীক্ষ্ণ চিক্কণ সুউচ্চ কালোপাথরের রূপ যেন! রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল আলোকিত শ্যামল সুরভিত মঞ্জরিত বনবীথি থেকে আদিম উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ-চাঞ্চল্যে বর্বরের মতো বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন আধুনিক কবিরা। নজরুল ইসলামের শিকলছেঁড়া উদ্দামতা আর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আন্‌কোরা রুক্ষ মরুময়তার যুগ সেটা। আরবী ফারসী শব্দের প্রাচুর্যে ভাষাকে জোরদার করা, অমার্জিত গ্রাম্য সংলাপের ভাষা দিয়ে কবিতার মধ্যে নূতন মেজাজ আনার চেষ্টা সেদিনের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবনানন্দের প্রথম আমলের লেখাতেও তাই আরবী ফারসী ও দেশজ শব্দের প্রাচুর্য। তবু নজরুলের মতো বর্বর-বলিষ্ঠতা নেই। 'ঝরাপালক'-এর শব্দ-ভাণ্ডার এক ম্লান, বিষণ্ণ, শ্লথ, প্রায়ান্ধকার, ক্লিন্ন জীবনের আবহ তুলে ধরে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র জগৎ আবার ভিন্ন —যেন এক অলস, উচ্ছল, মদির, আলোছায়াচ্ছন্ন বিকেলের ছবি, 'বনলতা সেন' যেন শুভ্র, স্নিগ্ধ, আলোকিত, রক্তাক্ত ভোর, 'সাতটি তারার তিমির' যেন যুদ্ধ-মৃত্যু-সমাকীর্ণ নাগরিক রাত্রির মত্ততা। আবার পরিণতির শেষ স্তরে কবিতার ভাষা যেন প্রৌঢ় বলিষ্ঠ উদ্ভাসিত রৌদ্রময় দিন।

'ঝরাপালকে' ব্যবহৃত ফারসী ও আরবী শব্দের প্রায় সবই বাংলা ভাষায় ঐতিহ্য সূত্রে এসেছিল। কারণ ফারসী ভাষা একদিন এদেশের দরবারী ভাষা ছিল। ফারসীর চর্চা উঠে যাওয়ার পর থেকে এই বলিষ্ঠ ভাষার অপর্যাপ্ত শব্দ-সম্ভার আমাদের আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাচ্ছে। অথচ এর শব্দের ধ্বনির যে জোর রয়েছে তাকে ব্যবহার করতে পারলে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও ঋজু ক'রে তোলা যায় কবিতার বক্তব্যকে। এ তথ্য

নজরুল ইসলামের জানা ছিল। তাই তাঁর সিদ্ধিও অনেক বেশি উল্লেখনীয়। কিন্তু জীবনানন্দ ততখানি সার্থকতার সঙ্গে এ ভাষার শব্দকে ব্যবহার করতে পেরেছেন মনে হয়না। তাঁর হাতে আরবী ফারসী শব্দ একটা নূতন আবহ গ'ড়ে তুলতে, একটা ভিনদেশী পরিবেশ রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র, বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে যেমন হ'তো। এর পিছনে অন্তরের তাগিদ ছিল না ব'লে 'ঝরাপালকে'র পরে যখন তিনি স্বভাবের উপযোগী কবিভাষা খুঁজে পেয়েছেন, তখন আর এসব শব্দ দেখা যায়নি বড় একটা। আমরা কয়েকটি মাত্র শব্দকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছি। আরবী শব্দ ফারসী ভাষার মাধ্যমে এসেছে ব'লে সেগুলিকে পৃথক করা হ'লো না।

আখের, আশান, আশেক, ইদ, ইদগাত, ইবলিশ, ইয়োসোফ, কলেজা, কাফের, খুন খারাবী, খবরদারী, খুশরোজী, খেয়ালখুশ, খেলাপ, খোশ, গজল, গুলজারিয়া, জবান, জাজিম, জিঞ্জির, জিন, জৌলস, তখত, তসবী, তালাস, দরাজ, দরিয়া, দস্তর, দিওয়ানা, দিলদার, দিলাওয়ার, দুষমন, নহবত, নিরিখ, পশমিনা, পেয়ালা, ফকির, ফরাশ, বান্দা, বেদুইন, বেহুঁশ, মশগুল, মশলাদার, মসুদ, মস্তানা, মীনার, মুয়াজ্জেন, মুসল্লা, মুসাফের, মেজাজ, রবার, রোজা, রোশনাই, শাহদারা, সরাই, সরাবখানা, সাকী, সোয়ার।

কিন্তু 'ঝরাপালকে'ই তাঁর হাতে তদ্ভব ও দেশজ কথ্য শব্দের ব্যবহার আরো চমকপ্রদ। আগুনদানা, উপাসী, ফোঁফরা, জ্যান্ত, দানোয় পাওয়া, রাতবিরেত, ফাগুয়া, মিঠা, পোষলা, পিলাই, সোয়াদ, সাঙ্গাত, হাপর ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার শুধু সেই আমলের পরিপ্রেক্ষিতে দুঃসাহসিক নয়, আজও এগুলিকে কবিতাতে অস্বস্তিকর বা গ্রাম্য মনে হবে। অথচ প্রয়োগের নিপুণতায় এতে এমন চরিত্র ফুটে উঠেছে যাকে অমার্জিত কিছুতেই বলা যায় না।

ক্রিয়াপদ ব্যবহারেও জীবনানন্দ এই গ্রন্থে নূতন পথে নেমেছেন। এসেছিল, নেমেছিল, গেছিল, বসল, কাঁদছে, ফোঁকাস, দিলেম, রেখেছে, ডাকলে, কেটেছে, দেখিনি, পেয়েছি, খুঁজে, যাচ্ছে, ঘুরছিল প্রভৃতি কথ্য সংক্ষিপ্ত বা অভিশ্রুতিজাত ক্রিয়াপদ জীবনানন্দের হাতে বেশ অস্বাভাবিক মনে হবে; কেন না পরবর্তীকালের কবিতায় আমরা শুধু দীর্ঘ ক্রিয়াপদ দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি। তেমন ক্রিয়াপদও— যেমন, ভুলিবে, চিনিবে, যেতেছে, খুলিয়া, ডাকিয়া ইত্যাদি অল্প স্বল্প পাওয়া যাবে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'ঝরাপালকে'র কিছু কিছু ক্রিয়াপদ বা বাগ্‌বিধির ব্যবহারে বরিশালের বিশিষ্ট বাগ্‌ধারার নিদর্শন আছে।

১। নাচতে আছিস আকাশ থানার গোখরো ফণার নীচে,

২। চলতে আছিস,—দ'লতে আছিস,—জ্বলতে আছিস ধূ-ধূ

প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত, পরবর্তীকালের লেখাতে কোথাও কোথাও বরিশালের বিশিষ্ট উচ্চারণভঙ্গি এবং বাক্যরীতির ছাপ দেখা যায়। যেমন, 'অইখানে' তাঁর কবিতায় বহুল ব্যবহৃত। 'ঘুমে' বা 'চুপে' শব্দকে নামধাতু হিসাবে প্রয়োগ করতে আর কাউকে দেখা যায় না। এমনি 'বাহিরে ঘুরিতে আছে,' 'ঘোড়া চড়ে কই যাও হে রায় রায়ান,' 'কত বীজ কলায়ে গিয়েছে,' ইত্যাদি স্মরণ যোগ্য।

'ঝরাপালকে' ক্বচিৎ অরুন্তুদ, উদধি, উরস যোনিচক্রস্মৃতি ইত্যাদি অনতিপ্রচলিত তৎসম শব্দের ব্যবহার হ'লেও পরবর্তীকালে এদিকে তাঁর উৎসাহ ও অন্বেষণ অনেক বেড়েছে। চার, পাঁচ, ছয়, কি তার চেয়ে বেশি অক্ষরের সংস্কৃত শব্দ বা সমাস-নিষ্পন্ন পদ সাধারণত কবিরা যা নাড়াচাড়া করতে বিব্রত বোধ করেন ব'লেই পাশ কাটিয়ে যান সেই সমস্ত শব্দ সম্পর্কেই জীবনানন্দের বিশেষ প্রবণতা ছিল। বাস্তবিক, এই সব শব্দের অর্থের দুরূহতা এবং গদ্য স্বভাব দেখে কবিতার পক্ষে অনুপযোগী মনে হ'লেও জীবনানন্দ ব্যবহার ক'রে প্রমাণ করলেন কবিতার কোনো স্বতন্ত্র পরিভাষার দরকার নেই, যে কোনো শব্দ ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে কবির হাতিয়ার হ'য়ে উঠতে পারে। কবিতার রসানুভবের জন্য পাঠকের পক্ষে সব শব্দের অর্থ জানারও প্রয়োজন হয় না। নমুনা হিসাবে কয়েকটি শব্দ রাখছি।

অকুতোভয়তা, অক্ষিগোলক, অগ্নিপরিধি, অনন্বুতপ্ততা, অনন্যোপায়, অনুকল্প, অনুপ্রাণনা, অনুসূর্য, অবাচী, অভিভাবিকা, আনুপূর্ব, অতিবৈতনিক, আস্ফোটে, ঈপ্সিত, উৎসরণ, উদীচী, উপস্থাপয়িতা, ঊর্ণা কঙ্কাল, কিন্নরকণ্ঠ, ক্রমমুক্তি, চর্মচক্ষুস্থির, তিতীর্ষু, দণ্ডীদের, দিৎসা, নভোচারী, নিরুৎকীর্ণ, নির্দেশবশতঃ, নিশিত, নিস্তেল, প্রতিপন্ন, প্রধূমায়মান, প্রসববেদনা, প্রামানিক, বিমান, বিস্তীর্ণতায়, ভবিতব্যতা, ভূয়োদর্শী, ভ্রান্তিবিলাস, ভ্রূণ, মুখপাত্রী, মৈথুনকাল, ম্লানায়মান, রিরংসা, রোল, শ্রুতিবিশোধন, সঙ্ঘারাম, সংপ্রসারণে, সময়গ্রন্থি, সময় সুখ্যাত, সূর্যকরোজ্জ্বল, সূর্য-তাড়সে, স্বর্গতি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে তাঁর কবিতার ক্ষেত্র গদ্যের চরণভূমিতে স্বাধীনতা পেয়েছে তবু তা গদ্য নয় কিছুতেই—এক অলক্ষ্য যাদু পর্দার ব্যবধান পাঠককে সর্বদা অনুভব করতে হয়।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও তার পরের কাব্যগ্রন্থগুলিতে দেশজ শব্দের ব্যবহার কম নয়। শব্দগুলির বিশেষত্ব তার প্রয়োগের অপূর্বতায়।

সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা,—শাদা,—বরফের কুঁচির মতন!
তাহাদের মুখ চোখ ভিজে,—

ফেনার শেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল!
কাঁচের গুঁড়ির মত শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে!

: **পরস্পর**

সেই যুগে 'শাদা' অথবা 'শরীর' শব্দের ব্যবহারে যে বিস্ময়কর অভিনবত্ব ছিল তা নিয়ে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু 'কালের পুতুল'-এ মনোরম আলোচনা করেছেন। আমরা বরফের কুচি, কাঁচের গুঁড়ি, শেমিজ এই শব্দগুলির ব্যবহার দেখতে বলবো। এমনি আইবুড়, আচলের খুঁট, আঁচ, আঢুল, আঁশটে, উজাগর, উপছায়ে, উম, কুটুম্বিনী, কুলুপ এ'টে, কুঁজ, কুঁড়েমি, ক্বাথ, খুঁজি, গলগণ্ড, গিরেবাজ, ঘেসেড়া, চুলের ঝুঁটি, ছানি, ছিড়ে ফেড়ে, ট্যাক, ঠ্যাঙের তুরকে, ডিম, তালাসে, তেপান্তরে গল্প, থুতনি, থ্যাতা, দিনমান, দেশোয়ালি, নিকেশ, নুলো, পরানকথা, পাখিপাখালি, বেনোজল, বিয়োবার, মানুষী, মাংস, রগড়, লাবনি, শরীরে ননীর ছিরি, শাখচুন্নী, হাটুভর, হাড়-হাভাতে—এই সব শব্দ আমাদের চেতনায় সদ্য পরিচয়ের এমন বিস্ময় চমক দেয় যে কখনো অস্বস্তি আসে, কখনো বিমুগ্ধ হ'তে হয়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত জায়গায় অপপ্রযুক্ত মনে হয় না কখনো। জীবনানন্দের পাঠক সমাজের, তা সে আজকের হোক, অথবা এক বা দুই দশক আগে যখন কবিতাগুলো লেখা হচ্ছিল তখনকারই হোক—এই অনুভূতি এত পরিচিত যে এর উল্লেখই বাহুল্য বোধ হয়।

শব্দের সন্ধান শুধু নয়, শব্দের প্রয়োগেও জীবনানন্দের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। শব্দের সঙ্গে শব্দের অপ্রত্যাশিত অন্বয়ে যে বিস্ময়রসের সৃষ্টি হয়, শব্দের মৃত শরীরে যেভাবে প্রাণ জেগে ওঠে তা বুঝে সুচতুর ব্যবহারে কবিরা কবিতায় রসের উন্মেষ ঘটাতে পারেন। জীবনানন্দ ঠিক এই ভাবেই যখন লেখেন এক মাইল শান্তি কল্যাণ, গ্রাম পতনের শব্দ, ব্রহ্মাণ্ডের কারুশিল্প লোক, শত শত স্ফীত খোঁপার প্রেমিকা নারী, ছিপছিপে ধূর্ত মোমের আলো তখন শব্দযোজনার জাদুশক্তির পরিচয় পাই। আবার কোনো কোনো শব্দের প্রয়োগ নৈপুণ্যে বাংলার প্রাচীন চিরায়ত অথচ হালে পরিত্যক্ত প্রিয় বাক্‌রীতি তুলে ধরেছেন। যেমন,

১। মুখের রূপ **ঠায়** ভালবেসে
২। পাঁচ সাত **ধনু** দূরে
৩। **খিঁচড়ে** ওঠে খচ্চরের মতন
৪। **ভোভোমির** অতল ক্রেঙ্কার

শেষ শব্দটি জীবনানন্দ কেমন অবলীলায় সৃষ্টি ক'রে নিতে পারলেন! ডোডো নামের পরিলুপ্ত পাখিটির সঙ্গে বাংলার তদ্ধিত প্রত্যয়ের সংযোগে প্রত্যাশিত তাৎপর্যও এসেছে সুন্দর।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাংলা ভাষারীতির আরেক সম্পদ। ভারতচন্দ্র থেকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অবধি বা তার আগে পরেও বহু কবি এর প্রয়োগের পারদর্শিতায় বাঙালী পাঠকের হৃদয় জয় করেছেন। সাম্প্রতিক কালের কবিরা উন্নাসিক দৃষ্টিতে সে সব কবিতাকে তাচ্ছিল্য করতে পারেন কিন্তু প্রবুদ্ধ যিনি, তিনি জানেন সে সম্পদ অবহেলার যোগ্য নয়। জীবনানন্দও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে সিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু এই দিকে অতিরেক নয়, সংযমই যে কবির পক্ষে কাম্য রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি তা জানতেন ও মেনে চলতেন। এদিকে তাঁর সাফল্যের দু-একটি নিদর্শন—

১। বুনো হাঁস পাখা মেলে—শাঁই শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার

২। পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড় কড়!

৩। ফিক করে হেসে

৪। টসটসে ভিজে জামরুল

আরো কিছু শব্দ যেমন—ঝিকমিক, চ্ছল চ্ছল শব্দ, ঝিলিক, রলরোল, খলখল, অন্ধকার, টুপটাপ, ঝরে ঝরঝর। অথবা এই শব্দগুলি—হেঁচকা, লিকলিকে, হিঁচড়ায়, ছিমছাম। অথবা এমন বর্ণজ্ঞাপক শব্দ—ফুটফুটে, ধবধবে। অথবা শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ, যেমন—উড়ুউড়ু, খড়িখড়ি, খিঁচেখিঁচে চুনচুন, এইসব শব্দে জীবনানন্দের সিদ্ধি বিস্ময়কর মনে হবে। একটি কবিতায় শব্দের অর্থহীন উল্লাস ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে—

> পৃথিবীর কাছে আমাদের
> সব কথা—সব কথা বলা
> ডাভেন্টি্ ডোমেই টাসে ষ্টেফানিতে
> যুদ্ধ শান্তি বিরতির নিয়তির ফাঁদে চিরদিন
> বেঁধে গিয়ে ব্যাহত রণনে
> শব্দের অপরিমেয় অচল বালির—
> মরুভূমি সৃষ্টি করে গেছে;

: অনির্বাণ

শব্দের অপরিমেয় অচল বালির যে মরুভূমি মানুষ সৃষ্টি করেছে আর পরিস্ফুট করতে এই সহজ সুবোধ্য কবিতার মধ্যে ধ্বনির এই বিচিত্র বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

উত্তরকালের লেখায় আর 'ঝরাপালকে'র যুগের মতো—আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের চেষ্টাকৃত অতিরেক নেই। তবু এই বাংলা ভাষার সূচনা থেকে ভাষায়

আগন্তুক শব্দের সম্পদ হারাতেও ইচ্ছুক নন। তার প্রমাণ জমিন, জাঁহাবাজ, জুলপি, বেলোয়ারী, লঙ্গরখানা, শাদা, হুণ্ডি ইত্যাদি ফারসী শব্দ এবং কবর, কুলুপ, খারিজ, তাবিজ, দলিল, মসজিদ, মসলাদরাজ, রেওয়াজ ইত্যাদি আরবী শব্দ তাঁর পরের কবিতায় দেখা যাচ্ছে।

জাফরি শব্দটি উর্দু। বাংলায় বহুল ব্যবহৃত।

জীবনানন্দের লেখায় বিদেশী শব্দের মধ্যে ইংরাজীর ব্যবহারই, সবচেয়ে দুঃসাহসিক ও স্বচ্ছন্দ। "কিন্তু তবু তা আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী কথাবার্তায় ইংরাজীর অহেতুক প্রয়োগের মতো নয়—একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সেখানে যে শব্দ ব্যবহার ক'রে যে ফল আদায় করা হয়েছে অন্য কোনো প্রতিশব্দে সে আবহ গ'ড়ে তোলা অসম্ভব হতো। কামিজের মতো দুটি একটি পর্তুগীজ অথবা এরকম ফরাসী বা রুশ শব্দ যে তাঁর লেখায় নেই তা নয়। সাধারণত এই শব্দগুলিকে ইংরাজী বা অন্য কোনো ভাষার মাধ্যমে পেয়েছি ব'লে এদের নিয়ে পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নেই। আমরা পরিশিষ্টে ভিনদেশী শব্দের একটি পরিপূর্ণ তালিকা দেবার চেষ্টা করেছি।

বিশেষণ

জীবনানন্দের কবিশক্তির অনেকখানি দাঁড়িয়ে আছে বিশেষণের কুশলী নির্বাচন ও চমকপ্রদ প্রয়োগের উপর। অভিনিবেশপ্রবণ কাব্যরসিক মাত্রই মানবেন কবির কবিত্ব সুষ্ঠু ও সুপ্রযুক্ত বিশেষণের মধ্যেও ব্যক্ত থাকে। হৃদয়াবেগে স্পন্দিত হয়ে উচ্ছ্বসিত অতিশয়োক্তিমূলক বিশেষণে আমরা কোন বিষয়ের স্তুতিনিন্দায় মুখর হ'তে পারি কিন্তু প্রবুদ্ধ পাঠকের কাছে সে উচ্ছ্বাস অর্থহীন, এমন কি বাহুল্য বোধে নিন্দিত হ'তে পারে। অতি সামান্য বস্তুকেও কবি সুপ্রযুক্ত বিশেষণে এভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম যে অতিরঞ্জনও আমাদের কাছে অত্যাবশ্যক মনে হবে। আশ্চর্য, সুন্দর, অপূর্ব, অপরূপ, অনবদ্য অথবা কুৎসিত, কদর্য, বীভৎস ইত্যাদি গুরুতর বিশেষণ অযথা প্রয়োগ ক'রে আমরা এদের অর্থ খেলো ক'রে তুলি। বড় কবি নূতন নূতন বিশেষণে বর্ণনাকে আকর্ষণীয় ও রম্য ক'রে তোলেন, তেমনি যথাস্থানে ব্যবহৃত হ'য়ে চিরাচরিত বিশেষণও হারানো অর্থমূল্য ও অবলুপ্ত মর্যাদা ফিরে পায়।

তবু কোনো ভাষার কাব্যধারায় প্রাণবেগ যখন স্তিমিত হয় তখন বিশেষণ সন্ধানের এই নবায়মানতা হ্রাস পায়। নূতন বিশেষণের সন্ধান ও সৃষ্টি পুরানো বিশেষণের মধ্যে নূতন তাৎপর্য আবিষ্কার তখন আর দেখা যায় না। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের

কবিতায় যে জীবন্ত সরল, মর্মছোঁয়া ঋজু বিশেষণ দেখা গিয়েছিল, বিদ্যাপতির মৈথিল পদে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার বিলুপ্ত ঐশ্বর্য থেকে বিশেষণ সন্ধানের যে চমৎকৃতি দেখা গিয়েছিল অথবা গোবিন্দদাস কবিরাজের বিশেষণের নিখুঁত কারুকৃতিতে যে শ্রী ফুটে ছিল তারই নিশ্চেতন অনুবর্তনে পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতা অর্থমূল্য হারিয়েছিল।

বস্তুত, বিশেষণ বহ্নিমান অঙ্গারের মতো। কোনো কবি শব্দের তিমির-গহ্বর থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে প্রতিভার প্রোজ্জ্বল শিখায় জ্বালিয়ে তোলেন, সেই বহ্নি দ্যুতিতে কবিতা ভাস্বর হয়। আমরা পতঙ্গের মতো আকৃষ্ট হই। কিন্তু প্রতিভাহীন পদ্যকারের হাতে পুনঃপুন ব্যবহারে তার না থাকে দাহ, না থাকে দ্যুতি, তাই সেই ভস্মশেষ অঙ্গারপুঞ্জ কাব্যকে উজ্জ্বল করতে পারে না, মসীলিপ্তই করে কেবল। আবার যখন কবি আসেন সেই ভস্মস্তূপ থেকে খুঁজে আনেন দগ্ধাবশিষ্ট অঙ্গারখণ্ড, প্রতিভার স্পর্শে আবার আগুন জ্বলে, নির্ধূম ভাস্বর আগুন।

আধুনিক যুগেও কবিদের সজাগ সন্ধানের শেষ নেই। তাঁদের অতন্দ্র তপস্যা ও নব নব পথনির্মাণের ফলে বিশেষণ সম্পর্কে বৈয়াকরণদের সংকীর্ণ ধারণা আমরা কাটিয়ে উঠেছি। আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি স্বকীয় রূপদৃষ্টি নিয়ে এলে নূতন বিশেষণ রচনা কোনো কবির পক্ষেই দুঃসাধ্য নয়।

কারণ বিশেষণ এ যুগে শুধু গুণ বা অবস্থাকেই ব্যক্ত করে না; এই সব রূপোন্মেষ-শীল মননজীবী বিশেষণ কল্পনাকে দিগন্তবিসারী ক'রে দিয়ে কখনো সমাসোক্তি কখনো আরোপোক্তি কখনো বা চিত্রকল্পে গিয়ে পরিসমাপ্ত হচ্ছে। বিশেষণ প্রয়োগে শিল্পীর সূক্ষ্মতা জীবনানন্দের রচনার সূচনা থেকেই দেখা যায়। বোঝা যায় তাঁর সচেতন শিল্পবুদ্ধি এর পরিণতি সম্পর্কে সজাগ।

আমরা একটি আশ্চর্য পংক্তির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে রয়েছে—

এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু;—আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম্ গাছে,—পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে;

: **শকুন**

'শৃঙ্গ' নয় 'শিঙ' দেওয়াতেই পাহাড়গুলো বুনো মহিষের মতো জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে, তেমনি 'ডানা' শব্দের যোগে পাম্ গাছকে মনে হয়েছে বিরাট পাখির মতো। জড়ের মধ্যে এমন চেতন প্রাণীর ধর্ম কল্পনা সমাসোক্তির মূল লক্ষণ। বিশেষণ না হ'লেও এমন কয়েকটি ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ সমাসোক্তির ভাবব্যঞ্জনা এনেছে যেমন: 'আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি,' 'কাঁকরের রক্ত,' 'রক্তাতিপাতের দেশে,' 'নদীটির শ্বাসে', 'স্নায়ুর

আঁধার', 'লোকোত্তর সূর্যের আমোদে'। আবার এমনি 'অসুস্থ পাতা,' 'ধোঁয়াটে ধারালো কুয়াশা,' 'সবজীর সবুজ রুধির,' ইত্যাদি বিশেষণের প্রয়োগে ইন্দ্রিয়চেতন কবির রূপদৃষ্টি, রোম্যাণ্টিক ভাবকল্পনা ও সজাগ স্বকীয়তার নিদর্শন মিলবে।

'মহাপৃথিবী'তে উপচয়িত বিশেষণ (transferred epithet) বা আরোপোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে। 'কৌতুকী আকাশ' অথবা 'খল খল অন্ধকার' উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এই জাতের অলঙ্কারও কখনো কখনো অচেতন বস্তুতে চেতন প্রাণীর ধর্ম আরোপিত হয় বটে, কিন্তু সমাসোক্তি ও আরোপোক্তি একবস্তু নয়। সমাসোক্তিতে আলোচ্য বিষয়ে বর্ণনার চাতুর্যে অন্য বস্তু বা প্রাণীর ধর্ম আরোপ করা হয় মাত্র, কিন্তু ঐই আরোপিত অলঙ্কারটি বক্তব্যের পক্ষে অনাবশ্যক। কিন্তু আরোপোক্তিতে বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়েরই গুরুত্ব সমান। সেখানে একটি প্রয়োজনীয় বিশেষণ এক স্থান থেকে অন্য একটি বিশেষ্যের পাশে উপচয়িত বা স্থানান্তরিত হয়েছে মাত্র। 'আঁধার বিশাল ডানা পাম্ গাছে' সমাসোক্তিতে পামগাছটিই বর্ণনীয়। 'বিশাল ডানা' বিশেষণটি গাছের মধ্যে পাখির রূপ আরোপ ক'রে পাঠককে চমক দিচ্ছে মাত্র। এটি না থাকলেও কবিতার বক্তব্যের দিক থেকে কিছুই অসুবিধা হয় না। কিন্তু 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে ব্যবহৃত 'প্রতারিত রাজপথ' অথবা 'সাহসিক নগরে বন্দরে' বাক্য দুটিতে 'প্রতারিত' এবং 'সাহসিক' বিশেষণ অন্য অনুল্লেখিত বিশেষ্যের পাশ থেকে ছিটকে এসে যথাক্রমে 'রাজপথ' ও 'নগরে বন্দরে'র পাশে বসে গেছে সুতরাং তা কবির বক্তব্যেরই অন্তর্ভুক্ত এবং অপরিহার্য। এমনি 'বনলতা সেন' গ্রন্থে রয়েছে 'অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন,' 'রক্তক্লান্ত কাজ', 'ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা'।

উপস্থাপন কৌশল ও চিন্তারীতির ঈষৎ পরিবর্তনে সাধারণ মননধর্মী বিশেষণ সৃষ্টি, সেখান থেকে উপচয়িত বিশেষণ এবং সমাসোক্তিতে গতায়াতেই শুধু নয়, যার সূচনায় 'মেধাবী নীলিমা,' 'নিমীল ফসলরাশি,' 'লিপ্ত অভিধান,' 'অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগ,' 'উশখুশু খোপা'—তাই-ই পরিণামে 'স্ফীত মাতাল বেলুন', 'মৌশুমী সমুদ্রের পেট,' 'প্রেমিক চিল-পুরুষের শিশির ভেজা চোখ,' 'আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানা,' 'দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্র,' 'অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাস,' 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা,' 'আকাশের রূপালি শস্য,' 'নিবিড় ঘাসমাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার,' 'খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,' 'সবচেয়ে গোধূলিমদির মেয়েটি,' 'অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু,' 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাস,' 'নির্জনবিমিশ্র চাঁদ,' 'হিম কমলালেবুর করুণ মাংস,' 'সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্র'।

দেখা যাচ্ছে 'বনলতা সেন' গ্রন্থের বিশেষণে চিত্রকল্পগুণ যেমন বেড়েছে তেমনি

একটি দুটি শব্দের মধ্যে আর তা আবদ্ধ থাকছে না। রূপটিকে সম্পূর্ণ ক'রে আঁকতে একের পর শব্দ যোজনা ক'রে বিশেষণকে বিশাল ক'রে তোলা হচ্ছে। কবি-কল্পনার এমন অপরূপ স্ফূর্তি, বিশেষণের এমন অফুরন্ত প্রয়োগ আর কোনো পর্বে দেখা যায় না। স্পষ্টই বোঝা যায় শিল্পৈশ্বর্যের দিক থেকে কবি-কল্পনা এখানে শিখর স্পর্শ করেছে। বিশেষণের এমন দীর্ঘ, নিপুণ রূপময় এবং কল্পনা সমৃদ্ধ প্রাচুর্যের সঙ্গে প্রতিভার উদয়-বিলয়ের যেন একটা অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে। এমনই হ'য়ে থাকে,—এমনই হওয়া উচিত। কবির শিল্পীমন যতই বিকশিত হয় ততই বিশেষণ প্রয়োগ নিপুণতর—আবার প্রতিভার ক্রমাবলুপ্তির পাশাপাশি বিশেষণ প্রয়োগও শিথিল হ'তে বাধ্য।

'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে বিশেষণ অনেকখানি সংক্ষিপ্ত সংহত, কিন্তু ভাব বৈচিত্র্য এবং ব্যাপ্ত পরিণত কল্পনায় বিস্ময়কর। 'নরকের নির্বচন মেঘ,' 'কিচেল পাতাল,' 'দিনের বিশ্রুত আলো,' 'মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ,' 'জাফরান আলোকের বিশুষ্কতা,' 'স্থির শুভ্র নৈসর্গিক কথা,' 'নির্ধূম আনন্দ,' 'একরাশ প্রাদেশিক ঘাস,' 'বড় বিভোর পরিধি,' 'হতমান সোনা,' 'অন্ধকার ডাইনী মাইল,' 'লোল হাস্য,' 'লবেজান হাওয়া,' 'তনুবাত শিখরের প্রশান্তি'। এই সব বিশেষণের মধ্যে যে জগৎ বিধৃত তা 'বনলতা সেন' গ্রন্থের প্রাকৃতিক রূপজগৎ নয়, তা বুদ্ধিদীপ্ত নাগরিক জীবন ও হিংসা-দ্বেষ-কোলাহল আবর্ত সংক্ষুব্ধ পাতাল-পৃথিবীর, যে জগতের প্রতিচ্ছবি ইউরোপের আধুনিক যন্ত্র-স্পন্দিত উপন্যাসের মধ্যে ধরা পড়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এর প্রথম এবং একমাত্র আবির্ভাব জীবনানন্দের মানস-কল্পনায়।

'বেলা অবেলা কালবেলায়' আগের নানা আমলের বৈচিত্র্যের দেখা মেলে, তবু তা ক্লান্তি রক্তে মাখা যেন। বিশেষণের বিশাল প্রাচুর্যও যেমন আছে তেমনি রয়েছে বিচক্ষণ সংহত সুষমা। কিন্তু সব কিছু এখানে 'জন্ম জন্মান্তর মৃত স্মরণের সাঁকো' বেয়ে আসে, সেখানে 'অন্ধঅন্ধকার তুষার পিচ্ছিল এক শোন নদী', 'সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভূকদের রক্তে' ভ'রে যায়, সেখানে ভয়াবহ অন্ধকারে সরু সলতের রেড়ীর আলোর মতো আশাবাদ' আর 'অনর্গল ইচ্ছার ঔরসে সঞ্চারিত উৎসব', সেখানে 'সৃষ্টিবিসারী গান,' 'বালিপ্রলেপী মরুভূমি,' 'বেতসতন্বী সূর্যশিখা,' 'মিশরী শঙ্খরেখা সর্পিল গাগরী,' 'অভিচারী বাতাস', 'জাতকুলশীল সময়,' 'তিমিরবিদারী রীতি' আর 'ধ্বংসমত্ত অন্ধকার'।

শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে গৃহীত পরবর্তী আমলের কবিতায় বিশেষণের সেই অজস্রতা ও কল্পনার সরসতা আর নেই। তবুও কোথাও কোথাও তার চমকপ্রদ বিকাশ দেখা যায়। 'অপব্যয়ী কল্পনার ইন্দ্রত্বের আসন,' 'অবিনাশ দ্বৈপ পরিবার,' 'অনবতুল আমি' ইত্যাদি। তবু এই বৈচিত্র্যের স্বল্পতা সত্ত্বেও অনুভব করা যায় 'সাতটি তারার তিমিরে'র সেই সঙ্কীর্ণ গহ্বর চেতনালোক ক্রমশ এসে যেন মিশেছে দিগন্তব্যাপী মানব হৃদয়ের সমুদ্র সৈকতে।

ছন্দোভাবনা

ছন্দোবৈচিত্র্য

ছন্দের যে নব নব বৈচিত্র্য ও পথসন্ধানের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে জাদুকর বলা হ'তো জীবনানন্দকে কখনোই তেমন কোনো নামে অভিহিত করা যাবে না। অনুভূতিশীল কবিপ্রাণ যেমন অন্তরস্থিত আবেগ ও আকুতিকে প্রকাশ করতেই ব্যগ্র থাকে, কাব্যের বহিরঙ্গ রূপকলা ও প্রসাধন বহিরঙ্গ ব'লেই যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি মূল্য পায় না। জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। নইলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করলে দেখা যাবে ছন্দের যে ক'টি রীতি—তান, ধ্বনি, শ্বাসাঘাত ও গদ্যছন্দ তার কোনোটাতেই জীবনানন্দের অধিকার কম ছিল না।

আমাদের আলোচনার অবকাশ সংক্ষিপ্ত এবং স্থূল কতকগুলি তথ্যের সমাহার ক'রেও এখানে কিছু লাভ নেই। আমরা যা বলতে চাইছি তা হ'লো, কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন দেখা গেছে ছন্দের ক্ষেত্রেও তেমনি তাঁর কবিসত্তা উদ্দেশ্য থেকে উপায়কে বড় ক'রে দেখতে শেখেনি। অন্তরের অভিব্যক্তির তাগিদে যেমন স্বতই কবিতার ভাষা এসেছে, তেমনি ছন্দও স্বাভাবিক ভাবে হিল্লোলিত হ'য়ে উঠেছে এবং কবির ভাবানুভূতির বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন অনুযায়ী তারই উপযোগী রীতি—কখনো তান-মুখ্য, কখনো ধ্বনি-মুখ্য, কখনো শ্বাসাঘাত-মুখ্য, কখনো বা গদ্য ছন্দ—কবিতার প্রধান বাহন হ'য়ে উঠেছে।

কবিপ্রতিভার উন্মেষ স্তরে, ঝরাপালকে, ছন্দের যে অশেষ বৈচিত্র্য ছিল একথা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম। একমাত্র গদ্যছন্দ ছাড়া উল্লিখিত তিনটি রীতিই নানা প্রকরণে সেখানে দেখা যাচ্ছে। নানা কবির রচনাধারায় প্রভাবিত ব'লে, নিজের কোনো বিশিষ্ট মনোভাবনা গ'ড়ে ওঠেনি ব'লে, ছন্দের মধ্যে কবির ব্যক্তিত্বকে অবশ্য চেনা যায় না। তার প্রমাণ মাঝে মাঝে ছন্দ-পতনে কোথাও বা আকস্মিক ছন্দ পরিবর্তনে দেখা যাবে। পরবর্তীকালে ছন্দ সম্পর্কে জীবনানন্দ এত স্পর্শাতুর যে অভিযোগটি অবিশ্বাস্য মনে হ'তে পারে মনে ক'রেই আমরা একটি দৃষ্টান্ত তুলছি এখানে।

বাংলার মাঠে মাঠে ফিরেছিনু বেনুহাতে একা,
গঙ্গার তীরে কবে কার সাথে হ'য়েছিল দেখা !
'ফুলটি ফুটিলে চাঁদিনী উঠিলে' এমনই রূপালী রাতে
কদম তলায় দাঁড়াতাম গিয়ে বাঁশের বাঁশীটি হাতে !

তাহারি নধর	অধর নিঙাড়ি	উথলিল বুকে	মধু
জোনাকির সাথে	ভেসে শেষ রাতে	দাঁড়াতাম দোরে	বঁধূ।
মনে পড়ে কি তা	চাঁদ জানে যাহা	জানে যা কৃষ্ণা	তিথির শশী
বুকের আগুনে	খুন চড়ে,—মুখ	চুন হয়ে যায়	একেলা ইসি !

: **অস্তচাঁদে**

একটি স্তবকের মধ্যে এমন দুবার ছন্দ পরিবর্তন ছন্দ সম্পর্কে তাঁর অনবহিতির সাক্ষ্যই বহন করছে। 'অস্তচাঁদে' কবিতাটি মূলতঃ ছিল তান মুখ্য ছন্দের। কিন্তু 'বাংলার মাঠে ঘাটে' এবং 'গঙ্গার তীরে কবে' পর্ব দুটিতে প্রত্যাশিত আটমাত্রা এসেছে ধ্বনি-মুখ্য রীতির মতো বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে। এখানে প্রথম চরণ দুটির পর্টবিন্যাস ৮+৪+৬ তার পরেই ছন্দটি আকস্মিক মোচড় খেয়ে ৬+৬+৬+২ পর্বে পরিবর্তিত হলো। বলাবাহুল্য এবার রীতি নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে ধ্বনিমুখ্য। কিন্তু এই রীতিও শেষ দুটি স্তবকে বজায় থাকলো না। নূতন পর্ববিন্যাস হলো ৬+৬+৬+৫। সমস্ত কবিতাটিতে এমন শিথিলতা আরো আছে।

তবু ঝরাপালকের বিক্ষিপ্ত ছন্দপ্রয়াসের মধ্যেও স্তবক রচনার বিচিত্র শিল্পিতা ছিল। ৬+৬+৮ মাত্রার ধ্বনিমুখ্য পংক্তির মধ্যে দু-একটি অপূর্ণপদী আট মাত্রার পংক্তি দিয়ে চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি যেমন লিখে গেছেন, সেই রীতিতে কবিতা লিখলেও পঞ্চপদী, ষটপদী বা অষ্টপদী নানা বিচিত্র স্তবক রচনার ফলে কবিতাগুলি বিশিষ্ট হ'য়ে উঠেছে। উদাহরণ 'বিবেকানন্দ', 'আমি কবি সেই কবি', 'নবনবীনের লাগি', 'সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে,' 'নিখিল আমার ভাই','হিন্দু মুসলমান' প্রভৃতি। এরকম তানমুখ্য, শ্বাসাঘাতমুখ্য, ধ্বনিমুখ্য ছন্দের অন্যান্য রকমের পর্ববিন্যাস ও স্তবক রচনার দৃষ্টান্ত তোলা যায়। কিন্তু সে কথা যাক্, ঝরাপালকে সবচেয়ে লক্ষণীয় শ্বাসাঘাত ছন্দে কবির অসামান্য দক্ষতা। 'চলছি উধাও', 'স্মৃতি', 'ছায়াপ্রিয়া', মিশর', 'মরুবালু' প্রভৃতি কবিতা পড়লেই অনুমিত হবে শ্বাসাঘাতের দ্রুতলয় যে অভিশ্রুতি-জাত ক্রিয়াপদই দাবি করে একথা জীবনানন্দ বুঝেছেন। তবু ঝরাপালকের পরে কাব্যরচনার শেষ পর্যায়ে না পৌঁছে কবি-প্রতিভা আর শ্বাসাঘাত ছন্দ কেন অবলম্বন করেনি সে কথা অবশ্যই ভাবতে হবে।

আমাদের বিশ্বাস, জীবনানন্দের স্তিমিত প্রগাঢ় মনোভঙ্গি এই দ্রুতলয়ের ছন্দ প্রকরণকে আয়ত্ত করলেও একে অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেনি। অথবা হয়তো সে যুগের অনেক কবিই ছড়ার ছন্দের দ্রুত লয়কে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে কাজে লাগিয়েছেন ব'লেই জীবনানন্দ সে পথ থেকে স'রে এসেছিলেন। এমনকি জীবনের শেষ পর্বে এসে যখন কবি আবার শ্বাসাঘাত ছন্দ আশ্রয় ক'রে কবিতা লিখেছেন সেখানেও দেখা যাবে

ছন্দের লয়ের দ্রুততা ভাষায় মৃদু বিলম্বিত চাল দিয়ে শোধন ক'রে নিয়েছেন। আমরা এই দুই স্তরের দুটি নমুনা তুলছি। ঝরাপালকে আছে—

ওরে কিশোর,—দূর-সোহাগী ঘর-বিবাগী সুখ!
—টুকটুকে কোন্ মেঘের পারে ফুটফুটে কার মুখ
ডাকছে তোদের ডাগর কাঁচা চোখের কাছে তার!
—শাদা শকুন-পাখার যে তাই তুলছে হাহাকার
ফাঁপা ঢেউয়ের চাপা কাঁদন,—ফাঁপর-ফাটা বুক!

: সাগর-বলাকা

এর সঙ্গে শেষ পর্যায়ের—

মনে পড়ে, জলের মতন ঘুরে অবিরল
পেয়েছিলাম জামের ছায়ার নিচে তোমার জল,
যেন তোমার আমার হাজার-হাজার বছর মিল,
মনের সঙ্গে শরীর যেমন মেশে।

মৃত্যু এসে; ম'রে যেতে হবে
ভালবাসা নদীর জলের মতন হয়ে রবে,
জলের থেকে ছিঁড়ে গিয়েও জল
জোড়া লাগে আবার যেমন নিবিড় জলে এসে।

দুটি কবিতার ছন্দের মাত্রা সমান। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতির চাল যে অনেক বিলম্বিত তাতে সন্দেহ নেই। ছন্দের গতির উপর শিল্পিসত্তার এমন অনিবার্য নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ঝরাপালকের পর্বে আসেনি।

জীবনানন্দের বিশিষ্ট কবিচিত্ত ধূসর পাণ্ডুলিপির কালে কিভাবে তার উপযোগী ছন্দটিকে নির্বাচন ক'রে নিয়েছে তা এখানেই দেখতে হবে। এখানেই দেখা যাচ্ছে, সত্যেন দত্ত যেমন ছন্দের নানাবিধ রূপ-কলায় আকৃষ্ট হতেন জীবনানন্দ তেমন নন। বরং পর্বসংখ্যা অসম রেখে, ছোট বড় পংক্তিতে সাজালে যেটুকু বৈচিত্র্য আসে তাতেই তিনি যেন খুশি। মিল-ক্রমের অভিনবত্ব ও নানাবিধ স্তবক রচনার কৌতূহলও সূচনায় দেখা গেলেও কালক্রমে স্তিমিত হয়ে গেছে।

শ্রেষ্ঠ কবিতায় নির্বাচিত ঝরাপালকের তিনটি কবিতাই অসমপদী তানমুখ্য ছন্দের। একেই প্রচলিত রীতিতে 'মুক্তক' ছন্দ বলে। এগুলি ছাড়াও এ রীতিতে আরো অনেকগুলি কবিতা ঝরাপালকে পাওয়া যাবে। 'কিশোরের প্রতি', 'নাবিক',

'একদিন খুঁজেছিনু যারে', 'ওগো দরদিয়া', 'শ্মশান', 'আলেয়া' প্রভৃতি। আসলে এই রীতির ছন্দই পরবর্তীকালে জীবনানন্দের কবিতার প্রধান বাহন হ'য়ে উঠেছিল।

ধূসর পাণ্ডুলিপিতে ইংরাজী ছন্দ-প্রকরণ জীবনানন্দকে আকৃষ্ট করেছিল। এতে যে তিনটি সুদীর্ঘ কবিতা আছে 'জীবন', 'অনেক আকাশ' ও 'প্রেম' তিনটিই নয় পংক্তির স্তবকে গঠিত। তার আগের দুটি 'স্পেনসরীয় স্তবক' রীতির

> যে-মুহূর্ত চ'লে গেছে,—জীবনের সেই দিনগুলি
> ফুরায়ে গিয়েছে সব,—একবার আসে তারা ফিরে
> তোমার পায়ের চাপে তাদের করেছ তুমি ধূলি
> তোমার আঘাত দিয়ে তাদের গিয়েছ তুমি ছিঁড়ে
> হে ক্ষমতা,—মনের ব্যথার মত তাদের শরীরে
> নিমেষে-নিমেষে তুমি কতবার উঠেছিলে জেগে!
> তারা সব চ'লে গেছে;—ভূতুড়ে পাতার মত ভিড়ে
> উত্তর-হাওয়ার মত তুমি আজো রহিয়াছ লেগে!
> যে-সময় চ'লে গেছে তা-ও কাঁপে ক্ষমতার বিস্ময়ে—আবেগে!
>
> : **অনেক আকাশ**

এই স্তবক রীতিতে মিলের বিন্যাস ক খ ক খ খ গ খ গ গ, বলা বাহুল্য শেষ পংক্তিটি একটু আয়তনে বড়। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটির পংক্তি-বিন্যাস ওয়ার্ডসওয়ার্থের Laodamia কবিতার পংক্তি-বিন্যাসের মতো। 'শকুন', 'অঘ্রাণ', 'শীতশেষ', 'এই সব', 'তাই শান্তি', 'পায়রারা', 'যেন এক দেশলাই', 'এই শান্তি', 'বুনোহাঁস', 'নদীরা'—আকারে চতুর্দশপদী হ'লেও আসলে Terza Rima ছন্দের। এই ছন্দের সনেটে পাঁচটি স্তবক থাকে। প্রথম চারটি স্তবক তিন পংক্তি নিয়ে গঠিত হয়, শেষটি দুই পংক্তির; প্রতি স্তবকে প্রথম পংক্তির সঙ্গে তৃতীয় পংক্তির মিল। দ্বিতীয় পংক্তির মিল ফিরে আসবে পরের স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে। দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তির মিল আবার ফিরে আসবে তৃতীয় স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে। শুধু শেষ স্তবকের পংক্তি দুটি হবে একটি পয়ারের মতো মিল যুক্ত। আরো লক্ষ্য করার এই যে জীবনানন্দ এই রীতির সবকটি সনেটেই ৮+৮+৪৬ এই তান মুখ্য মাত্রা-বিন্যাস করেছেন। যেমন:

আজ রাতে শেষ হয়ে	গেল শীত—তারপর কে যে এল	মাঠে-মাঠে খড়ে
হাঁস গাভী শাদা-প্লেট	আকাশের নীল পথে যেন মৃদু	মেঘের মতন,
ধানের সোনার ছড়া	নাই মাঠে—ইঁদুর তবুও আর	যাবে নাকো ঘরে
তাহার রূপালি রোম	জ্যোৎস্নায় একবার সচকিত	করে যায় মন,

হৃদয়ে আস্বাদ এলো   ফড়িঙের—কীটেরও যে—   ঘাস থেকে   ঘাসে-ঘাসে তাই
নির্জন ব্যাঙের মুখে   মাকড়ের জালে তারা   বরং এ   অধীর জীবন

ছেড়ে দেবে—তবু আজ   জ্যোৎস্নায় সুখ ছাড়া সাধ ছাড়া   আর কিছু নাই ;
আছে না কি আর কিছু ?   পাতা খড়কুটো দিয়ে যে আগুন   জ্বেলেছে হৃদয়
গভীর শীতের রাতে—   ব্যথা কম পাবে ব'লে—সেই সমারোহ   আর চাই ?

জীবন একাকী আজো—   ব্যথা আজো—এখন করি না তবু   . বিয়োগের ভয়
এখন এসেছে প্রেম ;—   কার সাথে ? কোনখানে ? জানি নাকো ;   তবু সে আমারে
মাঠে-মাঠে নিয়ে যায়—   তারপর পৃথিবীর ঘাস পাতা ডিম নীড় :   সে এক বিস্ময়

এ শরীর রোগ নখ   মুখ চুল—এ-জীবন ইহা যাহা   ইহা যাহা নয় :
রঙীন কীটের মতো   নিজের প্রাণের সাধে একবার   মাঠে জেগে রয়।

: **শীত শেষ**

বনলতা সেনের 'পথ হাঁটা' কবিতাটিও এই রীতির সনেট। অথচ ধূসর পাণ্ডুলিপিতেই 'তোমার শরীরে', 'একরাশ পৃথিবীরে', 'তোমারে দেখেছি, তাই', তিনটিই রূপপ্রকরণে সাধারণ সার্থক সনেট।

'রূপসী বাংলা'র মাত্র চারিটি কবিতা বাদ দিলে সবগুলিই সনেট—প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত রীতির সনেট। এই সনেটগুলির 'অষ্টক' অংশে পেত্রার্কীয় কখখক কখখক মিল বিন্যাস এবং পরবর্তী 'ষড়ক' অংশের অজস্র মিল বৈচিত্র্য কবির সনেট সম্পর্কিত ধারণা ভাবনার কিছুটা পরিচয় দেবে। আমরা জানি, ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা 'অষ্টক' অংশের মিল বিন্যাসে কোনো শৈথিল্য দেখান নি। কিন্তু ষড়কের মিল বিন্যাসে তাঁরও একাধিক বৈচিত্র্য ছিল। এই বৈচিত্র্যকেই জীবনানন্দ প্রসারিত করেছেন এখানে এবং দেখিয়েছেন মিলের এই বৈচিত্র্যে ভাব ও গঠনের সংহতিকে অক্ষুন্ন রেখেও করা সম্ভব। এক রীতিটি রাখার সার্থকতা এবং সনেট হিসাবে এর সাফল্য সম্পর্কে আমরা আগেই (দ্রঃ—১১৪ পৃঃ) আলোচনা করেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি বিশিষ্ট কবিতা যেমন মুক্তক ছন্দের, ধূসর পাণ্ডুলিপিতেও তেমনই। এই গ্রন্থে মুক্তক রীতিতে কবিপ্রতিভা প্রতিষ্ঠিত। তবে ভাষার বিশিষ্টতায় ছন্দের স্বাভাবিক ধীরলয় কোথাও কোথাও ধীরতর হয়েছে মনে হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্য কবিতা সৃষ্টির সূচনায় অমিল মুক্তক ব্যবহার করেছিলেন। 'ক্যাম্পে' কবিতাটিতে জীবনানন্দও প্রথম অমিল মুক্তক লিখলেন।

কোথাও বাঘের পাড়া / বনে আজ / নাই আর যেন ;
মৃগদের বুকে আজ / কোনো স্পষ্ট ভয় নাই, /

সন্দেহের আবছায়া / নাই কিছু ; /
কেবল পিপাসা আছে, /
রোমহর্ষ আছে।
মৃগীর মুখের রূপে / হয়তো চিতারও বুকে / জেগেছে বিস্ময় ;
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ / -প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হ'য়ে / উঠিতেছে সবদিকে /
আজ এই / বসন্তের রাতে ;
এইখানে / আমার নক্টার্ণ্।

: ক্যাম্পে

ইংরাজী চতুষ্পদী ব্যালাড স্তবকের বৈশিষ্ট্য হ'লো, এর দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির অন্ত্যানুপ্রাস আছে প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে নেই। ফলে দুইটি পংক্তি মিলে একটি পয়ারের পংক্তির মতো মনে হয় যেন। জীবনানন্দের অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতার মিল-বিন্যাস এই রকম। 'ফিরে এসো', 'কবিতা', 'সুচেতনা', 'তোমাকে', সাতটি তারার তিমিরের 'নাবিক', 'হাঁস', 'প্রতীতি', 'ভাষিত', 'সোনালি সিংহের গল্প' প্রভৃতির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে।

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিম বিন্যাস ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত ঃ
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।

: তোমাকে

এই ধরণের চতুষ্পদীর সঙ্গে আরো দুটি সমিল পংক্তি যোগ ক'রেও জীবনানন্দ অনেক কবিতা লিখেছেন। 'মিতভাষণ', 'সুচেতনা', 'শ্যামলী' প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত।

তোমার সৌন্দর্য নারি, অতীতের দানের মতন।
মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে
ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
শান্তির সঙ্ঘের দিকে—ধর্মে—নির্বাণে ;
তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।

: মিতভাষণ

এরকম তিনটি সমিল পংক্তির যোগে 'লঘু মুহূর্ত' কবিতাটির রচনা। কিন্তু শুধু ছন্দ নয়, জীবনানন্দের কবিতার মিল পরিকল্পনায় কোথাও কোথাও নূতন পথের সন্ধান রয়েছে এবং সেগুলি আমাদের অবশ্য আলোচ্য। 'ক্যাম্পে' কবিতার

মতো অমিল মুক্তক ছন্দে আরো অনেক কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দ। কিন্তু বিস্মিত হ'তে হয় যখন দেখি—

সেইখানে ক্লান্তি তবু—
ক্লান্তি—ক্লান্তি—
কেন ক্লান্তি
তা ভেবে বিস্ময় ;
সেইখানে মৃত্যু তবু ;
এই শুধু—
এই ;
চাঁদ আসে একলাটি ;
নক্ষত্রেরা দল বেঁধে আসে ;
দিগন্তের সমুদ্রের থেকে হাওয়া প্রথম আবেগে
এসে তবু অস্ত যায় ;

: উত্তর প্রবেশ

এই ভাবে অমিল রীতিতে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত কবি যখন বলেন—

অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ ক'রে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ-ভোর নবীন ব'লে মেনে নিতে হয় ;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব ; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

: ঐ

পরিসমাপ্তির এই অপ্রত্যাশিত অন্তিম অনুপ্রাস আশ্চর্যভাবে অন্তরকে রসাপ্লুত ক'রে তোলে।

অন্ত্যানুপ্রাসের এই রকম কৃপণের মতো ব্যবহারও যে ভাবের ক্ষেত্রে কতখানি সার্থকতা আনতে পারে জীবনানন্দের রচনা থেকে তার প্রচুর উদাহরণ তোলা সম্ভব—

জানি আমি জানি আদি নারী শরীরিণীকে স্মৃতির
(আজকে হেমন্ত ভোরে) সে কবের আঁধার অবধি,
সৃষ্টির ভীষণ অমা ক্ষমাহীনতায়
মানবের হৃদয়ের ভাঙা নীলিমায়
বকুলের বনে মনে অপার রক্তের ঢলে গ্রেশিয়ারে জলে
অসতী না হ'য়ে তবু স্মরণীয় অনন্ত উপলে
প্রিয়াকে পীড়ন ক'রে কোথায় নভের দিকে চলে।

: জনান্তিকে

এমনি অমিল মুক্তকের শেষপর্বে এসে অন্ত্যানুপ্রাসের আকস্মিক সমারোহ কি আশ্চর্য 'এফেক্ট' সৃষ্টি করে তা তিনি জানতেন ব'লেই এখানেও কচিৎ মিল রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে 'যাত্রী', 'স্থান থেকে' ইত্যাদি কবিতাও স্মরণ রাখা উচিত।

বনলতা সেনের একটি কবিতায় একটি বিস্ময়কর অন্ত্যানুপ্রাসের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করবো।

কাঁচ পোকা ঘুমিয়েছে—গঙ্গাফড়িং সে-ও ঘুমে;
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে প'ড়ে আছো তুমি।

: তুমি

ঘুমের সঙ্গে অনুপ্রাস দেওয়া দেওয়া হয়েছে 'তুমি'। অনুপ্রাসটি খুব সুখকর না হবারই কথা। কিন্তু পড়তে গিয়ে তা মনে হয় না। প্রথম পংক্তির 'ঘুমিয়েছে'র পরে 'ঘুমে' আম নিম হিজলের ভিড়ে কখন হারিয়ে যায় যে 'তুমি' উচ্চারিত হওয়ার সময় ভুলে যাই প্রথম পংক্তিতে কি ছিল।

কিন্তু তা হ'লেও এর পরেও কবিতাটি আমায় বারবার ভাবিয়েছে। বারবার মনে হয়েছে ঐ 'ঘুমে'র জায়গায় কবি কি 'ঘুমিয়েছে' লিখেছিলেন কখনো? লিখে দুই পংক্তির মধ্যে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন শব্দটিকে? তারপরে দ্বিতীয় পাঠের সময় সেটিকে পালটে দিয়েছেন? এসব জিজ্ঞাসার আর কোনো জবাব পাওয়া যাবে না।

কবিতায় এরকম নূতন নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষা জীবনানন্দ আরও করেছেন। মহাপৃথিবীর 'মনোবীজ' কবিতাটিতে দীর্ঘ তিন পৃষ্ঠা তানমুখ্য মুক্তক ছন্দে লেখার পর কবি শেষ স্তবকে এসে শ্বাসাঘাত ছন্দে রূপান্তরিত করলেন কবিতাটি।

অনেক মেধাবী মুখ   স্বপনের   বন্দরের তীরে,
যদিও পৃথিবী আজ   সৌন্দর্যেরে   ফেলিতেছে ছিঁড়ে।

প্রেম কি জাগায়   সূর্যকে আজ   ভোরে?
হয়তো জ্বালায়ে   গিয়েছে অনেক   অনেক বিগত   কাল,
বায়ুর ঘোড়ার   খুরে যে পরায়   অগ্নির মতো   নাল
জানে না সে কিছু   তবু তারে জেনে   সূর্য আজিকে   জ্বলে।

: মনোবীজ

তার ফলে ছন্দে যে দ্রুততা ও গতি সঞ্চারিত হলো তা কবিতার ভাবভূমিকে সমৃদ্ধ করেছে। ঠিক এর বিপরীত প্রক্রিয়া দেখা যায় শ্রেষ্ঠ কবিতার 'অনন্দা'য়। সেটি শ্বাসাঘাতের লঘু ছন্দে শুরু হয়েছে! পরে কিন্তু ভাবের পরিণতির সঙ্গে তাল রেখে

তানমুখ্য ছন্দে পরিবর্তিত হয়েছে ; সার্থকতা প্রশ্নাতীত। 'লঘু মুহূর্ত' কবিতায় ব্যবহৃত তানমুখ্য ছন্দ কবিতার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আশ্চর্য লঘু হ'য়ে গেছে—

> কি ক'রে ধর্মের কল ন'ড়ে যায় মিহিন বাতাসে ;
> মানুষটা ম'রে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
> কেউ দেয়—বিনিদামে—তবে কার লাভ—
> এই নিয়ে চারজনে ক'রে গেল ভীষণ সালিশী।
> কেননা এখন তা'রা যেই দেশে যাবে তাকে উড়ো নদী বলে ;
> সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে-জলে
> মুখ ছাখে—যত দিন মুখ দেখা চলে।

: **লঘু মুহূর্ত**

'সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে' এই পংক্তির পর্ববিন্যাস বিস্ময়কর। কিন্তু কোথাও যে ছন্দ পতন হয়েছে এমন কথা জোর ক'রে বলা চলবে না।

আশ্চর্য এই যে প্রাজ্ঞ ছন্দোবিজ্ঞানী ড. নীলরতন সেন জীবনানন্দের ছন্দ কুশলতা সম্পর্কে এক পরিশ্রমী রচনায় অসতর্ক ভাবে আলোচ্য কবিতাটিকে আট মাত্রার 'মাত্রাবৃত্ত' ব'লে নির্দেশ করেছেন। তিনি অবশ্য উল্লেখ করেছেন এর কোনো কোনো পর্বে 'অক্ষরবৃত্তের সংহত উচ্চারণ প্রবেশ করেছে'। তাঁর মতে, "সেটি সম্ভবপর হয়েছে এ ছন্দের আট-দশ মাত্রার দীর্ঘ যতিভাগের ফলে। নিঃসংশয়ে এটি একটি নতুন পরীক্ষা।" সাধারণ কোনো লেখকের উক্তি হলে আমরা এ মন্তব্য উপেক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু ডক্টর সেনের অভিমত বলেই একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে আমরা কখনো আট-দশ মাত্রার মতো বড় পর্বভাগে দেখিনি। দ্বিতীয়ত, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ পর্বের মাত্রা-সমকত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাতে 'অসমান মুক্তক পঙ্‌ক্তি' দেখা যায় না। তৃতীয়ত, এ ছন্দে 'অক্ষরবৃত্তের সংহত উচ্চারণ' কিছুতেই স্থান পেতে পারে না—তাতে ছন্দ ভেঙে পড়ে। কিন্তু ড. সেন লক্ষ্য করেছেন এখানে "ছন্দ পঙ্গু হয়নি"। ছন্দ যে অটুট আছে তার কারণ হ'লো এ ছন্দ মাত্রাবৃত্ত নয়, অক্ষরবৃত্ত। তানমুখ্য ছন্দেই কেবল সেই শোষণশক্তি বা স্থিতিস্থাপকতা আছে যা এজাতের ব্যতিক্রমকে মানিয়ে নিতে পারে। মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিমুখ্য ছন্দের সে ক্ষমতা নেই।

পর্ববিন্যাসের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য অন্য কবিতাতেও দেখা যাবে। আমরা এর আগে অন্য প্রসঙ্গে 'লোকেন বোসের জার্ণাল' কবিতাটির আলোচনা করেছিলাম।

> সুজাতাকে ভালো বাসতাম আমি
> এখনো কি ভালো বাসি ?

বেহালাবাদক কুবেলিকের প্রতিকৃতি / পিকাশো

জীবনানন্দ দাশের হস্তলিপির প্রতিচিত্র

সেটা অবসরে ভাববার কথা,
অবসর তবু নেই ;
তবু একদিন হেমন্ত এলে অবকাশ পাওয়া যাবে ;
এখন শেল্‌ফে চার্বাক ফ্রয়েড প্লেটো পাভ্‌লভ্‌ ভাবে
সুজাতাকে আমি ভালোবাসি কিনা।
পুরোনো চিঠির ফাইল কিছু আছে ;
সুজাতা লিখেছে আমার কাছে,
বারো তেরো কুড়ি বছর আগের সে-সব কথা ;

: **লোকেন বোসের জার্নাল**

কবিতাটি ধ্বনিমুখ্য ছন্দের ছয় মাত্রার পর্বে রচিত ? অথবা শ্বাসাঘাত ছন্দে ? শ্বাসাঘাত ছন্দের মতোই এর পর্বের মাত্রা কমিয়ে বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। নিম্নরেখাঙ্কিত পর্বগুলি দেখুন। বাংলা কবিতার ছন্দ সম্পর্কে এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা যদি সার্থক হয় তবে বাংলা ছন্দোবিজ্ঞানে তা গুরুতর বিপ্লব ব'লেই গণ্য হবে।

গদ্য কবিতা

গদ্য রীতিতে কবিতা লিখতে জীবনানন্দ কবে প্রথম উদ্বুদ্ধ হন, কোনটি তাঁর প্রথম গদ্য কবিতা তা সম্ভবত আজ আর বলা সম্ভব নয়। 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কবি' কবিতাটিকে জীবনানন্দের আদি ব্যঙ্গ কবিতা ব'লে আমরা ইতিপূর্বে নির্দেশ করেছি। সম্ভবত এটিকেই জীবনানন্দের প্রথম গদ্য কবিতার নিদর্শন হিসাবে গণ্য করতে হবে।

কবিকে দেখে এলাম
দেখে এলাম কবিকে
আনন্দের কবিতা একাদিক্রমে লিখে চলেছে
তবুও পয়সা রোজগার করবার দরকার আছে তার
কেউ উইল ক'রে কিছু রেখে যায়নি
চাকরী নেই
ব্যবসার মারপ্যাচ বোঝে না সে।

: **কবি**

এই যদি সূচনা হ'য়ে থাকে অথবা নাও হয় তাতে কিছু আসে যায় না। জীবনানন্দের রচনায় প্রথম গদ্য কবিতার প্রাচুর্য দেখা গেল মহাপৃথিবী-বনলতা সেন পর্বে। একটি দুটি নয়, অজস্র। 'শ্রাবণ রাত', 'মুহূর্ত', 'শহর', 'শীত রাত', 'আদিম দেবতারা', 'আজকের এক মুহূর্ত', 'ফুটপাতে', 'হঠাৎ মৃত', 'ঘাস', 'হাওয়ার রাত', 'বেড়াল', 'শিকার', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'আমি যদি হতাম', 'অন্ধকার', 'কমলালেবু', 'আমাকে তুমি' প্রভৃতি। আর এই সব গদ্য-কবিতার রূপ কি—কমনীয় শ্রী কত বেশি! রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতায় খুঁজেছিলেন 'দুর্গম নির্মম'কে, চেয়েছিলেন 'কঠিন-চিত্ত উদাসীনের গান'—তাই তাঁর কবিতা মনে হবে যেন রুক্ষ পাথরের কর্কশতা। জীবনানন্দের এই স্তরের কবিতায় গদ্যছন্দের সাধনা ও সিদ্ধি ভিন্ন জাতের—সামান্য নমুনা :

১। ভোর :

সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগিনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের
বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে ;
কচি বাতাবি লেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল—
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য ;
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো
একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য ;
এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

: শিকার

২। বাংলার পাড়া গাঁয়ে শীতের জ্যোৎস্নায় আমি কতবার দেখলাম
কত বালিকাকে নিয়ে গেল বাঘ—জঙ্গলের অন্ধকারে ;
কতবার হটেন্‌টট্—জুলু-দম্পতীর প্রেমের কথাবার্তার ভিতর
আফ্রিকার সিংহকে লাফিয়ে পড়তে দেখলাম ;
কিন্তু সেই সব মূঢ়তার দিন নেই আর সিংহদের ;
নীলিমার থেকে সমুদ্রের থেকে উঠে এসে
পরিস্ফুট রোদের ভিতর
উজ্জ্বল দেহ অদৃশ্য রাখে তারা ;

শাদা, হলদে, লাল, কালো মানুষদের
আর কোনো শেষ বক্তব্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে।

: আজকের এক মুহূর্ত

প্রকৃতির সজীব সান্নিধ্যে, কবি চিত্তের মুগ্ধতা ও আবেগের নির্বাধ সঞ্চরণ যেমন প্রথম কবিতায় দেখা যাবে দ্বিতীয়টিতে তেমনি জীবনের ক্রূর কুটিল রূপ ব্যঙ্গের ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতায় ব্যক্ত হয়েছে। বিষয়ের সঙ্গে ছন্দরীতির এই অদ্বয় এককত্ব এখানে লক্ষ্যণীয়।

গদ্য কবিতার এই সমৃদ্ধি ও সাফল্য কিন্তু পরবর্তীকালে উপেক্ষিত হয়েছে বলতে হবে। কেননা 'সাতটি তারার তিমিরে'র সাঙ্কেতিক কবিতাগুচ্ছের মধ্যে একটিও গদ্য কবিতা স্থান পায় নি। এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা'র চিন্তা-ভূয়সী কবিতা গুচ্ছের মধ্যে মাত্র দুটি গদ্য কবিতা 'আমাকে একটি কথা দাও', এবং 'সময়ের তীরে' পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া ঐ গ্রন্থের সুবিস্তৃত 'সূর্য নক্ষত্র নারী' কবিতার প্রথম অংশটিও গদ্য কবিতায় লেখা। 'সুদর্শনা'য় সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে মাত্র পাঁচটি 'সবার উপর', 'অনির্বাণ', 'আমি', 'চিঠি এলো' ও 'শবের পাশে' গদ্য কবিতা। কিন্তু প্রশ্ন হ'লো শিল্প সিদ্ধি সত্ত্বেও গদ্য কবিতাকে জীবনানন্দ সচেতনভাবে এইপর্বে পরিহার করলেন কেন? আমার হাতে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য উপস্থিত নেই। অনুমান করি, সাঙ্কেতিক কবিতার প্রকরণগত জটিলতা এবং বক্তব্যধর্মী কবিতার বিষয়-জটিলতার সঙ্গে ছন্দোহীনতাকে সংযুক্ত করলে সাধারণ পাঠককে খুব বঞ্চিত ও বিমুখ ক'রে তোলা হবে মনে ক'রে হয়তো ছন্দের ঈষৎ আন্দোলন, মিলের একটু আমেজ তিনি বজায় রেখে চলেছিলেন। কিন্তু পূর্বোক্ত কবিতাগুলি যত্ন ক'রে পড়তে এটাই প্রতীত হবে এই সাবধানতার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা ভাবের সংহতিতে, ভাষার সাবলীল বিন্যাসে বাণীর সৌন্দর্যে এসব গদ্য কবিতা প্রায় বেদ মন্ত্রের মতো সুমহান। একটু নমুনা:

আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মতো
সহজ মহৎ বিশাল,
গভীর; —সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুকদের রক্তে
মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন:
আমি যাকে আবহমান কাল ভালো বেসে এসেছি সেই নারীর।
সেই রাত্রির নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো;
সেই দিনের—আলোর অন্তহীন এঞ্জিন-চঞ্চল ডানার মতন
সেই উজ্জ্বল পাখিনীর—পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে
অগ্নির মতো প্রদীপ্ত দেখে অন্তিম শরীরিণী মোমের মতন।

: আমাকে একটি কথা দাও

জীবনানন্দের অসংগ্রথিত কবিতার মধ্যে আরো কিছু গদ্য কবিতার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সুদীর্ঘ কবিতার অংশ বিশেষ তুলছি :

কারো কারো মন স্বভাবত নিহত চেতন ;
হাসছে খেলছে গুলগল্পে গরমে মেতে আছে—
খাচ্ছে-ছুটছে-চালানি মালের মতো দিনরাত দিচ্ছে নিচ্ছে
দেহ—ভালবাসা—(দেহ-মাংস) ; —
সারাদিন চামড়া মাংস বিকিকিনি শেষ হয়ে গেলে
তারার আলোয় এসে ঘ-মানুষের মতো এরাও মানুষ :
আচ্ছন্ন করুণ, চেতনা জেগেছে, পথ নেই, বিন্দুর ভিতরে
স্তব্ধ হয়ে রয়েছে জাহাজ—মুর্গির খাঁচার মতো যেন ;
তবুও তা নয় ;—
আকাশ বিমুক্ত হয়ে আছে।

: যাত্রা

এই সুদীর্ঘ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'শিশুতীর্থ' কবিতার সমতুল্য ও সমান্তরাল ব'লে গণ্য হ'তে পারে। 'যাত্রা' নামে আরো একটি গদ্য কবিতা উত্তরসূরী পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখছি :

কতদিন হয়ে গেল
কতবার কাঁচা ধান কার্তিকের সূর্যে গেল পেকে ;
পউষের চাঁদ পড়ে ঝরে গেল।
খড় শুধু পৃথিবীর মুখ খানা ঢেকে
রয়ে গেল ;

: যাত্রা উত্তরসূরী

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'কখনও মুহূর্ত' কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে বলবো। মোট কথা রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে গদ্য কবিতার স্রষ্টাদের মধ্যে জীবনানন্দের আসন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

বিক্ষিপ্ত চিন্তা

অতিপ্রাকৃত

ইংরাজী সাহিত্যে কোলরিজ যে অনন্য ভূমিকায় অধিষ্ঠিত আছেন তার অন্যতম ভিত্তি অবশ্যই তাঁর অতিলৌকিক কবিতাগুচ্ছ। যদিও অতিলৌকিকতা রোম্যাণ্টিকতারই লক্ষণ বিশেষ, তবু এইরকম অদ্ভুতরসের কবিতা পৃথিবীর কোনো সাহিত্যেই পর্যাপ্ত সংখ্যায় রচিত হয়নি। যা হয়েছে তার রসসিদ্ধিও কতদূর উচ্চাঙ্গের তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। এই জন্যেই এ বিষয়ে কোলরিজের মহত্ব স্বীকৃত। পরবর্তীকালে একমাত্র মার্কিন কবি এডগার এলান পো এ বিষয়ে উল্লেখ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

বাংলা দেশে যে জীবনানন্দই একমাত্র অতিলৌকিক বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন তাই নয়, এবিষয়ে তাঁর সিদ্ধিও যে কোনো প্রধান কবির ঈর্ষার কারণ হ'তে পারে। অথচ আশ্চর্য, জীবনানন্দের কৃতিত্বের অনেক অনন্যসাধারণ দিকের মতো এদিকেও রসিক পাঠকের তেমন লক্ষ্য ছিল মনে হয় না। থাকলে, তাঁর জীবিতকালে এই সকল কবিতা আদৃত, অন্তত আলোচিত হ'লে—এদিকে আরো কিছু সৃষ্টির জন্য কবির চিত্ত উদ্দীপিত হ'তে পারতো।

'ঝরাপালকে'র 'সেদিন এ ধরণীর' কবিতাটি এই পর্যায়ের আদি কবিতা! যদিও পরিণত শিল্পচেতনার অভাবে কবিতাটি তেমন রসনিবিড় হ'য়ে ওঠেনি ; কিন্তু এখানেই তাঁর অতিলৌকিক চেতনার প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ। এই কবিতাটিই আবার পরবর্তীকালে ভাব পরিণতির ফলে 'বনলতা সেন'এ 'হাওয়ার রাত' হ'য়ে উঠেছে। কুতূহলীরা অবশ্যই কবিতা দুটিকে পাশাপাশি নিয়ে পড়বেন। স্বপ্ন ও চেতনার অন্তর্বর্তী এক স্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতির রূপ দুটি কবিতাতেই দেওয়া হয়েছে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সিগনেট সংস্করণে সংযোজিত কবিতাগুলির মধ্যে 'বৈতরণী' এবং 'মেয়ে', এই দুটি অপ্রাকৃত রসের কবিতা স্থান পেয়েছে। 'বৈতরণী' কবিতায় মৃত আত্মার মৃত্যুপুরী থেকে বিগত জীবনের আকাঙ্ক্ষায় প্রিয়জনের সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় শকুনের মতো উড়ে যাওয়া এবং পরিশেষে সেই বেদনার্ত মিশ্র অনুভূতি নিয়ে ফিরে আসা—

আবার চলেছি উড়ে একা-একা শকুনের কালো পাখা মেলে
পৃথিবীতে তাহাদের দেখিয়াছি—আজো তারা মনে ক'রে রেখেছে আমারে,
ভালবাসে ;—রক্তমাংসে থাকিতাম তবু যদি—আমার এ-সংসর্গের ভালবাসা পেলে,
রোজ ভোরে রোজ রাতে আমারে নতুন ক'রে পেলে

তাহারা বাসিত ভালো আরো বেশী—আরো বেশী—এই শুধু—আর কিছু নয়—
সাত-দিন সাত-রাত তাহাদের জানালায় পর্দায় উড়ে-উড়ে কেবল ভেবেছি এই কথা
আবার পেতাম যদি সে-শরীর—সে-জীবন—তাহলে প্রণয় প্রেম সত্য হত ;
আজ তা বিস্ময়

আজ তা বিস্ময় শুধু—শুধু স্মৃতি শুধু ভুল—হয়তো কর্তব্য বিহ্বলতা :
সাত-দিন সাত-রাত পৃথিবীতে কেবলই ভেবেছি এই কথা।

•

তারপর মৃত্যু তাই চাহিলাম—মৃত্যু ভালো—মৃত্যু তাই আর এক বার,
বিবর্ণ বিস্তৃত পাখা মেলে দিয়ে মাঝ-শূন্যে আমি ক্ষিপ্র শকুনের মতো
উড়িতেছি—উড়িতেছি ;—ছুটি নয়—খেলা নয়—স্বপ্ন নয়—যেইখানে জলের আঁধার
বৈতরণী—বৈতরণী—শান্তি দেয়—শান্তি—শান্তি—ঘুম—ঘুম—ঘুম অবিরত
তারি দিকে ছুটিতেছি আমি ক্লান্ত শকুনের মতো।

: **বৈতরণী**

কবিতাটি পড়তে পড়তে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুপুরীর বিখ্যাত চিত্রগুলি স্মরণে আসবে। মনে পড়বে—মেরী কোলরিজের বিখ্যাত গল্প 'King is dead, long live the king' কাহিনীর সারনির্যাস। কিন্তু ঐ গল্পে মানুষের নিষ্প্রেম নির্দয়তার কথাই ব্যক্ত হয়েছে, এই কবিতায় মানুষের দেহাশ্রয়ী ভালবাসার মানবিকতার স্বাভাবিক রস এর করুণ পরিণতিকে স্পষ্ট করেছে। আমরা মৃত স্বজনকে ভালবাসি কিন্তু বিদেহী আত্মাকে নয়, তার দেহ সংলগ্ন সামগ্রিক সত্তাকে ফিরে পেতে চাই, তাই এই আত্মাকে আবার ফিরে যেতে হ'লো মৃত্যুপুরীর দিকে।

বক্তব্য প্রায় একই তবু অলৌকিকতার রস-বিচারে 'মেয়ে' কবিতাটি আরো সার্থক, আরো সুন্দর হয়েছে। কবিতাটির পটভূমিতে রয়েছে কন্যাহারা পিতৃহৃদয়ের আশ্চর্য অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক মনস্তত্ব। পিতা মৃত মেয়েটিকে ফিরে পেতে চান কিন্তু জীবিত সন্তানের বিনিময়ে নয়। W. W. Jacobs-এর 'The Monkey's Paw' যে-অর্থে এক আশ্চর্য অলৌকিক নাট্য-রচনা, প্রায় অনুরূপ অর্থে 'মেয়ে' কবিতাটিও সার্থক সৃষ্টি। সেখানে মিঃ ও মিসেস হোয়াইটের যুগ্ম চরিত্রে যেমন পিতৃমাতৃহৃদয়ে মৃত সন্তানকে জীবিতভাবে ফিরে পাবার বাসনা এবং সন্তানের বিকৃত অবস্থার কথা কল্পনা ক'রে ভয়,—একজনের সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষা অন্যজনের বিবেচিত বিরুদ্ধতায় পরাভূত হয়েছে। প্রায় সেই রকম নাটকীয় অবস্থা এখানে। এই ছোট্ট লিরিকটি কবি এমনভাবে ব্যঞ্জনায় ভ'রে দিয়েছেন যে কবিতার সমাপ্তিতে যেন পিতার

ভীত নির্দেশ এবং মৃত কন্যার বেদনাতুর প্রতিপালনের কারুণ্য পাঠকের মনে অবিনশ্বর বর্ণে মুদ্রিত হ'য়ে যায়।

তবু তারে চাই আমি—তারে শুধু—পৃথিবীতে আর কিছু নয়
রক্ত মাংস চোখ চুল—আমার সে-মেয়ে
আমার প্রথম মেয়ে—সেই পাখি—শাদা পাখি—তারে আমি চাই ঃ
সে যেন বুঝিল সব—নতুন জীবন তাই পেয়ে
হঠাৎ দাঁড়াল কাছে সেই মৃত মেয়ে।

বলিল সে : 'আমারে চেয়েছ, তাই ছোট বোনটিরে—
তোমার সে ছোট-ছোট মেয়েটিরে এসেছি ঘাসের নিচে রেখে
সেখানে ছিলাম আমি অন্ধকারে এতদিন
ঘুমাতেছিলাম আমি'—ভয় পেয়ে থেমে গেল মেয়ে,
বলিলাম ঃ 'আবার ঘুমাও গিয়ে—
ছোট বোনটিরে তুমি দিয়ে যাও ডেকে।'

ব্যথা পেল সেই প্রাণ—খানিক দাঁড়াল চুপে—তারপর ধোঁয়া
সব তার ধোঁয়া হয়ে খসে গেল ধীরে-ধীরে তাই
শাদা চাদরের মতো বাতাসেরে জড়াল সে একবার
কখন উঠেছে ডেকে দাঁড়কাক—
চেয়ে দেখি ছোট মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খেলে—আর কেউ নাই।

: মেয়ে

'জোনাকি' কবিতাটির কথাও প্রসঙ্গত মনে পড়বে। এটিও 'মেয়ে' কবিতাটির মতোই বাৎসল্য রসেরই কবিতা। চার বছরের ছোট মেয়েটি সুন্দর নীল শিম পেড়ে নিয়ে আঁচল ভ'রে চ'লে গিয়েছে। তারপরে—

বেলা শেষ হ'লে
শুনলাম ডুবে গেছে পুকুরের জলে।
অনেক গভীর রাতে দেখা গেলো জোনাকি পোকার সাথে নক্ষত্রের তলে
শিমগুলো খেলা করে শিশিরের জলে;
আমাকে দাঁড়াতে দেখে বলে তারা ঃ 'বুঝেছ তো কে এই জোনাকি ?'
'চিনেছো ?' বললে রাতের লক্ষ্মীপাখি।

: জোনাকি

অতিপ্রাকৃত কবিতার যে কোনো সার্থক শিল্পীর মতোই জীবনানন্দের কবিতায় অলৌকিকতার অবতারণা মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় পথ ধরে। কন্যাহারা পিতার বিশ্বাস মৃত শিশুই বুঝি জোনাকির রূপ নিয়ে নীল শিমগুলোর সঙ্গে খেলতে এসেছে। এই বিশ্বাস তর্কাতীত, কারুণ্যের স্পর্শ পেয়ে এ কবিতা অনায়াসে রসোত্তীর্ণ। কিন্তু মহাপৃথিবীর 'স্বপ্ন' কবিতাটি ঠিক এই জাতের নয়। জাগ্রত চেতনার ভিত্তিভূমি থেকে এক অতিপ্রাকৃত জগতের অভ্যন্তরে তার স্বপ্নপ্রয়াণ—

পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি
নিস্তব্ধ ছিলাম বসে ;
শিশির পড়িতেছিল ধীরে ধীরে খ'সে ;
নিমের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখি নামি
উড়ে গেল কুয়াশায়—কুয়াশার থেকে দূর কুয়াশায় আরো
তাহারি পাখার হাওয়া প্রদীপ নিভায়ে গেল বুঝি ?
অন্ধকার হাতড়ায়ে ধীরে ধীরে দেশলাই খুঁজি
যখন জ্বালিব আলো, কার মুখ দেখা যাবে বলিতে কি পার ?

: **স্বপ্ন**

প্রথমে রাত্রির সেই প্রত্যক্ষতা, বাইরের আশ্চর্য নিভৃত পরিবেশ, নিমের শাখায় একাকীতম কোন পাখির অকস্মাৎ ডানা ঝাপটিয়ে দূরের কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপের নির্বাপন—যেন এই জগৎ লোপ ক'রে দিয়ে অন্য এক জগতের উদ্‌ঘাটনেরই রূপক। এইবার হাতড়ানো দেশলাইয়ের আলোতে যে মুখ ভাসবে সে নিশ্চয় অতীতের কোনো অবলুপ্ত পৃথিবীর কোনো পরিচিত মুখাবয়ব। কেননা কিছুই লুপ্ত হয় না পৃথিবীতে, বর্তমানের রূপের আড়ালে স্বপ্নের মতো সবই বিরাজ করে চিরকাল, আমরা মানুষেরা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেলেও স্বপ্নের জগৎ থেকে লোপ পাবো না কখনো।

এই সব কবিতায় সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে কবি সক্ষম হয়েছেন যেখানে পাঠকের অবিশ্বাস অবদমিত হয় স্বেচ্ছায়, রসের প্রাবল্যে। আর এটাই চরম কথা।

মনোকণিকা

কবিতার পরিমাপ কতখানি হওয়া সঙ্গত, এ প্রশ্ন যেমন মহাকাব্যের যুগের তেমন এই যুগেরও। অবশ্য সাময়িক পত্রিকার কল্যাণে বাংলা কবিতার একটা মোটামুটি আকার সীমা আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। তবু চার ছয় বারো লাইনের কবিতা ও সনেট যা কিছুদিন আগেও পত্রিকায় 'পাদপূরণের জন্য ব্যবহৃত হ'তো তার সঙ্গে শতাধিক পংক্তির বা তার কাছাকাছি আকারের কবিতার সম্মান-মূল্য সমান ছিল না। এখন দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ হ'লেও আমরাও এদের এক পংক্তিতে বসাতে চাই না।

গল্পের সঙ্গে ছোটগল্পের যে ভেদ, কবিতার সঙ্গে 'কবিতিকা'র তেমনই পার্থক্য আছে। একটি ছোট কবিতা ও একটি বড় কবিতা কি গুণগত ক্ষেত্রে সমান, এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েও আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেটা' বা 'পৃথিবী'র পাশাপাশি 'ধূসর গোধূলি লগ্নে' বা 'রূপ নারাণের কূলে'র কোনটি ভালো, বলা হয়তো কঠিন। কিন্তু একটার স্বাদ অন্যটায় মিলবে না।

আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে ছোট কবিতা যে ছিল না তা নয়—এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক' এবং পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসায়রের ছোট কবিতাগুলি অবশ্যই মনে পড়বে। অবশ্য প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে যাকে 'চিত্রকাব্য' বলা হয়েছে এগুলি সেই পর্যায়ের। একটুকু ভাব, একটা নীতিকথা, এক টুকরো কৌতুক এই কবিতাগুলির প্রাণ —পর্যাপ্ত রসমূল্য এদের আছে এমন মনে করা যায় না সর্বদা।

ছোট কবিতার এই রসমূল্য সম্পর্কে আমাদের প্রথম সচেতন করলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'জাপান যাত্রা' প্রবন্ধে এই উপলব্ধির খবর মিলবে, রবীন্দ্রনাথই একে 'কবিতিকা' ব'লে নামকরণ ক'রে সাহিত্যের আসরে বরণ ক'রে নিলেন। এগুলি আর ছন্দায়িত তত্ত্বমাত্র রইল না। তাঁর লক্ষ্য হ'লো জাপানী hokku-র মতো ক্ষুদ্রায়তনের চিত্র-রসময় কবিতা। আকারে ছোট ব'লে এদের ভাবগত বা শিল্পগত মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা', 'লেখন' ও 'স্ফুলিঙ্গে'র অধিকাংশ কবিতাই যে এই অর্থে কবিতিকা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু

লাজুক ছায়া বনের তলে
আলোরে ভালবাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে॥

কিম্বা

তুমি যে তুমিই ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।

এই জাতের আশ্চর্য রসোত্তীর্ণ কবিতা খুব বেশি সেখানেও নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ক্ষুদ্র কবিতা লিখতে হয়েছিল চলতি পথে স্বাক্ষর-শিকারীদের তাগিদে। ভাবনা ও অনুভূতির যে স্তব্ধতা থেকে সেরা কবিতার জন্ম হয় এভাবে অন্তত তা আশা করা যায় না।

আসলে ছোট কবিতার একটি বিশিষ্ট স্বরূপ-লক্ষণ আছে। ভাব সেখানে কঠিনতম সংযমে আবদ্ধ, তবু রস সেখানে নিবিড়। অনেক কবিতাতেই চেতনার এক দীপ্ত-উদ্ভাস দেখা যায়। ছোট কবিতার আয়তনের একটা পরিসীমা থাকা চাই, তবে ধরা যেতে পারে ১০।১২টি পংক্তির বা তার চেয়ে ছোট পরিধির কবিতাই কবিতিকা হ'তে পারে। অবশ্য পংক্তি গুণে কখনোই কবিতিকা কিনা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। আসল কথা এর সংযত-চরিত্র, পংক্তির সংখ্যা নয়। চর্যাপদের দশ পংক্তিতে রচিত কবিতাগুলি আকারে ছোট হ'লেও প্রকৃতিতে বড় কবিতাই বলতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের পরেও কয়েকজন নিষ্ঠার সঙ্গে এমন ছোট কবিতার চর্চা করেছেন। আমাদের অবশ্যই মনে পড়বে সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলের ফসল' আর 'মণিমঞ্জুষা'। প্রিয়ম্বদা দেবীর 'পত্রলেখা'তেও কয়েকটি সুন্দর কবিতিকা পাওয়া যাবে। একালের মধ্যে এমন ছোট কবিতায় জীবনানন্দ দাস, অন্নদাশংকর রায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কানাই সামন্ত ও মৃণালকান্তি দাসের সিদ্ধি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

জীবনানন্দ তাঁর ক্ষুদ্র কবিতার কয়েকটিকে 'মনোকণিকা' নাম দিয়েছেন। মনোকণিকা নামটিতে তাঁর কবিতিকার চরিত্র-স্বরূপ কিছু পরিমাণে ব্যক্ত হ'তে পারে। বারিবিন্দুতে যেমন সিন্ধুর স্বাদ পাওয়া যায় তেমনই এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাকণার মধ্যেও কবিমনের পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। 'রূপসী বাংলা'র এই ছোট্ট কবিতাটি যেমন—

সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা:
খড় মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে;
গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে;

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে ;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে ;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে ;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হ'য়ে আকাশে-আকাশে।

: পৃঃ ৬৮

এই শান্তি, এই স্তিমিত মন্থর গতিই 'রূপসী বাংলা'র মূল-স্বর। এই ছোট্ট কবিতার বাক্-সংযমের মধ্যেও তা অটুট রয়েছে। আকাশ-নক্ষত্রব্যাপী বিরাট পটভূমির সৌন্দর্য ও প্রেমিক হৃদয়ের মুগ্ধ প্রশান্তি একই প্রযত্নে এখানে এঁকে তোলা গিয়েছে।

জানি না কোথায় তুমি—সূর্য নিভে গেছে :
তোমার মননে আজ স্থির
সন্ধ্যার কুমোর পোকা—বাঁশের ছ্যাঁদার ঘূণ—
শাদা বেতফলের শিশির।

: তুমি

বিরহী চিত্তের যে আর্তি নিয়ে এই কবিতা, তা সূচনার একটি পংক্তির মধ্যেই পরিব্যক্ত। পরের তিনটি পংক্তি জুড়ে একটি অনুযোগ তিনটি নৈসর্গিক চিত্র অনুক্রমে অশ্রুপ্লুত বেদনায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রকৃতি ও হৃদয়ের সাজুয্যে এ কবিতাও অসামান্য রসোপেত।

আরো ছোট্ট একটি কবিতায়—

ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে
আমাদের দুজনকে নিতে চায় যেই শব্দহীন মাটি ঘাসে
সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনদিন সেদিকে যাবে না
তবুও পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চলে যায় কি গভীর সহজ অভ্যাসে।

: ঘড়ির দুইটি ছোটো (কবিতা)

কবিতাটির ক্লাসিক সংযম ও উত্তেজনাহীন আবেগ লক্ষ্য করতে হবে। মৃত্যুর শাশ্বত বেদনা এই প্রেমের কবিতাটির প্রাণ; মানুষের সাহস সংকল্প প্রেম অমরতার অভিলাষী অথচ ঘড়ির যুগল কাঁটার নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে মানুষের দেহ সব ইচ্ছা সাধ ব্যর্থ ক'রে দিয়ে প্রেমিকদের মৃত্যুর শীতল মৃত্তিকা প্রকোষ্ঠে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

এসব কবিতা আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও ভাবৈশ্বর্যে কোনো বড় কবিতা থেকে দীন নয়। এমনি একটি আশ্চর্য সার্থকতার কবিতা—

এখন অনেক রাতে বিছানা পেয়েছে
নরম আঁধার ঘর
শান্তি নিস্তব্ধতা
এখন ভেবোনা কোনো কথা
এখন শুনোনা কোনো স্বর
রক্তাক্ত হৃদয় মুছে
ঘুমের ভিতর
রজনীগন্ধার মতো মুদে থাকো।

: কোনো ব্যথিতাকে

কথকের হৃদয়ের অনুচ্চারিত ভালবাসা, ব্যথিতাকে সব আঘাত থেকে আড়াল ক'রে শুশ্রূষা ও শান্তি দিতে চেয়েছে। সমবেদনার এই রকম সুস্নিগ্ধ প্রকাশ জীবনানন্দের কবিতায় শুধু নয় বাংলা কবিতাতেই দুর্লভ।

এই রকমই আরেকটি ছোট নিসর্গপ্রীতির কবিতা—

এখন রজনীগন্ধা—প্রথম—নতুন—
একটি নক্ষত্র শুধু বিকেলের সমস্ত আকাশে;
অন্ধকার ভালো ব'লে শান্ত-পৃথিবীর
আলো নিভে আসে।

অনেক কাজের পরে এইখানে থেমে থাকা ভালো;
রজনীগন্ধার ফুলে মৌমাছির কাছে
কেউ নেই, কিছু নেই, তবু মুখোমুখি
এক আশাতীত ফুল আছে।

: রজনীগন্ধা (কবিতা)

আঁধার আকাশের বিশাল নীরব পটভূমিকায় একক নক্ষত্রের মতো, বিকেলের নির্জনতায় নতুন রজনীগন্ধার প্রথম ফুলে একটি মৌমাছির মতো, কবিতাটিকেও আশাতীত মনে হ'তে পারে আমাদের।

আসলে প্রকৃতিই জীবনানন্দের কবি-সত্তার আশ্রয়ভূমি। মানব জীবনে প্রকৃতির অসীম দাক্ষিণ্যই তাঁর কবিতার একটি মূল বাণী। সেই ভাবনাই বার বার তাঁর মনে দোলা দিয়ে গেছে;

এখানে নক্ষত্রে ভ'রে রয়েছে আকাশ,
সারাদিন সূর্য তার প্রান্তরের ঘাস;

ডালপালা ফাঁক ক'রে উঁচু উঁচু গাছে
নীলিমা কি চায় যেন আমাদের পৃথিবীর কাছে।

চারদিকে আলোকিত রোদের ভিতরে
অনেক জলের শব্দে দিন
হৃদয়ের ক্লান্তি ক্ষয় কালিমা মুছিয়ে
শুশ্রূষার মতো অন্তহীন।

: **এখানে নক্ষত্রে ভ'রে**

বিপুল মহাপ্রকৃতি তার সজীব সৌন্দর্য নিয়ে ব্যাপ্ত মহিমা নিয়ে মানুষের ক্লান্তি ক্ষয় কালিমা অনন্ত শুশ্রূষায় মুছে মুছে যায়। আর সুনীল আকাশ যেন কিসের অসীম প্রত্যাশায় চেয়ে থাকে পৃথিবীর দিকে।

কিন্তু প্রকৃতি বা প্রেমের কবিতাই শুধু কেন, রসের বিচিত্রতাও মনোকণিকার এক আশ্চর্য সম্পদ। দুটি উদাহরণ দেবো—

১। মানুষ সর্বদা যদি নরকের পথ বেছে নিতো—
(স্বর্গে পৌঁছুবার লোভ সিদ্ধার্থও গিয়েছিলো ভুলে),
অথবা বিষম মদ স্বতই গেলাসে ঢেলে নিতো,
পরচুলা এঁটে নিতো স্বাভাবিক চুলে,
সর্বদা এ-সব কাজ ক'রে যেত যদি
যেমন সে প্রায়শই করে,
পরচুলা তবে কার সন্দেহের বস্তু হ'তো, আহা,
অথবা মুখোশ খুলে খুশি হ'তো কে নিজের মুখের রগড়ে।

: **মানুষ সর্বদা যদি**

২। পৃথিবীতে তামাশার সুর ক্রমে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে
জন্ম নেবে একদিন। আমোদ গভীর হ'লে সব
বিভিন্ন মানুষ মিলে মিশে গিয়ে যে-কোনো আকাশে
মনে হবে পরস্পরের প্রিয়-প্রতিষ্ঠ মানব।
এই সব বোধ হয় আজ এই ভোরের আলোর পথে এসে
জুহুর সমুদ্র পারে, অগণন ঘোড়া ও ঘেসেড়াদের ভিড়ে
এদের স্বজন, বোন, বাপ-মা ও ভাই, ট্যাঁক, ধর্ম মরেছে;
তবুও উচ্চস্বরে হেসে ওঠে অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

: সমুদ্র তীরে :

এই রকমই মহাপৃথিবীর, 'ফিরে এসে', 'ইহাদেরি কানে', বনলতা সেনের 'হায় চিল', 'কমলা লেবু', 'হাজার বছর শুধু খেলা করে', 'স্বপ্নের ধ্বনিরা', 'ধানকাটা হয়ে গেছে', সাতটি তারার তিমিরের 'যেই সব শেয়ালেরা,' 'সপ্তক', সুদর্শনার 'জল', 'কে এসে যেন,' 'রশ্মি এসে পড়ে,' 'অন্তর বাহির,' 'অনেক রক্তে', 'আজ', 'মরুতৃণোজ্জলা,' 'হে জননী হে জীবন,' এই সব কবিতার রসবৈচিত্র্য ও স্বাদের তুলনা হয় না। কিন্তু এগুলি নিয়ে আগে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে ব'লে এখানে বাদ দেওয়া হ'লো।

তবু একথা ভেবে বিস্মিত হ'তে হয় প্রতিটি ছোট কবিতায় জীবনানন্দের এই অসামান্য সিদ্ধির হেতু কি? সাতটি তারার তিমিরের 'সপ্তক' কবিতাটির কথাই ধরা যাক্। সেখানে সরোজিনীর সমাধিক্ষেত্রের কাছে এসে ভাবনার স্রোত এলো কবির মনে।

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে; জানি না কে এইখানে শুয়ে আছে কি না—

: সপ্তক

প্রথম পংক্তি থেকে পাঠকের সমস্ত প্রত্যাশাকে মুহূর্তে মুহূর্তে পরাভূত ক'রে চমকপ্রদ নূতনত্বের স্বাদ দিয়ে তৃপ্ত করতে করতে ভাব ও ভাবনা পরের পংক্তিতে গড়িয়ে চলেছে। দিনের শেষে যে অন্ধকার নেমেছিল সেই অন্ধকার আবার আলোর আবেগে যেমন জেগে ওঠে; দিনের ক্লান্তির শেষে রাত্রির বিশ্রাম, রাত্রির শয়ন থেকে পুনরাবর্তিত আলোর ঢেউয়ের মতো কেউ কি চ'লে যায় দূরবর্তী মেঘের আড়ালে, কল্পনার স্বর্গলোকে যীশুখৃষ্টের পুনরুত্থান হয়েছিল যেমন। অথবা সে কি মৃত্তিকার গভীরে জ্যামিতিক অস্তিত্বের মতো র'য়ে গেছে? জ্যামিতিক শাস্ত্রে অন্তত তার কিছু উত্তর মেলে না। লুপ্ত বেড়ালের শূন্য চাতুরীর মূঢ় হাসির মতো এক জাফরান আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশের বুকে লেগে থাকে শুধু।

ছোট ছোট কবিতায় এমন ভাব ও রসের বৈচিত্র্য ও নৈপুণ্যের এটাই সম্ভবত কারণ যে, এইসব মনোকণিকার সৃষ্টিতে তাঁর সামগ্রিক প্রয়াস ও হৃদয়ের ভালবাসা ছিল। কবি যখন এদের ছোট ব'লে উপেক্ষা করেন নি, আমাদেরও এগুলিকে অবহেলা করার অধিকার নেই।

সুদর্শনা ও অন্যান্য

জীবনানন্দের কোনো নূতন কবিতাগ্রন্থের প্রকাশ, কাব্য-প্রেমিকদের কাছে নিঃসন্দেহে আনন্দ সংবাদ। তাই যাঁর অনলস উদ্যোগে ও শ্রমে 'সুদর্শনা' প্রকাশিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের সেই তন্নিষ্ঠ সেবক শ্রীযুত গোপালচন্দ্র রায় সকলের অকুণ্ঠ ধন্যবাদার্হ। আরও আনন্দের খবর শুধু এই বইয়ের চল্লিশটি প্রেমের কবিতাই নয়, নানা গ্রন্থাগার ও ব্যক্তির সংগ্রহ ঘেঁটে ও অন্যান্য জীবনানন্দ অনুরাগীর সহায়তায় আরো শতাধিক কবিতা তিনি সংগ্রহ করেছেন। তাঁর লেখা জীবনীগ্রন্থ 'জীবনানন্দ'-এর পরিশিষ্টে সতেরোটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যাশা করা যায় বাকি কবিতাগুলি এক বা একাধিক সংকলন গ্রন্থে অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হবে।

এ সবই সুখের কথা। এবং 'সুদর্শনা'র কবিতাগুলি প'ড়ে আমরা যে পরিতৃপ্ত হয়েছি একথা বলারও অপেক্ষা রাখে না। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৪ সালের নিকটবর্তী সময়ে রচিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এই সব কবিতা যদিও কবি কর্তৃক পরিমার্জিত হবার সুযোগ পায়নি তবু জীবনানন্দের পরিণততম চিন্তা, উপলব্ধি ও কাব্যশৈলীর প্রকাশ যে এতে হয়েছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। 'বেলা অবেলা কালবেলা'তে ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত রচিত কবিতা ছিল। এই বই শুধু যে 'বেলা অবেলা কালবেলা'র সমকালীন ও সমান্তরাল তাই নয়—এতে জীবনানন্দের জীবনের শেষ চারটি বছরের (১৯৫১—১৯৫৪) বেশ কিছু কবিতা বিধৃত হয়েছে যে অধ্যায় শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তর্ভুক্ত বিরল সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণ পাঠকদের এতদিন অপরিজ্ঞাতই ছিল। সুদর্শনার প্রকাশে এই আমলের প্রেম সম্পর্কিত কবিতার বিকাশ আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম।

কিন্তু সে আলোচনার আগে ব্যক্তিগত একটা আক্ষেপের কথা উল্লেখ করি। জীবনানন্দের যে কোনো গ্রন্থের প্রকাশকালে সাধারণভাবে সম্পাদক প্রকাশকদের যে যত্ন, সুরুচি ও সংযমের পরিচয় পেতে আমরা অভ্যস্ত তার অভাব এখানে আমাদের যথেষ্ট বেদনা দিয়েছে। প্রচ্ছদের অত্যন্ত অপটু অংকন বা পরিকল্পনা থেকে তার শুরু। আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-সজ্জা, সূচীপত্রের পরেই বাগ্-বহুল বিস্তারিত ভূমিকা আমাদের সুখী করতে পারেনি। 'মহাপৃথিবী'র সিগনেট সংস্করণে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সূচনায় নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সংযোজিত কবিতাগুলি সাজিয়ে দিয়েছিলেন এবং গ্রন্থের পরিশেষে আপন বক্তব্য 'সম্পাদকের নিবেদন' শিরোনামায় সংযত সংহতভাবে লিখেছিলেন এখানে দুঃখের বিষয় তার পরিচয় মিললো না।

কবিতার বইয়ের ভূমিকায়, কোন পত্রিকার সন্ধান কোথায় পাওয়া গেল বা গেল না তা সম্ভবতঃ আলোচ্য নয়। এর মধ্যে উপস্থাপিত চিঠিগুলি এবং তার বিশ্লেষণ যদিবা জীবনীগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো—এখানে তার সন্নিবেশ অবান্তর। জীবনানন্দের কবিতা পরিমার্জনের নেশার উল্লেখ ক'রলেই আমাদের মতে পর্যাপ্ত হ'তো। জীবনানন্দের কিছু কবিতার নামকরণ অন্যেরা করেছেন তা কি সম্পাদক মহাশয় মূল পাণ্ডুলিপি দেখে নিশ্চিত হয়েছেন? নইলে 'কোনো ব্যথিতাকে' প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন ও অযুক্তিসিদ্ধ। যাই হোক, সম্পাদকীয় ভূমিকা এক পৃষ্ঠার বেশি হ'লে বইয়ের পরিশিষ্টে দেওয়াই শোভন ও সঙ্গত হ'তো। আমরা আশা করবো এই বইয়ের ভবিষ্যৎ সংস্করণের সময়ে এবং অন্যান্য সংকলন গ্রন্থের প্রকাশকালে শ্রদ্ধেয় গোপালবাবু পাঠকদের এই প্রত্যাশা পূর্ণ করবেন।

গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির বিন্যাসে গোপালবাবু সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত বিষয়ক্রম অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। অভিনিবেশী পাঠে প্রতীত হবে এর সব ক'টি কবিতাই যে প্রকৃতপক্ষে প্রেমের কবিতা—একথা বলা যায় না। এবং তাঁর এই বিন্যাসরীতিও সুফলপ্রসূ হ'তে পারেনি। বিষয়ের যত বৈচিত্র্যই থাক যে কোনো কবিতা গ্রন্থ আগাগোড়া প'ড়ে গেলে একটা ভাবের বিকাশ আমরা অনুভব বা প্রত্যাশা করি। যেহেতু এটি প্রেমের কবিতার বই সেজন্য অন্তর্লীন যোগসূত্র রচনা সহজ সাধ্য ছিল। কিন্তু স্থূলভাবে বিষয়বিন্যাস করতে গিয়ে সম্পাদক মহাশয় ভুল করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেননি যখন রচনাগুলির কালগত ব্যবধান এত বেশি তখন তার ভাব ও বিষয় ভঙ্গিগত বিকাশের দিক থেকে সাজালে পাঠকরা আরো বেশি তৃপ্তি পেতে পারতেন। গ্রন্থের নামকরণ বিষয়েও সম্পাদক নিষ্প্রয়োজনে নানা কথা বলেছেন। অভিনয় কলায় 'নেপথ্যে-বিধান' ব'লে একটা কথা আছে তার প্রয়োজনীয়তা এই প্রসঙ্গে বারবার মনে পড়ছে।

'সুদর্শনা'র কবিতাগুলিকে যদি মোটামুটি কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায় তবে তার মধ্যে জীবনানন্দের প্রেমভাবনার বিকাশ ও বিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর 'আজ (২)' 'ফসলের দিনে' প্রভৃতি কবিতায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রেম কবিতা-গুলির অনুরূপ ভাব ও ভাষার বিন্যাস লক্ষ্য করা যাবে। সেখানে কবির প্রেমিকসত্তা যে নারীর কাছে প্রেমের আর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সেই বধির বিমুখ নারী অন্য পথগামী। কবি অনুভব করেন হয়তো অন্য কোনো প্রেমিকের উদ্দেশ্যে সেই ইঙ্গিতার অন্তরে প্রেমের উৎসার হ'তে পারতো, কিন্তু আজ দুর্দশা-চক্রে তাঁর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে সে নিপ্রেম ও উদাসীন। তাতে দুঃখ নেই। কেননা নারীর প্রেম শুধু প্রেমিকেরই লভ্য। কিন্তু যে হৃদয়বত্তা পুরুষ মাত্রেরই প্রত্যাশা তাও কেন দুর্লভ হ'লো?

অথচ একদিন তো এই নারীই প্রেমের দাক্ষিণ্য নিয়ে এসেছিল। আজ আর সেই দয়িতামূর্তিতে সে ফিরবে না, তবু কালের মহিমায় নূতন চেতনার ঐশ্বর্যে নবীন প্রেমিকের মতো তিনি ফসলের গন্ধে ভ'রে উঠেছেন।

এর পরের স্তরের কবিতার নমুনা হ'লো 'এখন এ পৃথিবীর' এবং 'নদী নক্ষত্র মানুষ'। এ পর্যায়ের কবিতার সঙ্গে বনলতা সেনের প্রেমচেতনার মিল পাওয়া যাবে ;—বিশেষ ক'রে 'দুজন', 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে। এখানেও হৃদয়ের 'বিষণ্ণ গোধূলিতে', আকাঙ্ক্ষার সুতীব্র আবেশ যখন নষ্ট হ'য়ে গেছে নারী পুরুষ পাশাপাশি অঘ্রাণ প্রান্তরে নেমে এলো। নিসর্গের সান্নিধ্যে প্রেম ও বাসনার পুনরুন্মেষ ঘটলো তাদের ; তবু তারা অনুভব করলো যে চেতনা অতীতে অর্থময় অভিব্যক্তি পেতে পারতো সেই প্রেম আজ দেহ থেকে ফুরিয়ে গিয়েছে, হৃদয়কে অঙ্গীকার ক'রে প্রকৃতির মাঝে এসে দাঁড়ালে পুরানো ভালবাসা নূতন পথ কেটে নেবে এই আশ্বাস এই দুঃখী মানুষ দুটি খুঁজে পেতে চেয়েছে।

'হে জননী, হে জীবন', 'শবের পাশে', 'অন্ধকারে', 'চিঠি এলো', 'ইতিবৃত্ত' প্রভৃতি কবিতায় 'সাতটি তারার তিমিরে'র সমান্তরাল অনুভূতি দেখা যায়। আরো পরের পর্যায়ের কবিতার দৃষ্টান্ত হ'লো 'এই পথ দিয়ে', 'অন্তর বাহির', 'আলোকপাত', 'অনির্বাণ', 'স্বাতীতারা', 'রাত্রি ও ভোর', 'আমি'। আর অন্তিম কবিতার মধ্যে 'তুমি আলো,' 'তোমার আমি', 'এসো', 'তোমার আমি (২)', 'তোমার আমার', 'জল', 'কে এসে যেন,' 'রশ্মি এসে পড়ে', 'হৃদয় তুমি', 'মনকে আমি', 'তুমি আজ', 'অনেক রক্তে', 'মরু তৃণোজ্জ্বল', 'তুমি', 'কোনো ব্যথিতাকে', 'এখন ওরা', 'তোমাকে', 'শান্তি ভাল' ইত্যাদি। এই শেষ পর্যায়ে কবিতা কেমন নির্ভার অনুভূতিঘন, সরল, ছন্দোময়।

তুমি আলো হতে আরো আলোকের পথে
চলেছ কোথায়
তোমার চলার পথে কি গো তপতীর
ছায়ার মতন থাকা যায় !
হয়তো আলোর ছায়া নেই ;
আলো তুমি তবুও তো—
আলো তুমি ছায়ারও মনেই ;
বাহিরে বিশাল ঐ পৃথিবীর জাতীয়তা অ-জাতীয়তায়
তুমি আলো।

: তুমি আলো :

দয়িতাকে এইভাবে তুমি ব'লে সম্বোধন করা তাকে এমন আলোর সঙ্গে, জলের সঙ্গে, নদীর সঙ্গে সমীকৃত ক'রে দেখা কবিতার বক্তব্যের এমন মিষ্টিক উৎসার শেষ পর্বের বৈশিষ্ট্য।

ভাষার যে বিবর্তনের কথা বলেছি তাও কবিতার এই কালানুক্রম অনুসরণ করলেই বোঝা যায়। প্রথম পর্যায়ের 'আজ (২)', 'ফসলের দিনে' প্রভৃতি কবিতায় যে ধরনের কৃত্রিম কাব্যিকতা ছিল তার উদাহরণ :

১। আমার হাতের কাজ আজ রাতে। **গিয়াছে ফুরায়ে—**

: আজ (২)

২। আমারে **বাসনি** ভাল তবু আজ ফসলের ভারে
নূতন ধানের গন্ধে **উঠিয়াছি** ফ'লে
নবীন প্রণয়ী আমি—পৃথিবীর কোলে
চেয়ে আছি—আসিবে কখন।

: ফসলের দিনে

কবিতার জন্য পৃথক কোনো পরিভাষা চাই না—এমন কোনো আপ্তবাক্যে জীবনানন্দের আস্থা ছিল না। তাঁর আজীবনের কবিতা তার প্রমাণ দেবে। যে কোনো উৎসজ-শব্দচয়ন ক'রে কবিতা লেখায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। ২নং দৃষ্টান্তে দেখা যাবে ছন্দের সৌকযার্থে কথ্য ক্রিয়াপদের পাশে সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহারেও তাঁর দ্বিধা নেই। অথচ পরে ভাষা ব্যবহারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির যে আমূল রূপান্তর ঘটেছিল তার প্রমাণ :

৩। কে এসে যেন অন্ধকারে জালিয়ে দিল বাতি,
বল্লে 'আমার অপার আকাশবলয় থেকে স্বাতী
তোমার ঘরে এসেছে আজ নেমে ;'

: কে এসে যেন

৪। ঝেঁজে ওঠে পাপীতাপীদের গালাগালি ;
চারিদিকে মানুষের মৃত্যু হয় মাছির মতন ;
মনে হয় অন্তরীক্ষে সৃষ্টির মরালী
হয়ে যেতে—তুমি যদি সে রকমের আশ্বাসের দেশে
রয়ে যেতে ;

: রশ্মি এসে পড়ে

৫। বিষণ্ণতা তাও **নেই**—পাতা ঝরবার
স্বর শুনি, ঢেউ নড়বার শব্দ পাই ;
এই পৃথিবীতে যেন কিছু নেই আর।

: নদী নক্ষত্র মানুষ

চিরাভ্যস্ত সাধু ক্রিয়াপদ যোজনার রীতি বর্জন করেছেন এখানে। এ পরিবর্তন শুধু দ্রুতলয়ের শ্বাসাঘাত ছন্দের জন্যই হয়নি। ধীর লয়ের তানমুখ্য ছন্দেও তিনি এই রীতি অনুসরণ করেছেন। কোনো কৃত্রিমতাই রাখতে চাননি ব'লে ৫নং দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে পাই শব্দের পূর্বক্রমে পরের পংক্তিতে 'নাই' লিখলে যে অনুপ্রাসের শ্রুতি-সুখকরতা পাওয়া যেত তাও সযত্নে পরিহার করেছেন।

প্রেমের অর্থকে যথেষ্ট প্রসারিত না করলে 'সবার ওপর', 'কে এসে যেন', 'অনির্বাণ', 'ইতিবৃত্ত' বা 'হে জননী, হে জীবনে'র মতো কবিতাকে প্রেমের কবিতা বলা যায় না।

রস-পরিণাম

আগেই বলা হয়েছে কোনো বিশেষ কবিতা বা বিশেষ যুগের কবিতা দিয়ে জীবনানন্দের কবিকৃতির পূর্ণ বিচার করা যায় না। কারণ সেগুলি যেমন স্বতন্ত্র অনুভূতির কবিতা তেমনই সেই সব 'মুডে'রও আবার ক্রমবিকাশ ও ক্রমাভিব্যক্তি আছে। 'ঝরাপালকে'র কবি যেমন কালে ও মনোভঙ্গিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম ইত্যাদির সগোত্র, কাব্যকৃতিতেও তেমনই বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্যের অনুসারী। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কল্পনার ঐশ্বর্যে তিনি আবার নূতন ঐতিহ্য সন্ধানী। 'রূপসী বাংলা'র গ্রামীণ সংস্কৃতিবোধ, 'বনলতা সেনে'র ইতিহাসনিষ্ঠ প্রেম, 'মহাপৃথিবী'র নৈরাত্ম্য বিশ্বাস, 'সাতটি তারার তিমিরে'র আত্মবীক্ষণশীল ইতিহাসদৃক্ষা এবং মৃত্যুর অব্যবহিত প্রাগ্বর্তী আস্থা ও আশ্বাসের অনুভূতি—এর কোনোটাই একক ভাবে সম্পূর্ণ নয়। সব মিলিয়েই জীবনানন্দের কবি-সত্তার পরিপূর্ণ পরিচয়।

এমনি অখণ্ডদৃষ্টিতে যদি বিচার করি, তবে তাঁকে মূলত কোন রসের কবি ব'লে গ্রহণ করবো? আমরা দেখেছি তিনি প্রেমিক কবি, কিন্তু কখনো প্রকৃত প্রেমের কবিতা লেখেননি। আনন্দের বা ব্যথার গানও তিনি গাননি। অদ্ভুত রসের প্রতি তাঁর বিশিষ্ট আকর্ষণ ছিল। শকুন পেঁচা উট ব্যাঙ প্রভৃতি কদাকার প্রাণীরা তাঁর লেখাতে আদিকাল থেকে আসর জমিয়েছে। মৃত্যু, রক্ত, শিকার, ভ্রূণ, কিছুই তিরস্কৃত হয়নি সেখানে। কোথাও কাঞ্চীবিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরেছে। কোথাও বা হাইড্রাণ্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠ রোগী জল চেটে নিয়েছে।

শত-শত শূকরের চীৎকার সেখানে,
শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর ;
এইসব ভয়াবহ আরতি !

: অন্ধকার

চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শশা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে
যে-সব হৃদয় ফলিয়াছে
—সেই সব।

: বোধ

জীবনের কোনো ঘটনাকেই কোনো অভিজ্ঞতাকেই তিনি কাব্যের জগতে এড়িয়ে যেতে নারাজ। এই জন্যেই তাঁর কবিতার বিশিষ্ট মনোভাবের সঙ্গে যাদের প্রাক্ পরিচয় নেই তাদের কাছে এসব কবিতা কেমনতরো লাগে। হঠাৎ কোনো শব্দ বা প্রসঙ্গ এমন ভাবে আসে যার জন্যে মনের প্রস্তুতি নেই। তাই প্রথমে কিছু কিছু আলোচক নির্মম হ'য়ে ওঠেন তাঁর বিরুদ্ধে, কিন্তু তাঁর মেজাজের স্বাদ পেলে এই অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে না। তাঁরা বোঝেন, সুন্দর কুৎসিতের প্রচলিত ব্যবহারিক মানদণ্ডে নয়, পৃথক বিশুদ্ধ রূপাত্মক বিচারেই এ সব প্রসঙ্গের প্রয়োগ হয়েছে।

পূর্বাপর সর্বত্রই এটা অনুভব করতে হয় কবিতা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-বিশ্বাস-অনুভব ও অভিজ্ঞতা আমাদের মতো নয়। কবিতা তাঁর কাছে শিল্প নয়—সাহিত্যও নয় আদৌ। রিয়ালিজম্, আইডিয়ালিজম্, ন্যাচারালিজমের ছকটানা চিন্তার খোপে তাকে মেলানো যাবে না। এই সব তুচ্ছ বিতর্কের চেয়ে অনেক উপরের, অনেক দূরের জিনিষ কবিতা। কি হ'লে কবিতা হয়—সে সম্পর্কে প্রাচীন কলাবিধিকে অত্যন্ত অপূর্ণ, হাস্যকরভাবে সংকীর্ণ মনে হবে এসব কবিতার স্বাদ পেলে। কবিতা জীবন নয়, জীবনের দর্পণ নয়, জীবনের ব্যাখ্যাও তাকে বলা চলে না—কবিতা জীবনের নব নব বোধ ও অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যক্তির আত্মউদ্ঘাটনের রেখালিপি—অভিব্যক্তির অপ্রতিরোধ্য আবেগ অথবা আরো অতল অগম অস্পর্শ কিছু।

রিয়ালিষ্টিক কবিতা লেখার মোহে অথবা শিল্প সৃষ্টির তাগিদে এই উপলব্ধিটি জীবনানন্দ বিস্মৃত হন নি। তিনি জানতেন বাস্তব জগতের অসুন্দর—কাব্যের জগতে অপাংক্তেয় নয়। কিন্তু তাকে স্থান ক'রে দিতে গেলে জীবনের প্রগাঢ় অনুভবের মধ্যে অন্বিত ক'রে আনতে হবে, তবেই তা সার্থক হ'য়ে উঠবে। অসুন্দরের সৌন্দর্য তার

অসংশয় অস্তিত্বের মধ্যে, তার ব্যক্তিত্বময় স্থিতির মধ্যে। যে শক্তির বলে জগতে সুন্দরের পাশাপাশি তারা টিকে থাকে, আমাদের মনের মধ্যেও সেই শক্তির সঙ্গে তাদের সংলগ্ন ক'রে দিতে হবে। তখন তাদের সেই অবিনাশী আত্মতা সেই অপ্রতিরোধ্য আগমনকে তুচ্ছ রূপের দোহাই দিয়ে রোধ করা যাবে না। তাদের অস্বীকার করতে গেলে আমাদের নিজের অস্তিত্বও বিপন্ন হ'য়ে ওঠে।

এই ভাবেই পূর্বোক্ত বীভৎস প্রসঙ্গগুলো এসেছে ব'লেই আমাদের অন্তরের বিরূপতা ছাপিয়েও ভালোমন্দের অনুভূতি সরিয়েও তা সম্পূর্ণ চেতনা অধিকার ক'রে বসে। লাসকাটা ঘরের শব যখন সাহিত্যে আসে তখন সুন্দর কুরূপের প্রশ্নই নয়—সে দুর্লঙ্ঘ্য, দুর্বার, মোহময়। এই জন্যেই তথাকথিত রিয়ালিষ্ট কবিদের মতো বস্তুরসের কাব্য লিখতে তাঁকে জোর ক'রে রোমান্টিসিজম্ বর্জন করতে হয়নি, অথবা বস্তু জগতে হাতড়ে বেড়াতে হয়নি।

তবু জীবনানন্দ অদ্ভুত রসের কবি নন। অদ্ভুত রসের আবেদন আছে ব'লেই আমরা তাঁর কবিতা পড়ি একথা যথার্থ নয়। তাঁর কাব্যের মূলরস ঈষৎ বিস্ময় মিশ্রিত শান্তরস। ধীর লয়ের বাইশ অক্ষরের প্রবহমান পয়ার ও মুক্তক ছন্দই তাঁর প্রতিভার প্রকৃষ্টতম বাহন। কবিতায় স্বরের বিশেষতঃ দীর্ঘ স্বরের আধিক্য, প্রেম-সম্পর্কীয় কবিতায় মিত-আবেগ স্বগতোক্তিও এই শান্ত মেজাজ-জনিত।

তথাপি শান্ত-রসকে কাব্যের মূল রস হিসাবে গ্রহণ করাতে আপত্তি ওঠা উচিত। মনে হয় যেখানে কাব্যগুণের কোনো কারণ দেখানো যায় না সেখানেই অগত্যা শান্তরসের কল্পনা করা হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ শান্তরসের কবিতা যদি রসোত্তীর্ণ হয় তবে তার মূলে অবশ্যই অন্য কোনো কারণ নিহিত থাকবে। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে সেই মূলরস প্রধানত 'রোম্যান্টিক' রস! সুদূরের মোহ ও সৌন্দর্যের অনুরাগ এই রোম্যান্টিকতার লক্ষণ। সৌন্দর্য মানে এখানে জাগতিক রূপসুষমা নয়, সঙ্গতি-সঞ্জাত রম্যানুভূতি। সুতরাং তথাকথিত কুরূপ যখন যথোপযুক্ত পরিবেশে স্থাপিত হ'য়ে সৌন্দর্যময় সঙ্গতি পেয়েছে তখন তাই সুন্দর হ'য়ে উঠেছে—তাই কবির কাব্যে আশ্রয় পেয়েছে। কেননা পরিণামী বিচারে জীবনানন্দের কবিপ্রাণ সৌন্দর্যেরই সাধক। তাঁর এই 'রোম্যান্টিক' মনোভঙ্গিই তাঁকে সুমিষ্ট নামের প্রতি, সুমিষ্ট নাম সম্বলিত বস্তুর মেঘসিঁড়ি, নীলডানা, হিজল, জলপিপি, বনঝাউ ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট করেছে। এই 'রোম্যান্টিক' রসই কখনো ইতিহাসচেতনায় কখনো কল্পনার ঐশ্বর্যে কখনো বাস্তব জীবনসম্ভূত মানব রসে বিলসিত হয়েছে। এই 'রোম্যান্টিক' রসই আবার পরিণতির ধাপে ধাপে 'মিষ্টিসিজমে' উপনীত হয়েছে।

কথাসাহিত্য

কথাশিল্পী

১৯৪৬ সালে একটি চিঠিতে আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে কবি জীবনানন্দ লিখেছিলেন :

"আমি খুব সম্ভবতঃ জাত সাহিত্যপ্রেমিক। যে আবহাওয়ায় ছিলাম তাতে উত্তরকালে ভালো সাহিত্যরসিক হয়েই মুক্তিলাভ করা যায় না, নিজের তরফ থেকে কিছু সৃষ্টি করবারও সাধ হয়। ছেলেবেলা থেকেই গল্প উপন্যাস—স্বদেশী ও বিদেশী নেহাৎ কম পড়েনি। ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচেনি। শ্রেষ্ঠ সমালোচনাও অবসরের অভাবে দানা বাঁধতে পারছে না। না পারছি মহৎ নাট্য-সমালোচকের নেতিবাচক নিরাশা ভঙ্গ করে তেমন কিছু নাটক লিখতে। এই দারুণ সংগ্রাম কঠিন সময়ে নানা রকম আধিদৈবিক দায়িত্ব মিটিয়ে যেটুকু সময় থাকে তাতে সাহিত্যের বোঝা একরকম অভিব্যক্তি (যেমন কবিতা) নিয়েই যতদূর সম্ভব পটভূমির প্রসার ও গভীরতা বাড়ানো যায়, সেই চেষ্টাই করা যেতে পারে। কিছু পরিমাণে এই জন্যই কবিতা লিখতে উৎসাহ পেয়েছি।"

জীবনানন্দের সাধ ও সাধনার একটা আভাস এ চিঠিতে আছে মনে হয়। আর তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত তিনটি গল্প ও একটি উপন্যাস পড়লে মনে হয় তাঁর এই ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার হওয়ার সাধ তাঁরই লেখা আগাগোড়া শরীরটা দিয়ে কানার তাঁত বোনার অভিলাস বা নুলো শাঁখারীর হাতে করাতের কার্যকারিতা মাত্র নয়—এটুকু অন্তত বিশ্বাস হবে। কল্লোল কালি-কলমের যে কবিরা বাংলা কথাসাহিত্যের উত্তাল আলোড়ন তুলে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন ক'রে নিয়েছিলেন। সেই প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসুর মতো জীবনানন্দও যে কথাসাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী হ'তে পারেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিস্ময়ের কথা হ'লো জীবনানন্দের প্রথম গল্প 'ছায়ানট' ১৯৩২ এবং দ্বিতীয় গল্প 'গ্রাম ও শহরের গল্প' ১৯৩৬ সালে লেখা হ'য়ে গেলেও এবং তা অল্পবিস্তর আঙ্গিকে ও বিষয়মাহাত্ম্যে আকর্ষণীয় হ'লেও কেন তার মৃত্যুর আগে তা আলোর মুখ দেখলো না। শ্রীসুনীলকুমার নন্দী অনুমান ক'রে নিয়েছেন যে তার কবিতারই অনুরাগীর সংখ্যা কবির জীবিতকালে যখন তেমন ছিল কিনা সন্দেহ, তখন চারপাশের এই অশিক্ষিত বেদরদীর ভিড়ে গল্প-উপন্যাসের উপস্থাপনায় তার অভিমান-মিশ্র দ্বিধা আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

জীবনানন্দের মতে তার কবিতায় তার 'যুক্তিধর্মী মানস আধুনিক সময়ের সমস্ত সঙ্গ ও অহেতুকতার সংস্পর্শে এসে কবিমানসের দৃষ্টি উজ্জ্বলতায় রূপান্তরিত হ'তে

চেয়েছে।' একথা তাঁর গল্প উপন্যাস সম্পর্কে সম্ভবত আরো বেশি মাত্রায় সত্য। আধুনিক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই যে বাস্তব পৃথিবী ও জীবন তাঁর যুক্তিধর্মী মানসপটে যেভাবে আলোড়ন তুলেছে তার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষতর চিত্রই হ'লো তাঁর গল্প ও উপন্যাস। তাঁর রচনার কাল, সেই কালের মানুষ এবং সেই মানুষের চরিত্র ও চিন্তাধারা এবং তার অবচেতনার আশ্চর্য রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

জীবনানন্দের গল্পত্রয়ীর কোনোটাই শিল্পের আঙ্গিকে অথবা বিষয়গৌরবে বাংলা-সাহিত্যে অনন্যসাধারণ বা অবিস্মরণীয় কিছু নয়। বস্তুত পাঠকের কাছে এগুলির যে বিশেষ আকর্ষণ ও আবেদন তা প্রথমতঃ এগুলি কবি জীবনানন্দের রচনা ব'লে এবং কবির কলমে লেখা ব'লে, তার ভাবে এবং উপস্থাপনায় কবিকর্মের অনপমেয় স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ ব'লে। কবিতায় জীবনানন্দকে আমরা যেভাবে দেখি বা চিনি গল্পের মধ্যে জীবনানন্দের সেই ভাবরূপ পরিবর্তিত হয় না—শুধু তাঁর কবিপ্রতিভার অস্পষ্ট বহিরেখাগুলি স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে মাত্র।

কিন্তু তাই নয়, জীবনানন্দের কবিতায় যে একটি বিশেষ স্বাদ পাই এখানে তা মিলবে না। এখানে তিনি আরো পার্থিব আরো জৈবিক স্থূলতর একটু কোথাও কোথাও এবং পদপ্রয়োগে তাঁর মাটিঘেঁষা চমৎকারিত্বের চেহারাটাও দেখতে পাচ্ছি এখানে। কবিতার মধ্যে পাই কবির নিজের কথা। গল্প উপন্যাসে, নাটকে চরিত্রের মুখে চরিত্রের নিজস্ব ভাষা থাকে। আর যেহেতু জীবনানন্দের গল্পের উপন্যাসের অনেক চরিত্রে জৈবধর্ম প্রবল অথবা পার্থিবতা বেশি অথবা আক্রোশ বা ঘৃণা অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি খুঁজেছে তাই তাদের চিন্তা চেতনায় এক স্বতন্ত্র পরিভাষা লক্ষ্য করা যাবে। সেটাই এখানে একটা নূতন চেহারাকে পাঠকের কাছে ফুটিয়ে তুলেছে যে চেহারা আগে তাঁদের অপরিজ্ঞাত ছিল।

ছায়ানট

'ছায়ানটে'র রচনাকাল যদি ১৯৩২ সাল হ'য়ে থাকে—তবে তখন ঝরা-পালক ও ধুসর পাণ্ডুলিপির শেষ কবিতাটিও লেখা হয়ে গেছে। বনলতা সেন, মহাপৃথিবী এবং সাতটি তারার তিমিরের কবিতাগুলি ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হচ্ছে। নিকটবর্তী কোনো সময়ে রূপসী বাংলার কবিতাগুচ্ছটি লেখা হ'য়ে গেল। এরই কাছাকাছি কালে এলো 'ছায়ানট' একটি সংক্ষিপ্ত সংহত ছোটগল্প। প্রেমেন্দ্র মিত্র এ গল্পকে বললেন 'মিথুন সমীক্ষণ'। বস্তুত এ নারীপুরুষের সম্পর্কেরই সমস্যা। লক্ষণীয়, এই একই সমস্যা

১৯৩৪ থেকে ১৯৪৮ এই ১৪ বছরের মধ্যে ছড়ানো সবক'টি গল্পে উপন্যাসে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাঁর সমস্ত কথাসাহিত্যের ভিত্তিমূলে রয়েছে দাম্পত্যের রহস্য ও সমস্যা। কিন্তু সেকথা আপাতত থাক। ছায়ানট প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্ভবত মনে হয়েছিল কল্লোল কালি-কলমের লেখকেরা যেভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের পিছনে, অর্থনীতিক রাজনীতিক সর্বোপরি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে অনুভব করতে চেয়েছিলেন জীবনানন্দের এই প্রথম প্রয়াসের মধ্যে তার এক অভিনব দুঃসাহসিক অভিব্যক্তি ও সফল সার্থকতা দেখা যায়। সমাজ ও অর্থনীতি আমাদের ব্যক্তি জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে—কিন্তু স্থূল ভাবে নয়, মানবচৈতন্যের গভীরে সূক্ষ্মভাবে অনুপ্রবেশ ক'রে। ছায়ানটের নায়ক বেরা নাম্নী যে অবলম্বনহীনা মেয়েটির আশ্রয় দেওয়া ও অভাব মোচনের অধিকারে হৃদয়মনের স্বত্বস্বামিত্ব পাবে আশা করেছিল তার অনতিবিলম্বে বুঝতে কষ্ট হ'লো না রেবার অন্তস্তলের অবরুদ্ধ মুক্তি পিপাসা। তার সেবার মধ্যে যখন অন্তরের বদলে যান্ত্রিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততার বদলে নির্দেশপালন দেখলো শুধু, অথচ এও দেখলো রেবা, মানুষটা যান্ত্রিক নয়—হৃদয়বান। ভিখিরীকে দু'হাত ভ'রে দিতে তার মুখে তৃপ্তির উল্লাস উপচে ওঠে।

সে ভাবলো, মুক্তি দেবে রেবাকে কিন্তু বুকের পাঁজর দিয়ে গড়া এই খাঁচা ভাঙা কি সহজ! কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাঙ্গণে নবাগত অল্পবয়সী ডাক্তারটি এসে দাঁড়াতেই স্বপ্নের তাসের ঘর ধ্বংসে গেল। নিজের ক্ষুধিত আত্মা দিয়ে অনুভব করতে পারলো তরুণ-তরুণীর মোহাকর্ষণ। মনে হ'লো ব'লে আমিও বলতে পারি, তোমরা যা বলেছ —সব···আমি যাই হই না কেন, নিজেকে এমন ক'রে ছেড়ে দিতে পারি তোমরা তা পারই না। কিন্তু তার অব্যক্ত আর্তনাদের উপরে জয়ী হ'লো প্রণয়ীযুগলের অসংযত চুম্বনধ্বনি।

এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম মানেই মুক্তির প্রাণৈশ্বর্য, তাই দেখা গেল রেবার স্বচ্ছন্দ আচরণে, নায়কও খুঁজে পেল তার পুরানো আকাশ। এখন তার আর রেবার সম্পর্ক সাবলীল অকুণ্ঠ।

বাধ্যবাধকতার বন্ধন প্রেমের স্বচ্ছন্দ বিকাশের পরিপন্থী—এই কি বক্তব্য ছিল লেখকের? অর্থনৈতিক শক্তির উপরে নারীহৃদয়ের অন্তর্লীন মুক্তি পিপাসারই কি এখানে জয়ধ্বনি? অথবা বয়স থেকে যৌবনশক্তির কাছে, অসুন্দর থেকে সৌন্দর্যের কাছে, অব্যক্ত প্রেমের থেকে পরিস্ফুট কামনার কাছে এ প্রগলভা নারীর আত্মসমর্পণ। কেননা অর্থনৈতিক শক্তির অনুমান করি উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীই সমান।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতে, 'গল্পের পদক্ষেপ কেমন যেন অনিশ্চিত। দুর্বলতা ধরা পড়ার ভয়েই যেন ভাষা সংক্ষেপ।' এ দুর্বলতা কিসের দুর্বলতা? বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সযত্নে

চেপে রাখতে চেয়ে কাঁচা লেখকরা যেভাবে কাহিনীকে বিকৃত ক'রে ফেলে, বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি দিতে পারে না—তার কথাই কি ইঙ্গিত করছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র? কেননা ভাষা এখানে স্পষ্ট আর নিশ্চিত। কাহিনীর বিন্যাসও যথাযথ, ছোটগল্পের শর্তমাফিক। যাই হোক ছায়ানট ব্যর্থহৃদয় প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসমর্থিত অভিজ্ঞতার আলোকে নারীমনস্তত্ত্বের এক বিচিত্র উদ্ঘাটন।

গ্রাম ও শহরের গল্প

গ্রাম ও শহরের গল্পের রচনাকাল ১৯৩৬। তখনও 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমিরে'র কবিতা সঞ্চয় চলেছে। এই পর্বের আরো কবিতা পাওয়া যাবে 'বেলা অবেলা কাল বেলা'য়, 'সুদর্শনা'য়। এখানেও বিষয় একই, নারী মনস্তত্ত্বের উদ্ঘাটন, কিন্তু বিন্যাস আরো নিপুণ আরো চমৎকার। এই নারী কুমারী নয়, গৃহিণী, স্বামীকেই ভালবাসে, তার উপর নির্ভরশীলা কেননা স্বামী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, বিত্তবান, সুরসিক শুধু নয়, শচীর প্রয়োজন মতো নিজেকে artitically পরিবর্তিত করতেও পারে, অথচ ধূমকেতুর মতো আকস্মিক আবির্ভূত তার বাল্যপ্রেমিক সোমেন লেখাপড়ায় কৃতী হ'য়েও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলো না, জীবন ব্যবসায়ের প্রতি অবিশ্বাসী—জীবনকে চায় শুধু; অনাবিষ্কৃত সোনার খনির মতো কোথাও প'ড়ে আছে আজ; তার স্বামীর অফিসে ষাট টাকার চাকরীর উমেদার একথা ভেবে শচী কুকড়ে উঠছিল।

অথচ সোমেন শচীর কাছে ঘুরে ঘুরে আসে, দুপুর বেলা শচী যখন একা, খুব একটা কোমল কুশানে ব'সে চুরুট টানতে টানতে একটি মেয়ে মানুষের সান্নিধ্যে ব'সে থাকার বিলাস অনুভব করতে চায় হয় তো। হয় তো যে কোনো মেয়ে মানুষ হলেই চলতো সোমেনের, শচী তার লক্ষ্য নয়। শচীর অবহেলা সেলাই-এর কলে চিঠি লেখায় লিপ্ত থাকা সোমেনকে আঘাত করছিল কয়েকদিন।

অবহেলা থাকলেও সোমেনের আপ্যায়ণে শচীর কোনো ত্রুটি ছিল না। আপ্যায়ণ কুশলা বারবিলাসিনীর মতো নিজেকে পুরানো প্রসাধনে সাজিয়ে দেখাবার ব্যাকুলতা উৎরে উঠতে পারছিল না শচী।

শহরের এই বিলাসের পরিধির বাইরে যে গ্রামে তার ছেলেবেলা কেটেছে সেখানে মাঝে মাঝে ফিরে যাবার ইচ্ছে হয় শচীর মনে, গ্রামে থাকতে একবার আম কাঁটাল বাঁশের জঙ্গলে শচী হারিয়ে গেলে সোমেন তাকে একটা পাৎলা সরপুটির মতো কানকোতে বেঁধে একটা বাচ্চা রুইয়ের মতো নদীতে ভেসে এসেছিল। সে সব ঘটনায়

পর্যালোচনাও অবান্তর আজ। শচীও হয়তো সেই গ্রাম পরিবেশে ফিরে যেতে চায় যেমন মানুষ তাজমহল দেখতে যেতে চায়। একটা ফরমায়েসী ট্রিপে খানিকটা সময়োপযোগী ভাবপ্রবণ হ'য়ে শচী গ্রামে যাবে কাঁদবে, চুমো দেবে, হয়তো আর ফিরেও যেতে চাইবে না, হয়তো ব্যবহার করতে দেবে নিজেকে। সে সব একটা দুপুরের জন্য। পাড়াগাঁর মাঠজঙ্গলের আচ্ছন্ন দুপুর বড় মারাত্মক। পরদিন ভোরেই এক সাঁতারে আরো চোদ্দ বছরের ওপারে চ'লে যাবে। সোমেন গেলে আর ফিরতে পারবে না। মেয়ে পুরুষের এই তফাৎ।

আজকে দুপুরের জন্যে শচী সেই শচী হ'য়ে গেছে। আজ সে শচীকে নিজের যে কোনো প্রয়োজনে লাগাতে পারে—শচী সেজন্য প্রস্তুত, ব্যাকুল। কিন্তু এই সোফার উপর? বক মোহানার নদীর ধারে যা একদিন হয়েছিল বনজঙ্গলের আবছায়ায় নক্ষত্রের নীচে, জলের গন্ধের কাছে?

ভাবতে গেলেও ব্যথা।

এই কামরায় আর এক মুহূর্তও টিকতে না পেরে একটা হ্যাভেনা হাতে সোমেন মুহূর্তের মধ্যে রাস্তায় উঠল গিয়ে।

এই গল্পের মানব সম্পর্কের পশ্চাৎপটে অর্থনীতিক টানাপোড়েন স্পষ্ট। 'কোনো ভ্যাগাবণ্ডকে তার ন্যায্য জায়গা দিতে পারে না মেয়েরা।' অথচ দেহধর্ম মাঝেমাঝে হয়তো স্মৃতির অনুসঙ্গে সামাজিক বিবেচনার উর্ধ্বে দিয়ে দাঁড়ায়। হয়তো নারী পুরুষের মনরেখার কম্পনে সবসময়ে ক্ষমতা আসে না ব'লে নানা দুর্ঘটনা ঘটে না প্রায়ই; কিন্তু ঘটলেও বিচিত্র কিছু ছিল কি?

শ্রী সুনীলকুমার নন্দী প্রকাশের চরিত্রে দেখেছেন সংকীর্ণ সম্পত্তি সচেতন গ্রাম্যতা। শচী সম্পর্কে প্রকাশের সন্দেহ-প্রবণতা তাঁর মতে, ভালবাসা নয়, শীলিত নির্লিপ্তিও নয়, সম্মানজনক বিশ্বাসবোধও নয়—তা জীবন ব্যবসায়ে জিতবার এক অভিনব স্থূলতা। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই কোনো দিকে গড়ায় না, সবই যায় ধোঁয়া হয়ে, শচীর স্বামী হয়ে প্রকাশই তো থাকে।' একথায় প্রকাশের প্রতি সুবিচার করা হয়নি সম্পূর্ণত। সন্দেহের এবং বিশ্বাসের এমন এক আলো আঁধারী পরিস্থিতির মধ্যেই আজকের জীবনের মানুষ-মাত্রেরই দাম্পত্য দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মধ্যে গুড়ের কলসীর মতো বন্ধ করে রাখবার জিনিস স্ত্রী নয় আজ আর, স্বামীও, খানিকটা বিশ্বাস, খানিকটা ক্ষমা ও নির্লিপ্তি নিয়েই সংসার চালাতে হয়। শচীকে পূর্বাপর যা দেখেছি 'যার মধ্যে বিশেষ কোনো নীতি প্রখরতা নেই' তাকে এই সন্দেহ ও এই নির্ভরতার অবকাশ কি প্রকাশের নেই?

প্রকাশের চরিত্রে স্থূলতা অন্যক্ষেত্রে, জীবন-দৃষ্টিতে, অন্যদের মূল্যায়নে,

আত্মবিশ্বাসের অতিরেকে। বরং শচীর গ্রাম জীবনের প্রতি আকর্ষণের অস্বাভাবিক স্নায়ুচাঞ্চল্য সঠিকভাবে নির্দেশ করেছেন সুনীলবাবু। স্মৃতিঅনুসঙ্গে পুরানো প্রেমিককে আজকের বিরূপতা কাটিয়েও সবকিছু ছেড়ে দিতে চাওয়া ওই চরিত্রের পক্ষে একটু অসঙ্গতিপূর্ণ অথচ পুরো গল্পটাই তো এর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সোমেনের জীবনের সঙ্গে চিন্তার একটু সূক্ষ্ম অসঙ্গতি আছে। সে ভাবে, ষাট টাকার কাজ পেলে বালিগঞ্জের দিকেই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে প্রকাশদের চেয়ে ঢের ভালো থাকতে পারতো। জীবন তার একটুও নিরর্থক হ'লে 'সুইসাইড লিষ্টে' খতম হ'য়ে যেত আগেই, তার চাকরী নেই, স্ত্রী নেই, ঘর নেই তবু এসবের অতিরিক্ত কিছু আছে ব'লেই জোর আছে। এই অতিরিক্ত কি আছে সোমেনের গলাবাজি ছাড়া, প্রকাশের প্রাপ্তিতে অক্ষম ঈর্ষা ছাড়া? শচী বলেছে 'grotesque, grotesque-এর চূড়ান্ত'।

এহেন সোমেন গ্রামে যেতে চায় শচীর সঙ্গে, কিন্তু ফিরে আসতে পারবে না। শচী ফিরে আসবে, সেটাই তার আক্ষেপ অথবা অভিযোগ। সে কি তবে শচীর শরীরের রোমাঞ্চ উর্বরতাই ফিরে পেতে চায় অতীতের মতো, কিন্তু এক দিনের জন্যে নয়, চিরকালের জন্যে। সেটাই তার অভিযোগ বা আক্ষেপ, এটারই পিছনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়ানো, তার অতিরিক্ত কিছু?

অথচ শচী, তার মধ্যে বিশেষ কোনো 'নীতি প্রখরতা নেই'। যে অতীতের যৌন সঙ্গী সোমেনের চেয়ে প্রকাশকে বরণীয় বুঝে দাম্পত্য জীবনে তৃপ্ত। তবু তার সেই সচেতন বিচারের অন্তস্তলে এক গৃহকাতরতা, অতীতের গ্রাম পরিমণ্ডলে, হয়তো প্রেম পরিমণ্ডলেও ফিরে যাবার কামনা। সেই দুর্বলতা বোঝে ব'লে সোমেনকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে এবং মুহূর্তের অভিভবে তারই প্রয়োজনে নিজেকে ব্যবহার করতে দিতে সে ইতস্তত করে না। একবার শচীর নিজেকে মনে হয়েছিল আপ্যায়ণ কুশলা বারবিলাসিনীর মতো। আমাদের কিন্তু মনে হয়, সে সব সামাজিক ছদ্মবেশের আড়ালে আবেগ-প্রবণ স্বৈরিণী একজন।

বিলাস

'বিলাস' গল্পটির রচনাকাল ১৯৪৭ সালের কাছাকাছি কোনো সময়ে। বিলাসের শান্তিশেখর চরিত্রে আত্মপ্রক্ষেপ অনেক বেশি। 'স্বরাজ' পত্রিকায় জীবনানন্দের কাজের অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লেগেছে। আবার হেডমাষ্টার অপরেশবাবুর

চরিত্রে ছায়াপাত ঘটেছে বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের হেডমাষ্টার জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। এঁর প্রভাব ছাত্র জীবনানন্দের জীবনে অনপনেয় ছিল।

'বিলাস' জীবনানন্দের শেষ গল্পই শুধু নয় শ্রেষ্ঠ গল্পও। ডঃ অমলেন্দু বসু সঠিক ভাবেই বলেছেন, "বিলাস গল্পটিতে কাহিনী শিল্পের একটি সূক্ষ্ম আঙ্গিক ও সাফল্য দেখতে পাই, সে আঙ্গিকে শ্লেষ অলঙ্কারের 'আয়রণির' নিপুণ প্রয়োগ। গল্পটির নামকরণ জীবনানন্দ স্বয়ং করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু বিলাস কথাটির দুই বিপরীত তাৎপর্যে এই গল্পের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য। এ গল্পের নায়ক কোনো বিশেষ মানুষ নয়। যদিও গল্পটির দুই অংশের যোগসূত্র হিসাবে শান্তিশেখরেরই সত্তায় গল্পটির প্লট উদ্ভাসিত। নায়ক একটি ভাবনা, কোন অর্থে বিলাস, সেই ভাবনা, এই বিলাসের প্রতিফলনে কাম-অর্থ-ক্ষমতা লোলুপ সমাজের চিত্রায়ণ।"

প্রকৃতপক্ষে গল্পটি বৈশিষ্ট্যেও অসামান্যতা এই প্লট পরিকল্পনায় কোনো চরিত্রকে ঘিরে নয়, ঘটনাকে ঘিরে নয়—একটি ভাবনাকে কেন্দ্র ক'রে গল্পটি গ'ড়ে তোলা হয়েছে। অথচ অত্যন্ত বাস্তব-এর ঘটনাপুঞ্জ সমাজ চৈতন্যের নিখুঁত প্রতিফলন, যুদ্ধোত্তর কালে মধ্যবিত্ত বাঙালীদের মধ্যে যে মূল্যবোধের বিনষ্টি ঘটেছিল, সেই দম্ভ, ঘৃণা, রিরংসা, আক্রোশের চিত্র এতে পাওয়া যায়। সূচনা থেকেই অতুলনীয় ভাষায় ও শ্লেষ অলংকারের তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা মিশিয়ে শান্তিশেখরের বেদনা ও বঞ্চনা, ঘৃণা ও প্রতিরোধ এবং শাস্তিভোগের বিবরণের মধ্য দিয়ে কাহিনীটি গড়িয়ে গেছে আস্তে আস্তে সর্বেন ঘোষের দাম্ভিক, কামুক, ইতর ও প্রতিহিংসা-প্রবণ চরিত্রের উদ্ঘাটনে, এবং তার মধ্যেই আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে মনোবৃত্তির প্রতি-তুলনা, যেদিকে গল্পের নামকরণের অভ্রান্ত ইঙ্গিত।

আত্মসৃষ্ট নিঃসঙ্গতার বন্দী শান্তিশেখরের দুটি আক্ষেপ—অনেক দামী দরকারী বই বুলেটিন কিনেছে সে, সময়ের স্বল্পতায় পড়া হয় নি, আরও ঢের বড় বইয়ের জগৎ বাইরে প'ড়ে রয়েছে—কিন্তু এসব না পড়েই ম'রে যেতে হবে তাছাড়া নারীকে না ভালবেসেই চ'লে যেতে হবে। কোথায়ই বা সেই নারী? ট্রামে বাসে উৎসব বাড়িতে যাদের দেখা যায় তাদের সঙ্গে বজ্রমনির মতো কোনো পাথরের ব্যবধান রচনা করেছে সময়।

তার এই অনর্থক বই কিনে জমানোকে সে হেডমাষ্টার অপরেশবাবুর অনুভূতিতে বিচার ক'রে বুঝেছে এ 'বিলাস'। কিন্তু পরক্ষণেই সংশোধন ক'রে দিয়েছেন তিনি : ভুল করছ। বিলাস তো খুব ভালো জিনিস শান্তিশেখর।

যৌন আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে তার যে একটু ছলনা আছে তা অপরেশবাবুর বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি। শান্তি বিয়ে করেছিল বটে, কিন্তু বিয়ের একমাস পরেই স্ত্রী মারা

যায়। কিন্তু তবুও মেয়েমানুষের ভালবাসা জীবনের থেকে ক্রমেই মুছে যাচ্ছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

যে আমেরিকান পত্রিকা অফিসে শান্তিশেখর কাজ করে তাদের সঙ্গে কথা ছিল ফী সপ্তাহে কিছু কিছু লেখবার, বড় বড় লিখিয়েদের দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেবার—কিন্তু বাঙালী সাহেবরা প্রুফ দেখার কাজ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন; শুধু প্রুফ দেখাই এখন কাজ তার। রাত দশটা পর্যন্ত।

সুস্মিতা চক্রবর্তীকে কিন্তু কিছুই করতে হয় না। রোজই আসতে হয় এই যা, উপরওলা সর্বেন ঘোষের গাড়ীতে। অপেক্ষা করতে হয় কখন সে ফিরে যাবে রাত দশটায়। তার মধ্যে কখনো বা শান্তিশেখরের কাছে এসে দাঁড়ায়। সহানুভূতি জানায় তার কাজের চাপের জন্য, সাহায্য করতে চায়। মহিলাটির চেহারা বিশ্রী কিন্তু গলার সুরে ন্যাকামির কুয়াশা কাটিয়ে নির্মলতা রয়েছে মনে হয়। তবু শান্তি-শেখর সুস্মিতার হাতটাকে নিজের হৃদয়ের দিকে এগোতেই দিচ্ছে না। ইচ্ছে করছে না। এমন কি রাতের ঘুমের স্বপ্নেও নানারকম নষ্টনমিত ইচ্ছার তোষণ-লোকেও দেখা গেল না তাকে।

শান্তিশেখর মারা গেল হঠাৎ। সে সংবাদে সর্বেন ঘোষের অন্তরে কোনো দাগ পড়লো না। সুস্মিতার কাছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কৌতুকের আসর খুলে বসল সে। কেননা অপরেশবাবুর কথায় সারাদিন ফুলবাবুর মতো সেজে বেড়ালে হবে কী সর্বেনের মনে কোনো বিলাস নেই। বিলাস যদি থাকত তাহ'লে লোকটা ম'রে গেছে শুনে চুপ মেরে যেতো সে। ছুটি দিয়ে দিত অফিস। কিন্তু সর্বেন ছুটি দেবে না। সুস্মিতা বললো, 'মরে গেছে—সে জায়গায় লোক ভর্তি ক'রে নিলেই হ'ল।' এ ব্যঙ্গেও চোখ ফুটলো না সর্বেনের। এমন কি 'আমার ওরকম হলেও হত।' সুস্মিতার এই মন্তব্যেও নয়। কেননা সর্বেন কাজ বোঝে। বিষয় আশয়ের মায়া কাটিয়ে ন্যালাভোলা জিনিস নিয়ে ভোম হ'য়ে থাকার জ্যাঠামশাই-সুলভ বিলাস তার নেই। সে বরং বিশ গ্যালন তেল গাড়িতে পুরে সুস্মিতার সঙ্গে গাড়ি হাঁকাতে পারে দর্শণার দিকে অকারণে।

অপরেশবাবুর দুই উত্তর পুরুষ। একজন ছাত্র আর একজন ভ্রাতুষ্পুত্র। একজন শান্তিশেখর, আরেকজন সর্বেন। সময়ের দোষে দুজনেই স্খলিত, তবু আদর্শের দিক থেকে, বিলাসের দিক থেকে দুজনেই পরস্পরের বিপরীত। সেইজন্যই বিদ্বেষ ঘৃণা। দুজনেরই মধ্যে যৌণ ক্ষুধা। একজন রাজহংসী খুঁজে মরছে কেবল, অথচ বালিহাঁস কাদা-খোঁচা খুঁচে মারছে তাকে; তবু সে অভুক্তই থেকে গেল। সেটাই বরণীয় মনে করলো। অন্যজনের মনে ততখানি বিলাস নেই, সে তাই প্রাচুর্যের মধ্যে ফেলাছড়া করেই দিন কাটায়।

সুস্মিতার সঙ্গে যদি শচীর তুলনা করা যায় তবে অনুভূত হয় আর্থনীতিক প্রখরতা সুস্মিতার জীবনকে, যৌণতাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে আরো। যে স্বচ্ছল জীবনের লোভে শচী প্রকাশকে পছন্দ করে, সোমেনকে তাচ্ছিল্য সেই বাঁচামরার প্রবলতর তাগিদে সুস্মিতাকে সর্বেনদার সঙ্গ দিতে হয়। অথচ শান্তিশেখরের দুর্দশায় তার সহানুভূতি, করুণা। এডিথ উর্সুলাদের সঙ্গে শান্তি যখন আলাপিত হ'তে অনিচ্ছা জানায়, বলে, 'যাব না। আমি হোটেলে নিয়ে খাওয়াতে পারবো না।' তখন দুঃখিত সুস্মিতাকে বলতে শুনি, "ওমা, কী যে বলেন' আপনি মোটরের আর খাটের ফাউ-ফুর্তি ছাড়া মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল হ'তে পারে না?" জীবনানন্দের সব নায়িকাদেরই এই অর্থনীতির দাসত্ব এবং তাকে অতিক্রম করার ইচ্ছা খুবই প্রবল দেখা যাচ্ছে। মাল্যবান উপন্যাসও উৎপলা স্বামীকে খাতির করে তখনই যখন তার টাকার প্রয়োজন, নতুবা সর্বক্ষণ তাকে দূরে সরিয়ে রাখে। তার জায়গায় অন্য যে কোনো চেনা আধোচেনা অচেনা মানুষকে সঙ্গ দেয়, অঙ্গও দেয় হয়তো।

মাল্যবান

'মাল্যবান' লেখা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের জুন মাসে। শুনেছি আরো দু চারটি উপন্যাসের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আছে তাঁর, সেগুলির রচনাকাল জানা নেই। জানলে বোঝা যেতো 'মাল্যবান' জীবনানন্দের উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস কিনা? 'মাল্যবান' বইটিও সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ—এই প্রশ্নটিও প্রাসঙ্গিক। যদি সম্পূর্ণ হয়েই থাকে অপ্রকাশিত ফেলে রেখেছিলেন কেন লেখক এতদিন? এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও অপ্রকাশিত পড়ে ছিল কেন এত দীর্ঘকাল?

এসব প্রশ্নের উত্তর এ বইয়ের মধ্য থেকেই আমাদের খুঁজে নিতে হবে। জীবনানন্দ লিখেছিলেন:

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি
না এলেই ভালো হত অনুভব করে;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি

: **সুচেতনা**

এই কথাগুলোই মনে পড়তে পারে রসজ্ঞ পাঠকের 'মাল্যবান' পড়ার পরে। এ বই একাধারে জীবনানন্দের শক্তির ও অশক্তি, ঔপন্যাসিক সামর্থ্যের ও দুর্বলতার বাহক। এরই প্রকাশ না হ'লেই ভালো হ'তো, হ'য়েও মন্দ কিছু হয়নি।

না হলেই ভালো হতো। কেননা, একজন শক্তিমান লেখককে তাঁর নিজের ক্ষেত্রে যে উঁচু আসনে দেখেছিলাম, তা অন্য এক ক্ষেত্রে তার নির্বলতার নমুনা দেখতে ভালো লাগে না। দ্বিতীয়ত লিরিক কবিতায় মানুষের আবিষ্ট ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি হয়, পরিপূর্ণ স্বভাবটা চেনা যায় না। উপন্যাসে তাঁর পরিপূর্ণ জীবনবোধের প্রতিচ্ছয়া পড়েই। সেই প্রতিচ্ছায়ায় জীবনানন্দকে খুব মহান ঔপন্যাসিকদের পাশাপাশি রাখতে পারছি না। তৃতীয়ত, এই অপরিমার্জিত লেখায় প্রথম লেখকের যে অপরিণত শৈলী, তাকে কাটিয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে না লেখককে।

লাভের দিকের কথা হলো, জীবনানন্দের কবি দৃষ্টি ও জীবনবোধের পূর্ণ বলয়টা এবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো, সেই চেনার আলোকে জীবনানন্দের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন সহজতর হবে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু সমকাল বাস্তবজীবন, ও যুক্তিবাদী চিত্ত উপন্যাসেই সবচেয়ে প্রকট হয় তাই উপন্যাসের ঘটনার বর্ণনা ও ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কবিতার বাক্‌প্রতিমা ও শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্যের গভীরে সহজে পৌছানো যাবে। তৃতীয়ত, গল্পত্রয়ীর সঙ্গে উপন্যাসদ্বয়ের যোগে জীবনানন্দের সমাজ ও প্রেমচেতনার যৌন সম্পর্কের বিশ্লেষণ তাঁর মনোভাবনার রহস্য প্রকাশিত হবে। এছাড়াও আরো অন্যান্য যে সব দিক আছে ডঃ অমলেন্দু বসু তাঁর ভূমিকাতে তার আভাস দিয়েছেন।

"ইদানীং বিশ্বসাহিত্যের অনেক খ্যাতনামা উপন্যাসের মতো 'মাল্যবান' মহাকাব্যের বিশাল বিস্তৃত পথে না গিয়ে সংহৃত জীবনচক্র অঙ্কিত করেছে এবং এই সীমিত চিত্রের মধ্যে আশ্চর্য শিল্পশক্তির প্রমাণ রেখেছে, চরিত্রায়নে, কথোপকথনে কাহিনীর গতিতে। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহ এই উপন্যাসের প্রধান আঙ্গিকী কৃতিত্ব, এবং এই কৃতিত্ব পরিচ্ছন্ন রচনাশৈলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উপন্যাসটিকে তার স্বাধীন নিজস্ব মূল্য দিয়েছে।"

জীবনানন্দ গত অর্ধ শতকের বিশিষ্টতম কবি। কিন্তু সে কবিত্ব জীবন-দৃষ্টির গভীরতার উপরে ততখানি নয়, যতখানি শিল্পচেতনার নিপুণ সিদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। জীবন দর্শনের যে ব্যাপ্তিও উদাত্ততা আমরা মহান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রত্যাশা করি লিরিক কবির তা না থাকলেও আসে যায় না। তাই লিরিকের ছোট প্রাঙ্গণ পেরিয়ে যখন উপন্যাসের প্রশস্ত প্রান্তরে কোনো কবি এসে দাঁড়ান তাঁর জীবনদৃষ্টির সীমাবদ্ধতাটা স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়তে পারে। আত্মহৃদয়ের সূক্ষ্ম স্পর্শকাতরতা নিয়েও, স্বেচ্ছামত বাস্তব থেকে কবিত্বের সৌন্দর্যলোকে প্রয়াণের উপযোগী ভাষার আশ্চর্য আয়ুধ আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও জীবনানন্দ যে টলষ্টয় নন, টুর্গেনিভ নন, ন্যুট হামস্থন, জোহান বোয়ার নন, ডি. এইচ. লরেন্সের জৈব প্রাণোচ্ছলতা ও গুস্তাভ ফ্লবার জীবনবোধ কিছুই তাঁর নেই—এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না। মধ্যবিত্ত

মানসিকতার সীমাবদ্ধতা নিয়ে তাঁর উপন্যাসের বিফল নায়কের মতো ভীরু পায়ে অপ্রত্যাশিত অনাহুত তিনি বাংলা উপন্যাসের জগতে এসে দাঁড়িয়েছেন।

অক্ষম উপন্যাস সবদেশেই বহু লেখা হয়েছে, হয়—অনেকে সমকালে লোকচিত্তে স্থানও করে নেন। জীবনানন্দের উপন্যাস কিন্তু তেমন একখানি চিরাচরিত ব্যর্থ নয়। হলে আলোচনার কিছু থাকতো না। নানাদিক থেকে এ উপন্যাসখানি বিশিষ্ট। কিন্তু যাঁর ভিস্তাভিশান ক্যামেরা নিয়ে আসার কথা, তিনি তার বদলে দূরবীণ ও নয়—একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র এনে যেন হাজির হয়েছেন!

তবু কি হয়নি, কি হলে ভাল হতো তার বিশদ বিচার নিষ্প্রয়োজন, কি পাওয়া গেল তার আলোচনায় লাভ আছে। জীবনানন্দের আলোচ্য উপন্যাসে চরিত্র পরিধি খুব ছোট। স্বামী, স্ত্রী এবং পার্শ্ব চরিত্র দু-একটি। অল্প চরিত্র নিলে উপন্যাস ঠিক প্রত্যাশিত ব্যাপ্তি পেতে চায় না। রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু উপন্যাস, দেশী বিদেশী আরো বহু নামকরা লেখকের লেখায় এমনটি হতে দেখা যায়; অথচ অন্তর অনুভূতির ঐশ্বর্যে, হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের সূক্ষ্ম টানা পোড়েনে এগুলি আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে এক একটি পদ্মরাগ মণির মতো।

মাল্যবান ও তার স্ত্রী উৎপলা—এক অসুখী দম্পতি, পরস্পরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। বিপরীত-মুখী মনোভঙ্গি নিয়ে এক সংসারেই তারা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। উৎপলা, স্বামীর প্রতি নির্মম, আক্রমণশীল, যৌন জীবনে প্রতিরোধ পরায়ণ। আর মাল্যবান ব্যক্তিত্বহীন, স্পর্শকাতর, স্ত্রীর প্রতিরোধের কাছে বিমূঢ় বিপন্ন, অথচ দেহগ্রন্থির আবেশে বারবার তার কাছেই অনুনয়শীল। উৎপলার এই নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, স্ব-বিরোধী যুক্তিজালে স্বামীকে বিতাড়িত করার সকল প্রয়াস এবং ভণ্ডামী, স্বামীকে আর্থিক ভাবে দোহন করার জন্য চতুর ছলনা বিস্তার এবং স্বার্থসিদ্ধির পর দুর্ব্যবহার; অজ্ঞাতশীল আগন্তুকের কাছে কুলটার মতো আত্ম-সমর্পণ—উপন্যাসের একের পর এক পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণী ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত হয়েছে। উন্মোচিত হয়েছে মাল্যবানের নির্বুদ্ধিতা ও আত্মসংগুপ্তি, ইতরসুলভ রঙ্গ, এবং প্রতারিত হচ্ছে জেনেও নিরুপায়তা নিষ্ক্রিয়; সর্বোপরি স্বামী স্ত্রীর এই নিরন্তর দ্বন্দ্বে শিশু-সন্তান মনুর দুর্দশা।

প্রশ্ন করা চলে স্বামী-স্ত্রীর এই জটিল অস্বাভাবিক সম্পর্ক ব্যক্ত করতে এতগুলি পরিচ্ছেদের, এতগুলি খণ্ড কাহিনীর (episode) আদৌ প্রয়োজন ছিল কি? আরো অল্প কথায় স্বল্প ঘটনায় এই পরিস্থিতি কি পাঠকের অনুভূতিবেদ্য করে তোলা যেতো না?

দ্বিতীয়তঃ উপন্যাসের মধ্যে ঘটনাস্রোত আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চরিত্রদ্বয়ের কোনো অগ্রগতি দেখি না। মেজদার সপরিবার আবির্ভাবে, বড় বৌদির 'সংবাদ'-

সংবাদে কিছুতেই এই অস্বাভাবিক দাম্পত্য পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না। এমনকি পরিশেষে অমরেশের আবির্ভাবের পর উৎপলা যখন চারিত্রিক দিক থেকে স্খলিত ও দুর্বল বলে প্রতিভাত হচ্ছে তখনো বিপর্যয়ের মুখেও দাম্পত্য ব্যবহারের কোনো ইতর বিশেষ ঘটলো না এটাই আশ্চর্য।

তবু তা সম্ভবপরতার, বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন। কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহিলা উৎপলার কথার মধ্যে এত অশ্লীলতা স্বাভাবিক কিনা। অথচ এই দুর্ভাগ্যজনক দাম্পত্য আড়াআড়ির চিত্রটা এত প্রত্যক্ষ, এত খুঁটিনাটি নিয়ে বিশদ যে মনে হয় এ লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই বিষয়। তাঁর লেখার তন্নিষ্ঠ পাঠকদের এও মনে পড়তে পারে যে মাল্যবানের দুঃখ ও অভিজ্ঞতার সমান্তরাল ভাবনা তাঁর কিছু কিছু কবিতায় পাওয়া যায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রেম কবিতাগুলিতে 'সাতটি তারার তিমিরে'র 'আকাশলীনা', 'সুদর্শনা'র 'আজ' (২), 'ফসলের দিনে' প্রভৃতি কবিতা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে।

তাহলে মাল্যবানের এই বেদনা কি জীবনানন্দের ব্যক্তিগত কোনো বেদনার প্রমূর্তি! মাল্যবানের চরিত্রের সঙ্গে কবির বহির্বিমুখ, গৃহকাতর, স্পর্শাতুর, অতিসহনশীল চরিত্রের অনেকখানি সঙ্গতি আছে, তবু দুটিকে একাকার করে দেখা সঙ্গত নয়। যেহেতু যে কোনো রচনাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে আপন অনুভূতির জারক-রসে তাকে জারিয়ে তুলতে আত্মপ্রক্ষেপ ঘটাতে হয় মরমী জীবনানন্দ অবশ্যই তা বুঝতেন। বিশেষত মাল্যবানের মত সম্বিত-প্রবাহমূলক উপন্যাসে। কিন্তু লেখকের সঙ্গে উপন্যাসের বিশেষ কোনো চরিত্রের একাত্মতাই উভয়কে অদ্বৈত করে দেয় না।

এক হিসাবে 'মাল্যবান' উপন্যাস লেখকের 'গ্রাম ও শহরের গল্পে'র কাহিনীর বিপরীত উপস্থাপন। শচী যেমন বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কারণে প্রকাশের উপর নির্ভরশীল, উৎপলাও তেমনি। শচী যেমন স্মৃতির ক্ষণ আবেশে সোমেনের কাছে আত্ম-সমর্পিতা, উৎপলাও অমরেশের কাছে তেমনি সঙ্গীতের আবেশে কি? নাকি প্রবলতর ব্যক্তিত্বের অভিভবে। আবার 'ছায়ানটে'র নায়ক যেমন অন্তরের সব ঐশ্বর্য নিয়েও আগন্তুক-ডাক্তারের কাছে প্রেমের দ্বন্দ্বে পরাভূত, এখানে মাল্যবানও একই ভাবে পরাভূত হচ্ছে স্থূলচেতন অমরেশের কাছে। কেন পরাজিত হচ্ছে তারা? সৌন্দর্য-হীনতার জন্যে, সরলতা যা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর তার জন্যে, প্রবল দস্যুবৃত্তি-প্রবণ পৌরুষের অভাবে, কেন তার মীমাংসা দেন নি লেখক। এবং এর মীমাংসায় নারী চরিত্রের গহন রহস্য উন্মোচনের অপেক্ষা রাখে।

ডঃ অমলেন্দু বসু মাল্যবানের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন "জীবনানন্দর কাব্যপাঠে

যাঁদের চিত্ত অনুরণিত হয়েছে…তাঁরা এই গল্প ও উপন্যাসকে জীবনানন্দর কথা সাহিত্যকে, তাঁর সম্পূর্ণ অমেয় সৃজনী কর্মের অচ্ছেদ্য অংশ বলেই গণ্য করবেন। জীবনানন্দর এই উপন্যাসটিকে শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই তাঁর কাব্যশিল্পের সূত্রে সমন্বিত করতে চাইব। তেমনটি যখন চাইব তখন এই কথাসাহিত্যে তাঁর কবিসত্তার অসংখ্য আভ্যন্তরীণ আভাস পাব। সে-আভাস যেমন শব্দপ্রয়োগে, তেমন বাক্‌বিধিতে, বর্ণনায়, সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে। সে-আভাস মূলত কবিত্বের আভাস, একটি সুপরিচিত কবিত্বশক্তির আভাস এমন ভাষায়, এমন দৃষ্টিতে, এমন অনুভূতিতে (যা) একজন বিশেষ বাঙালী কবিরই সৃজনীশক্তির মোহর আঁকা।"

এ কথার সত্যতা প্রতীত হবে যখন তাঁর কবিতার পংক্তিগুলি তুলে তুলে তাঁর উপন্যাসের পংক্তিগুলির পাশাপাশি স্থাপন করতে পারবো। তার শব্দপ্রয়োগ ও বাক্‌বিধির বৈশিষ্ট্য এখানেও ধরে দেওয়া যাবে। সেই সব বাক্য ও বাক্যাংশ তুলে তুলে নির্দেশ করা যাবে যা কবিতাতেই চলে কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবান্তর ছিল—কিন্তু জীবনানন্দ ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করেন নি। অথচ এখন অনুভব করতে পারি এগুলি উপন্যাস থেকে কেটে বাদ দিলে উপন্যাসটি অতি সাধারণ এবং বিস্মৃতিযোগ্য মনে হতো।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশখানি উপন্যাস সম্পাদনা প্রসঙ্গে সমারসেট মম্ জানিয়েছিলেন সর্ব দেশের সব মহান উপন্যাসিকের মহত্তম দৃষ্টিতেও এমন কিছু কিছু দুর্বল অংশ থাকে যা আপন সৃষ্টির প্রতি মমতাবশে তাঁরা বর্জন করতে পারেননি, কিন্তু তা কেটে বাদ দিলে লেখা দুর্বল হয় না, বরং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জীবনানন্দের লেখাতেও এমন দুর্বলতা—আগেই উল্লেখ করেছি—যথেষ্ট আছে। ভাবীকালের প্রাজ্ঞ সম্পাদক কেউ এসে তেমন করে অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে যদি কোনোদিন মাল্যবানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন তাহলে যে অংশটিই তিনি বর্জন করুন না কেন, জানিনা সেই বর্জিত অংশটি স্বতন্ত্র, স্বসম্পূর্ণ কবিতা বা কবিতা পরম্পরা বলে গণ্য হবে কিনা।

প্রবন্ধ সাহিত্য

কবিতার কথা

জীবনানন্দের কবিসত্তার এক প্রসার যদি গল্পে উপন্যাসে, আর এক উৎসার তেমনি প্রবন্ধে সমালোচনায়। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৬২ বঙ্গাব্দে সিগনেট প্রেসের উদ্যোগে তাঁর প্রথম প্রবন্ধসংকলন 'কবিতার কথা' প্রকাশিত হয়েছিল। সংকলিত ১৫টি রচনায় কবি কবিতার স্বরূপ এবং আধুনিক বাংলা কবিতা, ও পাশ্চাত্য কবিতা সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ও উপলব্ধির কথা বর্ণনা করেছিলেন। ১৩৪৫ থেকে ১৩৬০ অবধি সুদীর্ঘ ১৫ বছরে ছড়ানো এই সব প্রবন্ধে তাঁর চিন্তা দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তার ইতস্তত: বিবর্তন ও বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারের অভিলষিত সাবলীল ভাষা ও সুবিন্যস্ত বিষয়বিন্যাস-কুশলতা তাঁর প্রবন্ধে যদিও সুলভ নয়, তবু অনুভূতির সততা এবং কাব্য-শিল্প সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট কবির স্বীয় ভাবনা-ধারণা পছন্দ-অপছন্দের জন্য এই লেখাগুলি আধুনিক কাব্যপাঠক ও তত্ত্বজ্ঞদের কাছে মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে।

প্রথম প্রবন্ধ **'কবিতার কথা'** ১৩৩৫ সালের রচনা। জীবনানন্দ এতে কবিতা ও অকবিতার পার্থক্য নির্দেশ ক'রে প্রকৃত কবিতার জন্মরহস্যে অনুসন্ধানী আলো ফেলার চেষ্টা করেছেন। কবিতার সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকটভাবে নেই। সমাজনীতি রাজনীতি বা মনস্তত্ত্বই হয়তো গভীর ও নিগূঢ়ভাবে কবিতার মর্মকোষে থেকে আরো দীপ্যমান ক'রে তোলে কবিতাকে। কবিতা তবু সবার জন্যে নয়। যতদিন না সাধারণ মানুষ সুশিক্ষিত ও রসজ্ঞ হ'য়ে ওঠে ততদিন ভালো কবিতার সমাদর হবে না। শিক্ষার বিস্তার ঘটলে হয়তো প্রথম শ্রেণীর কবিরাও সমাদৃত হবেন। ততদিন ভালো কবিতা মুষ্টিমেয় দীক্ষিতের জন্যে থাকবে; ততদিন আপন প্রতিভার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে কবিকে সৃষ্টি ক'রে যেতে হবে মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ সফল হ'য়ে উঠবে এই প্রত্যাশায়।

'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধটি ১৩৪৮ সালে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পরেই রচিত। কোনো মহাকবিকে বুঝতে গেলে যে স্থির পরিপ্রেক্ষিত ও দূরত্বের প্রয়োজন, তার অভাব সত্ত্বেও জীবনানন্দ অভ্রান্তভাবে বলেছিলেন বহুযুগ ধরে পৃথিবীর কোনো দেশই এমন লোকোত্তর পুরুষকে ধারণ করেনি। জীবনানন্দ অনুভব করেছেন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে তাঁর যুগ পূর্ণতায় প্রতিফলিত হয় বলে অপর কবিদের পক্ষে তাঁর পরিধি এড়িয়ে প্রকৃত কাব্য কিছু রচনা করা দুঃসাধ্য হয়।

আঙ্গিকের দিকে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার অক্ষমতা এবং মননধর্মের শোকাবহ অভাব সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে আধুনিকত্ব দেয় নি। রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও ইতিহাসচেতনা

এক সীমায় এসে মন্থর হ'য়ে গেছে একথা অনুভব ক'রে আধুনিক কবিরা সমাজ ও ঐতিহ্য বোধে আশ্রয় নিয়েছেন। এ জিনিস রবীন্দ্র কাব্যে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ এর দিকে গুরুত্ব দেননি। এই ব্যতিরেকীগতির জন্য আধুনিক কবিতার চিন্তা ও ভাষা পৃথক পথে চলেছে। আধুনিক কবিতা মোটাচালে এবং গদ্যছন্দে চলে এ ধারণা ভুল। সূক্ষ্মসুরের আধুনিক কবিতা রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে গভীর সংঘর্ষে লিপ্ত। এই সব বিপ্লবাত্মক ভাববাদী কবিতার ভাবনা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে সৃষ্টি রহস্যের নূতনতর অর্থসন্ধানে ব্যস্ত। লোকায়ত জীবনদর্শনবাদী এইসব কবির মধ্যে মাত্র দু-একজনের মুষ্টিমেয় কবিতায় বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ববোধ সকল অভিব্যক্তি পেয়েছে।

আধুনিক এইসব কবি দিব্যানুভূতি বিরোধী। অন্যায়ের প্রতিরোধে তাঁদের শ্লেষাত্মক ও উন্মোচনী প্রতিভা নিয়োজিত। রাবীন্দ্রিক শুদ্ধ আবেগের পরিবর্তে এঁদের রচনা মননজীবী ও রসবিমুখ। এদের কবিতার বেশি বেদনা বেশি চেতনারই পরিচায়ক। ফরাসী প্রতীকী কবিদের অথবা ইয়েটস এলিয়ট পাউণ্ডের মনন বিচিত্রতার কাছে এঁরা ঋণী। আধুনিকদের এক পক্ষ মনে করেছিল এলিয়টের 'ওয়েষ্টল্যাণ্ড'ই যুগের প্রতিবিম্ব। তা সত্য, তবু এই বিশেষ সময়চিহ্নের ছাপ কালক্রমে ফিকে হ'য়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ—তিনি গণ-আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন বুর্জোয়া, আধ্যাত্মিক-সত্যে বিশ্বাসী। কাব্য যদি কবিমনের সততাপ্রসূত অভিজ্ঞতা ও কল্পনা প্রতিভার সন্তান হয়, তবে আধ্যাত্মিকতা মারাত্মক দোষ নয়—বরং শূন্যবাদের চেয়ে জীবনীশক্তি সম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সভ্যতায় লালিত হ'য়েও সেই সভ্যতারই প্রধান সমালোচক। পাউণ্ড এলিয়টও বুর্জোয়া সভ্যতার জীব, এলিয়টও আধ্যাত্মিক। জ্ঞাতসারে বিস্রস্ত হ'তে দিলেও আধুনিক কবিদের এক উৎকৃষ্ট পক্ষের অবচেতনায় রবীন্দ্র কাব্যই অনুভাবিত হয়েছে॥

ভাব ও চিন্তা বৈষম্যের হেঁয়ালিতে পড়ে আধুনিক বাংলা কবিতায় ভঙ্গুরতার দেদীপ্যমান ছাপ। ইতিহাস ও সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতার দোষ অতিক্রম ক'রে প্রয়োগ প্রতিভায় যদি কোনো ইঙ্গিতের দিব্যতা কবিতায় না মেলে তবে সেই শ্লেষ বা ধ্বংস কিম্বা গঠনমূলক প্রচার প্রবন্ধকে কাব্যসৃষ্টি বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ ও সুরকে অন্তগ্রথিত ক'রে কাব্য রচনা ক'রে গেছেন। রবীন্দ্র পরবর্তীদের মধ্যেও এমনি ঐতিহ্যচেতন নির্মাণ ও সৃষ্টির দ্বন্দ্বের থেকে উন্মেষিত সার্থকপ্রায় বা সফল কিছু কবিতা সৃষ্ট হচ্ছে। আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি ভেঙে ফেলছেন না বরং তাঁকে কেন্দ্র করেই নূতন বৃত্ত রচনায় ব্যাপ্ত রয়েছেন।

১৩৫১ সালে রচিত হয় **'মাত্রা চেতনা'**। কবিতার সৃষ্টিশেষে কবির কাছেই ধরা পড়ে তার সফলতা বিফলতা। কবিতা-সৃষ্টির মুহূর্তে লাভালাভের প্রশ্ন, পাঠকদের

কাছে গ্রহণীয় হবে কিনা এসব প্রশ্ন গৌণ হ'য়ে যায়। ঐকান্তিক চেষ্টা থাকে শুধু কবিতাটিকে সৎ ও সার্থক ক'রে তোলার। কবিতা কবির ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশের এক মহৎ মাধ্যম। কবি মানসের প্রমত্ততা তাকে অস্পষ্ট ক'রে তুললেও জনসাধারণের কাছে স্পষ্টতার দাবী কোনো কবিই উপলব্ধি না ক'রে পারেননি। তাঁর চেতনার গভীরে সেই দাবী তাঁর প্রতিভাকে যথাসম্ভব পরার্থপর ক'রে তুলতে সাহায্য করছে।

কবিতা যদি শুধু কবির কাছেই বোধ্য হ'য়ে থাকে তবে সন্দেহ স্বাভাবিক কবি সমাজ ও ইতিহাসধারাকে মর্মস্থ করতে পেরেছেন কিনা। বর্তমান যুগই অস্পষ্ট ও অন্তঃসারহীন—এই সদুত্তরেও পাঠক-সমাজ শান্ত হবে না। এই শান্তি পেতে হ'লে কবিতায় ও জীবনে মাত্রাচেতনায় পৌছাতে হবে। (এই বইয়ের ভূমিকায় ডঃ অমলেন্দু বসু 'মাত্রাচেতনা' শব্দটি ব্যাখ্যা করেছেন 'শুভবুদ্ধির আদর্শ' ব'লে।) কবিতা প'ড়ে মূল্যচেতনা (Sense of values ?) বাড়বার কথা। এসবের পরিণামে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে, কবি জনপ্রিয় হন। কবির আপন অভিজ্ঞতা কবিতাতে পরিবেশিত হ'লেও তা সার্বিক হ'লো কিনা, নিজের মূল্যজ্ঞানের চেতনায় সকলকে দীক্ষিত করা গেল কিনা তা কবিকেই দেখতে হবে।

অপরপক্ষে কবিতা স্পষ্ট করতেই হবে এ সংকল্পে কবিতা উৎরোবে না। কবির অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে স্থাপন করতে, প্রত্যয়কে সুস্থিরতা দিতে গিয়ে কবি সবচেয়ে স্পষ্ট ক'রে অন্যকে জানানোর আগে আপন ব্যক্তি-পুরুষকে দেখাবেন। এই ভাবে লেখা হ'লে কবিতায় প্রশান্তি আসে। কবিতা অনন্য সাধারণ হ'য়েও সাধারণের বোধগম্য হয়। অনেক কবি এসব জেনেও নিজেদের সংস্কার মুক্ত দেখানোর লোভে না জানার ভান করেন। তাঁদের উদ্দেশ্যমূলক রচনার পাশাপাশি তাঁদেরই কিছু প্রকৃত কবিতা তবু জাজ্বল্যমান হ'য়ে আছে।

কবিতা যে অমেয় পরিধি থেকে রূপ নেয়—তাতে আকাশও আছে। পাতালও আছে, প্রধানত আছে পৃথিবী, মানুষ। যে পথে কবিতা চলছে সেই পথেই একদিন ভাবীকালের কবিতা সুরসাম্য লাভ করবে। তাতে ভাষার প্রসাদও থাকবে মনে হয়।

১৩৫১ সালে **'উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য'** প্রবন্ধটি লেখা হয়। কবিতা যে 'মেমোরেবল স্পীচ' অডেনের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন জীবনানন্দ সংজ্ঞার অতিব্যাপ্তির যুক্তিতে। সমাজচেতনা, ইতিহাসচেতনা ও পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান কবিতাতে অন্তর্লীন থাকতে পারে কিন্তু একে নিয়ন্ত্রিত করবে, রূপ দেবে ভাবপ্রতিভা, কবিতা অবিস্মরণীয় বাণীই বটে, কিন্তু স্মরণীয় উক্তি নয়। পুরানো শব্দই ধ্বনি ও চিন্তার মর্যাদায় নূতন অর্থ লাভ ক'রে অবিস্মরণীয় হ'য়ে ওঠে। আধুনিক দেশী-বিদেশী কবির লেখা থেকে দৃষ্টান্ত তুলে জীবনানন্দ দেখিয়েছেন এদের বিশেষ বিশেষ কবিতা স্মরণীয় বাণী বা

স্মরণযোগ্য বাক্যের সমষ্টি মাত্র, হয়তো নিছক গদ্যধর্মী। স্মরণীয় যা তা সবসময়ে মনে নাও থাকতে পারে, যা অবিস্মরণীয় তা থেকে যায়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাব থেকে সচেতন মুক্তিপ্রয়াস নিয়ে যে বিদ্রোহের সূত্রপাত তা আজ অপ্রাসঙ্গিক। একালের কবিদের রচনায় বচন স্মরণীয়তা বেশি ব'লে তাতে কবিতার গুণ কম। রবীন্দ্র-কাব্যের মতো মহাকালের উৎসঙ্গে লুটিয়ে নেই—তা আজকের জন্যেই। তবু কিছু কবি আছেন যাদের পরিণতি এই খণ্ড কালের সময়ানুভূতিকে অতিক্রম ক'রে যাবে। অমিয় চক্রবর্তী আঙ্গিকের বিচিত্র আবহের ভিতর দিয়ে জীবনের অনুধ্যান ফুটিয়ে তুলেছেন। বুদ্ধদেবের কবিতার বহিঃ প্রসাধন স্তিমিত করেছে কি তার ভিতরের বহ্নি?—না সত্য তার বিপরীত? তিনি দর্শনভীরু হ'লেও তাঁর কবিতায় অস্তিবাদী জীবন দর্শন আছে। সুধীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও আন্তরিকতা একান্তভাবে তাঁরই। এ রকম আত্মপ্রসাদহীন সংযম দুর্লভ, তিনি আধুনিক বাংলা কবিতায় সবচেয়ে বেশি নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা। প্রেমেন্দ্র ঐতিহ্য বাদী, তাঁর কবিতা পরিণতিহীন, চিরনবীন। তাঁর শিল্প প্রেরণা ও জীবন চেতনা-বিচিত্র এবং কখনো কখনো মহৎ। প্রেমেন ও নজরুলের কাব্যাত্মা গত দু-দশককে বেশি আকর্ষণ করেছিল এখন দশকের সীমা ভেঙে পড়ছে। কাল অনেককে প্রবীণ করেছে, অনেকে প্রবীণতার ভান করেন, কেউ কেউ অন্যের উক্তির মাহাত্ম্যে প্রবীণ কাব্যশক্তিতে নয়, কেউ উপেক্ষিত—মহাকাল তাকে প্রবীণ বলবে। যেন প্রবীণতাই সাহিত্যের আরাধ্য। কিন্তু জীবনের প্রবীণতাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করার উপযুক্ত প্রজ্ঞা ও ভাবপ্রতিভার অভাব বড় বেশি।

'কল্লোলে'র উল্লেখযোগ্য সব কবিই জীবিত ও সৃষ্টিশীল। এমন দু-তিন দশক চললে একক রবীন্দ্রনাথের অভাব অনুভূত হবে না। রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র প্রভাব পর্বের পরে এই 'কবি সাধারণ সংঘ' সাহিত্যের কাছে সময়ের দান।

১৩৫৩ সালে রচিত **'কবিতা প্রসঙ্গে'** প্রবন্ধে লেখক বলেন, কবিতা লিখতে অন্তঃপ্রেরণার প্রয়োজন। বুদ্ধির মতোই সকলের কল্পনাপ্রতিভাও সমান হয় না। কল্পনা প্রতিভার উপরই কাব্যসৃষ্টির অন্তঃপ্রেরণা নির্ভরশীল। ইতিহাস-চেতনায় সুগঠিত শুদ্ধতর্কের ইঙ্গিত কবিকে বুঝতে হবে। ভালো কবিতা লেখা তাই মুহূর্তের ব্যাপার নয়—কখনো হয়তো কবিতার কাঠামোটি বা সম্পূর্ণ কবিতাটি লেখা হ'লো, তারপর আবার কল্পনা-প্রতিভার আশ্রয়ে শুদ্ধ-প্রতর্কের আবির্ভাবে তার দ্বিজত্ব ঘটে। কবিতার এক অঙ্গ অন্য অঙ্গকে স্পষ্ট ও সুসমঞ্জস ক'রে তোলে, তাতে বিশেষ ছন্দের দাম ক্ষুণ্ণ হ'লেও নক্সাটার উজ্জ্বলতা বাড়ে। এমন ঐকান্তিক কবিতা সুলভ নয় নানা কারণে।

প্রকৃতি, মানব সমাজ ও সময়—লিরিক কবি এই ত্রিভুবন-চারী। উপন্যাসে নাটকে প্রাধান্য মানবসমাজের। কিন্তু কবিতায় কেউ একক ভাবে প্রাধান্য পায় না। কিছুই চরম নয় কবিতার ক্ষেত্রে। আপন শুদ্ধ সত্তার মুকুরে বাস্তবকে প্রতিফলিত ক'রে নূতন কাব্যলোক গ'ড়ে তুলতে হয় কবিকে। ফলে বাস্তব ও বাক্যের জগতে যে সেতু গড়ে ওঠে তা কারো মতে পাঠকদের পরিনির্বাণে, কারো মতে সমাজ পুনর্গঠনে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে।

কবিতার প্রয়োজনে সাময়িকভাবে কবিকে কোনো কিছুকে 'চরম' মনে করতে হ'তে পারে। আধুনিক ইতিহাসের ইঙ্গিত এই অস্থায়ী পরমার্থকে নির্দেশ করে। সময় প্রকৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনা বিচার ক'রে এই চরমকে যাচিয়ে নেওয়া দরকার।

'কবিতার আত্মা ও শরীর' ১৩৫৩ সালের রচনা। নিছক বুদ্ধি দিয়ে কবিতা লেখা যায় না। আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলনে কবি মানসের আবহমানের অভিজ্ঞতার উপলব্ধি ঘটায় প্রেরণা। আজকের জটিল পৃথিবীতে প্রেরণার উৎস বহুমুখী, অবিজ্ঞানী অবিদ্যা পরিহার ক'রে সংসমাজের প্রবর্তনায় নিজেকে উদ্দীপিত করেন আধুনিক কবি। নবযুগের পরিবর্তিত মূল্যবোধ ছাড়া একালে সংকবিতা সৃষ্টি সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের নিরিখে সুনিয়ন্ত্রিত আধুনিক কবিমন পূর্বজ কবিদের চেয়ে সংহত ও সমৃদ্ধ। এদের মনন পরিমণ্ডল মহত্তর কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর। এই কাল সমাজ ও বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে কয়েকটি নূতন সত্য উদ্ভাবন করেছে; এসত্য অস্থায়ী হ'তেও পারে। তবু এই চলমান পটভূমির সঙ্গে একাত্ম আধুনিক কবিমন উত্তীর্ণ ছন্দের দ্যোতনায় সৃষ্টি করছে কবিতা।

যে কোনো আবেগ যে কোনো ছন্দে রূপ পায় না। বিশিষ্ট আবেগ মুহূর্তের মধ্যে বিশেষ এক ছন্দকে নির্ণয় ক'রে নেয়। ছন্দ অনেক রকম, গদ্যও এক রকম ছন্দ। বাংলা কবিতা ছন্দের মূল সুর হ'লো পয়ার। 'পয়ার' বলতে লেখক এক জাতের ছন্দ বোঝেন, ছন্দোবদ্ধ নয়। আধুনিক বাংলা কবিতার এক বিশেষত্ব ২২, ২৬ বা তার চেয়েও দীর্ঘতর মাত্রার পংক্তি সমাবেশ। অন্য কোনো ছন্দ এখনো বাংলা কবিতার প্রাণ বা আত্মার গহনতা আত্মস্থ করতে পারেনি।

আধুনিক কবিরা যতিপ্রান্তিকতার বদলে প্রবহমানতাই বেশি পছন্দ করেন। মুক্তক পয়ার, মুক্তক স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত মুক্তকেও লেখেন। একালের প্রাণের কথা যেমন সংহতি খুঁজছে, তেমনি সমাজ ও জীবনের বন্দীত্ব অতিক্রম ক'রে অমেয়তায় ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। তবু মাত্রাবৃত্ত মুক্তকে বা স্বরবৃত্তের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আধুনিক কবির তেমন উৎসাহ নেই। আজকের অব্যবস্থিত জীবনের মহানাটককে মহাকবিতায়

উত্তরিত করার সাধনাতেই কি একালের কবিরা শেক্সপীয়রীয় অমিত্রাক্ষর মহাপয়ার বেছে নিতে চাইছে?

১পরের প্রবন্ধ **'কি হিসেবে শাশ্বত'** লেখা হয় ১৩৫৫ সালে। প্রাচীন গ্রন্থ মহাভারত ও ইলিয়াডের মতো যে বইগুলি আজো বেঁচে আছে তা প্রকৃত পক্ষে সরাসরি আমাদের পড়া নেই—ঢের আধুনিকতর নানা রচনা থেকে আমরা এর জ্ঞান আহরণ করেছি। সাম্প্রতিক চার পাঁচশ বছরের দেশ-বিদেশী সাহিত্য ও চিন্তাবলয় বরং আরো বেশি সঞ্জীবিত ও সক্রিয়।

মহাভারত তার যুগকে ধারণ করেছিল, পথ নির্দেশ দিয়েছিল, গল্পবলার মর্মস্পর্শী অসাধারণত্ব দেখিয়েছিল। আজ হাজার হাজার বছর পরে আমাদের কালকে ঘিরে আমরা নূতন মহাভারতের স্বাদ পাচ্ছি। মহাভারত পড়া থাকায় এ কালের আনুপূর্বিকতাকে উত্তম এক বিধানের মধ্যে গ্রথিত ক'রে নেওয়া সহজ হয়েছে। মৌল পরিবর্তনও ঘটেছে অনেক, দৈব নির্ভরতা লুপ্ত হয়েছে জীবন লোকায়ত হচ্ছে, বিজ্ঞানের প্রসাদে আত্মনির্ভরশীল মানুষের সমস্যা মোচন হচ্ছে। আদি মহাভারতের জীবন প্রশ্ন এবং তার দিব্য সমাধান এখন অচল। তবু গল্প বলার সেই সফল বৃহৎ অনিমেষ পদ্ধতির জন্য, জীবনের কয়েকটা দিকের মর্মার্থ বোঝার জন্য বারবার আদি মহাভারতের কাছে ফিরে ফিরে যেতে হবে। আজ আর একমাত্র পরিচ্ছন্ন দিগ্‌নিরূপক অন্তিম গ্রন্থ হিসাবে মহাভারত বিবেচিত হবে না। কেননা অনেক সময়সন্ধির ভাঙাগড়ায় সেই যুগচেতনা পরিবর্তিত হ'য়ে গেছে। মহাভারত থেকে গল্প, রূপক টেনে এনে ব্যবহার করছি আমরা, করবোও। তবু জ্ঞান ধর্ম ও সাহিত্যের একমাত্র সারাৎসার গ্রন্থ আর মহাভারত নয়। কেননা এযুগের বড় সাহিত্যিকদের লেখা নিজস্ব মহাভারত আদি মহাভারতের চেয়ে অনেক বেশি নিকট এবং উজ্জ্বল।

দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' যেমন বহু প্রশংসিত কিন্তু অপঠিত, মহাভারতও তাই। প্রকৃত অর্থে পৃথিবীর কোনো বই-ই শাশ্বত হতে পারে না। এক এক জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অমর সংসদে চ'লে যান বটে কিন্তু তাঁর বইয়ের আবেদন ক্রমে রসিকদের কাছেও ক'মে আসে। দান্তের চেয়ে মহাভারত অনেক বেশি ব্যাপক ও লোকায়ত, তবু তার পাঠক সংখ্যা বেশি নয়। অনেকে কাশীদাসী মহাভারত পড়ে, না বুঝে, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। ভালো অনুবাদ, সুলভ দাম ও সুন্দর বিজ্ঞাপনের অভাবের জন্যও মহাভারতের পঠন পাঠন কম। সময় এবং রুচিও ক'মে গেছে মানুষের। তবু তার চেয়েও বড় কথা আমাদের ধারা ধারণাকে, কোন অলৌকিক নয়, সত্য পথ নির্দেশ মহাভারত করতে পারে না। তাই এই শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ অপঠিত থেকে যাচ্ছে। দান্তে আমাদের কাছে নিকটতর কালের হ'লেও দান্তের উপলব্ধির শাশ্বত জিনিসে মরচে

ধরেছে অনেক দিন, একই কারণে। একালের লেখকদের আকর্ষণীয় বই হাতে থাকতে দান্তের অব্যয় আলোর স্পর্শ নিতে কেউ রাজি নয়। শেক্সপীয়রও অমর, তবু তাঁর পরে দ্বিতীয় কোনো শেক্সপীয়র এসে দাঁড়ান নি ব'লে শেক্সপীয়র অনেকেই পড়েন। আধুনিক কালের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে এমন উপলব্ধি শেক্সপীয়রে বেশি বলে তাঁর লেখা বেশি দিন পড়া হবে মনে হয়।

'কবিতা পাঠ' লেখা হয়েছিল ১৩৫৬ সালে। ভালো কবিতা পড়লে অনুভব করা যায় সূক্ষ্ম জিনিসের স্পর্শে এসেছি। আমাদের পুরানো নানা অভিজ্ঞতা কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি এসে যায়। কবিতাটি স্মারক আঙুলের মতো তাদের জাগিয়ে দিয়ে মানুষ ও প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তার মর্মার্থ বাড়িয়ে দেয়। ভালো কবিতা প'ড়ে অভিজ্ঞতার এক বিশৃঙ্খল উপেক্ষিত অংশে সম্বিত এলো, গোছানো হ'তে লাগল সব, কবি যা দেখাতে চাচ্ছে মনশ্চক্ষে, তার অনেকখানিই দেখলাম, আনন্দ পেলাম। সংকবিতা পাঠকের কাছে সুস্থিরতাও অভিনিবেশ দাবী করে, তার অভিজ্ঞতা ও মূল্যচেতনা বুঝে নিতে চায়। ছন্দ মানুষের জন্মকালীন। তারপরে কবিতা এলো। মানুষের মৃত্যু অবধি কবিতা থেকে যাবে মনে হয়। দেশ কাল ও সন্ততির ব্যাপ্তিতে গ্রথিত গভীর সব কবিতা প'ড়ে, আমাদের সামাজিক অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন হয়। আরো কিছু বাড়তি লাভ করি যা ইতিহাস বা সময়ের নিরঞ্জনের ভিতরে এখনো মেলেনি।

এদেশে কবিতার পাঠক খুব কম, বাড়বে মনে হচ্ছে। পাঠকদেরও রুচি দৃষ্টিসিদ্ধি সমান নয়। তবু একই যুগের বোদ্ধা পাঠকরা কবিতা প'ড়ে যে অব্যর্থ স্বাদ পায়, অন্য যুগে ততখানি পাওয়া সম্ভব নয়। উনিশ শতকের একজন সার্থক পাঠক শুধু যে আধুনিক কবিতা প'ড়ে বুঝবে না তাই নয়, এর প্রাণ বস্তু সম্পর্কেও সন্দিহান হ'তে পারে। কবিতার ভাষা রীতি প্রকরণ সবই আমূল রূপান্তরিত হচ্ছে। সুতরাং আজকের পাঠককে ক্রমাগত দীক্ষিত হ'তে হবে।

একটি অনশ্বর কবিতার ভিন্ন ভিন্ন মানে বেরুবে একই বা ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের মনের বিভিন্ন অবস্থায়, অর্থ অস্বচ্ছ হ'লে ধ্বনিগুণ পাঠককে আকৃষ্ট করবে। এই সব ভাসা ভাসা অর্থ পেরিয়ে উপলব্ধির আলোয় অর্থের অনমনীয় শিবত্বে পৌছানো চাই। সমাজ চেতন বা ইতিহাস চেতন—এই সবের বিচারে বোঝা যায় না রচনাতে কবিতার অনিমেষ স্বভাব বা সম্পন্নতা এলো কিনা। ইতিহাস চেতনা সমাজচেতনার দরকার আছে কিন্তু তা কাব্যধর্মের অনুগত হয়েই আসবে।

অনেক কবিতা আছে, বিশেষ এক যুগে জন্ম হলেও বা চিরকালের কবিতা। চিরন্তন মানব প্রকৃতি ও বিশ্ব প্রকৃতি তাতে প্রতিফলিত হয়। সমাজ, মানুষ, প্রেম,

প্রকৃতি বা আধুনিক সমস্যা যা কিছুই অবলম্বন ক'রে কবিতা লেখা হোক তা অনুভূতি-বেদ্য হ'য়ে প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবির আরো দৃষ্টি-সাধনার প্রয়োজন।

বাংলা কবিতার ভালো অতীত ও বর্তমান রয়েছে। মনে হয় ভবিষ্যতেও সব দেশের সৎ কবিতার সঙ্গে গ্রথিত হয়ে বাংলা কবিতাও থাকবে, কখনো ভিড়ে চাপা কখনো আলোকোজ্জ্বল হবে। বাংলা আধুনিক কবিতার অধ্যয়ন ও আলোচনায় একালের ছাপ পড়বে বটে ক্রমে ক্রমে পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি আসবে—আলোচনার শুদ্ধতাও। মানুষের হৃদয় না বদলালেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়, সাহিত্যে তার প্রতিফলন পড়ে নূতন ভাবে। এই নূতন কালের অনাগত ভবিষ্যতের রূপরেখা অস্বচ্ছ হ'লেও ধ্যান ও বিচারের মাধ্যমে তাকে স্পষ্ট ও আয়ত্ত করতে হবে—তা হ'লে বোঝা যাবে এযুগের কাব্য থেকে কি মুছে যাচ্ছে, কি টিকে থাকবে।

পরবর্তী প্রবন্ধ **'দেশ কাল ও কবিতা'** ঐ বছরেরই রচনা। কবিতা যেহেতু বিশেষ কোনো দেশের বা যুগের নয়—তাই তার আলোচনায় কোনো গাণিতিক শুদ্ধি আশা করা যায় না। কোনো লোকের পক্ষেই যাবতীয় কবিতা প'ড়ে দেখা সম্ভব নয়। তবু যত বেশি দেশের বিচিত্র কবিতা সমালোচকের পড়া থাকবে তত স্পষ্ট আয়ত গভীর আলোচনা তার পক্ষে সহজ হবে। উদার, সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে, প্রাক্‌পরিগৃহীত কোনো ধারণা না রেখে কবিতা পড়লে সুজাত সমালোচকের বোধ জ্ঞানে পরিণত হবে। কবিতার ভালোমন্দ নির্ণয়ের সহজাত বোধ বিশ্লেষণ, অনুশীলন ও ব্যাপক কবিতাপাঠের ফলে সমালোচককে দক্ষ ক'রে তোলে।

এদেশে পূর্বজ প্রধান কবিদের সব লেখাও কিনতে বা লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করতে পারা যায় না। তবু আলাওল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত কালের ভালো কবিতা সমালোচকের পড়া দরকার, সংস্কৃত কবিতার পরিপ্রেক্ষিতের স্পষ্ট বোধ এবং ইংরাজী ও ফরাসী কবিতার—সমালোচকের বুনিয়াদ শক্ত করবে। ফরাসী, গ্রীক এবং সমস্ত প্রধান ইউরোপীয় কবিতাই ইংরেজী অনুবাদে পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার কবিতা থেকে তুলনায় লাভবান হওয়া কঠিন। ঢের বেশি কবিতা পড়া চাই, অন্তত নানা প্রামাণ্য সংকলনের ভিতর দিয়ে নানা দেশের সার্থক রচনার অন্তরে প্রবেশ করা দরকার।

সমালোচনার স্বভাবভিত্তি কোনো কোনো পাঠকের আছে। কম পড়েও তারা পৃথিবীর সমগ্র কবিতার অক্ষর স্বাদ, প্রতিটি কবিতার স্বতন্ত্র স্বাদ, বিভিন্ন দশক ও শতকের কবিতার স্বভাবধর্মকে অনুভব করতে পারে। কবিতার দেশ কাল ও তাৎপর্য তাদের কাছে ব্যক্ত হয়। তবু এই প্রাথমিক স্বভাব থেকে ক্রমে ক্রমে উপরের স্তর-

ভূমিতে উঠে এলে তবেই সংকাব্যের দোষত্রুটি, পাঠকচিত্তের রুচি পরিবর্তন এবং সমালোচকদের কাব্যে মীমাংসার রূপান্তরের হেতু প্রভৃতি জটিল প্রশ্নের পরিসর সাপেক্ষ উত্তর দিতে পারা যাবে। নিজের যুগ ছাড়িয়ে অন্য যুগের অনুভূতি উপলব্ধির স্বভাব ক্ষমতা বিস্তারিত কাব্য পাঠের সুফল এনে দিতে পারে। যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রকৃতি এবং সমালোচনার তত্ত্বের বিবর্তন ঘটেছে। তাই প্রত্যক্ষ ও সামগ্রিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে।

শাশ্বত কবিতার মতো সমালোচনাও শাশ্বত হতে পারে। তবু এক এক যুগে এক এক দিকে ঝোঁক পড়ে বেশি। বড় সমালোচককে একথা অনুভব ক'রে সাবধান হ'তে হবে। অক্ষর কবিতা আছে কিন্তু তা ব্রহ্মের মতো অব্যয় নয়। এ সব অনুভব করে বিভিন্ন যুগ প্রবণতা দোষ গুণ দাবী ও সার্থকতা বিচার ক'রে কবিদের যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রতিটি যুগের বিশেষত্ব ও আতিশয্য সম্পর্কে সচেতন থেকে অগ্রসর হ'লে স্বাভাবিক ও মহৎ কবিতার এক নূতন যুগ জন্ম নিতে পারে।

'সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা' ও ১৩৫৬ সালের সৃষ্টি। প্রাচীন মানুষের অলৌকিক নানা বিশ্বাস লুপ্ত হয়েছে বহুকাল। পরলোক, আত্মা, আত্মার অমরত্ব, ধর্ম, ব্রহ্ম ইত্যাদিতে এখন আস্থা অটুট থাকছে না। এই শূন্যতাটা ক্রমে ভ'রে উঠছে বিজ্ঞানে আস্থা দিয়ে। কিন্তু যুক্তি স্বচ্ছতা অতিক্রম ক'রে মানুষ কি আবেগ-ঘনিল হ'য়ে উঠছে?

দর্শনের জায়গাটা ক্রমেই বিজ্ঞানের দখলে আসছে। ফলে এক বিরাট ভাব-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। যুক্তিসিদ্ধ নিঃশ্রেয়সের জন্য এই বিপ্লব। কিন্তু প্রকৃত বিপ্লব হয়তো পরবর্তী প্রজন্মে ঘটবে।

গত চার হাজার বছরে মানুষের সমাজে খারাপ কিছু না হ'লেও বেশি সততার দিকে হৃদয়ের মোড় ঘোরেনি। সুতরাং সমাজের ভালো কি আরোপিত হবে, না শুভ বুদ্ধিজাত হবে? আরোপিত হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে। এ সমস্যার সমাধান দর্শন দিতে পারেনি, বিজ্ঞানও পারছে না। তবু জগতের কল্যাণমূলক সত্য বিজ্ঞানই বেশি আয়ত্ত করতে পারবে। বিজ্ঞানের নিজস্বভাবে কোনো দোষ না থাকলেও ব্যবহারকারীদের দোষে তার ফল নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ছাড়া কি মানুষের কল্যাণের কি অন্যপথ কিছু নেই?

কবিতা কোনো বিজ্ঞান-প্রামাণ্য পথে রচিত হয় না। কবিতা রচনার নানা উপকরণ আছে বটে কিন্তু ল্যাবরেটরীতে যে ভাবে কিছু উৎপন্ন হয় সেভাবে কবিতা গ'ড়ে ওঠে না। একটা স্থির ক্রমিক অব্যর্থতার বশে ঠিক প্রয়োজনীয় উপকরণটিই কবির চিত্তে আবির্ভূত হয়। যেভাবে কবিচিত্তে কবিতার সত্য উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে

ঠিক সেই ভাবেই বিজ্ঞানের সত্যও বিজ্ঞানীর চিত্ত গহনে আবিভূ্ত হতে পারে কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠিত করা গাণিতিক যুক্তি-সাপেক্ষ। কিন্তু গাণিতিক যুক্তি নেই ব'লে কবিতা অসত্য হ'লো না। তাকে গ্রহণ ও বিচার করবে সহৃদয় পাঠক-চিত্ত। কাব্যের সত্য বিজ্ঞানের সত্যের সমান্তরাল। ধর্ম এখনো দাঁড়িয়ে আছে বটে কিন্তু তার সত্যগুলো এক এক ক'রে ভুল প্রমাণ হ'য়ে বিজ্ঞানের আয়ত্তে চলে যাচ্ছে। বিশুদ্ধ ধর্মকে আরো নিয়ন্ত্রিত ক'রে নিলে তা কবিতার সঙ্গে বিপজ্জনক একাত্ম হ'য়ে উঠতে পারে। কিন্তু তা না করাই ভালো, তা ধর্মেরও আকাঙ্ক্ষিত নয়। কবিতাতেও আপ্ত বাক্যের স্থান নেই। দর্শন ও ধর্মের নিকটতর ছিল কবিতা। ধর্মের সংস্কার ও অনুভূতি, দর্শনের মানুষ ও নিসর্গজনিত সত্য তার উপাদান ছিল। আজ এ বিষয়ে কাব্য বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। যুক্তিরীতির উপায়ে শুদ্ধ হ'য়ে ধর্ম যদি ফিরে আসে তবে তার নাম ও রূপের বদল হবে নিশ্চয়। ধর্মের আসন্ন মৃত্যুতে কেউ কেউ নিঃসহায়। কিন্তু কবিতার মৃত্যু হয়নি। তবু বিজ্ঞানের মতো কবিতাতেও এই সব লোকের কোনো আশ্রয় নেই। বিজ্ঞান প্রদত্ত দ্বিতীয় সত্যের পাশাপাশি যারা কবিতার প্রথম সত্য অনুভব করে তারা কবিতায় আনন্দ পাবে। ধর্ম এদের ঢের বেশি সান্ত্বনা ও সিদ্ধি, বীতকাম ক'রে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ আর সে ক্ষমতা নেই। কিন্তু এখনো কবিতা এক জাতের আনন্দ ও প্রশান্তি দিতে পারে মানবচিত্তকে।

যে আগামী বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে তা ঘটলে কবিতা কি আরো সপ্রতিভ, আরো মহান হবে? বিপ্লবোত্তর দেশে দেখা যায় উচ্ছ্বাস আধিক্যে সুসাহিত্য লেখা হ'লেও বৃহৎ মহান সাহিত্য-সৃষ্টি দুরূহ হয়। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পরিমিতি প্রসার ও গভীরতা নিয়ে কবির কাজ। অতি অবিশ্বাসে আধুনিক সাহিত্যের অনেক সম্ভাবনা নষ্ট হচ্ছে, আশ্বাসের অতি সাচ্ছল্যে খারাপ হবার সম্ভাবনা আরো বেশি।

১৩৫৬ সালের চতুর্থ প্রবন্ধ হ'লো **'রুচি, বিচার ও অন্যান্য কথা'** উপনিষদের কাল থেকে আজপর্যন্ত রচিত দেশী বিদেশী অজস্র কবিতার অধিকাংশই ছাপাতে টিঁকে থাকলেও মন থেকে মুছে গেছে; যা আছে তাও যাবে কালক্রমে; অতি অল্পই অনেকদিন স্থায়ী হবে। মানুষের স্বভাব-নিহিত মঙ্গল-প্রেরণা আছে ব'লেই বইগুলো মানুষের রুচি ও জ্ঞানের আকর হতে চেষ্টা করেছে। মহান কবিতা তাই সততা ও শুদ্ধতার সহায়ক শক্তি। দর্শনে ব্রহ্ম সম্পর্কিত চিন্তার বিবর্তন এবং পরিশেষে বিনাশ হয়েছে। বিন্দুতে সিন্ধু আছে একথা ধ'রে না নিলে কবিতা ব্রহ্মের চেয়ে ঢের অল্পপরিসরের জিনিস। তবু তেমন গভীর কাব্যও আছে, তার আস্বাদের উপযোগী মনও আছে তবু তা দার্শনিক চিন্তা বিচারের চেয়ে ছোট পরিসরের বিষয়। ব্রহ্মাণ্ড

চেতনা মানুষের জন্ম মৃত্যুর চেয়েও পরিব্যক্ত। কোনো দার্শনিক বা চিন্তাবিদের রচনায় তার শেষ কথা উচ্চারিত হয়নি কিন্তু কবিতার পরিসর সাধারণত মানব কালের এক ছোট খণ্ডাংশ নিয়ে। তার স্বরূপ নির্ণয়েও আলোচককে এত অন্ধকার হাতড়াতে হয় না।

কবিতা সম্পর্কিত ধারণার যুগে যুগে বিবর্তন হয়েছে। প্রাচীনরা কবিতা সম্পর্কে পৃথক পৃথক রকম চিন্তা করতেন। তবু মনের স্থায়ী পদার্থ বদলায়নি ব'লে সাহিত্য-চিন্তার নানাস্তরে ফলিত ব্যক্তিত্বের তারতম্যটুকু বুঝে কবিতার প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নেওয়া অসম্ভব নয়। অধিকাংশ আলোচক আগে আপন খণ্ড কালের নিজ লক্ষণকে বড় ক'রে দেখেছেন ; সেই ত্রুটি বুঝে নিতে হবে। কোলরিজই প্রথম সমালোচনায় আপন দেশ ও কালের পরিধির বাইরে ধ্যানের একটা মেধাবী সমাহিতির সাধনা করেছিলেন। তাঁর আলোচনা আর্নল্ড ও এলিয়টের চেয়েও স্থিতধী ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। এদেশে যেমন বঙ্কিমের চেয়েও রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় গভীরতা ও উত্তরণ বেশি। প্রমথ চৌধুরীর মতো আলোচকের লেখাতেও পৃথিবীর যাবতীয় কবিতার চেতনা না থাকায় সে আলোচনা নির্ভরযোগ্য নয়। কাব্য-ব্রহ্মাণ্ডের চেতনার ভিতরে ব্যক্তির বা খণ্ড কালের কবিতাকে সৎসমালোচনা মর্মগ্রথিত ক'রে নেয়।

কারো আলোচনায় আবার নিজের রুচি প্রতিফলিত হয়েছে। নিজের পছন্দ মাফিক দেশকালের কবিতা ভিন্ন অন্য কিছুকেই তাঁরা স্বীকৃতি দেননা। এঁরা অধিকাংশই আপন ধরতাই সংস্কার ভালবেসে বা সমাজের হিত কামনা ক'রে কবিতার বদলে কবিতার অব্যবস্থিত উপকরণকেই ভিত্তি ক'রে সিদ্ধান্তে যেতে চান। কবিতার প্রকৃতি নাশ ক'রে বদলে কোনো রীতি দাঁড় করালে, কল্যাণ হবে না, চেতনার অন্তিম সিদ্ধির কয়েকটি স্তর লোপ পাবে। মর্মে কবিতা থাকা সত্বেও সমাজের অনুভব শক্তি কম। এজন্য কবিতা নয়—সমাজকেই পরিবর্তিত করতে হবে। কবিতা বেশি দিন লোক-কবিতা হ'য়ে থাকবে না—সরলতা ও নির্দোষ সাচ্ছল্য যেহেতু সভ্যতাতে আর নেই, তাই একালের অভিজ্ঞ স্থিরতর কবিদের চিন্তাগভীর ও অন্তর্গভীর কবিতার উপলব্ধি আয়াসসাধ্য হবে।

ঐ বছরের পঞ্চম প্রবন্ধ '**কবিতার আলোচনা**'। কবিতার আলোচনায় অকবিরা পরিচ্ছন্নতা ও ভালো অন্তঃপ্রবেশ দেখালেও নির্ভরযোগ্য ও কুশল আলোচনার জন্য প্রতিটি যুগের কবিদের এগিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। আপন কবিতার আলোচনায় তাগিদ কেউ কেউ অনুভব করেন। কবির একমাত্র তাগিদ—ভালো কবিতা লেখার, নিজের বোধিকে পরিতৃপ্ত ক'রে লেখার তাগিদ। সে কবিতা যদি পাঠকরা অনুভব করতে না পারেন তবে কবি কি কবিতার শরীর ও তার ভিতরের বেদ সম্পর্কে পাঠককে

বোঝাতে যাবেন, না কবিতা লেখা থামিয়ে দেবেন? কম কবিই এ বিষয়ে গদ্য লেখায় উৎসাহ বোধ করেছেন। সৎ কবির কাছে কবিতাই একমাত্র ভালবাসা ও দায়িত্বের জিনিস, সমালোচনা নয়। কালচেতনা ও কালোত্তর চেতনা সম্পর্কে শিক্ষিত কবিমন তাঁর স্বভাব-প্রতিভাকে প্রতিনিয়ত স্থির ও বিশুদ্ধ ক'রে নিচ্ছে, ফলে এসবের যথাযথ দাবি মিটিয়ে কবিতার জন্ম হচ্ছে, সৎকবির স্বভাব ও শিক্ষা ক্রমেই বদলাচ্ছে। পরের পর্যায়ের কবিতা সবসময়ে ভালো না হ'তে পারে কিন্তু আগের চেয়ে ভিন্ন হ'য়ে যায়। কবির অগ্রসরণ মানে পর্যান্তরে গমন। কবি তাই সহজাত গুণকে ক্রমেই আরো শিক্ষিত ও পরিণতির পথে চালনা করবেন। সৎ কবিতামাত্রই স্বভাব কবিতা। তবু অভিজ্ঞতা বাড়ার ফলে তা উন্নততর সিদ্ধিতে পৌঁছায়। অভিজ্ঞতাকে কতদূর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পেরেছেন কবি সে অনুযায়ী কবিদের উৎকর্ষের ক্রম ঠিক করা যায়। এই তারতম্যের জন্য সকল কবিদের মধ্যেও কারো কবিতা চলনসই, কারো সুন্দর, কারো সৎ, কারো বা মহৎ। তবু কবিতার কাজ দর্শনের শিখরে পৌঁছানো না, মানুষের চেতনার কাছে পৌঁছানো।

অভিজ্ঞতা বাড়াতে গেলে কবি প্রতিভা কখনো বা বিশৃঙ্খল হ'য়ে উঠতে পারে। বিশাল অভিজ্ঞতা মহৎভাবে শিক্ষিত কবির সংখ্যা তাই কম। অভিজ্ঞতা আসে জীবন আর গ্রন্থ থেকে। এ দুইয়ের সুষ্ঠু সন্নিবেশ দরকার।

লোকে কবির কবিতার সঙ্গতি অনুভব করতে না পারলেও কবি কি বিবেকের কাছে খাঁটি থেকে কবিতা লিখে যাবেন? বিদেশী সমালোচকরা কবিতার সৃষ্টি-প্রণালীর আশ্চর্য অন্তর্গূঢ় বিবরণ দিয়েছেন যদিও, তবু জীবনানন্দের মতো কবিতা সম্বন্ধে বড় সত্যার্থী আলোচনা কবিদেরই করা উচিত। তাঁদের লেখায় পাণ্ডিত্যের চেয়ে জ্ঞান থাকবে বেশি। পাণ্ডিত্যে অর্ধসত্য অনেক, জ্ঞান সত্যের নিকটতর। গত দশ পনেরো বছর কবিতার সমালোচনা যাদের হাতে অর্পিত ছিল তাদের বইপড়া পাণ্ডিত্য থাকলেও কবিতার ভাবলোকে বাস করার রুচি ও ক্ষমতা ছিল না। ফলে অপসমালোচনায় কবিতার ক্ষতি হয়েছে। আরো হ'তে পারে। উদ্ভিন্ন কবিদের সম্ভাবনা যাতে নষ্ট হ'য়ে না যায়, পাঠকরা যাতে প্রকৃত কবিতা চিনে নিতে পারে—এজন্য কবির সমালোচনায় এগিয়ে আসা প্রয়োজন। ইংলণ্ডে এবং বাংলাদেশে সমালোচনার ধারা কবিরাই বহন করেছেন এত দিন। বর্তমানে এই শূন্যতা কবিদেরই পূরণ করতে হবে।

১৩৫৭ সালে রচিত প্রথম প্রবন্ধ 'আধুনিক কবিতা'। জীবনানন্দ বলেছেন, মানুষের মনের চিরপদার্থ মহৎ লেখকের হাতের কৌশলে কবিতায় বা সাহিত্যে রূপ পেলে আধুনিক সাহিত্য বা কবিতা হ'য়ে ওঠে। সুতরাং সব সময়ের জন্য

আধুনিক এমন সাহিত্য রয়েছে। যেমন মহাভারতের কিছু অংশ শোফোক্লেস বা ইসকাইলাসের কিছু কিছু।*

যাঁরা দায়িত্বের খাতিরে কবিতা পড়েন ও আলোচনা করেন যেমন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপকরা—যেসব কবিদের উপর বিশদ আলোচনা ও স্বীকৃত সিদ্ধান্ত নেই, সেই সব আধুনিক কবিতায় আলোচনায় তাঁদের ধারণার অস্পষ্টতা লক্ষণীয়। কবিরাও অনেকে কবিতার আলোচক কিন্তু সকলের ধারণা ও রুচি সমান নয়। এলিয়ট, জীবনানন্দের মতে, কবিতার অধ্যাপক হলেও তাঁর মতামত সবিশেষ গণ্য নয়। তবু কবিরাই ওদেশে এবং এদেশে কবিতা সম্পর্কে বেশি বোধশক্তির পরিচয় দিতে পেরেছেন। ১৯২৫ থেকে পরবর্তী কালের কবি মনের জিজ্ঞাসা ও মীমাংসায় কোনো বাঙালী কবি এগিয়ে এলে সহজ হবে। হয়তো তাতেও ভুল থাকতে পারে তবু তা বর্তমান সমালোচকদের চেয়ে সম্পন্নতর হবে মনে হয়।

যুগলক্ষণ চিহ্নিত কবিতা আধুনিক কবিতা—এই প্রাথমিক আধুনিক কবিতার অল্প স্বল্প উত্তর যুগে উত্তরিত হবে। শেলীর কাব্যমূল্য সম্পর্কে সমালোচকরা ভুল করেছিলেন। শেলীর কবিতা কালোত্তীর্ণ হয়েছে, তা আজ পর্যন্ত আধুনিক। কবিদের মধ্যে যেমন নানা স্তরের প্রবীণতা আছে, রুচির তারতম্য আছে, সমালোচকদের মধ্যেও অনুরূপ তারতম্য দেখা যায়। এলিয়টের বিশ্লেষণী আলোচনার সমীচীন মেধা উজ্জ্বল স্পষ্টতা সত্ত্বেও শেলী এবং অন্যান্য উনিশ শতকের কবিদের রবীন্দ্রনাথ আরো ভালো ক'রে বুঝতে পেরেছেন।

যুগের বিশিষ্ট মর্ম যাঁরা অনুভব করতে পারেন না, আনুষঙ্গিকতার রীতি ও রাগে আচ্ছন্ন সে সব কবি নানা ভাসমান 'সামাজিক' বিষয় ও সমস্যা নিয়ে রিপোর্ট নিয়ে চিন্তা ও ভাবের অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে সার্থকতায় পৌঁছবার চেষ্টা না ক'রেও একধরনের প্রাথমিক আধুনিক কবিতা লিখেছিলেন। সেই আধুনিক কালের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কিছুকিছু আঙ্গিকের তাৎপর্য ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্তী এইসব কবির কবিতার কিছুই অবশিষ্ট নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আজও আধুনিক। বর্তমানেও তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ দশক যাঁরা কবিতা রচনা করছেন তাঁদের অনেকেই আপন যুগকে পরিষ্কার ও সত্য ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। তবু পূর্বজ কবিদের মতো আধ্যাত্মিকতার বা অন্য কোনো পরিচ্ছন্ন বিশ্বাসভূমি না থাকলেও কিছু কবি

* তাঁর এই বক্তব্য আমরা সমর্থন করি না। এ বিষয়ে আমাদের অভিমত আমরা ইতিপূর্বে (৩২ পৃঃ) উল্লেখ করেছি।

স্পষ্টতর ও সত্যতর ভাবে এই সফলতায় পৌঁছেছে। কিয়ের্কগার্ড প্রভৃতি দার্শনিকের অস্তিবাদী চিন্তাধারা মানবজীবনের এই অন্তর্নিঃসহায়তার কথাই ব্যক্ত করে। আশা করা যাক আধুনিক বিজ্ঞান নিরাশাবাদ ছাড়িয়ে শূন্যতা অতিক্রম ক'রে সৎ আশাবাদে মানুষকে উপনীত ক'রে দেবে। এবং এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-সিদ্ধ কবিতা ভালোর স্তর পেরিয়ে মহত্তের স্তরে উত্তরিত হবে।

১৩৫৭ সালের দ্বিতীয় প্রবন্ধ **'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ'**। ধর্মসাধকদের মতো অনেক কবি চেতনাতীত এক আলোর কথা বলেছেন। মন-নির্মনের সন্ধিজাত এই আলো নাকি তাঁদের কবিতা সৃষ্টির উপকরণগুলিকে উদ্বোধিত করতে সাহায্য করেছে। এরই জন্যে দর্শন বিজ্ঞান এমনকি ধর্মের মীমাংসার চেয়ে পৃথক এক নির্মলতা কবিতায় দেখা যায়। এই দিব্যতা কালের বিচারে টিঁকবে কি? বিজ্ঞানের অভ্যুন্নতিতে দর্শন বিলুপ্তপ্রায়। বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস আরো বাড়লে ধর্মও টিঁকবে মনে হয় না। তবু কবিতা বিজ্ঞানের পদ্ধতির বাইরেও সত্য ও দিব্যতা বজায় রাখতে পারে। কেননা কবিতা মানুষের মনের স্থায়ী পদার্থের সৃষ্টি। বিজ্ঞানের সত্য বিজ্ঞান সৃষ্টি করেনি, ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত এই সত্যকে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে বটে কিন্তু মাঝে মাঝে ভুলচুক ধরা পড়ে। কিন্তু কবিতার সত্যে এত বেশি খণ্ডন নেই, তাই উপনিষদের শেক্সপীয়রের বা রবীন্দ্রনাথের আবেদনের অনেকখানিই যুগান্তরেও অব্যর্থ থেকে যায়।

একটা বৃহৎ সময়ের ভিতর ফলিত হয়ে থাকবে কবিতা। প্রতিটি যুগের নতুন নমনীয়তায় নূতন সঙ্গতি লাভ ক'রে কবিতা বেঁচে থাকতেও পারে। মনের অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন বা বিনাশ না হ'লে কবিতা থাকবে।

বাংলা আধুনিক কবিতা আধুনিক পৃথিবীর মহত্তম তাৎপর্যগুলির সঙ্গে যোগ রেখে গভীরতর প্রসার পেয়েছে। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এখানে কবি বেশি— কাব্যধারা অখণ্ডিত। রবীন্দ্রোত্তর কালের সব লেখা স্থির ভাবে সংকলিত হ'লে বোঝা যেত একটা প্রধান কাব্যের যুগের ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা। পনেরো কুড়ি বছর পরে স্পষ্ট হবে একালে একজন বা দুজন কবির নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠতা আছে কিনা। তখন এ যুগও পরিসমাপ্ত হবে। এই যুগের মধ্যে দীর্ঘ কবিতা, কাব্য নাট্য এবং শ্লেষ মহান কবিতা লেখা হয়নি। আগামী দশ-পনেরো বছরে এসব পরিণতির দিকে মোড় ঘুরবে কি? বাংলা কবিতার ভাবী পরিণতির কোনো স্পষ্ট আভাস দেখছি না তবু অদূর ভবিষ্যতে দীর্ঘ কবিতা ও শ্লেষে লিখিত মহাকবিতা আসবে এবং গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের থেকে স্বতন্ত্র কাব্যনাট্য দেখা দেবেই।

এ গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধটি হ'লো ১৩৬০ সালে রচিত 'অসমাপ্ত আলোচনা।' নানা যুগে ও নানা দেশে রচিত অনেক কবিতাকেই আধুনিক কবিতা বলা চলে। একালে

রচিত অনেক কবিতাও কালোত্তর। তবু আধুনিক বলতে একালের রচনার কথা বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পনেরো বছর আগে থেকে 'কল্লোলের' লেখকদের নিয়ে একালের সূচনা। তাঁরা ভাবতেন, রবীন্দ্রনাথ সব বিষয়ে কবিতা লেখেন না। তাঁর লেখায় ইতিহাসের বিরাট জটিলতা প্রতিফলিত হয় না। জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের সঙ্কেত তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়নি। এই সব সত্যমিথ্যা যুক্তির ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের অনুলেখন করতে করতে 'কল্লোল' নিজের মন খুঁজে পেয়েছিল, ভাষায় এক নূতন তাৎপর্য এনেছিল। কয়েকটি সার্থক কবিতা পাওয়া গিয়েছিল। প্রতীকী সাররিয়ালিষ্ট ও অন্যান্য নানাজাতীয় ও প্রচারমূলক, শিক্ষামূলক প্রভৃতি লেখায় ব্যাপকতা এলেও গভীরতা এসেছিল কিনা তার প্রকৃত বিচার হয়নি।

রবীন্দ্রনাথকে উপাদান হিসাবে নিয়েও যদি পৃথক সিদ্ধি আধুনিক কবির আয়ত্তে এসে থাকে তবে তা প্রশ্নাতীত। কেউ কেউ নূতন বীক্ষা ও রীতিনীতির ভিতর স্বতন্ত্র কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কারো কারো হাতে ক্লাসিক রীতির অভিনব প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কোনো কোনো কবির লেখায় অন্তর্জ্ঞানের দুয়ার যথাসম্ভব খোলা, মালার্মে র‍্যাঁবো রিলকের মতো প্রতীকী কবিতার প্রবর্তন। আবহমানের বাংলা কবিতার ঐতিহ্যকে আধুনিক কবিরা পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ কাব্য উপলব্ধির সঙ্গে অন্বিত করতে পেরেছেন। আধুনিক কালের জটিল বিন্যাস কবির কাছে অপার সতর্কতা অধ্যবসায় ও মননের ক্ষমতা দাবি করছে। আগাগোড়া বাংলা কাব্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের সঙ্গে ইংরাজী ও ফরাসী কবিতার মর্ম অনুধাবন করার শক্তিও চাই।

দেশ কালের বিশেষত্ব ও মানুষের রুচির পরিবর্তনের ফলে পুরানো পদ্ধতির পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়েছে। যুগে যুগে সাহিত্যের যে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দেখা গেছে তার মধ্যে মানুষের সনাতন মূল্যবোধের অস্তিত্ব আছে বটে কিন্তু তা নূতন যুগে নূতন রীতি ভঙ্গি ও আঙ্গিকে বিলসিত, একথা বোঝেন ব'লে, আধুনিক বাংলা কবিতার বিষয় ও রীতির নিরন্তর পরীক্ষা চলেছে। এই পরীক্ষায় সিদ্ধি নিতান্ত তাচ্ছিল্যজনক নয়।

বছর পনেরো পরে এই কাব্যযুগ শেষ হবে তখন এ কবিতার আরো সঙ্গত পরিচয় পাওয়া যাবে। যে সব কবিতা কালান্তরে বেঁচে থাকবে তাদের শ্রেষ্ঠতারও তারতম্য থাকবে। সুদীর্ঘকাল ও বিভিন্ন রুচির পাঠক সমালোচকদের বিচারের পরিণামে যখন সেই তারতম্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হবে তখনই বলা যাবে একালে প্রকৃত মহৎ কবিতা কিছু লেখা হয়েছিল কিনা।

এবং অন্যান্য

'কবিতার কথা'য় সংকলিত প্রবন্ধগুলি ছাড়াও জীবনানন্দের আরো কিছু প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর অনেকগুলি শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'জীবনানন্দ' ১ম খণ্ডে সংকলন করেছেন। প্রবন্ধের মূল্য ও মর্যাদা নির্ভর করে বিষয়ের গুরুত্ব ও পরিবেশনের প্রাঞ্জলতার উপর। কবিতা বিষয়ক চিন্তা ব'লেই কবি জীবনানন্দের রচনা 'কবিতার কথা' পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অপরাপর প্রবন্ধের মধ্যে যেমন কবিতা প্রসঙ্গে আছে, (নজরুলের কবিতা ; লেখাও লেখকের দায়িত্ব) শিক্ষাপ্রসঙ্গে আছে, (শিক্ষা-দীক্ষা ; শিক্ষা ও ইংরাজি) তেমনি ভাষা প্রসঙ্গ নিয়েও তার একটি সুচিন্তিত আলোচনা পাচ্ছি (বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ)। আমরা পর্যায়ক্রমে এই প্রবন্ধ ক'টির বিষয়সার উদ্ধার করবো।

'নজরুলের কবিতা' প্রবন্ধটি ১৩৫১ সালে কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নজরুলের সাহিত্য সৃষ্টি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ সমকালীন মানুষের জীবন্মৃতের মতো আসন্ন, সার্বিক, নিপট মৃত্যুর প্রতীক্ষা এবং তার মধ্যেও পুনরুজ্জীবন সাধনার কথা উল্লেখ করেছেন। হয়তো প্রত্যেক যুগেই এমনটি দেখা যায় কালের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে এক সময় বৈশিষ্ট্য ক্ষয়িত হ'য়ে নূতন সাময়িকতা নিয়ে আসে শুধু। সমাজ উন্নয়ন না হোক এতে মূল্যচেতনা স্থিরতর হ'তে পারে।

সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে 'ভোর আসছে'। এমন প্রত্যুষ চেতনা বারবার এসেছে, বুদ্ধের যুগে, অশোকের যুগে, ফরাসী বিপ্লবোত্তর কালে, কিন্তু সুদীর্ঘ সুদিন বা সুরাত্রি কখনো আসেনি ইতিহাসে। তবু ভোর আসছে এই প্রত্যয় জাগছে। এর থেকে হয় নৈরাশ্যে পৌছাতে হয় কিম্বা বিশ্বাস করতে হয় এখনো মানবসভ্যতার শৈশবের কাল, ভূমিকার ভাঙাগড়ার কাজ এখনো চলেছে।

যুগের ভাঙনের মুখে কবি যদি ভাঙনের মত্ততার কবিতা লিখতে বসেন তাঁর মধ্যে নূতন সময়ের আভাস স্থির অর্থসফলতা না পেয়ে স্থূল হয়ে দাঁড়ায়। আবার ভাবীসমাজ রূপের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন নিয়ে যে সব নিয়মের প্রভাবে আগামীকাল জন্ম নিচ্ছে, তার কয়েকটিকে প্রতীক বা প্রবর্তয়িতার মতো মনে ক'রে এক ধরনের শ্লোগান ধর্মী কবিতা লেখা হচ্ছে ; অন্যপক্ষে বস্তুশক্তির দুরন্ত ক্রিয়াকৌশলের পরিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখে ভাবধর্মী সূক্ষ্মতনু আরেকধরনের কবিতাও লেখা হচ্ছে যার ভাষা শব্দ ইঙ্গিতের দুরূহ

আচ্ছন্নতা তাকে সাধারণের থেকে দূরে রেখেছে। যদিও এ সবের মিশ্রণে বেশ কিছু ভালো কবিতাও লেখা হয়েছে।

১৩২৫-৩০ এর কালপর্বে যখন একদিকে মৃত্যুর সমাচ্ছন্ন ঘনঘটা অপরপক্ষে অরুণোদয়ের রক্তচ্ছটা, তখন নজরুলের আবির্ভাব। সেই আলোড়িত জীবনসংক্রান্তি ভালো কবিতাসৃষ্টির অনুকূল ছিল না। কিম্বা তাঁর মননপ্রতিভা ও অনুশীলিত সুস্থিরতা থাকলে তখনই ভালো কবিতা হয়তো জন্মাতে পারতো। জনগণের চাহিদামতো চমৎকার কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়, এমন কবিতা লিখেছিলেন তিনি। তবু আজকের শ্লোগানধর্মী কবিতার চেয়ে তা সফল হয়েছিল। সমালোচকরা বিভ্রান্ত হয়ে জয়ধ্বনিও করেছেন কখনো কখনো, তবু তা মহৎমান এগিয়ে গেছে।

কোনো যুগেই মহৎ কবিতা বেশি লেখা হয় না। নজরুলের কিছু কবিতা সফল, কিছু কবিতা সার্থক। তুলনায় আজকের কবিতা বর্তমানের সুস্থিরতায় পৌঁছেও ঢের বেশি ব্যাহত হচ্ছে। হৃদয় আমাদের আত্মস্থ নয়, মন আমাদের বিরুদ্ধাচার করে। নজরুলের একাগ্রতা এবং সময়, বুদ্ধিসর্বস্বতা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। তাই তাঁর অনেক কবিতার ধ্বনিময়তা ও অঙ্গীকার আধুনিক কবিতা থেকে বেশি। তবু নজরুলের কবিতায় নিজেকে বিশোধিত ক'রে নেবার প্রতিভা নেই।

স্বার্থপরতা হেয়, কিন্তু কবির আত্মোপকার-প্রতিভাই তাকে মহত্ত্ব দেয়, কবিতাকে অন্তিম সঙ্গতির পথে পৌঁছে দেয়। সেই ব্যাপ্তি ও গভীরতার অভাবে নজরুলের কবিতা সফলতার সীমান্তে দাঁড়ায়নি।

'শিক্ষাদীক্ষা' প্রবন্ধটি দেশ-পত্রিকায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশ হয়েছিল। জীবনানন্দের বক্তব্য হ'লো, নানা শিক্ষা কমিশনের শ্রম ও সুপারিশ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অল্পস্বল্প পরিবর্তন সত্ত্বেও গত পঞ্চাশ বছরে শিক্ষার কাঠামো পাল্টায়নি। এদেশের শিক্ষানায়করা কখনো রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও নির্দেশের ফল গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

এদেশে শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজি। এটাই ভালো হয়েছে, কেননা ইংরাজি অনেক বড়ো ভাষা ও সাহিত্য। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের জন্য আরো কিছুকাল ইংরাজিকে ধ'রে রাখতে হবে। তবু ইংরাজি বিদেশী ভাষা। হিন্দী বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার তুলনায় তা শেখা কঠিন। কিন্তু সহজ হলেও শিক্ষা সংস্কৃতির দিক থেকে এসব ভাষা শিখে বিশেষ কোনো লাভ নেই। তাই বারো বছর প্রাণপাত ক'রেও বাঙালীরা ইংরাজি শিখছে, দশদিন পরিশ্রম ক'রেও কোনো ভারতীয় ভাষা শিখতে চায় না।

'শিক্ষা ও ইংরাজি' শারদীয়া দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় ১৩৬০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে একটু বিস্তৃততর পরিধিতে প্রায় একই বক্তব্য পরিবেশিত

হয়েছে। প্রাচীন টোল মাদ্রাসার শিক্ষাপদ্ধতির চেয়ে ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত ইংরাজি শিক্ষা প্রশস্ততর ছিল। সেকালে শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্যই ইংরাজি শিক্ষা চালাতে চেয়েছিলেন, তার দূরপ্রসারী ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামাননি। দেশী শিক্ষার সব কৃত্য যখন শেষ হয়েছে মনে হচ্ছিল সেই উপযুক্ত সময়েই ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হ'লো। এবং তার সদ্ব্যবহারও যথেষ্ট হয়েছিল। উনিশ শতকের নব্য ইংরাজিওয়ালারা পাশ্চাত্য ভাষা সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত বিমুগ্ধ ছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল দেশীসভ্যতা পুরোপুরিই অসার। তার প্রতিক্রিয়ায় আবার একদল ইংরাজি শিক্ষাকেই সর্বদোষেরআকর ব'লে মনে করতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূচনাকালে ইংরাজি শিক্ষা সমকালীন ইতিহাসে এদেশে পরমলাভের বিষয় ছিল। অর্থনীতি রাজনীতিতে ততখানি সফলতা না পেলেও সাহিত্য সংস্কৃতির চিন্তা পদ্ধতি অনেক কিছুই ইংরাজি শিক্ষার ফলে শুদ্ধতর হ'য়ে উঠেছে। দেশী ঐতিহ্যের মূল্য ও সারবত্তা সম্পর্কে সচেতন হ'য়েও পৃথিবীর সংকাজ ও চিন্তাধারার কাছে অর্জনীয় কিছু আছে এ আমরা জেনেছি। পরে যদি মূল্য বিশৃঙ্খলা কিছু ঢুকে থাকে তার কারণ আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের দোষ নয়—আমাদেরই মনের ত্রুটি ও অক্ষমতা।

এদেশে শিক্ষার বড় ত্রুটি হ'লো গোড়া থেকেই ইংরাজি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকরা নিখুঁত ব্যাকরণ সম্মত খাঁটি ইংরাজি সব ছাত্রের উপর চাপাতে চেয়েছেন। তবু আট দশ বছর স্কুলে কাটিয়েও ছাত্ররা শুদ্ধভাবে ইংরাজি বলতে বা লিখতে শেখেনি। ঠিক ইংরাজি না লিখতে শিখলে পরীক্ষায় পাশ করা যাবে না ভেবে সব জোর ইংরাজি শিক্ষার উপরে দিয়েছে, ফলে অন্য শিক্ষনীয় বিষয়ে দুর্বল থেকে গেছে। আজকাল ছাত্ররা আর ইংরেজি তেমন ভাবে শিখতেও চাচ্ছে না। পনেরো কুড়ি বছরে পরীক্ষায় ইংরাজি ব্যাকরণ ও সাহিত্য দুইদিক দিয়েই ছাত্ররা খুবই দুর্বল হ'য়ে গেছে।

ইংরাজি শেখার উপর এত জোর দেওয়াই ভুল। গোড়া থেকেই সরল বুনিয়াদি ইংরাজি শেখানোর চেষ্টা করা দরকার ছিল। সেভাবে কখনো চেষ্টা করা হয়নি। ইংরাজি শিক্ষার দিকে ছাত্রদের রুচি খানিকটা ফিরিয়ে আনা দরকার। ইংরাজির বিকল্প হিসাবে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে বাংলা বা হিন্দীকে এখনি দাঁড় করানো যাচ্ছে না। সুতরাং ইংরাজি শেখানোর পাঠ্য ও পদ্ধতি আমূল পালটে ফেলে ছাত্রদের কাছে ইংরাজিকে সহজ, আধুনিক ও রুচিকর ক'রে তোলা দরকার।

১৯৪৪ সালে প্রকাশিত '**লেখা, লেখকের দায়িত্ব**' প্রবন্ধে লেখক বলতে চেয়েছেন জীবন ছাড়িয়ে কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব নয়। কিছু কবি আছেন যাঁদের ভাবনা প্রতিভা যা সৃষ্টি করে তা জীবনের কোনো ব্যবহারে ধরা পড়ে না,

জীবনের প্রতিবিম্বও নয়। আমাদের এই ইতিহাস স্মৃতিজীবন ছাড়িয়ে তাঁর কবিমানস এক অনন্য অভিজ্ঞতার দেশে চ'লে যায় যেন, তবু জীবনের বাইরে যেতে পারে না। সমাজ ও সমবায় পদ্ধতির চেয়ে জীবন বড়ো তাই তা ঐ সব পদ্ধতিকে নিয়ত ভেঙে নূতন ক'রে গ'ড়ে চলেছে। মানুষের সেই শক্তি আছে যাতে সে কল্পনা প্রতিভার চমৎকার সংহতির মুহূর্তে মানব জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান কথা আবিষ্কার করার বা নূতন ভাবে প্রচার করার সুযোগ পায়। তা হ'লো কবিতা বা শিল্প সৃষ্টি।

কবিতা সবসময়ে সৃষ্ট হ'তে পারে না। তা সমীচীন গদ্য বা ভূয়োদর্শী সম্পাদকীয় মন্তব্য নয়, কেউ কেউ অন্য ভাবে চিন্তা করলেও গদ্যে বা পদ্যে রচিত কবিতার ভাষার বা ভাবে দিব্য ইঙ্গিত বা দিব্যতার স্পর্শ থাকা অপরাধ নয়।

কারো কারো ধারণা, সচেতন সমাজদর্শী মন এবং অভিব্যক্তির উপযোগী ভাষা থাকলেই ভালো কবিতা লেখা যায়। কিন্তু কবিতা এই সুলিপিকে অতিক্রম ক'রে আপন চরিত্রবলে সৃষ্ট হ'য়ে ওঠে, পূর্বজ কবিরা একে 'মায়াবল' বলতেন। যে কোনো রচনা সৌষ্ঠবকে অপ্রাসঙ্গিক ক'রে দিয়ে এই শক্তি রচনার অংশবিশেষ বা সমগ্রকেই কবিতা ক'রে তোলে। কবিতার সংজ্ঞা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অদূর ভবিষ্যতে হয়তো গ'ড়ে উঠবে।

কবি হিসাবে জীবনানন্দও কবিতার প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হ'য়েও তা ব্যক্ত করতে অসমর্থ। তাঁর সৃষ্টি পন্থা রৌদ্র ছায়াময়, ভবিষ্যতে বিশেষ ক'রে সূর্যাশ্রয়ী হবার জন্য। কবিতার স্বরূপ ও সম্পর্কিত সব ধারণা পাঠক ও কবির পক্ষে স্পষ্ট হওয়া দরকার। কবিতা মানুষের কল্যাণ সাধন করে না বরং জীবনের ভালো ও মনের ভয়াবহ স্বাভাবিকতা, ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের কাছে পরিস্ফুট করে। আমাদের জ্ঞানপিপাসাকে সর্বতোভাবে চরিতার্থ করে। ভাবনাকে সর্বমানবীয় পরিসর দেয়, স্বার্থপরতার ভ্রান্তি দূর ক'রে মহত্তর ও গ্লানিহীন ক'রে তোলে, হৃদয়কে ক্রমেই বিশুদ্ধ ক'রে পরিণতিশীল জীবনকে সজাগ ও শালীন ক'রে তোলার ভার কবিতার উপর।

বস্তুতঃ কবিতার উপর কোনো ভার নেই। কারো নির্দেশ পালন করেনা কবিমানস এবং কবিতা, তবু সৎ কবিতা আপন স্বচ্ছন্দ সমগ্রতায় শোধিত ক'রে তোলে মানব জীবন, জীবনে বিপ্লব আনে। মহৎ কবির ভাবনা ও আন্তরিকতা সূক্ষ্ম ও সক্রিয় থাকায় মানুষ চায় তিনি সমাজ বিবর্তনে আত্মনিয়োগ করুন। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কবিতা ও শিল্প সৃষ্টির মধ্যেই তিনি স্বাভাবিক ও স্মরণীয়, এমনকি মহৎ, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তেমন নন।

জীবনানন্দ এই অনুভূতি থেকেই লিখে থাকেন। কবিতা বা সাহিত্যই শুধু নয় সুলিপি সৃষ্টির জন্যও লেখা প্রয়োজন। তাতে মানুষের নিঃসহায়তার রূপ এবং তার থেকে মুক্তির পথসন্ধান পাওয়া যেতে.পারে। একথা সত্য যে অগণন মনীষীর নির্দেশ সত্বেও আমাদের জীবনের বেদনা ঘোচেনি, ব্যর্থতা বিদূরিত হয়নি, তবু একথাও মানতে হবে—কবিতা, সাহিত্য ও সুলিপি মানুষের ভাবনাকে জ্ঞানময় ও চরিত্রবান ক'রে তুলেছে।

শোষিত মানুষের 'জীবনের, বিপ্লবের, বিপ্লবোত্তর শুভ সমাজের বিষয় ছাড়াও কবিতা মহৎ হ'তে পারে।

'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধটি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ১৬ই চৈত্র দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় তার প্রতিক্রিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিভাবে পড়বে সে বিষয়ে এতে আলোচনা করা হয়েছিল। নবাবী আমল থেকে বিকাশের অব্যাহত ধারায় বাংলা আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা প্রায় পাশ্চাত্য ভাষার সমকক্ষ হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও এ ভাষার সাহিত্যের পরিধি বেড়েছে, বাড়ছে। কিন্তু ত্রিবিধ কারণে বাংলা ভাষায় আজ উদ্বেগের কারণ ঘটেছে।

১। বাংলা সাহিত্যে প্রতিনিয়ত যে নূতন নূতন প্রতিশ্রুতিশীল লেখকদের অব্যাহত অভ্যুদয় হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকা গোষ্ঠীর নামে যাদের পরিচিতি, কল্লোল যুগের পরে, চারের দশক থেকে তাতে খানিকটা ভাঁটা পড়েছে। নূতন লেখক থাকলেও লেখক-সংঘ নেই। তাদের সাহিত্য-কর্ম সংগঠিত নয়, অনেক লেখা সৎ হ'লেও মহৎ হচ্ছে না। সংখ্যার দিক থেকেও কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, পরিচয়, কবিতা যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সমতুল্য নয়, সংখ্যার সঙ্গে যুগের সংযোগে সাহিত্যে বড় সাফল্য দেখা যায় নইলে ক্ষয় দেখা দিতে পারে। বাংলা সাহিত্যে কি অবক্ষয় চলেছে? পুরানো সাহিত্যিকরা ফুরিয়ে আসছেন, দু-একজন বড় জোর দেড় দু-দশক চালিয়ে যেতে পারেন। নূতনরা কেউ কেউ ভালো লিখলেও নূতন সাহিত্য-সিদ্ধির দেশকালের ভিতর এসে পড়েছে মনে হচ্ছে না।

চারের দশকে বা তার আগের থেকে আরো একটি আধুনিক সাহিত্য যুগ বা যুগাংশের সূচনার প্রয়োজন ছিল। নূতন যুগ লক্ষণগুলো বড়ো লেখকের হাতে এতদিনে বিশেষ সংস্থা লাভ করতে পারতো, তা হয়নি। সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় একটা ছেদ পড়ার আশংকা দেখা যাচ্ছে।

২। খণ্ডনের আগের বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ পশ্চিমবাংলা। দেশ ছোট লোকজন কম। দেশ ছোট লোক কম হ'লেই সাহিত্য ছোট হবে তার কথা নেই।

প্রমাণ ইংল্যাণ্ড ও এথেন্সের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি। তবু প্রাচীন গ্রীস ও এলিজাবেথী ইংল্যাণ্ডের থেকে পশ্চিমবাংলার দেশ কাল পরিবেশ ভিন্ন। বিপদ অনেক রকম। উনিশ-বিশশতকের গোড়ার দিকের সঙ্গে আজকের দশকের সঙ্গতি নেই। দশ-বারো বছর আগে থেকেই ক্ষয় ও ক্ষুণ্ণতা শুরু হয়েছিল, দেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাই আশংকা বেড়েছে গ্রীস, ব্রিটেন বা আমাদের ২৫/৩০ বছর আগের বাংলাদেশের সমপর্যায়ে উঠতে গেলেও কত সময় লাগবে বলা কঠিন। এ শতক হয়তো দেশ সমাজের ভাঙা-গড়া পেটার কাজে লেগে যাবে।

এই ছোট বাংলাদেশে উদ্বাস্তুদের কুলিয়ে উঠছে না। আরো একটু পরিসর পেলে ভাল হ'তো। বাংলার উত্তর পশ্চিমে বেহারে যেখানে বাঙালীর সংখ্যা বেশি ছিল তা ফিরে পেলে ভাল হ'তো, কিন্তু হয়নি ; হবেনা হয়তো।

এ ভাষা আগে অবাঙালীকেও আপন সংস্কৃতি ও শক্তিতে আকৃষ্ট করছিল, তারা বাংলা শিখছিল, শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত অবাঙালীরা বাংলা বইয়ের ভাষার মর্যাদা মেনে বাংলা জানা দরকার মনে করতেন। বাংলা ভাষা যত উপরের স্তরে গেছে, পরিশ্রমও প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফল পাচ্ছে, তত এর সম্পর্কে অবাঙালীদের উৎসাহ কমছে। অবচেতনায় আগ্রহ থাকলেও, সচেতন তাগিদ দেখা যায় না। চলতি ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা আজও শ্রেষ্ঠ, তবু বাংলা ভারতের রাষ্ট্রভাষা নয়। সংখ্যাধিক্যের সুবিধা দেখতে চেয়ে রাষ্ট্র হিন্দীকে বেছে নিয়ে হয়তো ঠিকই করেছে। রাষ্ট্রভাষা ভাষাতত্ত্বজ্ঞ কমিশনের বিশেষ পরীক্ষা ও আলোচনায় নির্ধারিত হলো না। হ'লে হিন্দী হ'তে পারতো না বোধহয়। রাষ্ট্রভাষাও একটি মাত্র হ'লো বেশি নয়। ভারত রাষ্ট্রের ভাষা হওয়া দূরে থাকুক বাংলা এমন কি পশ্চিমবাংলার মতো ছোট রাজ্যর বাঙালীদের ভাষা। পূর্ববাংলার বাঙালীরা আজ পাকিস্তানী। বাংলার মুস্লিমরা কয়েকশো বছর নানা উপভাষায় লিখে যে ভাষার চর্চা ক'রে এসেছেন তা যদি লুপ্ত হয় তবে বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে না কি ?

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও শিক্ষিতের মুখের ভাষা পশ্চিমবাংলা ঘেঁষা ছিল কিন্তু উপহাসের উপেক্ষা ছাড়িয়ে বিশশতকের গোড়ার দিকে ঐসব উপভাষায় রচিত সাহিত্যের, ছড়া গীতিকা প্রভৃতি মূল্যও মর্যাদা বাঙালী বুঝেছে। পূর্ববাংলার বিভিন্ন উপভাষার নানা শব্দ ও প্রকাশরীতির ভাষাভঙ্গীর টানাপোড়েনে বাংলাভাষার যে মূল্যময় পরীক্ষা চলছিল তা অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত হবে। কেননা উদ্বাস্তুদের সন্ততিরা ক্রমে ক্রমে কলকাতার বা এদিককার নানা উপভাষায় রপ্ত হ'য়ে এদেশী হ'য়ে যাবে। পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু রাষ্ট্রভাষা ও জনভাষা হ'লে এত বড় বড় উপভাষা লুপ্ত হ'য়ে যাবে।

পূর্বপাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আলোড়ন চলছে। বাংলা পূর্বপাকিস্তানের দেশজ

ভাষা। এই আবহমানের ভাষা ও সাহিত্যকে ছেড়ে এখানের মানুষ উর্দুকে মেনে নিতে পারবে? না উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও একটি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পেতে চাইবে এসব সমস্যার মীমাংসা এখনো হয়নি। মনে হয় খুব বেশিসংখ্যক পাকিস্তানীই বাংলাকে পূর্বপাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দেখতে চান। এঁদের ইচ্ছা ও চেষ্টা সচল হ'লে পশ্চিমবাংলার ভাষা ও সাহিত্যের একটা বড় লাভ।

কিন্তু বাংলা পূর্বপাকিস্তান থেকে লুপ্ত হ'লে এ সাহিত্যের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হবে পশ্চিমবাংলা। পূর্বপাকিস্তানের নিজ ভাষা হ'য়েও ইংরাজি ও উর্দুর চাপে বাঙলা সেখানে ক্ষয় পেয়ে পশ্চিমবাংলার সক্রিয় ভাষার থেকে এত বেশি বিভিন্ন হ'য়ে পড়বে যে তখন তাকে চেনা কঠিন হবে।

ভাষার উপর এমন এক অবক্ষয়ের চাপ, পশ্চিমবাংলাতেও ক্রমে দেখা দেবে। এখনি দিচ্ছে, আগের মর্যাদা ও পরিব্যাপ্তি এখন এত বেশি সঙ্কুচিত যে অর্থ ও অন্নকষ্টে আচ্ছন্ন বেকার বাংলার লোকের ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে চিন্তা করার সময়ও বেশি নেই। যে বাঙলা একদিন ভাত কাপড়ে সচ্ছল ছিল তাদের গল্প রূপকথা বচন ছাড়া নূতন যুগে কোনো যুক্তিঘন ক্রমবিকাশ লাভ করলো না মরেই গেল, মানুষ ম'রে যাচ্ছে ব'লে।

বাংলার জনতাপট এই রকম, তাদের সাহিত্য নিস্তব্ধ। সাহিত্যিকরা প্রৌঢ়, নূতন সূচনা দেখা যাচ্ছেনা। গল্প উপন্যাস কবিতায় কোনো নতুন বৃহৎ তাৎপর্যের স্পষ্টতা পাওয়া পাচ্ছেনা। ব্যাপারটা শংকার বিষয়।

বাঙালী সাহিত্যিকরা লিখে ভাত কাপড়ের জোগাড় করতে পারেনি কখনো। চাকরীও দুর্লভ। কবিতায়, সমালোচনায় টাকা নেই, গল্পে উপন্যাসে আগের চেয়ে কম, লেখকদের টাকা ও অবসর না থাকলে সাহিত্য কর্মে স্থির থাকতে পারা কঠিন হবে, পূর্বপাকিস্তানেও একই অবস্থা। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হ'লে বাঙালী সাহিত্যিকদের বই ক্রমেই কম বিকোবে, শেষে অচল হ'য়ে যাবে।

রাষ্ট্রভাষা হিন্দী ইংরেজির তুলনায় অশক্ত ও দরিদ্র। এখন থেকে সারা দেশের বোধবুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার আশ্রয়ে পরিণত হ'তে থাকবে। কিন্তু তার কাছ থেকে বাংলার প্রায় কিছু পাবার নেই। যোগ্য রাষ্ট্রভাষা ও বড় সাহিত্যে হিন্দীকে দাঁড় করানোর জন্যে হিন্দীভাষী লেখকদের চেষ্টা ও উৎসাহ বেড়ে গেলেও হিন্দী ভারতের একক ভাষা হ'য়ে উঠতে পারবে না কখনো সংস্কৃতের মতো। যাইহোক, হিন্দীর দিকে মন দিতে গিয়ে প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রতি ঢিলেমি আসতে পারে সুতরাং হিন্দীর মঙ্গল হোক না হোক প্রাদেশিক সাহিত্যের অমঙ্গল হ'তে পারে। গত দেড়শো বছরে ইংরাজি ভাষার প্রভাবে বাংলার যে উন্নতি হয়েছে হিন্দীভাষা সংশ্রবে তেমন কোনো লাভের প্রত্যাশা নেই—ক্ষয় ও ক্ষতির সম্ভাবনাই বেড়েছে।

হিন্দীশিখে হিন্দীতে লিখলে বা বাংলা লেখার হিন্দী অনুবাদের চাহিদা পূরণে গরীব সাহিত্যিকদের অর্থকৃচ্ছতা ঘুচতে পারে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের তাতে কোনো বিকাশ হবেনা। বাঙলা ভাষার জন্যই বাঙালীর সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, আগামী পঁচিশ-ত্রিশ বছর বাঙালী সাহিত্যিকরা যদি সাহিত্যের বড় ধারাবাহিকতাকে বাঁচিয়ে রাখার মতো মন ও প্রাণের শক্তি দেখাতে পারেন তাহ'লে ভবিষ্যৎ যতটা খারাপ মনে হচ্ছে তা নাও হ'তে পারে।

কবি কথা

জীবন-প্রসঙ্গ

ইংরেজ কবি শেলী নীল নভ থেকে ভেসে আসা স্কাইলার্কের গানকে 'বিদেহী কণ্ঠস্বর' কল্পনা করেছিলেন। বাঙালীদেরও বোধহয় দৃঢ়বিশ্বাস, কবিদের শরীর নেই, জীবন নেই, জীবনের শতবিধ প্রয়োজনে ব্যাপৃত হ'তে হয় না তাঁদের। শুধু তাঁদের দেহাতীত বাণী আছে, কবিতা আছে, গান আছে, যে গান আকাশ থেকে ভেসে আসে দৈববাণীর মতো।

এ বিশ্বাস যদি না থাকত, তবে আমরা কবির কদর বুঝতাম, কবিতার দর দিতাম। কবির লেখা অমূল্য ব'লে অমূল্যে কিনে নিতাম না। কবি যে একজন মানুষ, যে বেঁচে থাকে, জীবনের অভাব-দৈন্যে দুঃখে দ্বন্দ্বে পীড়িত হয় একথা আমরা নির্মম ঔদাসীন্যে ভুলে থাকি!

লোকে বলে বাঙালী কবির জাত। যারা বলে, তারা একটি মিথ্যা উক্তির নির্বোধ পুনরুচ্চারণ করে। বাংলা দেশে কবিতা লেখেন অনেকে, কিন্তু কবি দুর্লভ। তার চেয়েও কম, কবিতা ভালবাসেন, পড়েন এবং বোঝেন এমন পাঠকের সংখ্যা। এদেশে গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে ছিল যে মানুষ, যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঁচালী শুনতো, ছড়া আওড়াতো, ভাটিয়ালী, কীর্তন গান গাইতো, আজ তারা লুপ্ত হ'য়ে গেছে অভাবে, অশিক্ষায়, অবস্থার অস্বাভাবিক চাপে। বেনে ইংরেজের আওতায় যে আধা-শিক্ষিত কলমপেশা আত্মাভিমানী মধ্যবিত্ত সমাজ গ'ড়ে উঠেছে, তাদের না আছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, না আছে মার্জিত রস-রুচি। মাইকেল মধুসূদন যখন ফ্যাশন ছিলেন তখন তারা মাইকেল-মাইকেল ব'লে চীৎকার করেছে, রবীন্দ্রনাথ যখন দরবারে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথই তাদের জিগির হয়েছে। এমনি আরো অনেককে নিয়ে। বলা বাহুল্য এঁদের তারা পড়েছে বুঝেছে—এর চেয়ে মিথ্যে আর কিছুই হ'তে পারে না। মূর্খ ধনী কাঁচের আলমারীতে বই সাজায়—এদের সাহিত্য-চর্চার উৎসাহের উৎস তার চেয়ে গভীরতর কোথাও নয়।

অথচ এই সব কবির সৃষ্টির মর্মসূত্র আদৌ দুরূহ ছিল না। হুজুগের বদলে কবিতায় সত্যিকারের অনুরাগ থাকলে এই কবিরা সমাদৃত হ'তে পারতেন।

এদেশে সাময়িকপত্র আছে প্রচুর। কিন্তু পাঠক রসিক আর সম্পাদকরা কাব্য-বোধশীল হ'লে তাতে সংখ্যাতীত অকাব্যের বদলে কিছু সৎকবিতার প্রকাশ হ'তো।

ভালো কবিরা আশ্রয় অর্থ ও মর্যাদা পেতেন। অসংখ্য অকবির সাথে মিশিয়ে তাদের মুড়ি-মিছরির একদর করা হ'তো না।

কিন্তু যে দেশে রেওয়াজ আছে ব'লেই কবিতা প্রকাশ করা হয়—বিচার ক'রে নয়, সেখানে বিজ্ঞাপনেরই জয়জয়কার। সেখানে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টারা স্বীকৃত হন না বরং ধিক্কার জোটে তাঁদের, নিকৃষ্টের ভাগ্যে প্রচুর বাহবা মেলে। কবিতার চেয়ে পদ্যের ছড়ার যেখানে আদর, কবিতা নিয়ে কোনো গভীরাত্মক আলোচনা ও চর্চা সেখানে বাহ্য বিবেচিত হয়।

এদেশে কাব্যানুরাগ যে কত ভূয়া তার আরো বড় প্রমাণ হ'লো এদেশে রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদন ছাড়া আর কারো প্রামাণ্য বা স্বাদু জীবনী নেই। কবিদের ব্যক্তিগত জীবন ও সাধনা সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র কৌতূহল সহানুভূতি এবং অনুসন্ধিৎসা নেই। কাদের সম্পর্ক আছে সে কথা উল্লেখ না করাই ভালো।

সম্প্রতিকালে কবি জীবনানন্দ দাশ উত্তর-রবীন্দ্র কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে অনেকের কাছে বিবেচিত হচ্ছে। তার কতটা কবিতার তুলনামূলক বিচারশীলতা ও কাব্য-চেতনার অনুভব থেকে এসেছে, কতটাই বা যুগের হুজুগ—যে সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হবার অবকাশ আছে। তিনি কতবড় কবি ছিলেন, আধুনিক কাব্য-চেতনার দিক থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের আসরে তাঁর স্থানটি ঠিক কোথায়, সে সম্পর্কে এদের কোনো সুনির্ণিত বোধ আছে মনে হচ্ছে না। আধুনিককালে কাব্য-বিচারের পুরনো পর্যায় পেরিয়ে আমরা এমন এক নূতন আদর্শে এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে মূল্যায়নের নূতন মানদণ্ডগুলি চিনে নিতে না পারলে কবির গুণাগুণ বিচার ক'রে তার কৃতিত্বের পরিমাপ করা সহজ হবে না। ধ্বনি ও রস-নির্ণয়ের পুরানো রীতি অতিক্রম ক'রে নব নব পদ্ধতি ও প্রকরণে ঋদ্ধ কবিতার নবাধিকৃত ভাবক্ষেত্র এমনই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে বিভিন্ন শিল্প-মতবাদ সমন্বিত কবিতার সাম্প্রতিক রূপরাগ অধিগত করতে না পারলে আধুনিক কবিতার গতিপ্রকৃতি এবং আধুনিক কবির সাধনা ও সিদ্ধি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হবে না।

আমাদের বিবেচনায়, রবীন্দ্রনাথ বাদে, বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালী কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি অজস্র সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু যা লিখেছেন তাতে যেমন শিল্পীর কুশলতা আছে তেমন হার্দ্য-স্বভাব ও সুস্থ-মননের সমন্বয় হয়েছে। তিনি আধুনিক শিল্প-চেতনা ও আন্দোলনের মূল ধারাস্রোতগুলিতে গাহন করেছিলেন আর তার দ্বারা সুন্দরভাবে সঞ্জীবিত করতে পেরেছিলেন কবিতাকে। তাঁর কাব্যের ভাব-পরিধি রবীন্দ্রনাথের মতো বহু ব্যাপক না হ'লেও সুপরিসর ও হৃদয়ের অন্তস্তলস্পর্শী ছিল! সর্বোপরি একই বিষয় বা বক্তব্যের অনুবর্তন

নয়, পরন্তু নব নব নিরীক্ষা ও সাধনায় পথে তিনি নিজেকে উদ্যত রেখেছিলেন। বর্তমান-কালের বিশ্বের মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ কবিদের সামনে উদ্ধৃতি-যোগ্য সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর। বাংলাদেশের মতো স্তিমিত চেতনার দেশে জন্মেছিলেন ব'লেই তাঁকে ঘিরে যথেষ্ট আলোচনা, আন্দোলন ও প্রচার হয়নি; নইলে যাঁরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের অনেকের চেয়ে জীবনানন্দের যোগ্যতা কম ছিল না।

কিন্তু জীবনানন্দের প্রতিভার বিচার আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কাল যখন নিরবধি এবং পৃথ্বী যখন বিপুলা, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য বিনষ্ট না হ'লে—তিনি প্রাপ্য মর্যাদা পাবেনই। কুক্কুটের কাছে অনাদৃত গজমোতি জহুরীর কাছে অবহেলা পায় না। কিন্তু তাঁর জীবনের সুবিস্তৃত কাহিনী যদি এখন সযত্নে রক্ষা করা না হয় তবে ভাবী কালের মানুষ, আক্ষেপ নয়, একালের অধিবাসীকে অভিসম্পাত করবে। কারণ আমরা ধ'রে না রাখলে তাঁর জীবনের ঘটনাবলীকে ভাবী কালের মানুষ কোথাও আবিষ্কার করতে পারবে না।

জীবনী লেখা বাঙালীর ধাতে নেই। এখানে সাহিত্যিকরা লাভের জন্য অথবা লোভের জন্যে সাহিত্য-সেবা করেন, আদর্শের জন্যে নয়। সেই জন্যে পরের জীবনীর চেয়ে আত্মস্মৃতি লিখতে পছন্দ করে তাঁরা। কারণ তাতে শ্রম নেই, লেখা যায় সহজে। নিজের ঢোল বাজিয়ে সুবিধে না থাক অসুবিধে নেই, কিন্তু পরের গুণকীর্তনে পেট ভরে না। জীবনীর কাটতিও নেই বাজারে। আর কবির জীবনী। কি হাস্যকর! অর্ধশতাব্দীতে যাঁর বইয়ের সংস্করণ হয় না, তাঁর আবার জীবন? তিনি একসময়ে বেঁচে ছিলেন, তারপর মারা গেছেন, মধ্যে কতগুলি দুর্বোধ্য কবিতা লিখে গেছেন—এর চেয়ে আর কি খবর থাকতে পারে আধুনিক কবির সম্পর্কে?

আমরা জীবনানন্দের জীবনী লিখতে বসিনি। সে সুযোগ এবং ক্ষমতাও আমাদের নেই। আমরা এমন নিষ্ঠাবান নির্লোভ সাহিত্যসেবীকে আহ্বান করছি যিনি তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখবেন। তাতে তিনি আর্থিক লাভবান হবেন এমন আশ্বাস দিতে পারি না, কিন্তু ভাবী কালের মানুষের কাছে তিনি যে চিরশ্রদ্ধেয় হবেন একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

জীবনানন্দের জীবন ঘন-ঘটনা-সমাচ্ছন্ন নয়। এক একজন মানুষ থাকে প্রতিভা যাদের জীবনে উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভের মতো। কিন্তু অন্যক্ষেত্রে তাঁরা অতি সাধারণ। তবু সেই আপাত-সাধারণ জীবনও তুচ্ছের নয়, তাচ্ছিল্যের নয়! কারণ সেই উজ্জ্বল আলোকময়তার উৎস রয়েছে আপাত সাধারণ জীবনেরই অভ্যন্তরে। খণ্ডাংশ-পরিদৃশ ভাসমান তুষার-শৈলের মতো তাঁর জীবনের বাহ্যিক ঘটনামান্দ্যের নিচে তীব্র চেতনার আলোড়নময় যে বিশাল অন্তর্জীবন থাকে যার পরিচয় বাইরের কার্যাবলীতে পরিস্ফুট

হয় না, কিন্তু চরিত্রের উপাদান রচনায় ও প্রতিভার বিকাশে আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য করে। জীবনানন্দও তেমন একজন। এই জন্যেই তাঁর জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ও তার বিশ্লেষণ তাঁর কাব্যরসপিপাসুর কাছে মূল্যবান ব'লে বিবেচিত হবে।

মধুসূদনের মতো যে শিল্পীর বহির্জীবনটাই ঘটনাবহুল ও একমাত্র, অজস্র ঘটনা ও আলাপে আচরণে যার অন্তরের অভিলাষ ও আকাজ্ক্ষা, সম্ভাবনা ও পরিণতি ব্যক্ত হ'য়ে আছে, তাকে নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই জীবনী-রচকের। কিন্তু বঙ্কিমের মতো যিনি নিজের মনোগহ্বরে আত্মগূঢ়, নিজের জীবন, নিজের চিন্তা-চেতনা যিনি নাটকীয়ভাবে সকলের সামনে তুলে ধরতে পারেন না বা ইচ্ছা করেন না, তীব্র চেতনা-সম্পন্ন অনুভূতিশালী সেই সব মানুষ নিয়েই সমস্যা। জীবনের কোনো ঘটনা এবং কোনো অনুভব অথবা পরিচিতদের জীবন থেকে লাভ করা অথবা গ্রন্থলব্ধ কোনো অভিজ্ঞতা তাঁর মনে ও জীবনে কি দুরপনেয় স্বাক্ষর রেখে যায় অতি অন্তরঙ্গ ছাড়া কেউ তা বলতে পারে না এবং আত্মীয়দের পক্ষেও সব বিষয়ের সন্ধান এবং সব জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। এই সমস্যার একটা দৃষ্টান্ত জীবনানন্দের জীবন থেকেই দেওয়া যেতে পারে। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় কবি এক লাশকাটা ঘরের কাহিনীকে অবিনশ্বর ক'রে রেখেছেন। এই কাহিনীর উৎসের অভিজ্ঞতা তিনি কবে কোথা থেকে কি ভাবে সঞ্চয় করেছিলেন তা কবি ছাড়া কারো পক্ষেই নিশ্চিত ক'রে বলা সম্ভব নয়। অথচ জীবনানন্দের জীবনী প্রসঙ্গে কেউ কেউ বরিশালের বাড়ির সন্নিকটের এক বিশেষ মর্গের কথা, সেখানে জীবনানন্দের বেড়ানোর বিবরণ এমন ভঙ্গিতে দিয়েছেন যে এই মর্গকে ঐ কবিতার উৎস মনে করা বিচিত্র নয়। প্রকৃতপক্ষে সেই তথ্যকে ভিত্তি ক'রে ইতিমধ্যেই কেউ কেউ ঐ কবিতার উৎস পর্যালোচনা পর্যন্ত করেছেন।

আমরা ঐ মর্গের অস্তিত্বের কথা, সেখানে জীবনানন্দের বেড়াতে ভালবাসার কথা কিছুই অস্বীকার বা অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু তবু আমরা পুরো ব্যাপারটাকে 'কাকতালীয়' বলতে ইতস্তত করি না। বরিশালের ঐ মর্গটি কবির বহু পরিচিত হ'লেও ঐ কবিতাটির উত্তেজের মূলে সেটাই একথা যেমন জোর ক'রে বলা সম্ভব নয়, তেমনি তাকে অস্বীকার করার মতো তথ্যও আমাদের নেই। কিন্তু কবির কল্পনার প্রেরণা-মূলে তাঁর কোনো দেখা ঘটনা, অথবা শোনা অথবা বইতে পড়া কোনো অভিজ্ঞতা অথবা সম্পূর্ণ কল্পনা কাজ করে অন্য ব্যক্তির তা বলা সম্ভব নয়। তাই আলোচনার সময় সতর্ক হ'তে হয়। অনুমানের কথা অনুমানের মতো ক'রেই বলতে হয়। এই ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা ও সংযম জীবনী লেখকদের থাকা ভালো।

জীবন বৃত্ত

১৩০৫ সালের ৬ই ফাল্গুন, (ইংরাজি ১৮৯৯ সালে) পূর্ববঙ্গের বরিশাল শহরে জীবনানন্দ দাশ জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কবির জীবন অন্তত একান্ত আকস্মিক ও ভুঁইফোড় হ'তে পারে না; সযত্ন লালন, স্নিগ্ধ শুশ্রূষায় ফুলের গাছের মতো কবির মন সঞ্জীবিত ও বিকশিত হ'য়ে থাকে। জীবনানন্দের মনোজীবনও এমনই পিতামাতার বিশিষ্ট সাধনা ও স্বপ্নের সুস্মিত পরিণতি। তাঁদের সম্পর্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে জীবনানন্দ লিখেছেন—"আজ অনুভব করি যে তাঁদের নানা বিজ্ঞানের ভূষণ ছিল না, কিন্তু মহত্তর মর্মজ্ঞান ছিল, তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, কিন্তু সকলের জন্যে যতদূর সম্ভব হিতাকাঙ্ক্ষা ছিল।......আমরা তাঁর সন্তান, য়ুনিভারসিটি থেকে পাশ করে বেরিয়েছি অনেক দিন হতে চল্ল। কিন্তু কার কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম আমরা? আমি অন্ততঃ তিনজন মানুষের কাছে। একজন বাবা, একজন মা, আর একজন ব্রজমোহন স্কুলের হেডমাষ্টার আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বরিশাল স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে অনেক বড় বড় কলেজে পড়েছি, য়ুনিভারসিটিতে পড়েছি; কিন্তু আজ জীবনের মাঝামাঝি এসে প্রতিনিয়তই টের পাচ্ছি যে আমার জীবনের শিক্ষার ভিত্তি এঁদের হাতে গড়া। এক এক সময়ে মনে হয় মহাভারতের রচনাকর্তা বেদব্যাসের মত দৃষ্টি নিয়ে এরা সবই শিখিয়েছিলেন আমাকে; আমার জীবনে সে শিক্ষা যদি ব্যবহারিকভাবে ফলপ্রসূ না হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের কোনো দোষ নেই, যদি মনোলোকে কিছু সার্থক হয়ে থাকে তাহলে এঁদেরই প্রশস্ত দানের ফলে।"

সুতরাং জীবনানন্দের জীবন রচনায় তাঁর পিতামাতার যে মূল্যবান ভূমিকা আছে সেটি স্বীকার করতে হবে। তাঁর বাবা সত্যানন্দ দাশ বরিশাল ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশানের শিক্ষক ছিলেন। যে যে গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী হ'লে জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায় সেই দুর্লভ শক্তি তাঁর আয়ত্তে থাকা সত্বেও শিক্ষকতাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। এজন্যে অন্তত কোনো আক্ষেপ ছিল না তাঁর জীবনে। আজীবন নির্ভীকভাবে, উদ্বোধিত হ'য়ে চিত্ত প্রসাদের সঙ্গে তিনি কাজ ক'রে গিয়েছেন।

তিনি সে যুগের একজন সাধারণ গ্রাজুয়েট ছিলেন, কিন্তু অসামান্য গ্রন্থপ্রীতি ছিল তাঁর। ভাল লাইব্রেরী ছিল বাড়িতে। নিজে কচিৎ যা লিখতেন তাতে উচ্ছ্বাস কম, সংহতি বেশি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট মননিষ্ঠা তাঁর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

ডারউইন, হাক্সলি, মিল থেকে সুরু ক'রে ওয়েলস, রাসেল এমনকি মার্কসিজম্ কম্যুনিজম্ পর্যন্ত তার অনুসন্ধিৎসার বাইরে ছিল না। সাহিত্যে তিনি ধারাবাহিক ঐতিহ্যের মূল্য স্বীকার করতেন এবং প্রাকলব্ধ সংস্কার নিয়ে কোনো দেশের সাহিত্য পাঠে অগ্রসর হতেন না। ইংরাজীসাহিত্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের যুগ এলিজাবেথীয় সাহিত্য কিম্বা সপ্তদশ শতকের মেটাফিজিক্যাল কাব্য, বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব বঙ্কিমী রাবীন্দ্রিক ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্য, রাশিয়ার টলষ্টয় ইত্যাদির প্রতি তাঁর উদার অনুরাগ ছিল। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে তিনি তথাকথিত ন্যাশানালিজম্ ও স্বদেশপ্রীতির প্রভেদ বুঝতেন; তাই স্বাধীনতা আন্দোলনে ভিক্ষুক বৃত্তির পরিবর্তে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনকে অনুভব মনে করতেন। তাঁকে কেন্দ্র করে বি. এম. স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের যে উন্মেষধর্মী সংঘ গ'ড়ে উঠেছিল—সেখানে এই জাতের সাহিত্যিক লৌকিক নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আলোচনায় বিকেল ও রাত্রিগুলো উজ্জীবিত হ'তো।

সত্যানন্দ দাশ সেখানকার ব্রাহ্মসমাজের আচার্য, নেতা ও বক্তা ছিলেন—এই সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতার সঙ্গে সাধনা, সাধনার সঙ্গে সততার পরিপ্রেক্ষণীতে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গতিশীল ধর্মবিশ্বাস, পুরাচার্যদের কাছ থেকে, নিজের পিতার কাছ থেকে যা পেয়েছিলেন নিয়ত অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তাকে পরিশীলিত করতে ইতস্তত করেনি। জীবনানন্দ লিখেছেন, "মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতাম তাঁর ধর্মজীবনের ভিত্তি নড়বে না তো?" এবং এই ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মাচার সম্পর্কেও তিনি সুচেতন মানুষের স্বাধীনতার অনুকূল ছিলেন।

ভারতীয় দর্শন এবং উপনিষদ তাঁর সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের বিষয় ছিল। "প্রায় রোজ শেষ রাত্রে—বিশেষতঃ হেমন্ত ও শীতকালে উপনিষদের শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে তিনি আমাদের অপরূপ সূর্যচেতনার প্রভাতে নিয়ে আসতেন। তারপর সকালবেলায় রৌদ্রের সাগরের ভিতর যখন একাকী বসে থাকতেন তখন মনে হতো মহাকবির মতন তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, তুমি কি করতে এসেছ অসীম দেশ ও অসীমকালের প্রান্তে? এর উত্তরে মন বলে আর কিছু নয়, জীবনে এই কথাটি প্রকাশ করতে এসেছি যে, 'দেখা হয়েছে'; এই উত্তরটি সমস্ত কর্মের মধ্যে নিহিত, সমস্ত বাধার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। ক্ষণে ক্ষণে শুভ মুহূর্তে উদ্ভাসিত চৈতন্যের দীপ্তিতে এই উত্তরটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সকল দেখার অন্তরে সত্যকে দেখতে পেলাম। কোনো কিছু সংবাদ নিতে নয়, তত্ত্ব নির্ণয় করতে নয়, শুধু এই অনুভব নিয়ে স্থির হয়ে থাকতে যে 'দর্শন করা হলো'।"

পিতার চরিত্রের সঙ্গে জীবনানন্দের অনেক বিষয়েই মিল নেই। তবু পিতার

চরিত্রের এই স্বাতন্ত্র্য, এই দার্শনিক-সুলভ মননিষ্ঠা ও সততার, এবং বৈদগ্ধ্যের উত্তরাধিকারে জীবনানন্দও অসামান্য ছিলেন। পিতার প্রভাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব এমন-ভাবে গ'ড়ে উঠেছিল যে বিভিন্ন বিষয় পঠন পাঠন ও অভিনিবেশ কিছুই তাঁকে একালের মানুষের মতো উন্নাসিক বুদ্ধিজীবী ক'রে তোলেনি। প্রজ্ঞা তাঁর চরিত্রে মগ্ন থেকে প্রতিভাকে অবয়ব দিয়েছে, ব্যক্তি-জীবনে বা ব্যবহারে প্রকট হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু সত্যানন্দের সামাজিক স্বভাব, নেতৃত্বের স্বাভাবিক অধিকার জীবনানন্দে দেখা যায় না। তিনি আত্মমগ্ন, নিঃসঙ্গ ও স্বভাব-লাজুক মানুষ ছিলেন। সরলতা ও স্পর্শকাতরতা মিশে তাঁকে লোকব্যবহারে বিষণ্ণ ও সঙ্কুচিত ক'রে তুলতো—অথচ অন্তরঙ্গ পরিবেশে তিনি বিষণ্ণ ছিলেন না আদৌ।

পিতার ধর্মশীলতাও পুত্রের মধ্যে পুরোপুরি আশ্রয় পায়নি। অথচ ঐতিহাসিক ভাবে ধর্মের কার্যকারিতা ও ভূমিকা সম্পর্কে চেতনা ছিল তাঁর। কিন্তু বর্তমান যুগপ্রেক্ষিতে সম্ভবত ধর্মের রূপান্তরের প্রয়োজন অনুভব করতেন তিনি। অন্তত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর খুব বেশি শ্রদ্ধা ছিল না।

জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী বরিশাল শহরেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার বেথুন স্কুলে খুব সম্ভব ফার্স্ট ক্লাশ অবধি পড়েছিলেন। তার পরেই বিয়ে হ'য়ে যায়। কিন্তু বিদ্যার্জনের উপযুক্ত মেধা ও অনুরাগ তাঁর কম ছিল না। বরিশালে শ্বশুরবাড়ির বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে গৃহস্থালী কাজকর্মে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হ'তো তাঁকে। খুব ভোর থেকে গভীর রাত অবধি অক্লান্তভাবে সকলের সব প্রয়োজন মিটিয়ে সংসারের শেষ মানুষটির খাওয়া হ'লে তবে তিনি ঘরে ফিরতেন। ঘরে এসেও ঘুরতেন ফিরতেন। প্রদীপের পাশে সেলাই করতে বসে যেতেন হয়তো, কিম্বা দু-চারটে পত্র-পত্রিকা নিয়ে ব'সে পড়তেন। ছেলেরা জেগে থাকলে পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞেস করতেন, ঘুমোতে বলতেন। মাঝে মাঝেই প্রতিবেশীরা রোগীর সেবায়, আশ্রয়চ্যুত দুঃস্থের সংবেদনায়, নিম্নশ্রেণীর কারো মৃত্যুতে, অনাথ বিপন্ন স্ত্রীলোকের উদ্ধারে, প্রতিবেশীর সন্তান-জন্মে তাঁকে ডাকতে আসতো, তিনি চ'লে যেতেন, সারারাত হয়তো বাড়িই ফিরতেন না।

এর মধ্যেও সময় ক'রে ছেলেদের তিনি স্কুলের পড়া শিখিয়েছেন। সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে ইস্কুলের পড়াটুকুই শুধু নয়। সংসারের সমাজের দেশের ও জীবনের সদর্থ আবিষ্কারের দিকেই তার লক্ষ্য থাকতো বলে সে শিক্ষা সার্থক হয়েছিল। মায়ের কাছেই জীবনানন্দ দেশী বিদেশী কবি ও ঔপন্যাসিকের লেখার ভাল দিকগুলি চিনেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলী ব্রাউনিঙের অনেক কবিতা কুসুমকুমারীর মুখস্থ থাকতো। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে, নবীন সেন, হেমচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন সেন,

রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে সুন্দর সুন্দর অংশ আবৃত্তি ক'রে শোনাতেন। শৈশবে মায়ের কাছে এইসব আবৃত্তি শুনতেই ভালোবাসতেন তিনি। এইভাবে মায়ের সাহিত্যপ্রীতি পুত্রের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল।

কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা সেদিনের বাংলাদেশের মহিলা কবিদের মধ্যে কুসুমকুমারী একটি বৈশিষ্ট্যসমুজ্জ্বল স্থান ছিল। সহজ ও স্বভাব-কবিত্ব নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। ঘর ও সমাজের কাজের চাপে কবিতা লেখার চর্চা করতে পারেননি তেমন। তবু যখন পত্রিকা থেকে তাগিদ আসতো হয়তো রান্নাঘরে ঢুকে এক হাতে খুন্তি নাড়তে নাড়তে কবিতা লিখছেন দেখা যেত, যেন চিঠি লিখছেন—বড় একটা ঠেকছেনা কোথাও। তবু একটা অর্থঘন সুস্মিত ভোরের আলো, শিশির লেগে রয়েছে যেন এসব কবিতার শরীরে। সময় এদের স্থানচ্যুত করতে পারবে না। গদ্য রচনাতেও একজন সৎ সাহিত্যিকের উপাদান ছিল তাঁর মধ্যে, এই সব রচনায়, সমাজের অভিভাষণে, আলাপ আলোচনায় বোঝা যেত আজকের পৃথিবীর জীবন-বেদের তাৎপর্য ও আধুনিকতার মর্ম বুঝেছিলেন তিনি। অনেক আগেই কবিতা লেখা তিনি বন্ধ করেছিলেন। যে মহৎ কবিতা তিনি লিখে যেতে পারতেন, যার আভাস আছে তাঁর কাব্যের শরীরে, তাই বোধ হয় উত্তরাধিকারে পূর্ণ হয়েছিল পুত্রের লেখায়। আমাদের বিশ্বাস এই ভূমিকা থেকে দেখলে জীবনানন্দের কবিমানসের পটপ্রচ্ছদটি স্পষ্টতর হবে।

জীবনানন্দ ছোট ভাই অশোকানন্দ ও বোন সুচরিতার সঙ্গে যে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন তা সুন্দর শান্তির সংসার ছিল। মায়ের সস্নেহ সান্নিধ্যে তাঁর শিক্ষার সূত্রপাত। বাড়ীর পরিচারক পরিচারিকাদেরও ছোট থেকে তাঁরা জানতেন আত্মীয়ের মতো। এদের কাছেই তিনি নানা কাহিনী, ছড়া, অনেক গাছ, লতা-পাখির নাম শিখেছিলেন। বাড়ির আওতায় মানুষ হওয়াতেই তাঁর প্রকৃতি হয়েছিল লাজুক। তবু ছোট বেলা থেকে খেলাধুলো বেড়ানো ও সাঁতারের অভ্যাস ছিল তাঁর।

বড় হ'লে তাঁকে প্রখ্যাত ব্রজমোহন স্কুলে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় সব সময়েই পুরস্কার পেতেন তিনি। পুরস্কারের টাকায় ইংরাজী কবিদের কাব্যগ্রন্থ তিনি নির্বাচন ক'রে নিতেন। স্কুলে পড়বার সময় থেকেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। কৈশোরের সে সব কবিতা তিনি নিজেই বিনষ্ট ক'রে দিয়েছেন।

ব্রজমোহন কলেজ থেকেই ১৯১৭ সালে তিনি ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেন। তখন বহু বাঙালী কবির কবিতার বই কিনতেন ও পছন্দ মতো অংশ বহুবার আবৃত্তি করতেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে

বি. এ. পাশ করেন, পরে যথা সময়ে ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ভাষায় এম. এ. উপাধি লাভ করেন।

১৯২২ সালে কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে তাঁর কর্ম-জীবনের সূত্রপাত। সেই সঙ্গে চলেছে কবিতা-চর্চা। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর সম্পর্কে যে কবিতা বঙ্গবাণী পত্রিকায় লিখেছিলেন সেটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার মধ্যে একটি। কবিতাটি সম্পর্কে কালিদাস রায় বলেছিলেন এই কবিতা প'ড়ে তাঁর মনে হয়েছে যে এটি একজন প্রবীণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ছদ্মনামে লিখেছেন! আরো অনেকে প্রশংসা করলেও "মা আমাকে ফেরৎ ডাকে লিখলেন চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে লিখেছ ভালই করেছ, কিন্তু রামমোহনের উপর লিখতে বলছি তোমাকে, মহর্ষির উপরেও। তিনি পড়ে বিক্ষুব্ধ বোধ করেছিলেন—এ যেন ধান ভানতে শিবের গীত।" মা কুসুমকুমারী হয়তো যাচিয়ে দেখতে চাইতেন সাময়িকতার আবর্তের বাইরে যে সব মহৎ মানুষ আছেন তাদের সম্পর্কে পুত্রের বিশ্বাসের সততা কতখানি। এইভাবে মায়ের নিরুচ্ছ্বাস উৎসাহ ও প্রত্যাশায় জীবনানন্দের কবিমনের দীক্ষা সম্ভব হয়েছিল।

জীবনানন্দের অধিকাংশ কবিতা এই আমলে প্রবাসী, বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, বিজলী ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হ'তো। ১৯২৮ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' প্রকাশিত হয়। এর পর তাঁর জীবনে এক বিপর্যয় এলো। সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করেন।

১৯২৯ সালে খুলনার বাগেরহাট কলেজে মাস তিনেক ইংরাজীর অধ্যাপনা করেছিলেন। পরে ঐ বছরই দিল্লীর রামযশ কলেজে আবার তিনি অধ্যাপনার কাজ পেলেন। পরের বছর শ্রীমতী লাবণ্য গুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৩০ সালে চাকরী ত্যাগ ক'রে তিনি আবার বাংলা দেশে ফিরে আসেন। ১৯৩১ সালে তাঁর কন্যা মঞ্জুশ্রীর জন্ম হয়। ১৯৩৫ সালে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজেই তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরের বছর তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বেশির ভাগ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল ধূপছায়া, প্রগতি ও কল্লোল পত্রিকায়। বরিশালের কলেজ ম্যাগাজিনে তিনি এসময়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ায় বর্তমানে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

জীবনানন্দের অধ্যাপক জীবন খুব উজ্জ্বল সাফল্যের ছিল না বলেই মনে হয়। তাঁর এক ছাত্র লিখেছেন, "জীবনানন্দ দাশ আমাদের ইংরেজী পড়াতেন, ছেলেদের মুখ থেকেই শুনতে পেয়েছিলাম তিনি কবি। কবি বলতে তখন রবীন্দ্রনাথকেই আমরা বুঝতাম। কাজেই আমাদের অধ্যাপক যাঁকে রোজ দেখি তিনি একজন

কবি এ সংবাদ আমার কিশোর মনে প্রকৃতই চাঞ্চল্য এনে দিয়েছিল। তিনি আমাদের The Northman পড়াতেন; আমি অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সেই কবিকে খুঁজবার চেষ্টা করতাম। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন, তার কয়েকদিন পরেই আমাদের ছাত্রাবাসের উঁচুক্লাসের কয়েকজন ছাত্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনার জন্য জীবনানন্দের বাসায় গেলেন। সেদিন তিনি কি বলেছিলেন তা কিছুই মনে নেই আজ, কিন্তু সেই স্বল্পভাষী কবির বিশাল চোখে সেদিন যা দেখেছিলাম তা তাঁর বলার চাইতেও বেশী। সেদিন বোধ হয় প্রথম সেই কবি মানুষটিকে দেখতে পেয়েছিলাম।"

১৯৪২ সালে কবিতাভবন থেকে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজে তাঁর 'বনলতা সেন' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হ'লো। তখন তার কলেবর, বলাবাহুল্য বর্তমানের চেয়ে ছোটো ছিল। ১৯৪৪ সালে এই গ্রন্থের কবিতাগুলির সঙ্গে আরো কিছু কবিতা গ্রথিত ক'রে 'মহাপৃথিবী' নামে প্রকাশ হ'লো।

১৯৪৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত জীবনানন্দ ব্রজমোহন কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলেন। এখানে 'স্বরাজ' দৈনিক পত্রের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। পরের বছর তিনি ব্রজমোহন কলেজের চাকরী ত্যাগ করলেন। ঐ সময় তাঁর 'সাতটি তারার তিমির' প্রকাশিত হয়।

কিন্তু 'স্বরাজ' পত্রিকার আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হ'লো না। এসময়ে কিছুদিন তাঁকে 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক হিসাবেও দেখা যাচ্ছে। আবার কর্মের সন্ধানে বাইরে যেতে হ'লো। ১৯৫০ সালে খড়্গপুরে তিনি অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯৫১ সালে 'মহাপৃথিবী'র নির্বাচিত কিছু কবিতার সঙ্গে আরো কিছু নূতন কবিতা যোগ ক'রে সিগনেট সংস্করণ 'বনলতা সেন' প্রকাশিত হয়। খড়্গপুরের চাকরী ত্যাগ ক'রে ঐ বছর নভেম্বর মাসে তিনি বরিষা কলেজের ইংরাজী বিভাগে অস্থায়ীভাবে যোগ দেন।

ঐ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য ছিল খুব ক্ষুণ্ণ। রক্তচাপ জনিত একটা মানসিক দৌর্বল্য দেখা দিয়েছিল। ক্লাসের পূর্ব মুহূর্তে বড় অসহায় মনে করতেন নিজেকে। সহানুভূতিশীল সহকর্মীর হাতে বাড়িয়ে দিতেন নিজের হাত। সহকর্মীর অনুমতির উপরেই নির্ভর করছে তাঁর ক্লাসে প্রবেশ করা না করা। ইদানীং চোখের দৃষ্টিও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। সুতরাং নির্ধারিত চার মাস পার হ'য়ে গেলে তাঁকে স্থায়ী ক'রে রাখার চেষ্টা না ক'রে কর্তৃপক্ষ অধিকতর কর্মঠ ব্যক্তির সন্ধান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন।

১৯৫৩ সালে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে সিগনেট সংস্করণ 'বনলতা সেন'

পুরস্কৃত হ'লো। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মহাজাতি সদনের সম্বর্ধনা সভায় দু'হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল তাঁর কবিতা বোধ হয় বেশি লোক পড়ে না। কিন্তু সেদিনের সে সভায় তাঁর ধারণা বদলেছিল। আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি। সম্বর্ধনার পরে উত্তর দিতে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় তাঁর হাত কাঁপছিল। এ সম্মেলনের পরবর্তী কোনো অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয়নি।

ঐ বছরই তিনি হাওড়া গার্লস কলেজে যোগ দেন এবং আমৃত্যু ঐ কলেজেই ছিলেন।

১৯৫৪ সালে কলকাতা সিনেট হলে আয়োজিত কবি-সম্মেলনে তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ঐ বছর মে মাসে জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আরও অনেক বারের মতো ঐ বছরের ১৩ই অক্টোবর কলকাতা কেন্দ্র থেকে বেতারে তিনি 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। পরদিন সেই নিয়ে আলোচনা করেছেন বন্ধুর সঙ্গে, কৌতুক করেছেন। তারপরে একাই [illegible]ত বেরিয়েছেন বিকালে। কখনো দুপুরে কখনো রাত্রির গভীরতায়। তাছাড়া বিকেলের দিকে নিয়মিতভাবে একাকী বেড়ানোর অভ্যাস ছিল। শহরের পাকচক্রের মানুষী ভিড় হৈ-হট্টগোলে বিলি কেটে, হাঁটুর নিচে ধুতিটাকে একটু গুটিয়ে তুলে ধ'রে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে চ'লে যেতেন। খুব কম লোক চিনতে পারতো ইনিই জীবনানন্দ দাশ। দেখা হ'লে একটু লাজুক চাপা হাসি হাসতেন বা অন্যমনস্ক কথা বলতেন দু-চার মিনিট, রাসবিহারী এভিনিউ-ল্যান্সডাউনের মোড়ে দাঁড়িয়ে।

সেদিনও জলখাবার ছাড়িয়ে জুয়েল হাউসের সামনে দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছিলেন তিনি। শুধু অন্যমনস্ক নয়, কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন কবি। চলন্ত ডাউন বালিগঞ্জ ট্রাম ষ্টপিং ষ্টেশন থেকে তখনও প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে। অবিরাম ঘণ্টা বাজানো ছাড়াও বারম্বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল ট্রাম ড্রাইভার। তবু যা অনিবার্য তাই ঘটলো। গাড়ি থামলো। তখন প্রচণ্ড ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গেই কবির দেহ ক্যাচারের ভিতর ঢুকে গেছে। ক্যাচারের কঠিন কবল থেকে অতিকষ্টে টেনে হিঁচড়ে বার করল সবাই কবির রক্তাপ্লুত অচৈতন্য দেহ। কেটে ছিঁড়ে থেতলে গেছে এখানে সেখানে। রক্তের ছোপ মাথায় হাতে বুকে, ডান চোখের কোণে। চুরমার হ'য়ে গেছে বুকের পাঁজরা। ডান দিকের কণ্ঠা আর উরুর হাড়।…

"ধরাধরি করে সবাই মিলে কবির বেহুঁশ দেহ নিয়ে গেলেন রাস্তার ওপারে। তারপর জল বাতাস বরফ…ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে পেলেন কবি: 'কি

হয়েছে? আমি এখানে কেন?' 'হাঁটতে হাঁটতে মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন।' কে একজন বললেন। 'আপনার নাম ঠিকানা কি?' আরেকটি প্রশ্ন। 'জীবনানন্দ দাশ, ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড।' খানিক এধার ওধার তাকালেন: 'আমি এখন বাড়ি যেতে পারি?' 'তা যেতে·· হ্যাঁ যেতে পারেন বৈ কি।' বললেন কে একজন।

উঠতে গিয়ে ধড়াস করে আছাড় খেয়ে পড়লেন। ছাতু হয়ে গেছে ডান পা। যেমন তেমন জখম নয়—এবার বুঝলেন সবাই।…"

রাস্তার লোকজনরাই ট্যাক্সি ক'রে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় শম্ভুনাথ হাসপাতালে পৌঁছে দেন। সবই করা হয়েছিল, চিকিৎসা বিদ্যার আয়ত্তে যা করা যেতো, কিন্তু ইতিমধ্যে আহত ফুসফুসে নিউমোনিয়া দেখা দেয়, যেটা আরোগ্য না করা পর্যন্ত চূর্ণ অস্থি সংস্থাপন করা সম্ভব ছিল না। এই নিউমোনিয়া শেষ পর্যন্ত আরোগ্য করা যায়নি।

তাঁর যারা সমসাময়িক কবি এবং সাহিত্যিক বন্ধু, কলকাতার যারা তরুণ লেখক এবং তাঁর কবিতার ভক্ত পাঠক তারা প্রায় প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন মন নিয়ে হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, ডাক্তারি পড়া তরুণ ছাত্ররা সারারাত্রি শয্যার পাশে উপস্থিত থাকতেন, সারাদিনই দেখা যেতো ব্যাকুল চোখমুখ ছোট খাটো [illegible] দল হাসপাতালের বারান্দায় নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন।

পুত্র সমরানন্দ (রঞ্জু), কন্যা মঞ্জুশ্রী, স্ত্রী এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের ম্লানমুখ অশ্রুসিক্ত ক'রে ২২শে অক্টোবর রাত সাড়ে এগারোটায় তিনি চ'লে গেলেন। পরদিন সকালে রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে নীরবে তাঁর দেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হ'লো। তাঁকে যাঁরা জানতেন, ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, তাঁরা এসেছিলেন। নাতিদীর্ঘ একটি শোকযাত্রীদল।*

*এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত যাবতীয় তথ্য এমনকি প্রায়শ তার ভাষাও মুখ্যত 'উত্তরসূরী' জীবনানন্দ স্মরণ সংখ্যা ও 'কবিতা' জীবনানন্দ স্মরণ সংখ্যার বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়ের একটি প্রবন্ধও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিশিষ্ট

উল্লেখপঞ্জী

জীবনানন্দের কবিতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ও পুরাপ্রসঙ্গের আলোচনা

অজন্তা—অজন্তার পার্বত্য গুহাচিত্রাবলী প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। হিউ এন সাঙ এই বৌদ্ধ শিল্প-কেন্দ্রের বিবরণ দিয়েছিলেন। পরে বিস্মৃত এই গুহাগুলি উনিশ শতকে আবিষ্কৃত হয়। এই সব গুহার ভিত্তিচিত্রের সুসমঞ্জস রেখাবিন্যাস, বর্ণসুষমা, ব্যঞ্জনা, গতিশীলতা ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর।

অতলান্তিক চার্টার—১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আটলাণ্টিক মহাসাগরের একটি জাহাজে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মিলিত হয়ে এক চার্টার প্রচার করেন। এতে স্থির হয় রাজ্যবিস্তার নীতি ত্যাগ করা হবে, পরাধীন জাতিদের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হবে, ফ্যাসিষ্ট শক্তি সমূহের পরাজয় ঘটিয়ে শান্তি ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ অনুসরণ করা হবে। বিভিন্ন দেশ পরে এই সনন্দ গ্রহণ করে। বিশ্বযুদ্ধের শেষে এই নীতির ভিত্তিতে শান্তিস্থাপন ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়।

অনুরাধা—জ্যোতিষ মতে শুভদায়ক সপ্তদশ নক্ষত্র। প্রত্যেক নক্ষত্রই কয়েকটি তারার সমষ্টি। অনুরাধা সপ্ততারাময়ী, (মতান্তরে তাতে চারটি তারা দেখা যায়)। অনুরাধার আকার সর্পের মতো। অনুরাধার অধিষ্ঠাতা দেবতা মিত্র। পুরাণে দেখা যায় কৃষ্ণের অনুরাগিণীরা সকলেই নক্ষত্র-নাম্নী। রাধার সঙ্গী অনুরাধা তাঁদেরই একজন।

অনুরাধাপুর—শ্রীলঙ্কার প্রাচীন রাজধানী। খ্রীষ্টজন্মকালে অনুরাধাপুর সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের শিখরে ওঠে। রাজা পিয়তিস্‌স বুদ্ধগয়া থেকে বোধিদ্রুমের শাখা আনিয়ে এখানের মহাবিহারে রোপণ করেন। সে গাছ এখনো আছে। বুদ্ধের শৌবন দন্ত (Canine tooth) দন্তপুর (পুরী) থেকে এনে এখানে স্থাপন করা হয়। দশম শতকে চোল রাজাদের আক্রমণে অনুরাধাপুর ধ্বংস হয়।

অনিরুদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্রও প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ। যুদ্ধে দুর্নিবার ছিলেন বলে অনিরুদ্ধ নাম। ভোজরাজ রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। শোনিত-পুরের রাজা বাণদৈত্যের পরম রূপবতীকন্যা উষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখে তাঁকে

পতিত্বে বরণ করেন। সখী চিত্রলেখার সাহায্যে উভয়ের মিলন হ'লে বাণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাঁকে নাগপাশে বদ্ধ করেন। পরে কৃষ্ণবলরাম প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে বাণ অনিরুদ্ধকে কন্যাসম্প্রদান করেন।

অপ্সরা—দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন কালে দেবযোনি নৃত্যগীত বিশারদ অপ্সরারা সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। কামদেব নাকি অপ্সরাদের অধিপতি। পরবর্তী সাহিত্যে অপ্সরারা গন্ধর্বদের স্ত্রী। মুনি ঋষিদের তপোভঙ্গের প্রয়োজনে দেবতারা অপ্সরাদের ব্যবহার করতেন। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরারা বিখ্যাত। এরা স্বর্গের স্বাধীনা নারী।

অম্বাপালী—বৈশালীর রাজোদ্যানে জাত এই শিশুটিকে উদ্যান-পালক লালন পালন করেন। আম্রোদ্যান-পালকের কন্যা ব'লে অম্বাপালী নামে পরিচিতা হন। অনিন্দ্যসুন্দর অম্বাপালী রাজকুমারদের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে সভানর্তকী হন। বুদ্ধ লিচ্ছবিরাজের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য ক'রে অম্বাপালীর ঘরে ভোজন করেছিলেন। অম্বাপালী ভিক্ষুসংঘকে একটি 'বিহার' দান করেন।

অর্জুন—তৃতীয় পাণ্ডব, ধনঞ্জয়। অর্জুন অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া রক্ষার জন্য পার্বতীর আশীর্বাদ ধন্য-নারীরাজ্যে গমন করেন ও নারীরাজ্যের অধীশ্বরী প্রমীলাকে বিয়ে করেন। দ্রঃ কৃষ্ণা।

অর্ধনারীশ্বর—একদেহে মিলিত হরগৌরীর যুগলমূর্তি। এই মূর্তি মণির মতো চিক্কণ, ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ, হাতে পাশ, রক্তপদ্ম, নরকপাল ও শূল।

অশোক—মৌর্যবংশের তৃতীয় সম্রাট। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র অশোক খ্রী. পূ. ২৭৩—২৩২ খ্রী. পূ. রাজত্ব করেন। প্রথম জীবনে নিষ্ঠুরতার জন্য 'চণ্ডাশোক' নাম ছিল। কলিঙ্গ দেশ জয়ের জন্য অজস্র সৈন্যক্ষয় দেখে অনুতপ্ত হ'য়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন ও প্রজাকল্যাণ এবং ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। নানাদেশে ধর্মপ্রচারক পাঠান। এই উদ্দেশ্যে পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকেও শ্রীলংকায় পাঠিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে পরে 'ধর্মাশোক' বলা হয়েছে।

অশোক স্তম্ভ—সারনাথে প্রাপ্ত অশোক প্রতিষ্ঠিত ধর্মানুশাসন লিপিযুক্ত প্রস্তর স্তম্ভ। এর মাথায় তিনদিকে তিনটি সিংহ ও তার মাঝখানে তিনটি চক্র (ধর্মচক্র) আছে। এটাই স্বাধীন ভারতের সরকারী প্রতীক এবং পূর্বোক্ত অশোক চক্র ভারতের জাতীয় পতাকায় স্থান পেয়েছে।

অহল্যা—বৃদ্ধাশ্বের কন্যা; গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যা। একদিন গৌতম স্নান করতে গেলে কামাতুর ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধ'রে অহল্যার কাছে এসে কামাভিলাষ জানান।

অহল্যা তাঁকে দেবরাজ ব'লে চিনেও তাঁর কামনা পূর্ণ করেন। পরে গৌতমের অভিশাপে অহল্যা পাষাণ হ'য়ে যান। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যার শাপমোচন হয়েছিল। দ্রঃ 'ইন্দ্র'।

আত্তিলা—হুন সম্রাট আত্তিলা (খ্রী. ৪০৬—৪৫৩) নিষ্ঠুরতার জন্য অবিস্মরণীয় হ'য়ে আছেন। ইনি রোমানবাহিনীকে পরাভূত ক'রে জার্মানী ও গল জয় করেন এবং ইতালী অভিযানের প্রস্তুতিকালে মারা যান।

আথেন্স—গ্রীক নগররাষ্ট্র। গ্রীক সভ্যতা সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। 'গ্রীস' দেখুন।

আফ্রিকা—মহাদেশ বিশেষ। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে শোষিত আফ্রিকার কালো মানুষ ও অন্ধকার মহাদেশ সম্প্রতিকালে মুক্তিলাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের উৎপীড়ন ও শোষণের বেদনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব ও যুদ্ধকালীন যুগে স্মরণীয় ছিল।

আলেকজান্দ্রিয়া—খ্রী. পূ. ৩৩০ অব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার আপন নামে মিশরে ভূমধ্যসাগর তীরে এই সমৃদ্ধ নগরীর পত্তন করেছিলেন। সুদীর্ঘকাল এই নগর এশিয়া ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্র ছিল।

ইছামতী—নদীবিশেষ। ১। পাবনা জেলায় আত্রেয়ী নদীর শাখা, পদ্মায় মিশেছে।

২। দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত নদী।

৩। ২৪ পরগণা জেলার পূর্বাঞ্চলে প্রবাহিত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের খাড়ি। পদ্মা থেকে নির্গত ভৈরব জলাঙ্গী ও মাথাভাঙার বন্যার জল একসময়ে ইছামতীর খাতে বইত। ত্রিবেণীর কাছে ভাগীরথী থেকে নির্গত অধুনালুপ্ত যমুনার জলও ইছামতীর খাতে বইত। এখন বনগাঁর কাছে মজে গেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে ইছামতীর নাম কালিন্দী।

ইন্দোচীন—দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সুবৃহৎ উপদ্বীপ ইন্দোচীন 'ভিয়েতনাম' 'কম্বোডিয়া' ও 'লাওস' তিন রাষ্ট্রের সমবায়। সুপ্রাচীন কালে এ অঞ্চল ভারতের উপনিবেশ ছিল। প্রাচীন কাম্বোজ দেশ (কাম্বোডিয়া) ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দী প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। জগৎবিখ্যাত আঙ্কোরভাট মন্দির ও আঙ্কোরথোমের মন্দির সমূহ এই সমৃদ্ধির চিহ্ন বহন করছে।

ইন্দ্র—দেবরাজ আখণ্ডল। ঋক্‌বেদের প্রধান দেবতা। পিতা কশ্যপ, মাতা অদিতি, রাজ্য অমরাবতী, উদ্যান নন্দন,প্রাসাদ বৈজয়ন্ত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তী ঐরাবত, রথ বিমান, সারথি মাতলি, ধনু ইন্দ্রচাপ, অস্ত্র বজ্র, স্ত্রী পুলোম-কন্যা শচী, পুত্র জয়ন্ত, ঋষভ, মীঢ়, অর্জুন ও বালী। তিলোত্তমা সৃষ্ট হ'য়ে ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করলে তিলোত্তমার দর্শন লালসায় তাঁর সর্বাঙ্গে সহস্র নেত্রের উদ্ভব হয়। মতান্তরে গুরু

পত্নী অহল্যাকে হরণ করায় গুরু গৌতমের শাপে সর্বাঙ্গে যোনি চিহ্ন দেখা দেয়, পরে তা সহস্র চক্ষুতে রূপান্তরিত হয়।

ইন্দ্রাণী—পুলোমা দানবের কন্যা ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে ইন্দ্রপত্নী 'প্রসহা'।

ইলোরা—মহারাষ্ট্রে ঔরঙ্গাবাদে অবস্থিত প্রাচীন 'এলাপুর।' পঞ্চাশটির বেশি কৃত্রিম পার্বত্য গুহায় বৌদ্ধ হিন্দু জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকীর্তি দেখা যায়। এগুলিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষ থাকতো। তাম্রপ্রস্তর যুগের বহু প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে। গুহা খনন শুরু হয় ষষ্ঠ শতকে এবং শেষ হয় সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকে। চিত্র-মান অজন্তার চেয়ে নিচু। তবু এখানেই বৌদ্ধ শৈলখাত স্থাপত্যের শেষ উজ্জ্বল নিদর্শন।

ইটালি—প্রাচীন ও বর্তমান ইটালি চিরকালই স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলার জন্য বিখ্যাত।

ইশিশ—প্রাচীন মিশরে দেবী ইশিশ প্রধানতম দেবী হিসাবে পূজিতা হতেন।

ঈশা—যীশুখ্রীষ্ট<হিব্রু যীশু, ইংরাজী Jesus. 'যীশুখ্রীষ্ট' দেখুন।

উজ্জয়িনী—প্রাচীন নগরী, অবন্তী, বিশালা, পদ্মাবতী, ভোগবতী, হিরণ্যবতী নামেও পরিচিত। স্কন্দপুরাণ, মেঘদূত, কথাসরিৎসাগরে এর উল্লেখ আছে। উজ্জয়িনী মালব দেশের রাজধানী ছিল। সে কালে উজ্জয়িনী ভাষা, সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা ভূগোল প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস সম্পর্কে অজস্র কিম্বদন্তী এই নগরী প্রসঙ্গে জড়িত আছে। শিপ্রা তটবর্তী এই নগরে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক মহাকাত্যায়ন ও লুইপাদ জন্মগ্রহণ করেন।

উত্তরপাড়া—হুগলী নদীর তীরে কলকাতার সন্নিহিত একটি উপনগরী।

উদয়ন— ১। অগস্ত্য মুনি।

২। বৎসরাজ উদয়ন চন্দ্রবংশীয় নৃপতি শতানীকের পুত্র (বা পৌত্র)। এঁর রাজধানী ছিল কৌশাম্বীতে। ইনি রাজকন্যা বাসবদত্তার পানিগ্রহণ করেন। এর অপর পত্নীর নাম রত্নাবলী। বাসবদত্তার গর্ভে এঁর নরবাহন নামে এক পুত্রের জন্ম হয়।

উমা—পিতা হিমালয় ও মাতা মেনকার কন্যা, পার্বতী, [সং উ (শিব) মা (লক্ষ্মী) ৬ষ্ঠী তৎ] দক্ষযজ্ঞ কালে সতীর দেহত্যাগের পর উমা রূপে জন্মগ্রহণ ক'রে, মদন ভস্মের পর শিবকে পতিরূপে পাবার জন্য যে কঠোর তপস্যা করেন তা দেখেই মেনকা 'উমা' শব্দ উচ্চারণ করেন। 'উ' (অয়ি পার্বতি !) মা (না, অর্থাৎ তপস্যা ক'রো না।) এই কথা মেনকা বলাতে তাঁর নাম হয় উমা। পরে শিবের সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয়।

ঊষা—দ্রঃ অনিরুদ্ধ।

উর—মেসোপটেমিয়া (ইরাক-এর) প্রাচীনতম শহরগুলির অন্যতম ও সুমের সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ও রাজধানী। বর্তমান নাম 'মুকেয়ির'। ইউফ্রেতিস ও টাইগ্রিস নদীর সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। বাইবেলে বর্ণিত ক্যালডিজদের মহানগরী উর এব্রাহামের জন্মস্থান। সিন্ধুসভ্যতার সমকালীন এই সভ্যতার অজস্র নিদর্শন আনুমানিক খ্রী. পূ. ৩০০০ বছর থেকে ৪০০ খ্রী. পূ. পর্যন্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্তরে বিন্যস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। দ্রঃ বেবিলন।

উর্বশী—সুন্দরী শ্রেষ্ঠা অনন্ত যৌবনা অপ্সরা বিশেষ। [উরুর্ণ (মহাপুরুষদের) + বষ্টি (বশ করেন) এই অর্থে] নারায়ণের উরু ভেদ ক'রে সমুদ্ভূত হওয়ায় এর নাম উর্বশী। পদ্ম পুরাণে আছে, বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গের জন্য কামদেব স্বীয় উরু থেকে উর্বশীকে সৃষ্টি করেন। উর্বশী বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গ সমর্থ হওয়ায় ইন্দ্র তাঁকে গ্রহণ করেন। প্রত্যাখ্যাত মিত্রাবরুণের শাপে উর্বশী মনুষ্যভোগ্য হ'য়ে রাজা পুরুরবার পত্নী হিসাবে মর্তে বাস করেন। বেদে বলা হয়েছে উর্বশী থেকে বশিষ্ঠের জন্ম। উর্বশীকে কেউ কেউ পার্থিব নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রতিমা হিসাবে মনে করেন।

এশিরিয়া—প্রাচীন এশিরিয়া দেশ ও রাষ্ট্রের সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। উত্তর মেসোপটেমিয়ায় এশিরিয়ার সাম্রাজ্য খ্রী. পূ. ১০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে অবস্থিত ছিল। খ্রী. পূ. ৭২১ অব্দে এশিরিয়রা ইজরাইল দখল করে ও বন্দী ইহুদীদের বেবিলনে বিক্রী ক'রে দিয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন বৈদিক সভ্যতার স্রষ্টা ভারতীয় আর্যরা অসুর সভ্যতার উত্তরসূরী ও তাদের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত।

এঞ্জেলো—বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী Buanarroti Michelangelo (১৪৭৫-১৫৬৪) Caprese তে জন্মগ্রহণ করেন।

ওডিসিউস—ট্রয়ের যুদ্ধে যে সব গ্রীক রাজা নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে ইথাকার রাজা Odysseus সবচেয়ে খামখেয়ালী ছিলেন। অবরুদ্ধ ট্রয়ের পতন ঘটানোর জন্য তিনি কাঠের ঘোড়া উদ্ভাবন ও নির্মাণ করেন। ট্রয় ধ্বংসের পর তাঁর স্বদেশে ফেরার বিবরণ নিয়ে হোমারের ওডেসী কাব্য রচিত হয়। জাহাজে ক'রে ২০ বছর নানা দেশে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে প'ড়ে অবশেষে তিনি দেশে ফেরেন। এদিকে রাজ্যের লোভে বহু রাজা ওডিসিউসের স্ত্রী রাণী পেনেলোপীর পানি প্রার্থনা করেন, সুকৌশলে পেনেলোপ তাদের ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ওডিসিউস তাদের হত্যা করেন ও কিছুদিন রাজ্য ভোগের পর পুত্র টেলমেকাসকে রাজত্ব দিয়ে আবার সমুদ্রাভিযানে বেরিয়ে পড়েন। পরবর্তী সাহিত্যে ওডিসিউসকেই ইউলিসিস বলা হয়েছে।

কঙ্কাবতী – বাংলা রূপকথার নায়িকা।

কনফুচ/কনফুশিয়াস – চীন দেশীয় রাজনৈতিক ও ধর্মসংস্কারক। (খ্রী. পূ. ৫৫১-খ্রী. পূ. ৪৪০)। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিভিন্ন চীনা ধর্মগ্রন্থ পড়ে ইনি ধর্মসংস্কারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। পরে চাংটু নগরের প্রশাসকের পদ লাভ ক'রে ইনি সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। পরে পদত্যাগ ক'রে দেশে দেশে তাঁর নীতি প্রচার করেন। তাঁর মতে সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার ত্রুটিই ব্যক্তি জীবনের দুঃখ কষ্টের হেতু। শিক্ষাকে তিনি সমাজ-সংস্কারের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধর্মচিন্তা মানবকেন্দ্রিক ও বাস্তব ধর্মী। মানুষকে ভালবাসাই পুণ্যকর্ম, মানুষকে জানাই জ্ঞান – এই সব শিক্ষা তিনি কথোপকথনছলে দিতে চেষ্টা করেন।

কপিল – সাংখ্য দর্শন প্রণেতা ও সগর বংশ ধ্বংসকারী মুনি। পিতা কর্দম প্রজাপতি এবং মাতা দেবহূতি। সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া চুরি ক'রে ইন্দ্র ধ্যানস্থ কপিলের কাছে রেখে আসেন। সাগর সন্তানেরা তাঁকেই চোর মনে ক'রে লাঞ্ছনা করায় তাঁর কোপানলে ভস্মীভূত হয়। তারপর অংশুমান তাঁকে তুষ্ট ক'রে অশ্ব আনেন এবং তাঁর উপদেশ মতো ভগীরথ গঙ্গা আনলে পূত সলিলে সাগর বংশের উদ্ধার হয়। দ্রঃ গঙ্গাসাগর।

কমলা – দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। শিব সতীকে দক্ষযজ্ঞে যেতে নিষেধ করলে, সতী কালী মূর্তিতে তাঁকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করেন। শিব তাতেও ভয় না পেলে তিনি দশদিকে দশ মূর্তিতে আবির্ভূতা হ'য়ে শিবের পথরোধ করেন ও ভীত শিবের সম্মতি আদায় করেন। এই দশ মহাবিদ্যা হ'লো কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা। [ক (ব্রহ্মত্ব)+ম (শিবত্ব)+লা (দান করা)+ডক+আপ] যিনি ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব দান করেন।

করাচী – সিন্ধুনদের মোহনায় অবস্থিত পাকিস্তানের সর্বপ্রধান শহর, বন্দর ও প্রথম রাজধানী।

কলকাতা – পশ্চিম বাংলার রাজধানী ও বন্দর নগরী। জব চার্নক প্রতিষ্ঠিত এই নগরী এক সময়ে ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। এটি ভারতের বৃহত্তম শহর।

কর্ণফুলী – নদী বিশেষ। লুসাই উপত্যকা থেকে উদ্ভূত এই নদী পূর্ব-পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ঊর্ধ্বাংশে অনেক জলপ্রপাত আছে। কাসালাং কাপতাই ও হালদা এর প্রধান উপনদী। মোহনা থেকে ঊর্ধ্বপ্রবাহে চট্টগ্রাম শহর স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। রাঙামাটি, চন্দ্রকোনা, কাসালাং নদীতীরের প্রধান শহর।

কল্কি – বিষ্ণুর দশাবতারের শেষ অবতার। কলিযুগের অন্তকালে বিষ্ণু সম্ভল গ্রামে

বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেবেন। ভার্গবের কাছে নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে মহাদেবের কাছে সর্বগ অশ্ব ও সর্বজ্ঞ শুক লাভ করবেন। সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে দেবদত্ত অসি হাতে ম্লেচ্ছ নিধন ক'রে নির্মূল করবেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণকে দান করবেন। তখন প্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংস পাবে এবং সত্যযুগের সূচনা হবে। এই কিম্বদন্তী আছে।

কল্পতরু—হিন্দুপুরাণের মতে স্বর্গোদ্যানস্থিত এই অলৌকিক গাছ প্রত্যেকের যে কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে।

কাঙরা চিত্র—নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণের পর মোগলরীতিতে শিক্ষিত হিন্দু চিত্রকরেরা পাঞ্জাব ও হিমালয় সন্নিহিত পাহাড়ী রাজাদের আশ্রয়ে মোগল ও রাজপুত চিত্ররীতির মিশ্রণে পাহাড়ী চিত্ররীতি গ'ড়ে তোলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কাঙরা দুর্গাধিপতি সংসার চাঁদের পৃষ্টপোষকতায় গুলের রাজ দরবারের থেকে আমন্ত্রিত শিল্পীরা হিন্দুপুরাণ ও কৃষ্ণকথা অবলম্বনে যে অসংখ্য উন্নতমানের চিত্ররচনা করেন সেই চিত্রধারা অবিচ্ছিন্নভাবে ১৯০৫ পর্যন্ত চ'লে এসেছে। বস্তু সংস্থাপনে, বর্ণিকাভঙ্গে রেখার ছন্দে, নারীরূপের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সজীব সমন্বয়ে এইসব চিত্র মোগল পরবর্তী যুগের ভারতীয় চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কাঞ্চন মালা—পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্যতম একটি পালার নায়িকা। এ কাহিনীটি প্রকৃত পক্ষে একটি রূপকথা।

কাঞ্চী—মাদ্রাজের চেঙ্গেলপুত জেলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির নগরী; কাঞ্চীপুরম বা কাঞ্জিনগরম নামেও পরিচিত। খ্রী. পূ. ২য় শতকে রচিত পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এর উল্লেখ আছে। ধর্মপাল বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান। খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকে পল্লবদের রাজধানী ছিল। হিউ-এন-সাঙ ধর্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, বিক্রমে একে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান রূপে বর্ণনা করেছেন। এর দুটি অংশ শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। কাঞ্চী বারাণসীতুল্য।

কামাখ্যা—কালিকা দেবীর নামান্তর। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর শিব তাঁর শব কাঁধে নিয়ে ঘুরতে থাকেন। বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে সেই দেহ খণ্ড খণ্ড করেন। সতীর যোনিমণ্ডল কামাখ্যায় নিক্ষিপ্ত হওয়ায় এটি এক মহাতীর্থে পরিণত হয়। কামাখ্যা ৫১ পীঠের অন্যতম আসামের গৌহাটি শহরের সন্নিকটবর্তী।

কারবালা—এজিদের চক্রান্তে আশ্রয়হারা হোসেন সদলবলে কারবালার প্রান্তরে বিপক্ষীয় সৈন্যদল পরিবেষ্টিত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। ফোরাত নদীর জল লাভ করার জন্য এখানে এজিদের সৈন্যদলের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হয় ও হোসেন নিহত হন।

কার্থেজ—ভূমধ্যসাগরের তীরে আফ্রিকার উপকূলে 'কার্থেজ' সুপ্রাচীন শক্তিশালী

রাষ্ট্র ছিল। রোমের অভ্যুদয়কালে বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশত উভয় রাষ্ট্রে সুদীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহ চলে। খ্রীঃ পূঃ ২৬৪ প্রথম পিউনির যুদ্ধ হয়। হানিবলের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পিউনির যুদ্ধে কার্থেজীয় বাহিনী বিপুল শৌর্য প্রদর্শন করেও পরাজিত হয়। খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দে রোম কার্থেজ জয় ধ্বংস করে।

কালকেতু—১। কৃষ্ণ পতাকা।

২। ইন্দ্র পুত্র নীলাম্বর শিবের শাপে মর্তে ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্র কালকেতু নামে জন্মগ্রহণ করেন। সাহসী ও বলশালী কালকেতু ব্যাধ পরে চণ্ডীর কৃপায় রাজ্যলাভ ও চণ্ডীর পূজা প্রচার করেন।

কালনেমি—(১) রাবণের মাতুল। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পুনর্জীবনের ওষধি সংগ্রহ লিপ্ত হনুমানকে বাধা দেবার জন্য অর্ধেক রাজত্বের লোভ দেখিয়ে তাকে রাবণ পাঠান। মুনির ছদ্মবেশী কালনেমির কাছে হনুমান জল চাইলে তিনি কাছের জলাশয়ে যেতে বলেন ও মকরী দ্বারা নিহত হবে মনে ক'রে মনে মনে লঙ্কা ভাগ করতে থাকেন। হনুমান মকরীকে বধ ক'রে কালনেমিকেও হত্যা করেন। (২) হিরণ্যকশিপুর পুত্র। অপরাজেয় এই দৈত্যকে বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে হত্যা করেন। পরজন্মে কালনেমি উগ্রসেন পুত্র কংসরূপে জন্ম নেন।

কালীদহ—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে ধনপতি সওদাগর সেতুবন্ধ পার হ'য়ে লঙ্কা অভিমুখে যাবার পথে সমুদ্রে কালীদহ নামে এক দহে উপস্থিত হয়। এখানে চণ্ডী মায়ার ছলনায় কমলে কামিনীরূপে ধনপতির চোখে প্রতিভাত হন।

কালীয় দমন—বিষধর সর্পরাজ কালীয় গরুড়ের ভয়ে একটি হ্রদে আশ্রয় নেয়। তার বিষে হ্রদের জল বিষাক্ত ও অপেয় হয়ে যায়। কৃষ্ণ এই হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে কালীয়ের ফণায় উঠে দাঁড়ান ও সে রক্তবমি করতে থাকে। অবশেষে কৃষ্ণের আদেশে কালীয় হ্রদ ত্যাগ করে সমুদ্রে চলে যায়।

কাশী—বরুণা ও অসি দুই নদীর দ্বারা পরিবেষ্টিত গঙ্গাতীরবর্তী ভূখণ্ড কাশী বা বারাণসী অতি পুণ্যক্ষেত্র। এটি নাকি শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত। এখানে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠিত আছেন। কাশী বিদ্যা ও সংস্কৃতিচর্চার সুপ্রাচীন পীঠস্থান ও অসংখ্য মন্দির শোভিত নগরী।

কাশীপুর—কলিকাতার উত্তর শহরতলীস্থিত শিল্পাঞ্চল। এখানে একটি রাইফেল ফ্যাক্টরী আছে।

কাশ্মীর—ভারতের উত্তরে অবস্থিত এই রাজ্যটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরিসীম। কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলা হয়। কাশ্মীর সুপ্রাচীন কাল থেকে দর্শনচর্চার পীঠস্থান বলে পরিগণিত।

কিন্নর—অরিষ্টা ও কশ্যপ থেকে জাত কিন্নরেরা দেবযোনি। কিন্নরদের মুখ ঘোড়ার মতো এবং দেহ মানুষের মতো বা দেহ ঘোড়ার মতো এবং মুখ মানুষের মতো। এদের নিবাস কৈলাসে। এদের রাজা চিত্ররথ (মতান্তরে কুবের)। কিন্নরেরা নৃত্যগীতের জন্য বিখ্যাত ও স্বর্গের গায়করূপে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে ও শিল্পে কিন্নরদের বিশিষ্ট স্থান আছে।

কীচক—কেকয় রাজপুত্র ও বিরাট রাজার শ্যালক কীচক অতি শক্তিশালী অহংকারী ও কামুক ছিলেন। ইনি ত্রিগর্তরাজ সুশর্মাকে পরাস্ত ক'রে তাঁর রাজ্য বিরাট রাজার অধীন ক'রে দেন এবং মৎস্যদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য বিরাট রাজার প্রশ্রয়ে যথেচ্ছাচার শুরু করেন। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস-কালে সৈরিন্ধ্রী বেশী দ্রৌপদীর প্রতি আসক্ত হ'লে ইনি ভীমের হাতে নিহত হন।

কীর্তিনাশা—পদ্মা নদী। পদ্মার প্রবল ভাঙনে পাশের অট্টালিকাপ্রভৃতি সব কীর্তি ধ্বংস হয় ব'লে পদ্মাকে কীর্তিনাশা বলে।

কুইসলিং—নরওয়ের সোস্যালডেমোক্রাট নেতা মেজর ভিদকুন কুইসলিং। ১৯৪০ সালে হিটলার অতর্কিতে নরওয়ে আক্রমণ ও অধিকার করলে নবপ্রতিষ্ঠিত পুতুল সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন কুইসলিং। পরে তাঁকে ঐ পদ থেকে বিতাড়ন করা হয়। যুদ্ধাবসানে বিশ্বাসঘাতকতার ও দেশদ্রোহের অপরাধে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। এখন কুইসলিং শব্দটি ঘৃণ্য দেশদ্রোহীর প্রতিশব্দ।

কুয়ালালামপুর—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে থাইল্যাণ্ডের অধীন মালয় দেশের রাজ্যগুলি ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা পায়। ১৯৫৭ সালে এমন কয়েকটি রাজ্য নিয়ে প্রথমে মালয় যুক্তরাষ্ট্র, পরে ১৯৬৩ সালে আরো কিছু রাষ্ট্রের যোগে মালয়েশিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। সিঙ্গাপুর ১৯৬৫ সালে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেয়। মালয় যুক্তরাষ্ট্র এবং মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর।

কুরুক্ষেত্র—মহাভারতে উল্লিখিত কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত হয়। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পরশুরাম ২১ বার পৃথিবী নিক্ষত্রিয় ক'রে পিতৃতর্পণ করেন।

কুরুবর্ষ—প্রাচীন ভারতের সূর্যবংশীয় সম্রাট কুরু ও তাঁর সন্ততিদের শাসিত রাষ্ট্রকে কুরুবর্ষ বলা চলে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—বেদব্যাস। মহর্ষি পরাশরের ঔরসে অবিবাহিতা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর গর্ভে দ্বাপরে এই মহামনীষীর জন্ম হয়। দ্বীপের মধ্যে জন্ম হয় ব'লে দ্বৈপায়ন, কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন ব'লে কৃষ্ণ এবং বেদ সংগ্রহ ও বিভাগ করেন ব'লে বেদব্যাস নাম হয়। ইনি মহাভারত রচনা করেন ও পাতঞ্জল দর্শনের টীকা করেন। বিচিত্রবীর্যের

বিধবা পত্নী অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং এক দাসীপত্নীর গর্ভে বিদুর নামে এঁর ক্ষেত্রজ পুত্র হয়।

কৃষ্ণা—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞাগ্নি সম্ভূত কন্যা যাজ্ঞসেনী। লক্ষ্যভেদ ক'রে বীর্যশুল্কা কৃষ্ণাকে অর্জুন লাভ করলেও মা কুন্তীর আদেশে পাঁচ ভাই মিলে বিবাহ করেন। কৃষ্ণসখী দ্রৌপদীকে পাশার বাজি হিসাবে ধ'রে যুধিষ্ঠির পরাজিত হন এবং দুঃশাসন প্রকাশ্য সভায় তাঁকে বিবস্ত্র করার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু অফুরন্ত এই শাড়ি খুলতে খুলতে ক্লান্ত ও অসমর্থ হন। কৃষ্ণার এই অপমানের প্রতিশোধে কুরুক্ষেত্রে ভীম দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতাকে হত্যা ও দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পান করেছিলেন।

কোশল—আর্যাবর্তের প্রাচীন রাজ্য ছিল কোশল।

কোশী—উত্তর বিহারে অবস্থিত প্রবল পার্বত্য নদী। নেপাল সন্নিহিত হিমালয় অঞ্চলে সপ্তকুশী নামে পরিচিত। বরাহক্ষেত্রের উত্তরে সাতটি নদীর মিলিত ধারা কুশী নামে সমতলভূমিতে প্রবেশ করেছে। কুশী নদী বহুবার খাত পরিবর্তন করেছে। প্রতি বছর বন্যায় এ-নদী কৃষির যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি করতো। বর্তমানে কোশী পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। রামায়ণ ও পুরাণে নদীটির উল্লেখ আছে।

কৌটিল্য—চাণক্য। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিখ্যাত কূটনীতি-বিশারদ মন্ত্রী। চাণক্য রচিত 'অর্থশাস্ত্রে' প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি সমাজ নীতি এবং শিল্পকলা বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। কথিত আছে এঁরই পরামর্শে ৩২২ খ্রী. পূ. চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস ক'রে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ক্যালডিয়া—এশিরিয়দের হাতে ব্যাবিলন ধ্বংস হ'লে ক্যালদি নামক এক উপজাতি সেখানে বসতি স্থাপন করে। ক্যালদিয়দের প্রতিভাবান নেতা নেবুচাডনেজার বেবিলনের পূর্বগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইরান এবং ইহুদী রাজ্য জুডা দখল করেন এবং জেরুজালেম অধিকার ক'রে ইহুদীদের ক্যালদিয় দেবতা 'মারদুপের' পূজা করতে বাধ্য করেন। যে সব ইহুদী মূর্তিপূজায় অস্বীকৃত হন তাদের অগ্নিদগ্ধ ক'রে হত্যা করা হয়। দ্রঃ উর।

ক্রেমলীন—রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে অবস্থিত এক প্রাসাদ। এখান থেকেই রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় বলেই এর গুরুত্ব ও খ্যাতি।

খ্রীষ্ট—যীশু খ্রীষ্ট দ্রঃ।

গগ্যাঁ—প্রখ্যাত ফরাসী চিত্রশিল্পী Paul Gauguin। ১৮৪০ খ্রী. প্যারিসে জন্ম। স্টক দালাল হিসাবে জীবন শুরু করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কাজ ছেড়ে ইম্প্রেশানিষ্ট ঢঙে পিসারো ও সেজান-এর সমতুল্য ছবি আঁকতেন। পরে ঐ রীতি এবং প্রকৃতি

চিত্রণের রীতি ছেড়ে Synthelism চিত্র আঁকেন। বিশ শতকের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এর প্রভাব অপরিসীম। ১৯০৩ খ্রী. দারিদ্র্য, রোগ ও দুঃখে তাঁর মৃত্যু হয়।

গঙ্গাসাগর—গঙ্গার মোহনায় সাগর দ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তস্থ তীর্থ। এখানে সম্ভবত প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। ১৬৮৮ খ্রী. ভীষণ জলপ্লাবনে এই দ্বীপ জলহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হয়। কথিত আছে সাংখ্য দর্শন প্রণেতা কপিল মুনি এখানে তপস্যা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর শাপে ভস্মীভূত সগরসন্তানদের উদ্ধারকল্পে ভগীরথ গঙ্গাকে মর্তে আনেন ও গঙ্গার মাহাত্ম্যে এই স্থান তীর্থে পরিণত হয়। এখানে পৌষসংক্রান্তিতে মেলা হয়। আগে সন্তানহীনা নারীরা মানত ক'রে সন্তান লাভ করলে প্রথম পুত্র এখানে বিসর্জন দিত। এই দ্বীপে কপিল মুনির এক মন্দির আছে। দ্রঃ কপিল।

গন্ধর্ব—ঋগ্বেদে আছে, আদি গন্ধর্ব প্রথম মানব-মানবী যম ও যমীর পিতা ছিলেন। পরবর্তী সাহিত্যে গন্ধর্বরা দেবযোনি এবং স্বর্গের গায়ক। সঙ্গীতশাস্ত্রকে তাই বলে গন্ধর্ববেদ। গন্ধর্বরা সুপুরুষ ও কামুক। তাদের বিবাহরীতিকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। অথর্ব বেদের মতে গন্ধর্বদের অমঙ্গল করার শক্তি আছে।

গাঙুড়—মনসামঙ্গলে উল্লেখিত নদী। লখীন্দরের মৃতদেহ নিয়ে কলার ভেলায় বেহুলা এই নদীপথে ভেসে স্বর্গে পৌছান এবং দেবতাদের কৃপায় তাকে পুনর্জীবিত ক'রে ফিরে আসেন।

গৌড়—বাংলায় অবস্থিত প্রাচীন রাজ্য ও রাজধানী। গৌড় নগরী বর্তমান মালদহের মধ্যে। খ্রী. পূ. পঞ্চম শতক থেকে গ্রন্থাদিতে গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৭ম শতকে কর্ণসুবর্ণকে রাজধানী ক'রে স্বাধীন গৌড়রাজ্য রাজা শশাঙ্কের অধীনে গ'ড়ে ওঠে। পরে পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের এবং পাঠান সুলতানদের আমলেও গৌড়ের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ অব্যাহত ছিল। মোগল আমলে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় গৌড়ের গৌরব ম্লান হয়।

গ্যালিফ ষ্ট্রীট—উত্তর কলিকাতার একটি রাজপথ।

গ্যেটে—বিখ্যাত জার্মান কবি নাট্যকার ও কথাশিল্পী Johann Wolfgang von Goethe (১৭৪৯-১৮৩২) তাঁর বহুবিধ রচনার মধ্যে Sorrows of Young Werther উপন্যাস ও Faust নাট্যকাব্য অন্যতম। Faust বিশ্বের একটি মহত্তম সৃষ্টি। তাঁর 'ইফিগেনী আউফ টাউরিস' কাব্য এবং সুবিশাল উপন্যাস 'ভিলহেলম মাইষ্টের' উল্লেখযোগ্য। গ্যেটে একাধারে রাজনীতিজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক কবি ও চিন্তানায়ক হিসাবে বিশ্বজোড়াখ্যাতির অধিকারী হন।

গ্রীস—ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এজিয়ান ঝাগর ও ভূমধ্যসাগর সন্নিহিত উপদ্বীপ। স্বাধীন নগর রাষ্ট্রভিত্তিক গঠনতন্ত্র এখানেই প্রথম উদ্ভূত হয়। বিশিষ্ট সভ্যতা ও কৃষ্টিসম্পন্ন গ্রীসের ইতিহাস প্রতিটি নগর রাষ্ট্রের পৃথক পৃথক কাহিনীর সমষ্টি। এগুলির মধ্যে এথেন্স স্পার্টা মাসিডন প্রভৃতি নগর রাষ্ট্র প্রধান। খ্রী. পূ. ১০০০ সাল থেকে খ্রী. পূ. ৩০০ গ্রীস ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার জ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য ও শিল্পকলা সবই প্রাচীন গ্রীসের দান।

চণ্ডিকামঙ্গল—এ মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। কালকেতু এবং ধনপতি দুটি উপকাহিনীর মাধ্যমে চণ্ডীদেবীর মহিমা প্রতিষ্ঠা ও তাঁর পূজা প্রচার করা হয়েছিল।

চণ্ডীদাস—বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস সম্ভবত চৈতন্য পূর্ববর্তী। সহজ সরল ভাষায় রচিত তাঁর পদাবলী চিরকাল বাংলাদেশে আদৃত হয়েছে। কিছুদিন আগে ‘বড়ুচণ্ডীদাস’ রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রশ্ন দেখা দেয় দুই চণ্ডীদাসই এক এবং অভিন্ন কিনা।

চন্দ্রমালা—রূপকথার নায়িকা.

চন্দ্রশেখর—শিব। চাঁদ শিবের শিরোভূষণ ব'লে এই নামকরণ।

চাঁদ—মনসামঙ্গলকাব্যে বর্ণিত চন্দ্রধর সওদাগর। শিবভক্ত চাঁদ মনসার পূজা করতে অস্বীকৃত হওয়ায় মনসার কোপে অশেষ দুর্ভাগ্যের শিকার হন কিন্তু তাঁর মনোবল নষ্ট হয় না। অবশেষে পুত্রবধূ বেহুলার মাধ্যমে মনসা তাঁর সঙ্গে সন্ধি ক'রে বাম হাতের পূজা লাভ করেন এবং চাঁদের পুত্রদের পুনর্জীবিত ও ধনসম্পদ পুনরুদ্ধার ক'রে দেন।

চার্বাক—নাস্তিক মুনিবিশেষ। কথিত আছে তিনি বৃহস্পতির প্রিয় শিষ্য এবং তাঁর কাছেই এই জড়বাদী দর্শন লাভ করেন। তাঁর কথা খুব চারু বা মিষ্ট ছিল ব'লে নাম চার্বাক। এঁর মতে—‘দেহ সচেতন; আত্মা নেই; পরলোক নেই; সুখই পরম পুরুষার্থ; প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; পৃথিবী, জল, বায়ু ও আগুন থেকে সব পদার্থের উদ্ভব হয়েছে’ ইত্যাদি।

চিৎপুর—কলকাতার উত্তর ও মধ্য সংযোগকারী এক প্রধান রাজপথ (বর্তমানে রবীন্দ্র সরণী) ও উত্তরস্থিত একটি থানা। কলকাতার এই অঞ্চলটি সুপ্রাচীন ও ঘনবসতি পূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র।

চীন—এশিয়ার বৃহত্তম লোকবসতিপূর্ণ রাজ্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম অধিষ্ঠানভূমি চীন, মূল চীন ভূখণ্ড ও মাঞ্চুরিয়া, শিকাং, চিংহাই, শিনকিয়াং

ও অন্তর্মঙ্গোলিয়া নিয়ে গঠিত। এখানে কনফুশিয়ান, বৌদ্ধ ও তাও ধর্মাবলম্বীদের বাস। এখন চীন কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত।

চেৎলা—দক্ষিণ কলিকাতায় কালিঘাটের পার্শ্ববর্তী এক অঞ্চল।

জাভা—ইন্দোনেশিয়া। অনেক পর্বত ও আগ্নেয়গিরি সমাকীর্ণ এই দ্বীপে রবার, কফি চা, চিনি, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ও নানা রকম বনজ ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য আছে। ঘনবসতি এই রাজ্যের রাজধানী জাকার্তা। জাভা, সুমাত্রা ও বোর্ণিওর উপকূল সংলগ্ন প্রশান্ত মহাসাগরের অংশবিশেষকে জাভা সমুদ্র বলা হয়।

জরাথুষ্ট—প্রাচীন পারসীক ধর্মপ্রবর্তক জরাথুষ্ট খ্রী. পূ. ১০০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কথিত আছে পনের বছর পর্বতে তপস্যার পর পরমেশ্বর 'অহুর-মজদা' তাঁকে দেখা দেন। এর পর তিনি নিজের লেখা গাথায় একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। এজন্যে আজীবন অশেষ নির্যাতন ভোগ করে ৭৭ বছর বয়সে এক ধর্মাজ ব্যক্তির হাতে ইনি নিহত হন। এর বড় ছেলে 'মগ' বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। 'মগ' শব্দেরই গ্রীক বহুবচন রূপ Magi (প্রাচ্যের জ্ঞানীবর্গ) বাইবেলে উল্লেখিত হয়েছে।

জলাঙ্গী—বাংলাদেশে অবস্থিত এই নদীটি পদ্মার একটি উপনদী এবং পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত হ'য়ে এসে হুগলী নদীর সঙ্গে মিশেছে।

জাঞ্জিবার—পূর্ব আফ্রিকাস্থিত সুবৃহৎ দ্বীপ। জাঞ্জিবারের রাজধানী জাঞ্জিবার।

জুহু—বোম্বাই শহরের সন্নিহিত সমুদ্র উপকূল। জুহু ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাগরবেলা এবং পর্যটনস্থান।

জেঙ্গিস (চিঙ্গিজ খান ১১৫৫-১২২৭ খ্রী.)—মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এর আদি নাম তেমুজিন। বন্য তাতার-দের দমন করে ১১৮৮ খ্রী. খান পদে বৃত হন। ক্রমে তাঁর সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কাস্পিয়ান এবং কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত এবং সাইবেরিয়া থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। নেপলিয়ঁর মতো রণনিপুণ এবং তাঁর চেয়েও দক্ষ সাম্রাজ্য সংগঠক জেঙ্গিস দুর্দান্ত ও নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁর পৌত্র কুবলাই খাঁ।

জেনিভা—সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত শহর। ১৮৬৪ খ্রী. ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এখানে এক চুক্তিতে উপনীত হয়ে যুদ্ধে আহত ও রুগ্নদের প্রতি মানবিক আচরণ ও তাদের সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা করেন। এর ফলে পরে ১৮৭০ সালে রেডক্রশ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে জেনিভায় মিত্রশক্তি ও জার্মানীর মধ্যে যে চুক্তি হয় তার ফলে জার্মানী লোকার্ণোচুক্তিকে

শর্তাদি মেনে নেয়। (লোকার্ণো দেখুন) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এই সময়েই একমাত্র শান্তির উজ্জ্বল পরিবেশ স্পন্দিত হয়েছিল।

জোড়াসাঁকো—উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়।

জ্যাসন—গ্রীক পুরাতত্ত্বমতে Acson-এর পুত্র জ্যাসন রাজার আদেশে পঞ্চাশ দাঁড়ের জাহাজ 'আর্গো' তৈরী ক'রে সমুদ্রাভিযানে যান। Colchis থেকে Phrixus-এর বিদেহী আত্মাকে মুক্তি দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। নানা বিঘ্ন উত্তীর্ণ Jason-এর যোগ্য নেতৃত্বে এই দুঃসাহসী ও ঘটনাবহুল অভিযান সার্থক হয়েছিল।

টায়ার সিন্ধু—ফিনিসিয়ার সর্বদক্ষিণ উপকূলে নগররাষ্ট্র ছিল টায়ার। বাণিজ্য দক্ষ ফিনিশিয়রা এই টায়ার বন্দরে ভিড়তেন। খ্রী. পূ. পঞ্চম শতকে পারস্য সম্রাট Xerxes গ্রীস আক্রমণ করলে নৌশক্তিতে দক্ষ ফিনিশিয়রা তাঁকে সাহায্য করেছিল। খ্রী. পূ. ৩৩২ অব্দে আলেকজাণ্ডার টায়ার বিজয় করলে ফিনিশিয় সভ্যতা ধ্বংস হয়। টায়ারে নগরীর উপকূলবর্তী সাগর 'টায়ার সিন্ধু'।

টারানটেলা—বিষাক্ত মাকড়শার কামড়ের বিষ দূর করার জন্য ইতালিতে এক ধরণের নাচের রীতি ছিল। এই নাচকে টারানটেলা বলা হ'তো।

টালা—কলকাতার পূর্ব উপকণ্ঠস্থিত এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত জলের সুবৃহৎ ট্যাঙ্ক আছে। এখান থেকে কলকাতায় জল সরবরাহ করা হয়।

টেনিসি—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেণ্টকি প্রদেশস্থিত নদী বিশেষ। ওহিও নদীর প্রধান শাখানদী। এর উপত্যকা আগে প্রবল বন্যায় বিপর্যস্ত হ'তো। এখন বহুমুখী নদী পরিকল্পনার সাহায্যে বহু বাঁধ তৈরী ক'রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি মাধ্যমে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছে। এই পরিকল্পনার আদলে ভারতে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা নেয়া হয়।

টেরিটি বাজার—মধ্য কলকাতাস্থিত একটি বাজার।

টোকিও—জাপানের রাজধানী। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

ট্রয়—প্রাচীন এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুরস্ক) উত্তর পশ্চিম কোণে পৌরাণিক যুগের ইলিয়াম রাজ্যের রাজধানী ছিল ট্রয়। ইউরোপ ও এশিয়ার যোগাযোগের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল বলে এরা বিদেশী জাহাজীদের উপর জুলুম করতো। এই কারণেই গ্রীকদের সঙ্গে তাদের শত্রুতা হয়। গ্রীকদের সমবেত আক্রমণে এই ট্রয়ের ধ্বংসের কাহিনী হোমরের ইলিয়াড কাব্যের বিষয়বস্তু। পুরাতত্ত্ববিদ শ্লীম্যান ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বার করেন। এখানে নানা স্তরে বিন্যস্ত বিভিন্ন যুগের সভ্যতার নিদর্শন ও ঘরবাড়ি পাওয়া যায়।

তক্ষশীলা—মহাভারতে উল্লেখিত এই নগরী বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত। প্রাচীন

হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। তক্ষশীলা চিরকাল শিক্ষাও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত।

সূর্যপত্নী ছায়া।

তাজমহল—সাজাহাঁ দেখুন।

তিলোত্তমা—পরমাসুন্দরী দেবীবিশেষ। বিশ্বের রমনীয় পদার্থগুলির তিল তিল অংশ নিয়ে একে সৃষ্টি করা হয় ব'লে এর নাম তিলোত্তমা। একে পাবার জন্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন দুর্ধর্ষ অসুর ভ্রাতৃযুগল সুন্দ ও উপসুন্দের মধ্যে লড়াই বাধে, ফলে উভয়ের ধ্বংস ও মৃত্যু হয়।

তালতলা—উত্তর-পূর্ব কলকাতায় অবস্থিত এক অঞ্চল।

তৈমুর—(১৩৩৬-১৪০৫) চাঘতাই তুর্কী নেতা তৈমুর ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সমরকন্দের সিংহাসন লাভ করেন। খোঁড়া ছিলেন বলে 'তৈমুরলঙ্গ' বলা হয়। পারস্য, আফগানিস্তান ও মেসোপোটেমিয়া জয় করে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে ভারতে আসেন। তলম্ব দীপালপুর ও ভাতনীর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন। দিল্লীতে তিনি এক লক্ষ বন্দী হিন্দুকে হত্যা করেন। নাসিরুদ্দিন মামুদকে পরাজিত করে মীরাট কাংরা ও জম্মু জয় ক'রে ১৩৯৯ খ্রী. ভারত ত্যাগ করেন।

ত্রিশঙ্কু—কিম্বদন্তী আছে রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের সহায়তায় স্বর্গলাভের চেষ্টা করেন। বিশ্বামিত্র তপপ্রভাবে তাঁকে স্বর্গে পাঠান কিন্তু ইন্দ্র তাকে স্বর্গে প্রবেশ করতে দেন না। মধ্যপথস্থিত ত্রিশঙ্কুর দুর্দশামোচনে কৃতসংকল্প বিশ্বামিত্র নূতন নক্ষত্র-মণ্ডল ও নূতন স্বর্গসৃষ্টি করতে শুরু করেন। তখন ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে স্থান দেন।

দক্ষ প্রজাপতি—ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ তাঁর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্ম নেন। এর ভার্যা প্রসূতি। দক্ষের বহুকন্যা হয় তার মধ্যে কশ্যপ ১২টি, ধর্মরাজ ১০টি, চন্দ্র ২৭টি, অরিষ্টনেমি ৪টি, অঙ্গিরা ২টি এবং শিব সর্বকনিষ্ঠা সতীকে বিবাহ করেন। ভৃগুঋষির যজ্ঞে শিব দক্ষকে অভিবাদন না করায় ক্রুদ্ধ দক্ষ স্বয়ং এক শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণে এই যজ্ঞে উপস্থিত হ'য়ে দক্ষের শিবনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেন। সানুচর শিব তখন যজ্ঞ নষ্ট ক'রে দক্ষের শিরোচ্ছেদ করেন। পরে প্রসূতির স্তবে শিব দক্ষের ছিন্ন মুণ্ডের স্থানে ছাগমুণ্ড বসিয়ে পুনর্জ্জীবিত ক'রে দেন।

দধীচি—অথর্বা ঋষির পুত্র দধীচিমুনি বৃত্রের নিধনের জন্য ইন্দ্রের অনুরোধে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন অস্থি দান করেন। সেই অস্থিতে বজ্র নির্মাণ ক'রে ইন্দ্র অসুরদের দমন করেন।

দামোদর—পালামৌ জেলার খাসারগড় থেকে উদ্ভূত এই নদ বরাকর কোণায় বোকারো ও যমুনীয়া উপনদীর জলে পুষ্ট হয়ে সর্পিল গতিতে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে হুগলি নদীতে মিশেছে। দামোদরের নিম্ন অববাহিকায় বন্যার নিয়মিত প্রকোপে বিধ্বস্ত হ'তো। এজন্যে চীনের হোয়াংহো বা ইয়াংসির বন্যার সঙ্গে তুলনা করা হ'তো। বর্তমানে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণ ক'রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাধার থেকে কৃষির জন্য জলসেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ক'রে এই অঞ্চলের বহুমুখী উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে।

দিকহস্তী—পৌরাণিক মতে আকাশের আটদিকে দাঁড়িয়ে আটটি দিক হস্তী (মতান্তরে চারটি) শুড় দিয়ে পৃথিবীকে ধারণ ক'রে আছে। পূব দিকে থেকে এরা হ'লো ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদণ্ড, সার্বভৌম, সুপ্রতীক।

দিল্লী—সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের রাজধানী। খ্রী. ১১শ শতাব্দীতে তোমর বংশীয় রাজা অনঙ্গপাল কুতব মিনারের কাছে লালকোট দুর্গ তৈরী ক'রে দিল্লীর পত্তন করেন। ১২শ শতাব্দীতে এখানে পৃথ্বীরাজ চৌহান 'রায় পিথোরা' প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরে দিল্লীতে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। বারবার নগরীর প্রসার, সমৃদ্ধি ও ধ্বংসের এবং রাজধানী স্থাপন ও স্থানান্তরের পর ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর হয় এবং প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের পূর্বে এবং শাহজাহানাবাদের দক্ষিণে রায়মিনায় নূতন নগর নয়াদিল্লী গ'ড়ে ওঠে।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান—আদিনাম চন্দ্রগর্ভ নামান্তর অতীশ। ৯৮০ খ্রী. বাংলাদেশে বিক্রমপুরে কল্যাণশ্রীর ঊরসে প্রভাবতীর গর্ভে এর জন্ম হয়। শৈশবে জেতারি নামক অবধূতের কাছে, পরে কৃষ্ণ গিরি বিহারের রাহুল গুপ্তের কাছে শিক্ষালাভ করেন। উনিশ বছর বয়সে ওদন্তপুরী বিহারের মহাসাঙ্ঘিকাচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নিয়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আখ্যা পান। ব্রহ্মদেশে সুবর্ণদীপ গিয়ে চন্দ্রকীর্তির কাছে অধ্যয়ন ক'রে ১২ বছর পরে মগধে ফেরেন এবং রাজা নয়ন পালদেবের অনুরোধে বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ হন। তারপর ধর্মপ্রচারের জন্য তিব্বতে যান ও লাসার কাছে নেথান নগরে নির্বাণ লাভ করেন। মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর বহু গ্রন্থের লেখক।

দেবদত্ত—১। বুদ্ধদেবের খুড়তুত ছোট ভাই দেবদত্ত ও আনন্দ সহোদর ছিলেন। বুদ্ধের অনুসরণে এরা দুজনেই প্রব্রজ্যা নেন। রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য দেবদত্তের সঙ্গে বুদ্ধের মতবিরোধ হয়। দেবদত্তের ইচ্ছা ছিল বুদ্ধের পর তিনি সঙ্ঘের নেতা হবেন। কিন্তু বুদ্ধ তার বিরোধিতা করেন। কৃচ্ছ্রসাধনের পোষকতা ক'রে

দেবদত্ত সঙ্ঘ ভেদ করেন। কথিত আছে ইনি একাধিকবার বুদ্ধকে হত্যার চেষ্টাও করেছিলেন।

২। অর্জুনের শঙ্খ।

দেশবন্ধু—চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন। দানের জন্য এর অসামান্য খ্যাতি ছিল। মহাবিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে মামলা পরিচালনা করে তাঁকে মুক্ত করেন এবং ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২২ সালে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সভাপতি হন। পরে কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্য দল গঠন করেন। 'সাগর সঙ্গীত' প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থের ও অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা।

* দ্বারকা—গুজরাটের উত্তর পশ্চিমপ্রান্তে আরব সাগর তীরস্থিত বন্দর। প্রাচীন নাম দ্বারাবতী ও কুশস্থলী। খ্রী. পূ. ২য় শতক থেকে বৈষ্ণব ও শৈবতীর্থ হিসাবে খ্যাত। দ্বারকার জ্যোতির্লিঙ্গ হলেন নাগেশ শিব। কুশস্থলী আনর্ত দেশের রাজধানী ছিল। পুণ্যজন রাক্ষস এটি অধিকার করায় শর্যাতির বংশধররা এ নগর ত্যাগ করেন। পরে জরাসন্ধের আক্রমণে বিব্রত কৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করে কুশস্থলীর জনহীন ভূখণ্ডে দ্বারকা পত্তন করেন। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়। কারো মতে জুনাগড় বা গিরিনগরই দ্বারকা; মতান্তরে বেট দ্বারকাই প্রাচীন দ্বারকা। কথিত আছে বেট দ্বীপে বিষ্ণু শঙ্খসুন দৈত্যকে নিহত ক'রে তার পত্নী তুলসীকে চারাগাছে রূপান্তরিত করেন।

ধনপতি—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম নায়ক। উজানি নগরবাসী এই সওদাগরের লহনা ও খুল্লনা দুই স্ত্রী। বাণিজ্যের জন্য সিংহলে যাবার পথে তিনি কালিদহে কমলে কামিনী মূর্তি দেখেন ও সিংহল রাজকে জানান। কিন্তু রাজাকে দেখাতে না পেরে কারারুদ্ধ হন। ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত চণ্ডীর কৃপায় রাজাকে এই মূর্তি দেখিয়ে পিতাকে কারামুক্ত করেন।

ধন্বন্তরী—দেববৈদ্য, সর্ববেদ বিশারদ ও মন্ত্র তন্ত্র পারদর্শী ধন্বন্তরী সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূত হন। তিনি দেবতা, অস্ত্রক্ষত নিরাময় ও প্রাণদানে সক্ষম। মতান্তরে তিনি দীর্ঘতমা বা দীর্ঘতপা ঋষির পুত্র। অনেকে এঁকে দিবোদাসের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন আবার কারো কারো মতে দিবোদাস ধন্বন্তরী বংশ সম্ভূত। ধন্বন্তরী সুশ্রুতকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। সুতরাং সুশ্রুতের কাল বিচারে তিনি খ্রী. পূ. ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক।

ধর্মাশোক—অশোক দ্র.।

ধলেশ্বরী—বাংলাদেশস্থিত নদীবিশেষ।

ধানসিড়ি—ধনশ্রী>ধনসিরি। আসামে এই নামে ২টি নদী আছে। ১। নাগাপর্বতের দক্ষিণ পশ্চিম থেকে ডিমাপুরের কাছে শিবসাগর জেলা দিয়ে উত্তর ও উত্তর পূর্বে গোলাঘাট পর্যন্ত গিয়ে পশ্চিমে সরে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে।

২। নেফার তাওয়াং থেকে বেরিয়ে দরং জেলার উদলগুড়ির দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে। সমভূমিতে পড়ার সময় ভৈরবকুণ্ড নামে সুগভীর ও পবিত্র কুণ্ড সৃষ্টি করেছে।

ধূমাবতী—কথিত আছে ক্ষুধিত পার্বতী শিবের কাছে খাদ্য চেয়ে না পেয়ে তাঁকেই গ্রাস করেন। তাতে দেবীর শরীর থেকে ধূম নির্গত হ'য়ে তাঁকে বিবর্ণ ক'রে দেয়। তখন শিব বললেন 'আমাকে যখন গ্রাস করেছো তখন বিধবা বেশ ধারণ করে তুমি জগতের পূজা নাও। এই মূর্তি ধূমাবতী নামে খ্যাত হোক।' দ্র. 'কমলা'।

নচিকেতা—কঠোপনিষদে আছে বাজশ্রবা ঋষির পুত্র নচিকেতা পিতার কথা রক্ষা করতে যমালয়ে যান এবং ধর্মরাজ যমের কাছে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনা করেন।

নরক—মৃত্যুর পর যেখানে পাপভোগ করতে হয়। ভূমণ্ডলের দক্ষিণ দিকে ভূমির নীচে ও জলের উপরে যম মৃতদের এনে কর্মানুসারে বিচার করে শাস্তিবিধান করেন। অমিত্র, রৌরব, কুম্ভীপাক প্রভৃতি একুশটি নরকে পাপের তারতম্যানুসারে ঐ সব শাস্তি দেওয়া হয়।

নরীম্যান—বোম্বাই শহরের মেয়র ছিলেন। প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ।

নাগার্জুন—প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিক। ইনি খ্রী. ২য় শতকের লোক; অশ্বঘোষ, আর্যদেব কুমারলাত ও কনিষ্কের সমসাময়িক। ইনি বিদর্ভের অধিবাসী ও অন্ধ্ররাজ সাতবাহনের বন্ধু ছিলেন। ইনি মহাযানের প্রধান শাখা মাধ্যামিক যানের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি 'মাধ্যামিক কারিকা' গ্রন্থ, 'অকুতোভয়া' টীকা, প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র দশভূমিবিভাষ শাস্ত্র, মহাযানবিংশক, সুহৃল্লেখ, যুক্তি ষষ্টিকা, শূন্যতাসপ্ততি, প্রভৃতি গ্রন্থ। ইনি জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মনে হয় নাগার্জুন নামে একাধিক লোক ছিলেন।

নাটোর—বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নগর বিশেষ। রাণীভবানীর রাজত্বের রাজধানী ছিল।

নিউইয়র্ক—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ম্যানহাটন দ্বীপের ডাচদের প্রতিষ্ঠিত এই শহর বিশাল অট্টালিকা সুন্দর উদ্যান ও সেতু শোভিত।

নিনেভে—মেসোপোটেমিয়ার (ইরাক) সুপ্রাচীন রাজধানী। টাইগ্রীস নদীর পূর্বতীরের এই নগরটি আধুনিক মোসুল-এর বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

প্রাচীন সুমের সভ্যতার কেন্দ্র। আসুরীয় আমলে এখানে রাজধানী স্থাপিত হয় এবং আসুরবনিপালের আমলে (খ্রী. পূ. ৭০০) এই রাজধানী নূতন রূপ নেয়।

নিমতলা—কলকাতার উত্তর পশ্চিম অংশে অবস্থিত অঞ্চল। এখানে বিখ্যাত নিমতলা মহাশ্মশান অবস্থিত আছে।

নীলকণ্ঠ—শিব। সমুদ্র মন্থনের ফলের যে কালকুট বিষ ওঠে শিব তা পান করেন। কিন্তু তা উদরস্থ না ক'রে কণ্ঠ ধারণ করেন। তার ফলে কণ্ঠ নীল বর্ণ হ'য়ে যায়। এইজন্য শিবের অপর নাম নীলকণ্ঠ ও মৃত্যুঞ্জয়।

নেহেরু—ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নেহেরু পরিবার অতিবিখ্যাত। মতিলাল নেহেরু তৎকালীন রাজনীতিক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। তাঁর পুত্র জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯) রাষ্ট্রনীতিক ও লেখক। ইনি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ও নবভারতের রূপকার শান্তিবাদী এই মহান নেতা ৭ বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। Glimpses of World History. The Discovery of India. An Autobiography প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

পদ্মা—বাংলাদেশে প্রবাহিত গঙ্গার মূল প্রবাহ। 'কীর্তিনাশা' দেখুন।

পক্ষিরাজঘোড়া—রূপকথায় উল্লেখিত কিম্বদন্তীর ডানাওয়ালা দ্রুতগামী উড়ন্ত ঘোড়া।

পতঞ্জলি—'পাতঞ্জল' নামক যোগ দর্শনের স্রষ্টা। 'যোগসূত্র' ও 'পাণিনি ভাষ্য' গ্রন্থের রচয়িতা পতঞ্জলি সুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক। তাঁর জীবনকালে গ্রীকরা সাকেত ও মধ্যমিকা নগরী অবরোধ করেছিল। এই গ্রীক আক্রমণকাল থেকে অনুমান করা যায় খ্রী. পূ. ১৫০ অব্দে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

পাটলীপুত্র—মৌর্যসাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলীপুত্র (বর্তমান পাটনা) বিহারে অবস্থিত।

পাথুরেঘাটা—উত্তর কলিকাতার একটি অঞ্চল।

পাভলভ—প্রখ্যাত রুশ শরীর বিজ্ঞানী পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) পাচনতন্ত্রের গ্রন্থি বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি হৃৎপিণ্ড ও রক্তসঞ্চালনের নার্ভ ঘটিত নিয়ন্ত্রণ, পরিপাক এবং অভ্যাসলব্ধ প্রতিবর্ত্য ক্রিয়া (কনডিশনড রিফ্লেক্স) সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এইসব যুগান্তকারী গবেষণা লব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে মস্তিস্ক নির্ভর মনোবিদ্যা গ'ড়ে ওঠে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন সমৃদ্ধ হয় ও মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা সহজ হয়। তাঁর মতে মানবচৈতন্য সমেত যাবতীয় মননক্রিয়া মস্তিষ্কের উপর বহির্জগতের প্রতিফলন। যান্ত্রিক জড়বাদের সঙ্গে পাভলভ বিজ্ঞানের সম্পর্ক নেই।

পারিয়া—তামিলনাড়ুতে অচ্ছুৎ বর্ণবিশেষ। ব্রাহ্মণরা এদের ঘৃণা করেন এবং ছায়া মাড়ানোও পাপ মনে করতেন। বর্তমানে এ মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে।

পারস্য—বর্তমান ইরাণ। আর্যদের সুপ্রাচীন আবাসভূমি পারস্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভারতের বৈদিক যুগের সমকালীন।

পিকাশো—Pablo Ruigy, Picasso বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মালাগাতে জন্ম। Munch, Toulouse-Lautrec, Renoir, Ganguin, Van Gogh প্রভৃতির শিল্পধারা অল্পদিনেই আয়ত্ত করেন। প্রথম পর্বে নীল বর্ণের সুপ্রচুর সমাবেশ। প্যারিসের দুর্গতদের ছবি এতে এঁকেছেন। গথিক স্থাপত্যের প্রভাব বাড়ে। তারপর আসে গোলাপীযুগ। সুখেরচিত্র। ১৯০৭ সালে সেঁজার ভঙ্গিতে বিমূর্ত শিল্পের ধরণে কিউবিজমের পত্তন করেন। আরো পরের চিত্রে নিগ্রোভাস্কর্যের প্রভাব পড়ে।

পিরামিড—মিশরের প্রাচীন যুগের বিশাল ত্রিকোণাকার রাজসমাধি। প্রাচীনযুগের স্থাপত্য প্রতিভার বিস্ময়কর নিদর্শন ও বিশ্বের আশ্চর্যসপ্তকের অন্যতম। এইসব পিরামিডের অভ্যন্তরে গুপ্তকক্ষে ফারাওদের মৃতদেহ মমীর আকারে কফিনের মধ্যে রক্ষিত হ'তো।

পোল্যাণ্ড—ইউরোপের অন্তর্গত এই দেশ ১৯১৮ সালে প্রথম স্বাধীনতা লাভ করে। কৃষি ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশের রাজধানী ওয়ারশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী দ্বারা অধিকৃত ও বিধ্বস্ত হয়।

প্যারিস—শেন নদীর তীরে অবস্থিত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ফ্রান্সের ৫ম বৃহত্তম নগরী। সাহিত্য ও শিল্প চর্চার পীঠস্থান। ১৮৭০-৭১ সালে জার্মানীর দ্বারা অবরুদ্ধ এবং ১৯৪০-৪৫ জার্মানীর দ্বারা অধিকৃত ছিল। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে ১৯১৯ সালে এখানে প্যারিস সীট কনফারেন্স সুরু হয় এবং ১৯২০ সালে প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী বার্লিন শান্তিচুক্তি সমর্থিত হয়।

প্যালেষ্টাইন—বাইবেলে উল্লেখিত প্রাচীন রাষ্ট্র সিরিয়া ও লেবাননের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই শহরের উত্তরে জর্ডন পূর্বে মিশরের সিনাই অঞ্চল, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। ১৯৪৮ সালে এখানে এক নূতন ইহুদীরাষ্ট্র ইজরায়েল-এর প্রতিষ্ঠা হয়। পরপর কয়েকটি যুদ্ধে এই নবগঠিত রাষ্ট্র পার্শ্বস্থ আরব রাষ্ট্রগুলির নানা অঞ্চল অধিকার ক'রে বিশাল হ'য়ে ওঠে। এর প্রধান শহর জেরুজালেম, খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান।

প্রচেতা—১। বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ২। প্রজাপতি দক্ষের পিতা। ৩। ব্রহ্মার পুত্র।

প্রভেন্স—পূর্ব দক্ষিণ ফ্রান্সে অবস্থিত এক অঞ্চল। এখানে মধ্যযুগে ত্রুবাদুররা শৌর্য প্রদর্শন ক'রে গিয়েছে।

প্লেটো—(খ্রী. পূ. ৪২৭-খ্রী. পূ. ৩১৭) গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সক্রেটিসের শিষ্য ও অ্যারিষ্টটলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর অজস্র বইয়ের মধ্যে Dialogues এবং Repablic অন্যতম।

ফিনিশিয়—ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে সিরিয়ার উপকূলে ও লেবানন পর্বতের পশ্চিমে প্রাচীনকালে ফিনিশিয়া অবস্থিত ছিল। খ্রী. পূ. ৪০০০ বছর আগে তাঁরা সিরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে। খ্রী. পূ. ১৮০০ থেকে প্রসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে। তখন থেকে খ্রী. পূ. ৩৩২ অব্দে আলেকজাণ্ডারের টায়ার বিজয় পর্যন্ত ফিনিশিয় সভ্যতার যুগ। খ্রী. পূ. ১৫০০ অব্দে মিশর সম্রাট থাড়মোজের এবং তারপরে ব্যাবিলন সম্রাট নেবুচাডনেজার ফিনিশিয়া জয় করেন। তারপর ফিনিশিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন হয়। বিবলস সিডন ও টায়ার ফিনিশিয়ার তিন নগরী। ফিনিশিয়রা বাণিজ্যে পক্ষ, নৌযুদ্ধে পটু ও উপনিবেশস্থাপনে উদ্যোগী ছিল। ফিনিশিয় বর্ণমালা থেকে গ্রীক বর্ণমালা উদ্ভূত হয়। 'টায়ার সিন্ধু' দেখুন।

ফিয়ারলেন—কলিকাতার একটি গলিপথ।

ফ্যারাও—মিশরের সম্রাটের উপাধি।

ফ্রয়েড—Signund Frued (১৮৫৯-১৯৩৯) বিশ্বখ্যাত মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানী! ১৯২০ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে Neurology-র অধ্যাপক ছিলেন। প্রথমে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে নার্ভরোগে সম্পর্কে ফরাসী চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাঁ সার্তে শার্কের কাছে মনোরোগ ও সংবেশন (হিপনোটিজম্) সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ করেন। পরে মনোরোগের চিকিৎসক হিসাবে ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক বহুগ্রন্থের লেখক হিসাবে বিখ্যাত হন। তাঁর মতে শৈশব থেকে ক্রমবিকশিত অহংবোধ এবং আধিশাস্তা বা সুপার ইগোর প্রভাবে অবদমনের ফলে যৌনকামনা নির্জ্জনমনে জমা হয়। মনোবিকার এই অতৃপ্ত যৌনকামনার প্রকাশ। স্বপ্নে তারই স্ফুরণ বা চরিতার্থতা ঘটে।

ফ্রান্স—পশ্চিম ইউরোপের একটি রাষ্ট্র। রাজধানী প্যারিস। ফ্রান্স সুদীর্ঘকাল শিল্প ও সাহিত্যের পোষকতা ক'রে এসেছে। প্যারিসকে এক সময়ে বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজধানী মনে করা হ'তো। বহু খ্যাতিমান চিত্রকর ও ভাস্কর এদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং অসংখ্য চিত্রশালা এবং সংগ্রহশালায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্র নিদর্শন রক্ষিত আছে।

বটতলা—উত্তর কলকাতার এই অঞ্চল সস্তা লোকপাঠ্য পুস্তক ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত।

বরুণ—জলের অধিদেবতা বরুণ প্রাচীন বৈদিক দেবতাদের অন্যতম। তিনি পাশ অস্ত্রধারী। ইন্দ্রের কোপ থেকে তিনি হিমালয় পুত্র মৈনাককে আশ্রয় দেন। এবং ভৃগুমুনির অভিশাপে স্বর্গে শ্রীভ্রষ্ট হ'লে তিনি লক্ষ্মীকে জলতলে আপন কন্যার মতো পালন করেন।

বরাহ অবতার—বিষ্ণুর শূকরবৎ মুখাবয়ব বিশিষ্ট দশাবতারের তৃতীয় অবতার। এই মূর্তিতে তিনি 'বর' নামক অসুরকে বধ করেন। পৃথিবী জলতলে নিমগ্ন হ'লে বিষ্ণু বরাহরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে দাঁত দিয়ে পৃথিবীকে জল থেকে তুলে ধরেন। এর ঔরসে ধরনীর গর্ভে নরক নামক অবতারের জন্ম হয়। এই অবতারে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ দৈত্যর নিপাত সাধন করেন।

বল্লাল সেন—গৌড়ের সেন বংশীয় রাজা বিজয় সেন ও রানী বিলাসদেবীর পুত্র বল্লাল সেন খ্রী. ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই এদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। ইনিই সেন বংশীয় রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এর পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সময়ে গৌড় তুর্কীদের পদানত হয়।

বাগীশ্বরী—সরস্বতী, বাক্‌পটু।

বাদুড়বাগান—উত্তর কলকাতার একটি অঞ্চল।

বারুনী—১। বরুণের কন্যা; লক্ষ্মী। ২। বরুণের স্ত্রী, 'বরুণালী' শব্দের পরিবর্তে 'বারুনী' কথাটিকে মধুসূদনই প্রথম বরুণের স্ত্রী হিসাবে প্রয়োনা করেন।

বালি—জাভার পূর্বদিকের একটি দ্বীপ। ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন ভারতীয় উপনিবেশ এখানে ছিল। এখানের অধিবাসীদের মধ্যে উন্নত নৃত্যকলার চর্চা আছে।

বাসব—ইন্দ্র। ইন্দ্র দেখুন।

বিদর্ভ—প্রাচীন রাজ্যবিশেষ। কুন্তিনগর। অধুনা এই স্থানের নাম বেরার প্রদেশ। দময়ন্তী, অগস্ত্য পত্নী লোপামুদ্রা ও রুক্মিনী বিদর্ভের কন্যা ছিলেন।

বিদিশা—প্রাচীন নগরী। মালব রাজ্যের অন্তর্গত। গোয়ালিয়রের নিকটে আধুনিক 'ভিলসা'।

বিম্বিসার—প্রাচীন মগধের রাজা। খ্রী. পূ. ৫৩৭ খ্রী. পূ. ৪৮৫ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এর রাজধানী ছিল রাজগৃহ (রাজগীর)। বুদ্ধদেবের কাছে ইনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ইনি নিজপুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হন।

বিশালাক্ষী—বাংলাদেশের লৌকিক দেবীবিশেষ। চণ্ডীর বা সরস্বতীর রূপভেদ। বাশুলী। সম্ভবতঃ বাশুলীশব্দ থেকেই 'বিশালাক্ষী' শব্দ কল্পিত হয়েছে। বৌদ্ধ তন্ত্রেও বাশুলী নাম পাওয়া যায়। বিশালাক্ষী রূপবাচক বিশেষণ কোনো নির্দিষ্ট

দেবতার পরিচয় নয়; তিনি কালী থেকে সরস্বতী যে কেউ হ'তে পারেন। জীবনানন্দের বিশালাক্ষী নিঃসন্দেহে লক্ষ্মী। নারায়ণ পদে।

বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট—কলকাতার একটি রাজপথ।

বেথলেহম—ইজরায়েল-এর অন্তর্ভুক্ত জেরুজালেম-এর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর। এখানে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়।

বেবিলন—মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীনতম শহরগুলির অন্যতম ও সুমের সভ্যতার পীঠস্থান ও এককালীন রাজধানী বেবিলন আধুনিক বাগদাদ শহর থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণে ইউফ্রেতিশ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সুমেরীয় সভ্যতা প্রায় খ্রী. পূ. ৪০০০ অব্দের হ'লেও এখানে সম্ভবত খ্রী. পূ. ২৩০০ অব্দে রাজধানী স্থাপিত হয়। খ্রী. পূ. ১৯০০ অব্দে সম্রাট হাম্মুরাবি এবং আরো পরে সম্রাট নেবুকাডনেজারের ঝুলন্ত বাগান এবং হাম্মুরাবির গ্রন্থাগার এই সভ্যতার চিহ্ন বহন করছে।

বেলগাছিয়া—উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে আর. জি. কর হাসপাতাল অবস্থিত।

বেহালা—কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থিত এক অঞ্চল।

বেহুলা—মনসামঙ্গলের নায়িকা বেহুলা (<বিপুলা) সায়বেনের কন্যা ও চন্দ্রধর সওদাগরের পুত্র লখীন্দরের বধূ। বাসর ঘরে সর্পাঘাতে লখীন্দরের মৃত্যু হ'লে বেহুলা কলার মান্দাসে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভাসতে ভাসতে স্বর্গে উপনীত হন। নেত্রবতীর সাহায্যে ইন্দ্রের সভায় নাচগানে দেবতাদের মুগ্ধ ও মনসাকে তুষ্ট ক'রে স্বামীকে পুনর্জীবিত করেন। চাঁদ দ্রঃ।

বৈকুণ্ঠ—স্বর্গে বিষ্ণুর বাসস্থান।

বৈতরণী—মৃত্যুনদী। যমপুরীর প্রান্তে এই নদী প্রবাহিত। এই নদী পার না হ'য়ে কেউ যমালয়ে প্রবেশ করতে পারে না।

বৈশালী—মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের আগে বিখ্যাত ষোড়শ জনপদের অন্যতম। গঙ্গার উত্তর উপকূল থেকে নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত বৃজি রাজ্য ছিল। এই বৃজি আটটি উপজাতির একটি যুক্তরাষ্ট্র ছিল। এর অন্যতম ছিল বিদেহ, লিচ্ছবী, যাত্রিক, বৃজি ইত্যাদি। এই গণশাসিত বৃজি (লিচ্ছবী) রাজ্যের রাজধানী বৈশালী। বৌদ্ধ উপকথায় এই বৈশালীর প্রসঙ্গ বহুবার এসেছে। 'অম্বাপালী' দেখুন।

বৃন্দাবন—যমুনাতীরে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও রাধা মিলিত হতেন। বৃন্দাবন তাই পুণ্যতীর্থ ব'লে পরিগণিত।

বুদ্ধ—শাক্যসিংহ, গৌতম, সিদ্ধার্থ (খ্রী. পূ. ৫৫৬-৫৭৬) কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধন ও রাণী মহামায়ার পুত্র সিদ্ধার্থ বিমাতা গৌতমী কর্তৃক লালিত হন।

পরিণত বয়সে দণ্ডপানির কন্যা গোপার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর পুত্রের নাম রাহুল। জীবের দুঃখ মোচনকল্পে তিনি গৃহত্যাগ ক'রে কঠোর তপশ্চর্যায় বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধত্ব অর্জন করেন ও অহিংসা এবং সর্ব জীবে দয়াভিত্তিক নবধর্ম প্রচার করেন। ৮০ বছর বয়সে কুশীনগরে তাঁর মৃত্যু হয়।

বেরিংতরঙ্গ—উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের অংশ বিশেষ বেরিং সাগর উত্তর আমেরিকায় আলেউসিকাল দ্বীপসমূহের সন্নিহিত। বেরিং প্রবাহ বেরিং প্রণালী থেকে কামস্কাইকা ও জাপানে দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে প্রবাহিত অপেক্ষাকৃত শীতল জলের স্রোত। বেরিং সাগরে মুক্তা পাওয়া যায়।

ব্যাণ্ডেল—হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি উপনগরী। ডাচদের প্রতিষ্ঠিত এই শহরে একটি সুপ্রাচীন ক্যাথলিক চার্চ আছে।

ব্যাসকুট—মহাভারত রচনাকালে ব্যাসদেব লিপিকর গণেশের গতি বিলম্বিত করার জন্য কয়েকটি দুর্বোধ্য শ্লোক রচনা করেন। এই শ্লোকগুলির অর্থভেদ করতে গণেশেরও যথেষ্ট সময় লাগে।

ব্রহ্ম—নির্গুণ পরমাত্মা, পরব্রহ্ম। ইনি সর্বভূতে অবস্থিত অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ, অব্যয়। উপনিষদসমূহে এঁর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আধুনিক কালে পৌত্তলিকতা বিরোধী রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনা পুনঃ প্রবর্তন করেন।

ব্রহ্মা—মহাপ্রলয়ের পরে স্বর্ণ অণ্ড থেকে উদ্ভূত আদি দেবতার অন্যতম ব্রহ্মা। ব্রহ্মা চতুর্ভুজ চতুরানন ও রক্তবর্ণ। তিনি হিরণ্য গর্ভ প্রজাপতি। তাঁর মানস পুত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ট, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ। তাঁর স্ত্রী সরস্বতী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তাঁর দুই কন্যা। তাঁর বাহন হংস।

ভাগীরথী—গঙ্গা; ভস্মীভূত সগর সন্তানদের উদ্ধারের জন্য সগর পৌত্র ভগীরথ তপস্যাবলে স্বর্গস্থিত গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন তাই গঙ্গাকে ভাগীরথী বলে।

ভারত—ভারতবর্ষ। আর্যমতে পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। জম্বু, প্লক্ষ, কুষা, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, শাল্মলী দ্বীপের অংশবিশেষকে বর্ষ বলে। জম্বুদ্বীপের যে বর্ষে ভরত নামক রাজা রাজত্ব করতেন তাকে ভারতবর্ষ বলা হয়েছে। ভারতবর্ষ আধুনিক কালে তিনটি রাষ্ট্রে (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) বিভক্ত। ভারত বলতে বর্তমানে সাধারণত ভারত রাষ্ট্রকেই বোঝানো হয়। ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত মহাসাগরকে 'ভারত সমুদ্র' বলা হয়েছে।

ভাসান—মনসামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে রচিত গান মনসার ভাসান।

ভুবনেশ্বর—উড়িষ্যার রাজধানী ও সুপ্রাচীন মন্দির নগরী ভুবনেশ্বর ভারতের অন্যতম দ্রষ্টব্য তীর্থস্থান।

ভূমধ্যসাগর—ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী প্রায় নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। দার্দানেলিশ প্রণালীর মাধ্যমে কৃষ্ণসাগর এবং জিব্রাণ্টার প্রণালীর মাধ্যমে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত।

মকরকেতন—কন্দর্প, কামদেব, মদন। 'মীন কেতন' দেখুন।

মঞ্জু ভাষা—চার্বাকের প্রণয়িনী ছিলেন।

মৎস্যনারী—এক শ্রেণীর কল্পিত প্রাণী যার মাথা ও ধড়টি মানুষের মতো এবং নিচের অংশ মাছের লেজের মতো। এরা সমুদ্রের অধিবাসী। এদেরই স্ত্রীজাতিকে মৎস্যনারী বা মীনকন্যা বলা হ'য়ে থাকে। পাশ্চাত্যদেশের প্রাচীন কিম্বদন্তীতে এদের 'সাইরেন' বা সুধাকণ্ঠ মায়াবিনী মনে করা হ'তো।

মনসা—নীল মাতা বিষহরী মনসা, কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (মতান্তরে শিবের মানসকন্যা ও বাসুকি কর্তৃক লালিতা)। বাসুকীর ভগিনী ইনি জরৎকারু মুনির পত্নী এবং আস্তিক মুনির মা। বিমাতা চণ্ডীর সঙ্গেবিবাদে এঁর এক চক্ষু কানা হ'য়ে যায়।

মনুমেণ্ট—কলকাতার অক্টরলোনি মনুমেণ্ট। গড়ের মাঠে অবস্থিত এই সুউচ্চ স্তম্ভ কলকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য ও শোভা। এখন একে শহীদ মিনার নামকরণ হয়েছে।

মমী—কৃত্রিম রাসায়নিক উপায়ে সংরক্ষিত শবদেহ। মিশরীয় সম্রাটদের দেহ এই উপায়ে সংরক্ষিত ক'রে পিরামিডের মধ্যে গোপন কক্ষে রক্ষা করা হ'তো। তারা বিশ্বাস করতো ভবিষ্যতে দেহ বহির্ভূত আত্মা ফিরে এসে আবার এই দেহে আশ্রয় করবে এবং মানুষ প্রাণ ফিরে পাবে।

ময়—উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো অঞ্চলে সুপ্রাচীন 'মায়া' সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই সভ্যতা প্রসঙ্গেই কি 'ময়' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে?

মহাত্মা গান্ধী—(১৮৬৯-১৯৪৮) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ব্যারিষ্টারী উপলক্ষে আফ্রিকা যান এবং শ্বেতাঙ্গ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ক'রে বিখ্যাত হন। ১৯১৪ সালে ভারতে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। বহুবার আইন অমান্য ক'রে কারাবরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'মহাত্মা' আখ্যা দেন। ১৯২৪ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য ও অন্যান্য বহু অন্যায়ের প্রতিবাদে তাঁকে অনেকবার অনশন করতে হয়। স্বাধীনতার পর ভারত পাকিস্তানের সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে এক প্রার্থনা সভায় আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিতে হয়।

মহাভারত – কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ পর্ব এই মহাকাব্য কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। এতে ১ লক্ষ ১০ হাজার শ্লোক আছে। দেবদেবী সংক্রান্ত নানাবিধ পৌরাণিক কথা রাজ বংশাবলীর ইতিহাস ও ধর্মোপদেশ এর অন্তর্ভুক্ত। মহাভারতকে প্রাচীন ভারতের বিদ্যাকল্পদ্রুম বলা চলে।

মহেন্দ্র – সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ভগিনী সঙ্ঘমিত্রার সঙ্গে সিংহলে গিয়েছিলেন।

মাণিকমালা – রূপকথার নায়িকা।

মাতঙ্গী – দশমহাবিদ্যার অন্যতম মূর্তি মাতঙ্গী।

মাতিস – Henri Matisse (১৮৬৯-১৯৫৪) ফ'-গোষ্ঠীর প্রধান শিল্পী। ইনি Gustave Moreau-র শিষ্য ছিলেন। এর রচনা ইম্প্রোনিজম দ্বারা প্রভাবিত। সেজাঁ ও Signac-র প্রভাব খুব প্রবল দেখা যায়। ১৯১০ সালে পিকাসোর কিউবিক আর্টের সংশ্রবে আসেন এবং এঁর ফলে ১৯১৪ সালে ফ' আন্দোলনের উদ্ভব হয়।

মাথুর – শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ঘটিত ব্যাপারের গীত। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজা হ'য়ে বৃন্দাবন ত্যাগ ক'রে চ'লে যান। অক্রুর এই সংবাদ বহন ক'রে আনেন ফলে বৃন্দাবনস্থিত গোপিনীদের অশেষ দুঃখ আক্ষেপ হয়। এই বিরহ গাথা অবলম্বনে বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর পালা রচিত হয়েছিল।

মানিকতলা – উত্তর কলকাতার একটি অঞ্চল।

মার্কস – জার্মান দার্শনিক Hienrich Karl Marks (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রী.) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা সাম্যবাদের জনক। জার্মানীর ট্রেড্স্-এ ইহুদী বংশে এঁর জন্ম। বিখ্যাত গ্রন্থ Das capital-এর রচয়িতা।

মার্কোপোলো – বিখ্যাত ভিনিসীয় পর্যটক ও আবিষ্কারক মার্কোপোলো (১২৫৬ – ১৩২৩) চীন ভারত ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশসমূহ পরিক্রমা ক'রে ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, সমসাময়িক ব্যক্তিরা এইসব বিস্ময়কর ঘটনা বিশ্বাস না করলেও পরবর্তীকালে তার অনেকাংশ সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে।

মালয় – দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি উপদ্বীপ। এখন সন্নিহিত রাষ্ট্রগুলি একত্র হ'য়ে মালয়েশিয়া রাষ্ট্র গঠন করেছে। মালয়ের সন্নিকটস্থ সাগরকে জীবনানন্দ মালয় সাগর নামে অভিহিত করেছেঁন।

মালাবার – ভারতের পশ্চিম দক্ষিণ উপকূলকে মালাবার উপকূল বলা হয়।

মিউনিখ – জার্মানীর অন্তর্গত ব্যাভেরিয়া প্রদেশের রাজধানী মিউনিখ আইসের নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে হিটলারকে তুষ্ট করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলীন, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের, হিটলার

ও মুসোলিনীর মধ্যে এক চুক্তি হয়। এর ফলে হিটলার অষ্ট্রিয়া গ্রাস করে। রাশিয়ার অজ্ঞাতে এই চুক্তি হয়েছিল।

মিশর—আফ্রিকা মহাদেশের একটি সুপ্রাচীন দেশ। বর্তমান নাম সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র। নীল নদের তীরে উদ্ভূত মিশরীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাসমূহের অন্যতম।

মিহিজাম—বিহারের একটি স্বাস্থ্যবাস।

মীনকন্যা—মৎস্য নারী দ্রঃ।

মীনকেতন—কামদেব, কন্দর্প। এঁর ধ্বজায় মীন বা মাছের চিহ্ন আঁকা থাকতো। মাছ উর্বরতার প্রতীক তাই প্রেমের অধিদেবতার প্রতীক হিসাবে মীন চিহ্ন ধরা হয়েছে মনে হয়।

মুকুন্দরাম—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে কাব্য রচনা করেন। পিতা হৃদয় মিশ্র। ডিহিদার মামুদ শরীপের অত্যাচারে জন্মভূমি দামুন্যা ত্যাগ ক'রে মুকুন্দরাম মেদিনীপুরের আড়রা গ্রামে রাজা বাঁকুড়া রায়ের পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে ছাত্র রঘুনাথ রাজা হ'লে তাঁর অনুরোধে অভয়ামঙ্গল নামে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা ক'রে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন। 'চণ্ডিকামঙ্গল' দেখুন।

মুচিপাড়া—মধ্য কলকাতার একটি থানা এলাকা।

মুন্সী—এখানে সম্ভবত বিখ্যাত লেখক ও রাজনীতিবিদ কে. এম. মুন্সীর কথা বলা হয়েছে।

মেঘনা—পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্রবাহকে মেঘনা বলা হয়। মেঘনা পৃথিবীর বিস্তৃততম নদী। মোহনায় পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সন্দ্বীপ ও ভোলা অবস্থিত।

মেম্নন—ইথিওপিয়ার রাজা মেম্নন খুল্লতাত ট্রয়রাজ প্রায়ামের সাহায্যের জন্য ট্রয়ের যুদ্ধে যান ও অ্যাকিলিসের হাতে নিহত হন। তার মা cosকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। থেবস দ্বীপে অ্যামেনোফিসের যে মূর্তি আছে তাকে গ্রীকরা মেম্নন মনে করে। কথিত আছে, উদিত সূর্যের প্রথম রশ্মিপাতে এই মূর্তি সুরঝংকার তোলে। মনে করা হয়, মা cos (ভোর) পুত্রকে চুম্বন করছে এবং মেম্নন সঙ্গীত-ধ্বনিতে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

মৈত্রেয়ী—ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী। ইনি পার্থিব ধনসম্পদ বর্জন ক'রে স্বামীর কাছে অমৃতের সন্ধান করেছিলেন। ইনি বলেছিলেন যাতে আমি অমৃত হবো না তা দিয়ে কি করবো ?

যদুবংশ—যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু পিতৃশাপে রাজ্যভ্রষ্ট হন। এরই বংশধরেরা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নেতৃত্বে শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে পরাক্রান্ত হয় কিন্তু অন্তর্কলহে সমগ্র বংশই ধ্বংস হয়।

যম—সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে মৃত্যুর অধিদেবতা যমের জন্ম। বিমাতা ছায়া এঁর অযত্ন করলে ইনি তাঁকে পদাঘাত করতে যান, ফলে ছায়ার অভিশাপে পায়ে ক্ষত ও কীট হয়। সূর্য তখন এঁকে এক কুকুর দেন, সে ক্ষত নির্গত পুঁজ ও কীট খায়। ইনি দক্ষিণদিকপাল ও জীবের পাপপুণ্যের বিচারক, যমী এঁর ভগিনী, মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত, আয়ুধ দণ্ড, বাহন মহিষ, দক্ষপ্রজাপতির ১৩টি কন্যার ইনি পানিগ্রহণ করেন। অনীমাণ্ডব্য মুনির শাপে ইনি মর্তে বিদুর রূপে জন্মান। যমের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়।

যমুনা—নদী বিশেষ। সূর্যকন্যা কালিন্দী। বেদোক্ত নদী। এই নামে কয়েকটি নদী আছে। ১। উত্তর ভারতের বিখ্যাত নদী। এর তীরে আগ্রা, বৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি অবস্থিত। প্রয়াগ তীর্থে এই নদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ২। ব্রহ্মপুত্র নদের নিম্নাংশ যা পদ্মার সঙ্গে মিলে মেঘনা নামাঙ্কিত হয়েছে। ৩। ইচ্ছামতীর অংশবিশেষ সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে গঙ্গাসাগরে পড়েছে। ৪। আসামের নদী বিশেষ। ৫। দিনাজপুর জেলায় প্রবাহিত নদী বিশেষ।

যাদবপুর—কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থিত যাদবপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি যক্ষা হাসপাতাল আছে।

য়ুনানী—গ্রীক, আইওনিয়া দ্বীপবাসী।

রবি, রবীন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' নামক ইংরাজী কবিতার বইয়ের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান। কবিতা ছাড়াও গল্প উপন্যাস নাটক, প্রবন্ধ গান ও নৃত্যনাট্যে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। চিত্রকর অভিনেতা ও বক্তা হিসাবেও তিনি বিশিষ্ট ছিলেন। ইনি বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা ক'রে আপন সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দেন।

রাই—'রাধিকা' দেখুন।

রাজবল্লভ—আলীবর্দীখাঁর প্রধানমন্ত্রী জানকীরামের পৌত্র ও রায়দুর্লভ বা দুর্লভরামের পুত্র রাজবল্লভ। দুর্লভরাম আলীবর্দী ও সিরাজের আমলে যুদ্ধ বিভাগের প্রধান দেওয়ান ছিলেন। পিতার সহায়তায় রাজবল্লভ দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হন।

রাজাবাজার—মধ্য কলিকাতায় শিয়ালদহের সন্নিহিত অঞ্চল। এই এলাকায় প্রধানিতঃ দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলমান ও হিন্দু শ্রমজীবিদের বাস।

*রাধিকা—রাধা, রাই। শ্রীকৃষ্ণের মাতুল অভিমন্যু বা আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠা অনুরাগিনী ছিলেন। ইনি বৃষভানুর কন্যা। শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার উল্লেখ নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, দেবী ভাগবত ও পদ্মপুরাণে-রাধার উল্লেখ আছে। 'রা' অর্থে লাভ করা, মুক্তি পাওয়া 'ধা' অর্থে ধাবমান হওয়া। রাধিকা আরাধিকা এবং কৃষ্ণকে আকর্ষক অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবান হিসাবে গণ্য করা হয়।

রামপ্রসাদ—শাক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩-৭৫) ২৪ পরগণা জেলার হালিশহরে জন্ম। কলকাতায় এক ধনীর অধীনে সামান্য চাকরী করলেও সবসময়ে শ্যামাবিষয়ক চিন্তায় মগ্ন থেকে গীত রচনা করতেন। কবিত্বশক্তি দেখে মালিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা ক'রে দেন। পরে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহও লাভ করেছিলেন। এঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতগুলি অতি সহজ ও স্বাদু। একখানি কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ইনি 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ করেছিলেন।

রামেসিস—প্রাচীন মিশরীয় রাজবংশের উপাধি। এর অর্থ সূর্যবংশোদ্ভূত। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশ প্রথম এই উপাধি গ্রহণ করে। সোসোস্ত্রিসকে রামেসিসদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।

রায়—মানবেন্দ্রনাথ রায়। প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৮৭-১৯৫৪) ১৯০৭ সালে এঁর নেতৃত্বে প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতি হয়। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে অস্ত্র আনতে জাভা যান। বাঘা যতীনের মৃত্যু হ'লে চীনদেশে সানইয়াৎ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও ছদ্মবেশে জাপান আমেরিকা মেক্সিকো ঘুরে লেনিনের আমন্ত্রণে রাশিয়ায় তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দেন। মস্কোয় তিনি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। লেলিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় ১৯২৯ সালে কমিনটার্নের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন ও ১৯৩০ সালে দেশে ফিরে বন্দী হন। মুক্তি পেয়ে প্রথম কংগ্রেসে যোগ দিলেও পরে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গ'ড়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালে তাও ভেঙ্গে হিউম্যানিষ্ট আন্দোলনের সূচনা করেন। ইনি বিপ্লবী, দার্শনিক, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও লেখক হিসাবে সম্মানিত।

রায় গুণাকর—ভারতচন্দ্র রায় (১৬৩৪ শক-১৬৮২ শক) হুগলীর পাণ্ডুয়া গ্রামে জমিদার বংশে জন্ম। বর্ধমানরাজের রোষে জমিদারীভ্রষ্ট ও কারারুদ্ধ হন। পালিয়ে গিয়ে নানা তীর্থ ভ্রমণের পর ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের আশ্রয় পান। পরে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁকে আপন দরবারে স্থান দেন ও

কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা ক'রে 'রায় গুণাকর' উপাধি লাভ করেন। বর্ধমানরাজের প্রতি বিরাগহেতু অন্নদামঙ্গল কাব্যে সু-কৌশলে ইনি 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যান জুড়ে দেন।

রাষ্ট্রসংঘ—ইউ. এন. ও.। রাষ্ট্র সমূহের যুদ্ধ-বিবাদ মীমাংসা শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ১৯৪৩ সালে মস্কোর রাষ্ট্রসঙ্ঘের চার্টার গৃহীত হয়। ১৯৪৫ সালে সানফ্রানসিস্কোয় এর গঠন ও কর্মধারা নির্ধারিত হয়। এর কার্যকরী সংগঠন নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সভ্য আমেরিকা, ইংলণ্ড, চীন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার ভেটো দেবার অধিকার আছে। বহু নূতন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির ফলে এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মধারা প্রসারিত হওয়ায় রাষ্ট্রসংঘ আজ এক শক্তিশালী গৌরবমণ্ডিত অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান।

রাহু—বিপ্রচিত্তি দানবের পুত্র রাহু সমুদ্রমন্থনের পর মোহিনীবেশী বিষ্ণুর সুধাবণ্টনের সময় দেবতাদের পংক্তিতে সুধা পান করেন। চন্দ্র ও সূর্য তাকে চিনে একথা বিষ্ণুকে জানালে সুদর্শনচক্রে রাহুর মুণ্ডচ্ছেদ করেন। কিন্তু অমৃতপানের ফলে তার মৃত্যু না হওয়ায় মস্তক ভাগ 'রাহু' ও দেহ ভাগ 'কেতু' নামে পরিচিত হয়। তাই চন্দ্র সূর্যের প্রতি চিরশত্রুতাবশে এরা চন্দ্র ও সূর্যকে সুযোগ মতো গ্রাস করে সুতরাং চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়। রাহু নবগ্রহের প্রথম গ্রহ ও নৈঋ্ত কোণের অধিপতি।

রুদ্র—ধ্বংসকারী শিব। শম্ভু দেখুন।

রুম—রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত। পুরোহিত।

রুশ—রাশিয়ার অধিবাসী, ভাষা, রাষ্ট্র বা উৎপন্ন দ্রব্য।

রুশো—Jen Jacques Rousseau (১৭১২-৭৮) জেনিভাতে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন কঠোর শ্রম ও পর্যটনের পর ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে এসে দিদোর সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর রচিত উপন্যাস সমূহের মুক্ত চিন্তাধারা প্রাচীন পন্থীদের বিরাগের কারণ হয়; ফলে সাময়িকভাবে রুশো ফ্রান্স ত্যাগ করেন। ইংল্যাণ্ডে বাসকালে তিনি Confession এবং Le Contact Social বই দুটি লেখেন। এই অভিনব চিন্তাধারা ও সরকার গঠন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পরিণামে ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত করে।

রূপসা—আসামের নদীবিশেষ।

রোম—ইতালীর রাজধানী। টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত এটি একটি সুপ্রাচীন ও ও সুবিখ্যাত শহর। প্রাচীন বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র ছিল। এখানে ভাটিকান শহরে ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের বাস।

সতী—'দক্ষ যজ্ঞ' দেখুন।

সনকা—মনসামঙ্গলের নায়ক চন্দ্রধর সওদাগরের স্ত্রী, লখীন্দরের মা।

সব্যসাচী—অর্জুন, দুই হাতেই শরসন্ধানে সমান নিপুণ ব'লে অর্জুনকে সব্যসাচী বলা হ'তো। গাণ্ডীব ধনুধারী অর্জুনই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি ছিলেন। 'অর্জুন' দেখুন।

সাজাহাঁ—মোগল সম্রাট সাজাহাঁ জাহাঙ্গীরের পুত্র। শিল্পানুরাগী সাজাহাঁ পত্নী মমতাজের বিস্ময়কর স্মৃতিসৌধ তাজমহল নির্মাণ করেন।

সাভারকর—ভারতীয় জননেতা বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৮৩-১৯৬৬) ১৯১০ সালে স্যার কার্জন ওয়ালিকে হত্যার অপবাদে অভিযুক্ত হন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে বিলাত থেকে ভারতে আসার সময় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মার্সাই শহরে যান কিন্তু ফরাসীদের দ্বারা ধৃত হয়ে ১৯২৪ পর্যন্ত বন্দী থাকেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৩৭-৪২ সালে হিন্দু মহাসভা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সিংহল—প্রাচীন লঙ্কা, সাম্প্রতিক নাম শ্রীলঙ্কা। ভারত মহাসাগরীয় একটি দ্বীপ রাষ্ট্র। শোনা যায় বিজয় সিংহ এই দ্বীপ জয় ক'রে এর সিংহল নাম রাখেন। কথিত আছে এখানে প্রাচীনকালে কুবেরের রাজধানী ছিল, রাবণ তাঁকে বিতাড়িত ক'রে সিংহাসন আরোহণ করেন। পরে বিভীষণ রাজত্ব পান। বিজয়সিংহের রাজধানী ছিল অনুরাধাপুর। 'অনুরাধাপুর' দ্রঃ। সিংহলের সন্নিহিত সমুদ্রকে সিংহল সমুদ্র বলা হয়েছে।

সিদ্ধার্থ—বুদ্ধ দেখুন।

সিন্দবাদ—আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদ নাবিকের কাহিনী প্রসঙ্গ।

সীতা—রামায়ণের নায়িকা সীতা জনকরাজার কন্যা ও রামের পত্নী। পিতৃসত্য-পালনে রাম বনে গেলে সীতাও অনুগামিনী হন। সীতা হরণকারী রাবণকে লঙ্কাযুদ্ধে বিনাশ ক'রে রাম সীতাকে উদ্ধার করলেও আত্মশক্তির জন্য সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়। তবু সীতার চরিত্র বিষয়ে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হ'লে অন্তঃসত্ত্বা সীতা নির্বাসিত হন। পরে দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা দিতে বললে সীতা পাতাল-প্রবেশ করেন।

সীতারাম—সীতারাম রায় বাংলাদেশের বারভুঁইয়ার অন্যতম বিদ্রোহী রাজা ছিলেন। যশোহর জেলার মহম্মদপুরে এঁর বাস ছিল। তৎকালীন বাংলার সুবাদার সীতারামের রাজ্য দখলে ব্যর্থ হন। পরে এর উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগে বাদশাহী সৈন্য মহম্মদপুর আক্রমণ ক'রে সীতারামকে পরাজিত ও বন্দী করে। এর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারাম' উপন্যাস রচনা করেন।

সুজাতা—যে ভক্তিমতী কন্যা তপঃক্লিষ্ট বুদ্ধদেবকে পায়সান্ন খাওইয়াছিলেন।

সুমাত্রা—দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক সুবৃহৎ দ্বীপ সুমিত্রা বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আগে এখানে প্রাচীন ভারতের উপনিবেশ ছিল। এদেশ কফি, গোলমরিচ, চিনি, ধান প্রভৃতি কৃষিজ ও টিন পেট্রোল সোনা প্রভৃতি খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ।

সুমেরীয়—খ্রী. পূ. ৩৫০০ বছর আগে সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটে। তাদের সভ্যতার নিদর্শন নানা বাণমুখ লিপিচিত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্র. উর, বেবিলন।

সূর্য—আদিত্য, রবি, প্রধান দেবতা পত্নী ছাবড়ে তপতী।

সেজান—Paul Cezanne (১৮৩৯-১৯০৬) সম্ভবতঃ গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী। Aix-cn Paovence-এ জন্ম। Bourbon কলেজে শিক্ষা। সেখানে Zola-র সঙ্গে বন্ধুত্ব। ১৮৬১ খ্রী. Passiro-র সঙ্গে পরিচয় ও চিত্র রচনার সাধনা। ১৮৭৪ খ্রী. প্রথম ইম্প্রেশানিষ্ট প্রদর্শনী। রং এবং টোন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেন। Cabism-এর মূলনীতি প্রথম তাঁর সৃষ্টিতে পাওয়া যায়।

সেলিম—ভারতের মোগল সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিম ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ ক'রে সিংহাসনে বসেন। শের আফগানের স্ত্রী মেহেরউন্নিসাকে লাভ করার জন্য শের আফগানকে হত্যা করান। নূরজাহান উপাধি ধারণ ক'রে মেহেরউন্নিসা জাহাঙ্গীরের অংশ গ্রহণ করেন। ১৬২৭ খ্রী. জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।

সোক্রেতিস—প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক। (খ্রী. পূ. ৪৬৯-খ্রী. পূ. ৩৯৯) তখন প্রচলিত সব শিক্ষায় পটুত্বলাভ ক'রে ইনি সৈন্য বিভাগে যোগ দেন। পরে সৈনিকবৃত্তি ত্যাগ ক'রে এথেন্সে বাসকালে জনগণকে ধর্মতত্ত্ব রাজনীতি বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। বিরুদ্ধবাদীদের চক্রান্তে নাস্তিকতা ও তরুণদের কলুষিত করার অভিযোগে ইনি অভিযুক্ত হন ও বিষপানে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপালন করেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এর শিষ্য ছিলেন।

সোফোক্লেস—গ্রীক নাট্যকার (খ্রী. পূ. ৪৯৫ খ্রী. পূ. ৪৫৬) ইনি প্রায় ১০০খানি নাটক রচনা করেন।

সোভিয়েট—এই রুশ শব্দের অর্থ সভা। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পর শ্রমিক সভা বা সোভিয়েট ভিত্তিক শাসনতন্ত্র চালু হয়। সমাজবাদী সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থার বদলে 'সোভিয়েট' কাজটি ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়।

স্ট্যালিন—রুশ রাষ্ট্রনায়ক যোশেফ ভিসারিওনোভিচ স্ট্যালিন (১৮৭৯-১৯৫০) ১৭ বছর বয়স থেকে সক্রিয় বিপ্লবী ছিলেন। ১৯১৭ সালের বিপ্লবে মুখ্য ভূমিকা নেন।

লেলিনের মৃত্যুর পরে রাশিয়ার অবিসংবাদী নেতা হ'য়ে ওঠেন। তাঁর নেতৃত্বে রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যান।

স্ফীংকস—কিম্বদন্তীর ডানাওয়ালা প্রাণী, যার মাথা নারীর মতো আর দেহটা সিংহের মতো। এই মূর্তি মিশরের থেকে উদ্ভূত। সূর্য যখন সিংহ রাশিস্থ হয় তখন নীল নদের জেগে ওঠার প্রতীক। সম্ভবত স্ফীংকসের পরিকল্পনা মেসোপোটামিয়া থেকে উদ্ভূত হয়। রাজাকে দৈবী মূর্তিতে দেখানো তার উদ্দেশ্য ছিল। আনুমানিক ২৯০০ খ্রী. পূ. নির্মিত গীর্জের বিশাল স্পীংকস মূর্তিটির দেহ সিংহের আর মাথা একজন 'এ্যারাও'-এর। কথিত আছে, স্ফীংকস এক জল দানব। সে থেবকের লোকদের এক ধাঁধা জিজ্ঞাসা করতো, উত্তর দিতে না পারলে হত্যা করতো। ইডিপাস সেই ধাঁধার সঠিক জবাব দেন ও স্ফীংকসের মৃত্যু হয়।

স্বর্গ—দেবতাদের বাসস্থান, সুরলোক, অমরাবতী, ত্রিদিব। দেবতারা ও মৃত পুণ্যাত্মারা সেখানে দুঃখবিবর্জিত পরমসুখে বাস করেন। সেখানে রোগ, শোক, ক্ষুৎপিপাসা ক্লান্তি, জরা, মৃত্যু নেই। সুখের অজস্র উপকরণ অমৃত, নৃত্যপরা অপ্সরা, নন্দন কানন কল্পতরু প্রভৃতি আছে। সূর্যের ধ্রুবতারার সংস্থান পর্যন্ত এলাকা হ'লো স্বর্গ।

স্বাতী—অশ্বিনী প্রভৃতির অন্তর্গত পঞ্চদশ নক্ষত্র। এই নক্ষত্র কুঙ্কুমের মতো রাঙা ও এক তারা বিশিষ্ট। কিম্বদন্তী আছে স্বাতী নক্ষত্রের জল সাগরে শুক্তির মধ্যে পড়লে মুক্তা জন্মায়।

হংকঙ্—ক্যাণ্টন নদীরতীরে অবস্থিত চীনের প্রাচীন বন্দর। বর্তমানে ব্রিটিশ অধিকৃত হংকঙ্ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও বিলাসব্যসনের কেন্দ্র।

হরপ্পা—পাঞ্জাবের অন্তর্গত মন্টগোমারী জেলার হরপ্পাতে আনুমানিক ৩০০০ খ্রী. পূ.-এর প্রাগৈতিহাসিক নাগরিক সভ্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায় মহেঞ্জোদাড়োর সমকালীন এই নগরীতে প্রাপ্ত মূর্তি সমূহের গঠন নৈপুণ্য ও শিলমোহর সমূহের লিপিচিত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হরি—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, যিনি পাপ হরণ করেন: মৃত্যুকালে তাই হরিনাম করা রীতি।

হিটলার—(১৮৯৯-১৯৪৫) জার্মানীর রাষ্ট্রনায়ক। নাৎসীদলের নেতা জার্মানীর চ্যান্সেলার ও রাষ্ট্রপতি ছিলেন। জন্মস্থান উত্তর অস্ট্রিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইনিই সূচনা করেন। এ যুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হ'লে ইনি আত্মহত্যা করেন।

হেগেল—১৭৭০-১৮৩০ খ্যাতনামা জার্মান দার্শনিক। ষ্টাটগার্ড-এ জন্ম। কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর দর্শনগ্রন্থের রচয়িতা।

ভিয়েনা—ডানিয়ুব নদীর তীরে অস্ট্রিয়া রাজ্যের ভিয়েনা শহর ইউরোপের সুন্দর শহরগুলির অন্যতম। ১৮১৪ সালে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ভিয়েনা কংগ্রেসে মিলিত ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ফরাসী সাম্রাজ্য ভাগাভাগি ক'রে নেয়। এই চুক্তি ৪০ বছর কার্যকরী ছিল।

ভের্সাই—ফ্রান্সের এই বিশিষ্ট শহর প্যারিসের ১২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত! ১ম বিশ্বযুদ্ধের ভার এখানে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ বাবদ জার্মানীর মাথায় ঋণের বোঝা চাপানো তার বিভিন্ন অঞ্চল ও উপনিবেশ ভাগবাটোয়ারা ও নানা অপমানজনক শর্ত চাপানো হয়। এই চুক্তির দ্বারা লীগ অফ নেশনস্ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও হয়েছিল। তবু এই চুক্তিরই সুদূর প্রসারী পরিণামে হয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

হ্যারিসন রোড—কলকাতার শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন সংযোগকারী প্রধান রাজপথ। বর্তমান নাম মহাত্মা গান্ধী রোড।

হ্যোল্ডেরলিন—জার্মান কবি ফ্রেডেরিখ হ্যোল্ডেরলিন (১৭৭০-১৮৪৩) হেলেনিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। ১৮০৬ সালে তিনি উন্মাদ হ'য়ে যান। সুস্থ অবস্থায় হাইপেরিয়ান উপন্যাস ও সোফোক্লেসের ছ'টি অনুবাদ নাটক মাত্র প্রকাশ করেন। তিনি পাগল হওয়ার পর তাঁর বন্ধুরা তার সমুদয় গ্রন্থ একে একে প্রকাশ করেন! প্রাচীন ছন্দে গ্রীক বিষয় বস্তুর উপরে রচিত তাঁর লিরিকগুলি ধীরে ধীরে কবি হিসাবে তাঁর অসামান্য প্রতিষ্ঠা এনে দেয়।

শব্দপঞ্জী

[জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত ভিনদেশী শব্দসমূহের তালিকা]

আরবী

আখের<আখির—পরিণাম, শেষ, অন্ত।

আশক, আশেক<আশিক—প্রেমিক।

ইদ<ঈদ্—মুসলমানদের প্রধান পর্ব, ঈদ্ উল্-ফিৎর্, ঈদ-উজ্-জোহা।

ইলাহী<ইলাহি—ঈশ্বর, উচ্চ, মহান, বিরাট।

কবর<কব্র্—সমাধি, গোর।

কাফের<কাফির—অমুসলমান, (বাংলা), বিধর্মী।

কুলুপ<কুফ্ল্—তালা।

কোরাণ<কুর্ আন—মুসলমান ধর্মের মূল শাস্ত্র গ্রন্থ।

খবরদারি<খবর্দার—সতর্কতা, তত্ত্বাবধান।

খামির<খমীর—পচানো তামাক, গাঁজা পচাইবার বীজ

খারাবি<খরাবি—অনিষ্ট, দুষ্ট আচরণ।

খারিজ—বাতিল অগ্রাহ্য।

খুন—রক্ত, (বাংলা) হত্যা।

খুন খারাবি<খুন খরাবি—লাল রং বিশেষ, dragon's blood.

খেয়াল<খ'য়াল—কল্পনা, fancy, স্বপ্ন দেখা, শখ, ইচ্ছা, হুঁশ স্মরণ, জ্ঞান অনুমান, প্রবৃত্তি; সুলতান হোসেনী প্রবর্তিত সঙ্গীতের পদ্ধতিবিশেষ।

খেলাপ<খিলাফ্—অন্যথাচারণ, ব্যত্যয়।

গজল—সঙ্গীতের সুরবিশেষ, কবিতা-বিশেষ, প্রেমসঙ্গীত।

জৌলস—উজ্জ্বল্য।

তসবী<তস্বি—মুসলমানের জপমালা।

তাবিজ<তবীজ্—বাহুর অলঙ্কার-বিশেষ, কবচ, মাদুলি।

তালাস<তলাশ—খোঁজ, অনুসন্ধান, search.

দলিল—লিখিত প্রমাণপত্র, স্বত্বাস্বত্ব নির্দেশক পত্র।

নহবত<নওবৎ—সানাই ইত্যাদির ঐকতান বাদ্য।

ফকির—মুসলমান সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক।

ফরাশ<ফারোশ—মেঝের বা বড় তক্তাপোষের আস্তরণ। যে চাকর বিছানা পাতা, ঘর সাফ, বাতি জ্বালা ইত্যাদি কাজ করে।

বুরুজ<বুর্জ—দুর্গাদির প্রাকারের বহির্গত অংশবিশেষ, চূড়াযুক্ত স্তম্ভ, গুম্বজ; তাসখেলা বিশেষ।

বেদুইন—আরব দেশের যাযাবর জাতি-বিশেষ।

মজগুল<মসগুল,—নিমগ্ন, বিহ্বল।

মসজিদ<মস্‌জিদ্‌—মুসলমান উপাসনা মন্দির।

মসলাদরাজ, মসলাদার<মশালাহ্‌দার—খাদ্য সুগন্ধ ও স্বাদু করিবার উপকরণ যুক্ত।

মুয়াজ্জেন<মুআজ্জীন্‌—নামাজের সময়ে মসজিদের মিনার হইতে আল্লাহ্‌-র নাম ঘোষণাকারী।

মুসাফের<মুসাফির—পথিক, বিদেশী ভ্রমণকারী।

মেজাজ<মিজাজ—মনের অবস্থা, mood.

রেওয়াজ—দস্তর, রীতি, চলন।

শরাব—মদ্য।

সফর—ভ্রমণ, দেশভ্রমণ।

ফারসী

আশান<আসান—অবসান, রেহাই, লাঘব।

খুশ, খোস, খোশ<খুশ—আনন্দজনক প্রীতিকর, স্বেচ্ছাকৃত, প্রীত, সন্তোষ।

গুলজারিয়া, গুলজার—ফুলের কেয়ারী, (ব্যঙ্গে) বিভিন্ন পাপীর একত্র সমাবেশ।

জবান—ভাষা, কথা, জিহ্বা।

জমিন<জমীন্‌—কৃষিক্ষেত্র, ভূমি।

জাজিম<জাজম—ফরাস বিছানা ইত্যাদির চাদর।

জাহাঁবাজ<জাহান্‌বাজ—ধড়িবাজ, কূটবুদ্ধি, বহুদর্শী, দুর্দান্ত।

জিঞ্জির—শিকল।

জিন<জীন—ঘোড়ার পিঠের আসন, Saddle.

জুলপি<জুল্‌ফ—কানের পাশে রাখা চুল বা কানের পাশ হইতে গালের কিছু দূর পর্যন্ত রাখা দাড়ি।

তখত, তখ্‌ৎ—সিংহাসন, কাঠের ফলা, board.

দরাজ—মুক্ত, বিস্তৃত, প্রশস্ত।

দরিয়া—নদী, (বাংলা) বড় নদী, সমুদ্র।

দস্তর—প্রথা, নিয়ম, কায়দা।

দিওয়ানা<দিবানা—পাগল।

দিলদার—মহানুভব।

দুষমণ<দুশমন—শত্রু, দুর্বৃত্ত।

নিরিখ<নির্খ—দর, হার, rate.

পরী—পক্ষযুক্তা উপদেবীবিশেষ।

পশমিনা—পশমী বস্ত্রবিশেষ।

পীর—মুসলমান সাধু, মহাপুরুষ।

পেয়ালা,<পিয়ালা—পানপাত্র, বাটি, Cup.

বান্দা, বন্দা<বন্দাহ্‌—দাস, গোলাম, চাকর, অনুগত বা অধীন ব্যক্তি; (ব্যঙ্গে) লোক, chap.

বেলোয়ারী বিল্লৌরী—স্ফটিকের ন্যায় পলতোলা কাঁচ দ্বারা নির্মিত।

বেহুশ, বেহোশ—অচৈতন্য, জ্ঞানহীন।

মীনার, মিনার—স্তম্ভাকৃতি চূড়া বা মন্দির।

রবাব—বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

রোজা—রমজান মাসে পালনীয় মুসলমানের উপবাসব্রত।

রোশনাই, রোশনি—আলোক, আলোকসজ্জা, illumination.

লঙ্গরখানা—সাধারণের রান্নাঘর; বিনামূল্যে অন্ন বিতরণের স্থান।

শাহানশাহ—রাজাধিরাজ, সম্রাট।

সরাই—পান্থশালা, চটি।

সাকী—সুরা পরিবেশনকারী তরুণ বা তরুণী।

সাদা<সাদাহ্—শ্বেত, শুভ্র।

সওয়ার—আরোহী, অশ্বারোহী।

হুণ্ডি—ভিন্ন স্থানস্থ কাহাকেও টাকা দিবার নির্দেশলিপি।

ইংরাজী

Aerial—বায়বীয়, বায়ুবিহারী, শূন্যস্থিত, আকাশতার।

Aerodrome—বিমানঘাঁটি।

Aeroplane—উড়োজাহাজ।

All clear—বিমান আক্রমণের পর নিরাপত্তা সংকেত।

Aluminium—অ্যালুমিনিয়াম, শুভ্র লঘু ধাতু বিশেষ।

Ambulance—আহত বা রুগ্ন ব্যক্তিবাহী যান।

Amoeba—সর্বদা পরিবর্তনশীল জীবাণুবিশেষ।

Art—শিল্প।

Baboon—বৃহৎ বাঁদর বিশেষ।

Ball—গোলক।

Ballot—গুপ্ত ভোটদান পদ্ধতি।

Bank—ব্যাঙ্ক, অধিকোষ।

Barrack—সেনানিবাস, ছাউনি।

Bathroom—স্নানাগার।

Bed—শয্যা।

Beryl—পান্না, ফিরোজমণি।

Blade—ব্লেড, অস্ত্রের ফলক।

Blizzard—তুষার ঝটিকা।

Bobbin—সুতা জড়াইবার নলি।

Bodkin—কাপড় ফুটো করার সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্র।

Bomber—বোমারু সৈনিক বা বিমান।

Bourgeois—ক্ষুদ্র অক্ষরের মাপবিশেষ।

Bread-basket—রুটির টুকরি।

Briar pipe—গাছের শিকড় থেকে তৈরী তামাক খাবার পাইপ।

Bubonic plague—গ্রন্থি স্ফীতিযুক্ত সংক্রামক রোগবিশেষ।

Budget meeting—বার্ষিক আয়-ব্যয়ের আগাম হিসাবের বৈঠক।

Camp—শিবির।

Canary—দ্বীপপুঞ্জবিশেষ।

Canteen—(সেনানিবাসে) মদ্য খাদ্য প্রভৃতির দোকান।

Caravan—মরুভ্রমণকারী বণিকদল, বাস যোগ্য বড় গাড়ী।

Charter—রাজ শাসনপত্র, সনন্দ।

Chemise—সেমিজ, স্ত্রীলোকের লম্বা ঢিলা জামাবিশেষ।

Chorus—একতান সঙ্গীত।
Circus—মণ্ডলাকাকার ক্রীড়াঙ্গন।
Club—প্রমোদ সমিতি।
Commission—কোনো কার্য সাধনার্থ নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।
Committee—কার্যনির্বাহক সভা।
Compass—দিক নির্ণয় যন্ত্র।
Congress—মহাসভা।
Convoy—রক্ষাবাহিনী।
Co-prosperity—সহ-সমৃদ্ধি।
Cormorant—সামুদ্রিক অভিভোজী পক্ষী বিশেষ।
Crane—কপিকল।
Cross—বধকাষ্ঠ, যে দণ্ডকাষ্ঠে যীশু খ্রীষ্টের প্রাণবধ করা হয়।
Dialectic—তর্কশাস্ত্র সম্পর্কীয়।
Dish—থালা, পেয়ালা।
Dock—জাহাজ নির্মাণের বা মেরামতের জায়গা, কাঠগড়া।
Dodo—অধুনা বিলুপ্ত একজাতীয় বৃহৎ পক্ষী।
Dollar—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রৌপ্যমুদ্রা বিশেষ।
Dynamite—বিস্ফোরক বিশেষ।
Dynamo—তড়িতোৎপাদক যন্ত্র।
Electron—পরমাণু, তড়িত-অণু।
Enamel—কলাই, মীনা, দাঁতের মসৃণ কঠিন আচ্ছাদন।
Engine—বাষ্পীয় যন্ত্র।
Factory—কারখানা।
Foot—পরিমাপ বিশেষ, ১২ ইঞ্চি।
Foot-Path—হাঁটিয়া যাইবার পথ।
Gas-lamp—গ্যাসবাতি।
Gas-light—গ্যাসের আলো।
Glacier—হিমবাহ, তুষার নদী।
Glass—কাঁচ, গেলাস।
Grill—হোটেলের রান্নাঘর।
Halitosis—মুখের দুর্গন্ধ রোগ।
Head line—শিরোলিপি।
Heliotrope—সূর্যমুখী।
Hotel—পান্থনিবাস, সরাই।
Hurray—উল্লাস ধ্বনি।
Hydrant—জল তোলার কল।
Hydrogen—উদজান।
Income tax—আয়কর।
Jacket—ছোট জামা বিশেষ।
Jeep—ছোট দ্রুতগামী মোটর গাড়ী।
Jetty—জেটি।
Journal—দিনপঞ্জী।
Lagoon—উপহ্রদ, সমুদ্রের নিকটবর্তী অগভীর লবণাক্ত হ্রদ।
Lamp—দীপ, আলোক
Lens—দৃষ্টিসহায় কাঁচ, পরকলা।
Libido—কামবৃত্তি।
Machine—যন্ত্র।
Magnetic-mine—চৌম্বক মাইন।
Mammoth—অধুনা বিলুপ্ত হস্তী-জাতীয় জন্তু বিশেষ।
Marmalade—মোরাব্বা বিশেষ।
Maroon—আপিঙ্গল, লোহিত।
Meeting—অধিবেশন, বৈঠক।
Microphone—স্বরবিবর্ধক যন্ত্র।

Middle man—দালাল।

Mile—আধ ক্রোশ।

Monument—কীর্তিস্তম্ভ, স্মৃতিস্তম্ভ।

Morgue—শবব্যবচ্ছেদ গৃহ।

Mosaic—চিত্রবিশেষ, কারুকার্য বিশেষ।

Motot car—মোটর গাড়ী।

Mummy—মসলা দ্বারা রক্ষিত শব।

Museum—যাদুঘর।

Nation—জাতি।

Neolith—নব্য প্রস্তরিক।

Nocturne—রাত্রির ছবি, নৈশদৃশ্যের ছবি, স্বপ্নময় সঙ্গীতালেখ্য।

O. K. (All Correct) ঠিক থাকা।

Oasis—মরুদ্যান, মরুভূমির মধ্যস্থ উর্বরা জমি।

Oblong—আযত ক্ষেত্র, আয়তাকার:

Olive—জলপাই।

Overbridge—রেললাইনের উপরকার উচ্চ সেতু।

Pact—চুক্তি, সন্ধি।

Pagoda—বৌদ্ধমন্দির।

Papyrus—ভূর্জপত্র, এক প্রকার চারাগাছ, তার থেকে প্রাচীন-কালে কাগজ তৈরী হতো।

Paraffin—শাদা মোমজাতীয় পদার্থ-বিশেষ।

Party politics—দলীয় রাজনীতি।

Petrol—খনিজ তৈল।

Phoshorescence—অন্ধকারে জ্বলনশীল, অনুপ্রভা।

Photograph—আলোকচিত্র।

Pice restaurant—বিভিন্ন পদের জন্য পৃথক পৃথক মূল্য দিয়া ভাত ইত্যাদি আহারের স্থান।

Piston—পাম্পে ব্যবহৃত ছোট সিলিণ্ডার, চাপদণ্ড।

Plan—অভিসন্ধি, অভিপ্রায়, পরিকল্পনা।

Plane—উড়োজাহাজ।

Plate—রেকাবী।

Poplar—বৃক্ষ বিশেষ।

Power—শক্তি, কর্মদক্ষতা।

Printing press—ছাপাখানা।

Propellar—প্রচালিকা, বাষ্পচালিত তরীর চাকা।

Renaissance—নব জাগরণ, ১৪শ হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে শিল্প ও সাহিত্যের পুনরুভ্যুদয়।

Restaurant—রেস্তোরাঁ, সাধারণ ভোজনালয়।

Ribbon—রেশমী ফিতা।

Ricksaw—রিক্‌শা গাড়ী।

Rubber—রবার।

Saccharin—আলকাৎরাজাত চিনি।

Satin—রেশমী বস্ত্র।

School—বিদ্যালয়।

Simoon—আরবের উষ্ণ বায়ু, উত্তপ্ত বাতাস।

Siren—বিমান আক্রমণের সঙ্কেত-শিঙ্গা, কবি কল্পিত কোকিলকণ্ঠী কুহকিনী।

Skylight—ছাদস্থিত জানালা।

Slogan—স্কটল্যাণ্ডের পার্ব্যত্য প্রদেশের প্রাচীন রণধ্বনি, কোনো দলের বাঁধা বুলি।

Slot machine—মূল ঢুকিয়ে যে যন্ত্রকে চালু করা হয়। স্বয়ংক্রিয় বিক্রয়যন্ত্র।

Soviet—সাম্যবাদী রুশ দেশের প্রতিনিধি সভা।

Splinter—টুকরো, চটা, চোকলা।

Torch—মশাল, পথপ্রদীপ।

Totem—বংশচিহ্ন, কুলকেতু।

Trade union—কর্মী সংঘ।

Traffic—মাল বা যাত্রীর যাতায়াত।

Tram—ট্রাম, লোহার রেলের উপর চালিত গাড়ী বিশেষ।

Truck—ট্রাক, শকট।

Typhoon—প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঘূর্ণিবাত্যা।

U. N. O. (United Nation's Organisation)—সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ।

Velvet—মখমল।

Vitamin—খাদ্য-প্রাণ।

Vote—মতপ্রকাশ।

Wrist watch—মনিবন্ধ ঘড়ি, হাতঘড়ি।

নির্ঘণ্ট

জীবনানন্দ দাশ

অসংগ্রথিত কবিতা

অসংগ্রথিত প্রবন্ধ

জীবনানন্দ দাশের গল্প

ঝরাপালক

———

সংযোজন

সুতীর্থ

'সুতীর্থ' জীবনানন্দের লেখা প্রথম উপন্যাস। 'মাল্যবান' লেখা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের জুন মাসে। 'সুতীর্থ'র রচনাকাল এর অব্যবহিত আগে মে ও জুন মাসে। প্রথম প্রকাশ হয় 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৭৬-এর ৩রা জানুয়ারী থেকে ৪ সেপ্টেম্বর অবধি পর্যায়ক্রমে ৩৬ সংখ্যা ধ'রে। এর প্রকাশে বিলম্বের কারণ বিবৃতি প্রসঙ্গে অশোকানন্দ দাশ লেখেন: "জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে তাঁর রচনার সমস্ত পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে।...উপন্যাসগুলো প্রকাশ সম্বন্ধে কী তাঁর ভাবনাকল্পনা, পরিমার্জনা সম্বন্ধে কীই-বা তাঁর চিন্তা ছিল সবই অব্যক্ত থেকে গেছে। তাই এগুলো প্রকাশে আমার কিঞ্চিৎ সংকোচ ছিল। 'সুতীর্থ' উপন্যাসটি শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং 'মাল্যবান' উপন্যাসটি ...শ্রীঅমলেন্দু বসুকে আমি পড়তে দিয়েছিলুম। তাঁরা দুজনেই উপন্যাসগুলি প্রকাশ করার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন।...এগুলি প্রকাশ করার অধিকার ছিল তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী লাবণ্য দাশের অনুমতি সাপেক্ষ।...তিনি দীর্ঘকাল এই উপন্যাসগুলি প্রকাশ করবার অনুমতি দেননি। ১৯৭৩ সালে...অনুমতি লাভ করি। কালবিলম্ব না করে তাঁর ছোট উপন্যাস মাল্যবান প্রকাশিত হয়।...কিন্তু ছোট ছোট অক্ষরে দ্রুত লিখনের জন্য জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার সহজসাধ্য নয়। কোথাও লাইনের নীচে দাগ আছে, কোথাও দুটি শব্দ পাশাপাশি আছে, যে পাঠ আমাদের অধিকতর উপযোগী মনে হয়েছে তাই আমরা গ্রহণ করেছি।"

'সুতীর্থ' যে ভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা আদ্যন্ত সযত্নে পড়ে আমাদের মনে হয়েছে এতে এখনো অনেক পাঠবিভ্রাট এবং মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে; সেগুলি সযত্নে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করা দরকার। তা ছাড়া উপন্যাস দুটি পাণ্ডুলিপি থেকে অবিকল নেওয়া হয়েছে, অথবা উপন্যাসের সুষ্ঠু অবয়ব বা পরিসমাপ্তি দেবার জন্যে কিছু ছাটকাট বা অদল বদল করা হয়েছে কিনা সে কথা জানতে পারা গেল না। আমার স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে তবে মনে পড়ছে, জীবনানন্দের মৃত্যুর অনতিকাল পরে অশোকানন্দ আমাকে বলেছিলেন যে বই দুটিকে প্রকাশ করতে গেলে এমন অল্প স্বল্প ছাঁট কাটের প্রয়োজন হতে পারে। এই জন্যেই বিশেষ করে এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অপরিতৃপ্ত রয়ে গেল।

'সুতীর্থ' 'মাল্যবানের মতোই নায়ক নামাঙ্কিত উপন্যাস। নানা কারণে উপন্যাসটি 'মাল্যবানে'র চেয়ে স্বতন্ত্র এবং জীবনানন্দের সমস্ত কথা-সাহিত্যের মধ্যে বিশিষ্ট। এখানে জীবনের এক ব্যাপ্ততর পটভূমিতে নায়ক নায়িকাদের উপস্থাপন করা হয়েছে; ঘটনার বৈচিত্র্য এবং উপস্থাপিত চরিত্রের সংখ্যাও এখানে অনেক বেশী। ঘটনা অনেক

আছে বটে, কিন্তু তার বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন, পারম্পর্যহীন এবং উপন্যাসের মূল আখ্যানের সঙ্গে সংযোগশূন্য। বইটি যদি আদ্যন্ত সম্বিত প্রবাহমূলক হতো হয়তো তাহলে এ দোষ উল্লেখনীয় হতো না। কিন্তু রীতির বিপর্যয় একে খাঁটি ঘটনামূলক বা চেতনামূলক কোনটাই হতে দেয়নি, তাই পাঠকরা বই পড়ে খুশি হতে পারে না। এই উপন্যাস লেখকের রচনা রীতিটা হলো, যে কোনো সময়ে যে কোনো স্থানে উপন্যাসের নর-নারীকে পরস্পরের মুখোমুখি করে দেওয়া এবং পরস্পরের চেতনার অভিঘাতে তাদের চরিত্রস্বরূপের উদ্ঘাটন। কিন্তু এই উপন্যাসের মানুষগুলি এত প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, নিজেদের অবস্থা ও প্রয়োজনের সঙ্গে তাদের আচরণ এত সামঞ্জস্যহীন ও প্রতারণাময় যে তাদের কথা ও কাজের কোনো স্থিরতা পাওয়া যায় না, তাই তাদের সম্পর্কে পাঠক একটা সুস্থির প্রত্যয়ে পৌঁছাতে পারে না। জীবনানন্দ যেন দেখাতে চান কালের প্রতিসরণ নেই, যদিবা থাকে তা বর্তুলাকার। দেখাতে চান, জীবনের অস্থিরতা মানুষের কাজে ও কথায় প্রতিফলিত, চেতনা কোন ধ্রুবত্বকে নির্দেশ করে না ; সুতরাং তাঁর উপন্যাস বাহ্যত পূর্বাপর অসংলগ্ন ও উদ্দেশ্যহীন।

নায়ক সুতীর্থ দাশগুপ্তকে লেখক প্রথমে পরিচিত করলেন সাহিত্যিক বলে। সে লেখা ছেড়ে দিয়েছে সময়ের অভাব বশত। দুর্মর তার খামখেয়ালীপনা। বাড়ি ভাড়া দেয় না খেয়াল থাকে না বলে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বলে বেড়ায় পাশ গাঁয়ে তাঁর স্ত্রী পুত্র আছে। পরে জানা যায় পাশ গাঁ বলে গ্রামই নেই পৃথিবীতে স্ত্রী পুত্র তো দূরস্থান। সে উচ্চ পদের অফিসার, খুশি মতো কাজ করে, ডিরেক্টরের পরোয়া নেই তার। নিচু কর্মীদের ধর্মঘটে তাতায়, ধর্মঘট না হলে চাকরী ছেড়ে চলে যায় আকস্মিক যোগাযোগে অন্যত্র শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে। ক্রমে উন্মোচিত হয়, যে আশৈশব বিপ্লববাদী, যদিও অহিংস ; যদিও হত্যায় বিমুখ, বিপ্লবীদের সশস্ত্র সহযোগিতায় পরান্মুখ হয়নি কখনো ; যদিও দেশ সেবা করেছে জেল খেটেছে, পরীক্ষায় বিফল হয়নি, যদিও পড়াশুনো করেছে, সাহিত্য সাধনা ছাড়েনি ; যদিও চাকরী করেছে, কখনো গোলাম বনে নি। অনুমান করা যাক যখন উপন্যাসের ঘটনাকাল, দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর প্রাক্ স্বাধীনতার মুহূর্তে। সুতীর্থর বয়স ৪৬ বলা হচ্ছে ২০ বছর আগে যে গ্রামে ছিল তখন সে স্বপ্ন-চর। আবার বলা হচ্ছে ৩০ বছর আগে ভবতোষ তার স্কটিশে পাঠসঙ্গী। তাহলে কলেজে পড়ার পর সে গ্রামে ফিরে গিয়েছিল কি ? এমন অনেক জটিল গ্রন্থি রয়ে গেছে তার জীবনে। গয়ানাথ মালোর মৃত্যুর পূর্বাপর পরিস্থিতি এমনি একটি গ্রন্থি। গয়ানাথ সুতীর্থকে হত্যা করতে গিয়ে দৈববশে পদস্খলিত হয়ে আত্মঘাতী হয়, সুতীর্থের তাই ধারণা ছিল। এমনও হতে পারে মুখার্জীর দালাল বন্ধুর হাতে খুন হয়েছিল গয়ানাথ। কিন্তু আহত

গয়ানাথকে পাঁজাকোলা করে যে স্নতীর্থ চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, সে কেন গয়ানাথকে মৃত দেখে ফেলে পালালো? পালানোর সময় কেন টাই জুতো ইত্যাদি গয়ানাথের লাসের কাছে ফেলে গেল? কেনই বা স্বপ্নচর হয়ে বার বার ট্রাম পালটালো, শেষে আচ্ছন্নের মতো যখন ঘরে পৌছলো তখন তার মনে থাকলো না, সে নিজে প্রস্তুত কিনা? তার পোষাকের রক্ত তার দেহের ক্ষত জাত কিনা! কিন্তু দেহে তার একটি আঁচড়ও পাওয়া গেল না। স্নতীর্থের মতো যুক্তিবাদী মানুষের কাছে এই আচরণ যেমন সামঞ্জস্যহীন, তেমনি দুর্বোধ্য তার মুখার্জীর কথার ফাঁদে পড়ে গয়ানাথের মৃত্যুর মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে ধর্মঘট থেকে পিছিয়ে আসা, মণিকাকে ব্যবহার করতে চাওয়া মুখার্জীর মনতুষ্টির জন্য, পরিশেষে নিজের অক্ষমতা বুঝে ঘুষ নিয়ে মুখার্জীর শর্তমতো ধর্মঘট ছেড়ে চলে যাওয়া।

বোঝা যায় 'স্নতীর্থ' চরিত্র সম্পর্কে আগে থেকে লেখক সুষ্ঠুভাবে সুপরিকল্পিত ভাবে চিন্তা করে নিতে পারেন নি। লিখতে লিখতে ঘটনা সংস্থানের প্রয়োজনে চরিত্রটির নানা পরিচয় তোলার চেষ্টা হয়েছে এই পরিচয়গুলি একসঙ্গে দেখলে একটা পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তেমনটি ঠিক হয় নি। ঘটনার বাঁকগুলির প্রয়োজনে চরিত্র ও বাঁক ফিরেছে কিন্তু সমস্ত চারিত্রিক বাঁকগুলির পারম্পর্যে নদী-প্রবাহের মতো অবিচ্ছিন্ন গতি নেই। এইজন্যেই কোনো চরিত্রই সঙ্গত ও স্বাভাবিক মনে হয় না; মনে হয়, অনেকখানি আরোপিত ও অসমঞ্জস। স্নতীর্থের মতোই তার স্রষ্টার কল্পনাও খামখেয়ালী ও দায়িত্বহীন।

এমন অজস্র অসঙ্গতি কণ্টকিত স্নতীর্থ উপন্যাসের কাহিনী। কারো উক্তি ও কাজের মধ্যে এমন কোন স্থিরতা নেই যাতে তাদের সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়—পকেটমার হারাণ জানায় তার বাবা শোভান ঘোষ। বাবা-মা মরে গেছে দাঙ্গায়, অথচ মজিলপুরে সে যাবে বাবা মার কাছে, অথচ জানবাজারে থাকে হারাণ, মিঞা সাহেবের কাছে, শোভান মিঞা তার বাবা। এমন অজস্র আত্মখণ্ডনের আত্মপরিচয় শেষ হলে হঠাৎ ছেলেটি "বান মাছের মত সাঁ করে সটকে হঠাৎ কখন ঘাই মেরে অন্ধকারের সময় প্রসৃতির ভেতর ডুবে গেল—স্নতীর্থ আর খুঁজে পেল না তাকে।"

এমন অন্ধকার সময় প্রসৃতির বুক থেকে উঠে আসে ভবতোষ ত্রিশ বছর বাদে হঠাৎ চৌরঙ্গী কফি-হাউসে অপেক্ষারতা পরীদের কাছে স্নতীর্থকে সঙ্গে নিয়ে যাবে কি যাবে না, ট্রামে না ট্যাক্সীতে ঠিক করতে না করতেই হারিয়ে যায় রাত্রির অন্ধকারে আগামী ত্রিশ বছরের মতো। বাসে চলতে স্নতীর্থের সঙ্গে ম্যাকগ্রেগরের আলাপ হয়। অহেতুক মনে হয় স্নতীর্থের তাকে স্কটিশের অধ্যাপক হিসাবে স্বীকার করিয়ে নেবার

চেষ্টা ও তার বারবার অস্বীকৃতি। এসব কিছুই মনে হয় অসংলগ্ন উদ্দেশ্যহীন এমন কি মুখার্জীর জেরার সময় হঠাৎ জানা যায় সুতীর্থ ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে সংযোগ রেখেছে, তারপরেও এই অসংলগ্নতার বোধ খণ্ডিত হয় না।

উপন্যাসটির আগাগোড়াই এমন, কেন যে এত কথাবার্তা, এত চরিত্রপুঞ্জ, এত বিরোধ-সংঘর্ষ, এত পাত্রপাত্রীর কেনই বা এমন আকস্মিক প্রবেশ প্রস্থান, পরিণামী তাৎপর্যের দিক থেকে দেখলে অস্পষ্ট ও অহেতুক মনে হয়। কিন্তু ,এসব সত্ত্বেও উপন্যাসটির এক অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব আছে। সমকাল যে অস্থিরতা দিয়েছে মানুষের জীবনে, যে লোভ, রিরংসা, অসহায়তার শিকার আমরা সকলেই—উপন্যাসের সূচনা থেকে পরিণামের মধ্যে অন্তত তা থেকে উত্তরণের প্রয়াস আছে। বিরূপাক্ষের টাকার প্রলোভনে সুন্দরী সুশিক্ষিতা হয়েও জয়তী এই অর্ধশিক্ষিত ইতরস্বভাবের কনট্রাকটরকে বিয়ে করে জীবনের তিনটি বছর নষ্ট করেছে, বিরূপাক্ষের হীন আস্ফালন ও আত্মম্ভরিতার অন্ধকূপ থেকে জয়তী বেরিয়ে আসবার আগে তার পাঁচ লাখ টাকা ও একখানা বাড়ি বাগিয়ে নিয়ে এলো। এই অর্থের আসক্তি ত্যাগ দুরূহ বলেই সুতীর্থর সঙ্গে তার গ্রামে যাওয়া হলো না। কিন্তু উপন্যাসের শেষে দেখা যায় সে এই প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়েছে।

মণিকা মজুমদার সুতীর্থের বাড়িওয়ালা, অসুস্থ স্বামী ও অভাবগ্রস্ত সংসারের জন্যই হোক বা স্বভাববশেই হোক তারও অর্থের লোভ কম নয়। বিরূপাক্ষ তাকে টাকার টোপ দিয়ে শিকার করতে চায়। মণিকারও সংকল্প বিরূপাক্ষের টাকা নেবে, কিন্তু ধরা দেবে না কিছুতেই। অথচ মণিকা সুতীর্থকে ভালবাসে, মেয়ে অমলার সঙ্গে সুতীর্থর বিয়ের প্রস্তাব রাখে, সে প্রস্তাব সুতীর্থের মনঃপুত নয়। যে মুখার্জীকে মণিকা মুখে চাবুক মেরেছিল একদিন, ধর্মঘটের দাবী আদায়ের জন্য সেই মুখার্জীর কাছেই রাত্রে মণিকাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয় সুতীর্থ। এত অসঙ্গত প্রস্তাবও মণিকাকে ভাবিয়ে তুলতে পারে তার কারণ তো কোনো লোভ নয়, আসক্তি নয়, সুতীর্থর প্রতি সুগভীর সহানুভূতি ও প্রেম একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ক্রমেশ তার আত্মমগ্ন উপদ্বীপ থেকে ইতিহাস প্রবাহের কলরোলের সামনে এসে দাঁড়ায়। সুতীর্থ তার হঠকারিতার, অস্থিরতা ও নিঃসঙ্গতার বলয় পেরিয়ে স্থির করে নেয় গ্রামীণ কর্মসূচী। শ্রমিক আন্দোলন মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের অনির্ভর অসঙ্গতি পেরিয়ে প্রকৃত শ্রমিক নেতৃত্বে এগিয়ে চলবে তার আভাস মেলে। জীবনানন্দের কোনো গল্পে উপন্যাসে এমন বৃহৎ সামাজিক তাৎপর্য আমরা দেখিনি। যেমন উপন্যাসটির প্রায় প্রতিটি পরিচ্ছেদে সূচনার লৌকিকতা পিছনে ফেলে সমাপ্তি এক কাব্যময় দার্শনিকতায় উন্নীত হয়েছে, ঠিক তেমনই সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে একটা উত্তরণ আমরা দেখতে পেলাম।

আমি মনে করি, এই উপন্যাস যোগ্য হাতে সুষ্ঠু সম্পাদনার অপেক্ষা রাখে, পরিচ্ছেদগুলির বিন্যাসের ক্রম কিছুটা পালটালে, কিছু অপ্রয়োজনীয় উটকো প্রসঙ্গ ও উক্তি-প্রত্যুক্তি বাদছাদ দিলে বইটি আরো পরিণত শিল্পশ্রী লাভ করতে পারে। এ বইয়ের ভাষা মাল্যবানের মতই বিশিষ্ট ও অপ্রত্যাশিত, বড়ো লৌকিক, কখনো শ্লীলতায় সীমা না মেনে গা করকর করা ভাষা। কিন্তু এ ভাষা সচেতন। পাঠকদের জিজ্ঞাসার উত্তরে যেন উপন্যাসের চরিত্রের মুখ দিয়েই জীবনানন্দ এ জাতীয় প্রশ্নের জবাব দিয়ে গিয়েছেন :

: 'এ কেমন ভাষা ব্যবহার করছ তুমি—যা মুখে আসছে তাই বলছ। কেমন বাংলা রপ্ত করে নিলে তুমি ?'

: 'বাংলা আমার ঠিকই আছে—ওর জন্যে আমি মাথা ঘামাইনে।

"ভাষা ও চিন্তা কি রকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে টের পাও না তুমি।"

জীবনানন্দের ভাষার এই অপরিচ্ছন্ন বলিষ্ঠ রূপ যে আজকের কবি সাহিত্যিকদের ভাষা চেতনার অগ্রজাতক একথা ভেবে বিস্ময় জাগে।